আধুনিক বাংলা সাহিত্য

মোহিতলালের অন্যান্য গ্রন্থ

প্রবন্ধ ও সমালোচনা

সাহিত্য-কথা

বিবিধ কথা

বিচিত্র কথা

সাহিত্য-বিতান

বাংলা কবিতার ছন্দ

বাংলার নবযুগ

(যন্ত্রস্থ)

কবি শ্রীমধুসূদন

সাহিত্য-বিচার

জয়তু নেতাজী

বিপন্ন বাঙালী

বাংলা ও বাঙালী জাতি

কবিতা

স্বপন-পসারী

বিস্মরণী

স্মর-গরল

হেমন্ত-গোধূলি

রূপকথা

ছন্দ-চতুর্দ্দশী (যন্ত্রস্থ)

আধুনিক বাংলা সাহিত্য

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

জেনারেল প্রিণ্টার্স য্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড
১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১৩৫৩

প্রকাশক : শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ
জেনারেল প্রিণ্টার্স য্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—শ্রাবণ, ১৩৪৩
দ্বিতীয় সংস্করণ—অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯
তৃতীয় সংস্করণ—কার্ত্তিক, ১৩৫৩

মূল্য পাঁচ টাকা

জেনারেল প্রিণ্টার্স য্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেডের
মুদ্রণ বিভাগে [অবিনাশ প্রেস—১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট,
কলিকাতা] শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস এম-এ কর্তৃক মুদ্রিত

স্বর্গীয় পিতৃদেবের

চরণোদ্দেশে
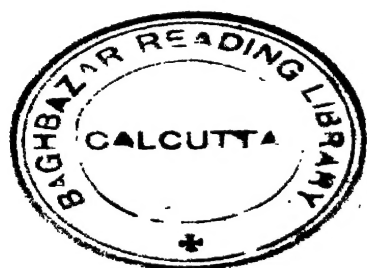
তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে নিঃশেষ হইয়াছিল, তথাপি এ পর্য্যন্ত তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই ইহার জন্য প্রকাশক দায়ী নহেন। অতিশয় দুর্ম্মূল্য অথচ নিকৃষ্ট কাগজে এই পুস্তক ছাপিতে আমিই তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছিলাম। এতদিন পরে তিনি উপযুক্ত কাগজ সংগ্রহ করিয়া এই সংস্করণেও পূর্ব্বের সৌষ্ঠব বজায় রাখিতে পারিয়াছেন—ইহাতে আশা করি বিলম্বের ক্রটী মার্জ্জনীয় হইয়াছে। ঐ কাগজের জন্যই কিঞ্চিৎ মূল্যবৃদ্ধি করিতে হইল—অধিক মূল্যেও এইরূপ কাগজ এ সময়ে সুলভ নহে। এই বিলম্ব ও মূল্যবৃদ্ধির জন্য আমিই দায়ী।

এবার আর একটি নিবন্ধ—নাম, 'আধুনিক সাহিত্যের পরিণাম'—গ্রন্থশেষে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় এইরূপ সমাপ্তির প্রয়োজন ছিল, নহিলে ইতিহাস ক্ষুণ্ণ হইত। উহাতে যে চিন্তা বা মত প্রকাশ পাইয়াছে তাহা আজিকার দিনে বিতর্কের বিষয় হইলেও, ভবিষ্যৎ ইতিহাস-লেখকের কাজে লাগিবে বলিয়া মনে করি।

বাগনান, বি-এন্-আর, }
কার্ত্তিক, ১৩৫৩। }

গ্রন্থকার

মুখবন্ধ

বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধরাশি হইতে কয়েকটিমাত্র কুড়াইয়া ও সাজাইয়া 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' প্রকাশিত হইল, এজন্য গ্রন্থারম্ভে কিছু বলিবার আছে।

প্রথমেই বলিয়া রাখি, এই গ্রন্থ আধুনিক বাংলাসাহিত্য সম্বন্ধে ঐতিহাসিক পদ্ধতি-মূলক গবেষণা নহে, অর্থাৎ পাণ্ডিত্যপূর্ণ 'থীসিস্' নহে। এই প্রবন্ধগুলি লিখিবার কালে লেখকের মনে যাহা ছিল তাহা এই। উনবিংশ শতকের শেষভাগে বাংলাসাহিত্যে যে অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তন দেখা দেয় তাহা বুঝিতে ও মানিয়া লইতে বিলম্ব হয় নাই; আজ এত-কাল পরে সে পরিবর্ত্তন আর লক্ষ্যগোচরই হয় না,—মনে হয় ইহাই যেন এ সাহিত্যের সনাতন রীতি; এমন কি, এই সনাতন রীতির বিরুদ্ধে আজ বিদ্রোহ জাগিয়াছে। ভাবটা যেন এই; য়ুরোপীয় সাহিত্য ও আমাদের সাহিত্য একই, সেখানে যাহা হইতেছে, এখানেও তাহা হওয়াই স্বাভাবিক। অতএব, এই যে সাহিত্য—মধুসূদনে যাহার প্রথম পূর্ণ উন্মেষ, এবং রবীন্দ্রনাথে যাহার অন্তিম পরিণতি, যাহাকে 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' নামে অভিহিত করা যায়—তাহা যে 'আধুনিক' হইলেও 'বাংলা' সাহিত্য, ইহা ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। কারণ, ইহা পূর্ব্বতন সাহিত্য হইতে বিলক্ষণ হইলেও ভুঁইফোঁড় নহে। আমাদের জীবনে যতটা না হউক, সাহিত্যে—ইংরাজীতে যাহাকে Renaissance বা 'পুনরুজ্জীবন' বলে তাহাই ঘটিয়াছিল; কিন্তু দেহ ও প্রাণধর্ম্ম দেশেরই, বাহির হইতে আসিয়াছিল কেবল সঞ্জীবনী ভাব-প্রেরণা। অতএব, আজ সাহিত্য ও ভাষার এই আদর্শ-সঙ্কটের দিনে, জাতির প্রতিভা ও প্রকৃতিগত প্রবৃত্তি—এক কথায়, তাহার স্বধর্ম্ম,—এই নব্য সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে কতখানি অনুকূল বা প্রতিকূল হইয়াছে তাহা বুঝিয়া লইবার প্রয়োজন হইয়াছে।

এজন্য আমি এই সাহিত্যের ভিতরেই বাঙ্গালীর যে জাতিগত বৈশিষ্ট্য—ভাব ও ভাবনার যে কয়টি প্রধান লক্ষণ—ধরিতে পারিয়াছি, তাহারই সূত্র অবলম্বন করিয়া এই যুগের কয়েকজন কবি-লেখকের সাহিত্যিক প্রতিভা, কবি-মানস, ও কাব্যকীর্ত্তির আলোচনা করিয়াছি। এই সাহিত্যের কালক্রমিক ধারা এবং সেই ধারা-অনুযায়ী লেখকগণের পুরুষানু-ক্রমিক ইতিবৃত্ত-রচনাই আমার অভিপ্রায় নহে—আমি এই সাহিত্যের মধ্যে বাঙ্গালীর ভাব-শরীরের প্রতিকৃতির সন্ধানই করিয়াছি। তাই, দেখা যাইবে, যাঁহারা অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী, যেমন—হেম ও নবীন, অথবা যাঁহারা অত্যুৎকৃষ্ট প্রতিভার অধিকারী, যেমন—মধুসূদন ও বঙ্কিম, তাঁহাদের সম্বন্ধে যথোচিত বিস্তৃত আলোচনা এই গ্রন্থে নাই; আবার, যাঁহারা তাদৃশ প্রতিভাশালী বা খ্যাতনামা নহেন তাঁহাদের বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি; এবং সকল লেখকের প্রসঙ্গেই কয়েকটি মূল-কথার পুনরাবৃত্তি করিয়াছি।

ঐতিহাসিক পদ্ধতি-প্রয়োগের অবকাশও এখানে নাই। কারণ, এ সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যই এই যে, ইহার প্রেরণা মুখ্যতঃ অন্তর্মুখী; বহির্গত ব্যাপারের সহিত ইহার কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ খুব অল্প। যে দুইটি ঘটনা গৌণ ও মুখ্যভাবে এই সাহিত্যকে সম্ভব করিয়াছে তাহা—ইংরেজের আইন ও ইংরেজী-শিক্ষা; বাকী যাহা-কিছু তাহা বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব। আমার যে অভিপ্রায়ের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি তাহার পক্ষে ঐ দুইটির ব্যাখ্যা-বিবৃতি সম্পূর্ণ অবান্তর। এ প্রসঙ্গে একটা প্রধান কথা এই যে, এই সাহিত্য প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কাব্য-প্রধান, ভাবোচ্ছল, আদর্শপন্থী। অক্ষয়কুমার দত্তের জ্ঞান-পিপাসা বা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কর্ম্মযোগ বাংলা গদ্য-সাহিত্যে যে প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিল, তাহা অকালেই নিবৃত্ত হইয়াছিল। মধুসূদনের মহাকাব্যও যেমন কবিতার গীতিচ্ছন্দ রোধ করিতে পারে নাই, বঙ্কিমচন্দ্রের পুরুষোচিত প্রতিভাও তেমনই জাতির অতীত-গৌরবের ধ্যানে বাংলাসাহিত্যের যে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিল, তাহাতে ভাব-কল্পনার আবেগই শেষ পর্য্যন্ত অটুট হইয়া রহিল। অতএব যে-প্রভাবে এ সাহিত্যের জন্ম, তাহা নিকট-বাস্তবের নহে—পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাব-রাজ্য হইতে তাহার বীজ অন্তরেই অঙ্কুরিত হইয়াছিল, বাহিরের সহিত তাহার বিশেষ যোগ ছিল না; বরং বাস্তবের প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন, মুক্ত-স্বাধীন কবি-কল্পনাই জীবনের অতি ঊর্দ্ধে এক উদার নক্ষত্র-লোক বিস্তার করিয়াছিল। এজন্য সাল-তারিখ-সমন্বিত ঘটনার ঐতিহাসিক ক্রমে আমি এই আলোচনাগুলিকে সন্নিবিষ্ট করি নাই।

আমার অভিপ্রায় কতদূর সফল হইয়াছে জানি না, কিন্তু এ বিশ্বাস আমার আছে যে, এই লেখাগুলিতে আধুনিক গবেষণার পাণ্ডিত্য না থাকিলেও, আমি ভাবের ঘরে চুরি বা আত্মপ্রতারণা করি নাই—আমার অন্তরের আলোক কুত্রাপি হারাই নাই।

অভিপ্রায়ের কথা বলিলাম। এইবার এই লেখাগুলির পশ্চাতে যে একটু কাহিনী আছে তাহাই বলিব, তাহাই আমার কৈফিয়ৎ।

আমি আজীবন কাব্যচর্চ্চাই করিয়াছি; কাব্যরসের স্বাদ-বৈচিত্র্য, সাহিত্যের সৃষ্টিতত্ত্ব, কবিপ্রেরণার গূঢ়রহস্য—প্রভৃতির ভাবনা ও জিজ্ঞাসা আমাকে চিরদিন আকৃষ্ট করিয়াছে। ১৩২৬ সনের 'ভারতী' পত্রিকায় আমি এ বিষয়ে লিখিয়া-ভাবিতে আরম্ভ করি। কিন্তু শীঘ্রই বুঝিতে পারিলাম, এরূপ নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব-আলোচনার দিন আমাদের সাহিত্যে এখনও আসে নাই; বাংলাভাষায় আধুনিক-সাহিত্য যেটুকু গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার সম্বন্ধেই আধুনিক-রীতিসম্মত কোন সমালোচনা এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। একমাত্র রবীন্দ্রনাথ এককালে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে বিশ্বসাহিত্য ও বাংলাসাহিত্য উভয়েরই কিঞ্চিৎ আলোচনা ছিল; কিন্তু সেগুলির মধ্যেও ব্যস্ততার লক্ষণ আছে; এবং আলোচনার প্রণালীও স্পষ্ট নহে। তথাপি তাহাতে আধুনিক-সাহিত্য-সমালোচনার একটা ভিত্তি-স্থাপনা হইয়াছিল। কিন্তু ইহার পর আর বিশেষ কিছুই হয় নাই; যাহা কিছু হইয়াছে এবং এখনও

হইতেছে তাহা সাহিত্য অথবা বাংলাসাহিত্যের আলোচনা নয়—রবীন্দ্র-জয়ন্তী বা শরৎ-প্রশস্তির কলোচ্ছ্বাস।

ইহার পর, ১৩৩০ সালের 'নব্যভারত'-পত্রিকায় আমি ধারাবাহিকভাবে আধুনিক বাংলাসাহিত্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাও শেষ করিতে পারি নাই। ঐ আলোচনায় অতিশয় দ্রুত-চিন্তা ও অধীরতার কারণ ছিল, ফলে উহা ত্যাগ করিতে বাধ্য হই। কিন্তু আধুনিক বাংলাসাহিত্য সম্বন্ধে আমার নিজস্ব ভাবনার কয়েকটি কথা উহাতেই প্রথম প্রকাশ পাইয়াছিল। ইহার ২।৩ বৎসর পরে 'প্রবাসী'তে 'কাব্য-কথা' নাম দিয়া কয়েকটি প্রবন্ধ লিখি; বাংলা ও ইংরাজী, উভয়বিধ কাব্য হইতে দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিয়া আমি বাংলায় একটা Theory of Poetry বা কাব্যবিজ্ঞান খাড়া করিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু অদৃষ্টক্রমে উৎসাহের অভাবে আমি উহাও সম্পূর্ণ করিতে পারি নাই—যদিও প্রবন্ধগুলি স্বতন্ত্রভাবে সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

উপরি-উক্ত কাহিনী হইতে আমিও বুঝিতে পারি যে, বঙ্গভারতীর বীণা লইয়া যে অনধিকার-চর্চ্চা করিয়াছি তদপেক্ষা দুঃসাহসিক অনধিকার-চর্চ্চায় বার বার প্রলুব্ধ হইয়া বিশেষ কিছুই করিয়া উঠিতে পারি নাই—প্রাণে যে তাড়না অনুভব করিয়াছিলাম, বর্ত্তমান বাংলাসাহিত্যের প্রতিকূল আবহাওয়ায়, এবং নিজের অনুপযুক্ততার কারণে, আমাকে বারবার তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে হইয়াছে।

কিন্তু ইহার পরেও স্থির থাকিতে পারি নাই। আমাদের সাহিত্যের গত-যুগকে বুঝিবার যে প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলাম, এবং বর্ত্তমানকালে আধুনিকত্বের যে ব্যাধি ছোট-বড় সকলের মধ্যে দ্রুত সংক্রামিত হইতে দেখিলাম, তাহাতে বাংলা-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে না পারিয়া, এবং যোগ্যতর ব্যক্তিকে এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে না দেখিয়া, আমি আমার ক্ষুদ্র শক্তি ও অপ্রচুর বিদ্যাবুদ্ধি লইয়াই নব্য বাংলাসাহিত্যের অন্তর্নিহিত ধর্ম্ম ও তাহার গতি-প্রকৃতির পরিচয়-সাধনে ব্যাপৃত হইলাম। এই সময়ে 'শনিবারের চিঠি' নামক বহুনিন্দিত পত্রিকার উদ্ভব হয়; ঐ পত্রিকাতেই সাহিত্যসমালোচনার মূলসূত্র ও আধুনিক বাংলাসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমি দীর্ঘকাল ধরিয়া যথাসাধ্য আলোচনা করিয়াছিলাম। যাঁহাদের অকৃত্রিম আগ্রহ ও সাহিত্যিক সমপ্রাণতা এই কার্য্যে আমার উৎসাহ রক্ষা করিয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমান্ সজনীকান্ত দাস, শ্রীমান্ নীরদচন্দ্র চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত গোপাল হালদারের নাম আমি এক্ষণে স্মরণ করিতেছি। শ্রীমান্ সজনীকান্ত 'শনিবারের চিঠি'তে অতিশয় অপ্রিয় ও দুঃখকর আলোচনার ভার লইয়া যে ভাবে আমার লেখাগুলির জন্য উন্মুখ হইয়া থাকিতেন—নিন্দার বিষ নিজ অংশে রাখিয়া যে ভাবে প্রশংসার মধু আমার জন্য সংগ্রহ করিতেন, এবং তাহাতেই কৃতকৃতার্থ বোধ করিতেন—আজিকার দিনে সেরূপ সাহিত্য-প্রীতি যথার্থই দুর্লভ। এ গ্রন্থের প্রায় সকল রচনাই এমনই ভাবে এই কালে লিখিত

হইয়াছিল। কেবল 'রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটি রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে লিখিত ও 'জয়ন্তী-উৎসর্গ' নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছিল। অক্ষয়কুমার বড়াল সম্বন্ধে আলোচনা ইতিপূর্ব্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। কি ভাবে ও কি অবস্থায় এই গ্রন্থের সূচনা হইয়াছিল তাহা জানাইলাম। আশা করি, এ কাহিনী অবান্তর নহে।

কিন্তু অভিপ্রায় যাহাই হউক, এই রচনাগুলি একটি যুগবিশেষের বাংলাসাহিত্যের কথা হইলেও এ সাহিত্যের প্রকৃতি ও মূল্য-নির্ণয়ে আমি সর্ব্বকালের সাহিত্যের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াছি; এবং আলোচনাপ্রসঙ্গে বহুস্থলে কাব্য-সৃষ্টির মূল-তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছি। এজন্য আধুনিক সাহিত্য-বিচারের কতকগুলি অপরিহার্য্য শব্দ ইংরাজী হইতে বাংলায় অনুবাদ করিতে হইয়াছে। সেগুলির সকলই যে সুষ্ঠু হইয়াছে, এ বিশ্বাস আমারও নাই; বরং এবিষয়ে নিজে সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই বলিয়া, একই অর্থে ভিন্ন শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করিয়াছি; এমন কি, ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিতেও সঙ্কোচ বোধ করি নাই। উদ্দেশ্য এই যে, যেটি চলিবার সেটি চলিয়া যাইবে; এবং ইংরেজী শব্দের দ্বারা যে অর্থনির্দ্দেশ এখনও আবশ্যক, পরে আর তাহা হইবে না। ইতিমধ্যে আমার রচিত দুয়েকটি শব্দ চলিত হইয়াছে—"ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য" শব্দটি আমারই রচিত, দেখিলাম উহা চলিতেছে।

একটি কথা গ্রন্থের যথাস্থানে উল্লেখ করা হয় নাই, এইখানে তাহা করিব। অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্যগুলির যে কালক্রম ধরা হইয়াছে তাহা প্রথম সংস্করণগুলির নয়—দ্বিতীয় সংস্করণের। কবি তাঁহার কবিতা, তথা কাব্যগুলির যে ক্রমানুবদ্ধ নূতন করিয়া ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন, আমিও সেই ধারাটি রক্ষা করিয়াছি, অর্থাৎ কবিমানসের বিকাশ-ভঙ্গিটি কবির দিক দিয়াই দেখিয়াছি। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে অক্ষয়কুমারের কবিতা সম্বন্ধে—'শনিবারের চিঠি'তে (বৈশাখ, ১৩৩৬) যে উপাদেয় নিবন্ধটি প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেটিও এই সঙ্গে পঠিতব্য বলিয়া মনে করি।

রচনাগুলির শেষে যে তারিখ দেওয়া আছে, উহা প্রথম-প্রকাশের তারিখ; যে-রচনা খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহারও আরম্ভের তারিখই দিয়াছি। মুদ্রাকর-প্রমাদ কিছু কিছু আছে, কিন্তু সেগুলি তেমন মারাত্মক নয় বলিয়া শুদ্ধিপত্রের শরণাপন্ন হইলাম না।

নীলকেত, রমনা
ঢাকা, শ্রাবণ, ১৩৪৩

গ্রন্থকার

সূচী

পরিশিষ্ট

আধুনিক বাংলা সাহিত্য

একথা বলিলে ভুল হইবে না যে, আধুনিক সাহিত্যেই বাঙ্গালী জাতির জীবনীশক্তি ও প্রাণশক্তির একটি সুগভীর পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে; কারণ, বাহিরের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টার মধ্যে এ যুগের বাঙ্গালীর স্বরূপ এখনও তেমন সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই—চরিত্র ও কর্ম্মবুদ্ধির অভাবে সেখানে সে বিশেষ সাফল্য লাভ করে নাই। সে-যুগে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য অটুট ছিল, নবতি বৎসর বয়সেও দেহ-মনের সামর্থ্য একেবারে লোপ পাইত না, পুত্র-পৌত্রাদিবহুল পরিবার তখনও চারিদিকে বিদ্যমান। এজন্য বিদেশী শিক্ষা ও সভ্যতার তীব্র মদিরাও বাঙ্গালীর মনের পক্ষে রসায়নের কাজ করিয়াছিল, প্রাচীন সমাজের সুদৃঢ় বন্ধনের মধ্যেও তাহার প্রাণে নবীনতার আবেগ নিষ্ফল হয় নাই। যে শক্তি এতদিন সুপ্ত ছিল, তাহা বাস্তবজীবনে বাধা পাইলেও ভাবনা, ধারণা ও ধ্যান-কল্পনার ক্ষেত্রে অতিশয় বলিষ্ঠভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। সংস্কারের মোহ ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, আত্মদমনের শাস্ত্রবিধি ও ইতিহাস-বিজ্ঞানের পৌরুষ-পাঞ্চজন্য, তাহার হৃদয়ে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাতে সে ভিতরে ভিতরে অতিশয় অধীর ও অশান্ত হইয়া উঠিতেছিল; বাহিরে যাহার সহিত সন্ধি করিতে না পারিয়া সে একটা ঘূর্ণীর মধ্যে ঘুরিতেছিল, অন্তরে সে তাহার সহিত আরও স্বাধীনভাবে বোঝাপড়া করিবার সাধনা করিয়াছিল। সেই সাধনার প্রাণময়তা, সেই সংগ্রামের উল্লাস, এবং আত্মচেতনার স্ফূর্ত্তি এই সাহিত্যের মধ্যে উদ্বেলিত হইয়াছে। এ যুগের সাধনায় যদি জাতির সেই বিশিষ্ট চেতনা জাগিয়া না থাকিত, সে যদি ভাবের বিশ্বাকাশে আপনার মনোরথকে ছাড়িয়া না দিয়া, প্রাণরশ্মির দ্বারা তাহাকে আপনার পথে—স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের নিয়তি নির্দ্দিষ্ট রথবর্ত্মে—চালাইবার শক্তি না পাইত, তবে সাহিত্যে প্রাণের সাড়া জাগিত না, ভাষা ফুটিত না, সাহিত্যেরই সৃষ্টি হইত না।

মাইকেল হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর এই সাহিত্য-জীবনের ধারা, এবং গতি প্রকৃতির নানা দিক আছে; সকল দিকগুলির সম্যক আলোচনা করিতে না পারিলে, বাঙ্গালীর এই যুগের সাধনা ও সিদ্ধির একটা সুস্পষ্ট ধারণা হইবে না। বহু প্রাচীন অতীতের ইতিহাস এখনও উদ্ধার হয় নাই, কাজেই কীর্ত্তি-পরম্পরার ভিতর দিয়া জাতির অদৃষ্টলিপি বুঝিয়া লইবার উপায় নাই। অতএব সদ্য-বিগত কালের যে একমাত্র কীর্ত্তির মধ্যে বাঙ্গালীর একটা পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতেই আমাদের জাতীয় জীবনের একটা আভাস পাওয়া যাইবে। এজন্য এই সাহিত্যের উৎপত্তি, তাহার প্রধান প্রবৃত্তি, এবং বর্ত্তমান পরিণতির কথা আর এক দিক দিয়া অনুধাবন করিবার প্রয়োজন আছে।

'জাতীয়তা' ও 'সাহিত্য'—আজকালকার কাল্‌চার বিলাসী, dilettante বাঙ্গালীর মতে —এই দুইটি শব্দ পরস্পর-বিরোধী। সাহিত্যে এখন বিশ্বজনীনতার নামে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধুয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মনস্তত্ত্ব ও সাহিত্য-ধর্ম্মের দিক দিয়া এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য কি অর্থে কতখানি সত্য, সে বিচারের ক্ষমতা বা প্রয়োজন কাহারও নাই। অথচ দেখা যাইতেছে ব্যক্তির খেয়াল-খুশি, বা pseudo-Romantic ভাবতন্ত্রের তাণ্ডব-লীলা এ যুগে সাহিত্য-সৃষ্টির পক্ষে ব্যর্থ হইয়াছে। আজকাল য়ুরোপীয় সাহিত্যে spirit-এর উপর matter জয়ী হইয়াছে; আধুনিক লেখকেরা যে স্বাধীন ভাব-কল্পনার দাবী করিয়া থাকেন, মূলে তাহা বাহিরের নিকটে অন্তরের পরাজয়, বস্তুর নিকটে আত্মসমর্পণ,—সমাজের যুগ-প্রয়োজন স্বকীয় কল্পনার পক্ষচ্ছেদ। এই সকল লেখকেরা আত্মভ্রষ্ট, বস্তু-নিগৃহীত, সামাজিক সমস্যার অন্ধ তাড়নায় সনাতন ভাব-সত্য হইতে তিরস্কৃত। ইহারা স্বাধীন নয়, ইহাদের স্বাতন্ত্র্য একটা মোহ মাত্র; ইহারা জড়জীবী, চিৎ-শক্তিহীন, বর্ত্তমানের আবিল ও বিক্ষুব্ধ জলস্রোতের ক্ষণ-বুদ্বুদ— ইহাদের রচনা শতাব্দী পরে যুগবিশেষের দাহচিহ্ন মসীরেখার মতই মিলাইয়া যাইবে।

ব্যক্তিতন্ত্র বা বস্তুতন্ত্র—ইহার কোনটাই খাঁটি সাহিত্যতন্ত্র নয়। সাহিত্য-সমালোচনায় যে সকল বাক্য বা formula ব্যবহার করা হয়, তাহার দ্বারা কাব্যসৃষ্টির প্রক্রিয়াটিকে ধরিবার চেষ্টা করা হয় মাত্র। সমালোচনা-শাস্ত্র এ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে নানা তত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়া হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। আসলে যাহা সাহিত্য তাহা একই নিয়মে সৃষ্ট হইয়া থাকে, নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথ্বী তাহাকে একই রূপে চিনিয়া লয়; যাহা accidental তাহাই যদি essential হইয়া উঠে, তবে সে ভুল ভাঙ্গিতে বিলম্ব হয় না। সাহিত্যে ব্যক্তিও আছে, বস্তুও আছে; কিন্তু ব্যক্তিতন্ত্র বা বস্তুতন্ত্র নাই। যাহা তর্ক-বিচারের অতীত তাহা লইয়া আমরা যখন বিচার করিতে বসি, তখনই এইরূপ বৈলক্ষণ্য নির্দ্দেশের প্রয়োজন হয়—কিন্তু যে-গুণে রচনা কাব্য হইয়া উঠে তাহার মূল রহস্য একই। তথাপি এইরূপ বিচারেও ক্ষতি নাই—যদি সেই বিচার-বিতর্কের সিদ্ধান্তগুলিকে একটা গণ্ডির মধ্যে মানিয়া লওয়া হয়। কারণ, মনে রাখিতে হইবে, এই সকল সিদ্ধান্ত কাব্যসৃষ্টির রহস্য সম্বন্ধে আমাদের মনের কৌতূহল চরিতার্থ করে মাত্র—রসাস্বাদ বা রসের ধারণার ইতর-বিশেষ করিতে পারে না। কাব্যরচনায় রসের উৎপত্তি কেমন করিয়া হয়, কবির প্রাণের কোন নিগূঢ় নিয়মের বশে কাব্যসৃষ্টি হয়, তাহা যেমন রসের ধারণা বা রসতত্ত্ব হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় না, তেমনই কবির যে প্রাণধর্ম্ম কাব্যসৃষ্টি করে, সেই প্রাণধর্ম্মের লক্ষণগুলির উপরে রসতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হয় না। বিভিন্ন কবির বিভিন্ন emotions বিশ্লেষণ করিয়া আমরা কাব্যের উপাদান-উপকরণের বৈচিত্র্য দেখিয়া মুগ্ধ হই—কবিবিশেষের ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকার ভেদ আমাদের ব্যক্তিগত রুচির অনুকূল অথবা প্রতিকূল হয়; কিন্তু emotions-এর ঐ প্রকারভেদ পর্য্যন্তই যদি কাব্যের স্বরূপ-নির্দ্দেশ হয়, তবে তাহা রস পর্য্যন্ত আর পৌঁছাইবে না—কাব্য ঐখানেই ইতি। অতি-আধুনিক সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি এবং তাহার সম্বন্ধে

রসিকের রসোচ্ছ্বাস দেখিয়া মনে হয়, ইহারা কাব্যকে হারাইয়া, সোনা ফেলিয়া আঁচলে গিরা দিতেছে। কাব্যে তাহারা কবির খেয়াল-খুশি, অথবা জীবনের যে দিকটা জড়চেতনার দিক—spirit যেখানে matter-এর দ্বারা অভিভূত—সেই বস্তু-পীড়িত চেতনাকে উৎকৃষ্ট কবি-প্রেরণা বলিয়া মনে করিতেছে। ক্ষণ-পরিচ্ছিন্ন তড়িৎ-স্পর্শের মত যাহা তাহাদের স্নায়ুকে মাত্র আঘাত করে তাহাই কাব্যরস! প্রকৃত জীবন-রহস্যের পরিবর্ত্তে, পারিবারিক, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় জীবন-যাত্রার যে সব জমা-খরচের হিসাব মানুষের জড়চেতনাকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে—তজ্জনিত জৃম্ভণ, উদ্গার, আর্ত্তনাদ, প্রলাপ ও দুঃস্বপ্ন যে রচনায় যত অধিক প্রকট হইয়াছে তাহাই তত উৎকৃষ্ট কাব্য! এ অবস্থায় কাব্যসমালোচনা নিষ্ফল।

কিন্তু আমরা গত যুগের বাংলা সাহিত্যের কথা বলিতেছি। সে সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে খুব আধুনিক সাহিত্যনীতি অবলম্বন না করিলেও বোধ হয় চলিবে; আমরা সে সাহিত্যের কাব্যগুণ বিচার করিতেছি না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই সাহিত্যের ইতিহাসে আমরা বাঙ্গালীর হৃদয়-সংগ্রাম, তাহার 'জাতীয়' আত্মপ্রতিষ্ঠার একটা বিপুল প্রয়াস দেখিতে পাই। বাঙ্গালী যে তখনও বাঁচিয়াছিল—আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রসার, জীব-ধর্ম্মের এই দুই শক্তির প্রমাণ তাহার এই সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই প্রাণশক্তি ছিল বলিয়াই সে তাহার প্রাণের ভাষাকে এমন সুন্দর, সুদৃঢ় ও সুপরিপুষ্টরূপে ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছিল। আজও পর্য্যন্ত আমরা সাহিত্যের নামে যে অনাচার করিতেছি তাহা এই ভাষারই বুকে; আজও পর্য্যন্ত আমরা গদ্যে ও পদ্যে যে বমন ও রোমন্থন করিতেছি তাহাও পিতৃপিতামহ-নির্ম্মিত এই সাহিত্যের শিলা-চত্বরের উপরেই। কারণ, কি ভাষা, কি সাহিত্য, কোন দিক দিয়াই আমরা সেই মন্দিরে একটি নূতন চূড়া তুলিতে পারি নাই বরং তার ভিৎ জখম করিতেছি।

গতযুগে এই সাহিত্য ও ভাষার সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছিল কেমন করিয়া?—যেমন করিয়া সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদেশে কোনো জাতির সাহিত্য গড়িয়া ওঠে। সাহিত্যের সৃষ্টিতত্ত্ব ও সাহিত্যের রসতত্ত্ব এক নয়। সাহিত্যের সৃষ্টি-মূলে জীবন-ধর্ম্ম আছে, কিন্তু রসের আস্বাদনে ব্যক্তির ব্যক্তিগত বা জাতিগত চেতনা নির্ব্যক্তিক ও সার্ব্বজনীন হইয়া ওঠে। এই জীবনধর্ম্ম অর্থে আধুনিক সাহিত্যের আত্মতন্ত্র বা বস্তুতন্ত্র নয়। ইহা আরও গভীর আরও ব্যাপক। কবিও প্রকৃতিপরবশ, কিন্তু কবির অহং এই প্রকৃতির অধীন হইয়াই দেশ, কাল ও জাতির বিশিষ্ট সাধন-সংস্কারের প্রভাবে যাহা সৃষ্টি করে তাহাই সাহিত্য। কারণ, ভাব যতই বিশ্বজনীন হউক, কবির প্রাণের ছাঁচে ঢালা না হইলে তাহা রূপময় হইয়া উঠে না—এই প্রাণই কবিধর্ম্মের, তথা জীবনধর্ম্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। যেখানে যাহা কিছু সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার রস যতই গভীর, উদার ও সার্ব্বজনীন হউক—যে রূপ হইতে সেই রসের উৎপত্তি হয় তাহা কবির প্রাণেরই রূপ; অর্থাৎ তাহাতে যে বর্ণ আছে তাহা ব্যক্তিবিশেষের হৃদয়-রক্তের আভা; এবং তাহাতে আলোছায়ার যে রেখাপাত আছে, তাহা ব্যক্তিবিশেষের

আনন্দ-বেদনার অশ্রু-হাস্যে বিচিত্রিত। কবি যতই বস্তু-তন্ত্র বা আত্ম-তন্ত্র হউন, তাঁহার এই প্রাণধর্ম্মই কাব্যসৃষ্টির আদি প্রেরণা। এই প্রাণের স্পন্দন একটা নির্ব্বিশেষ ভাব-যন্ত্রের ক্রিয়া নয়; কবির জাতি ও বংশ, তাঁহার দেশ ও কাল এই প্রাণের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে—ইহাকে পুষ্ট করিয়াছে। সাহিত্যের যে-রূপ রসের আধার—সেই রূপটি বৃন্তহীন পুষ্পসম বিশ্বাকাশে ফুটিয়া উঠে না, তাহার মূলে এই বিশেষের মৃত্তিকা-বন্ধন আছে, না থাকিলে কোনও সাহিত্যেরই বৈশিষ্ট্য থাকিত না—সাহিত্য সাহিত্যই হইত না; কারণ তাহা হইলে ভাবের রূপসৃষ্টি অসম্ভব হইত। তাই, জগতের সাহিত্যে যে, কাব্য সবচেয়ে নির্ব্যক্তিক, সেই সেক্সপীরীয় নাটকের প্রেরণামূলেও এলিজাবেথীয় যুগের ইংরাজ প্রাণ স্পন্দিত হইতেছে; তাই, গেটে যে ভাষায় তাহার ফাউষ্ট লিখিয়াছেন, সেই ভাষাই তাহার প্রাণ; সে ভাষার বাহিরে সে এতটুকু দাঁড়াইতে পারে না।

অতএব সাহিত্যের সঙ্গে জাতীয়তার সম্পর্ক কি, এবং এই জাতীয়তারই বা অর্থ কি, তাহা বুঝিতে কষ্ট হইবে না। মনে রাখিতে হইবে, আমি এখানে সাহিত্য-রসের লক্ষণ বিচার করিতেছি না। সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে কোন্ শক্তির ক্রিয়া আছে, সাহিত্যের মধ্য দিয়া জাতির জীবন—তাহার জাতীয় আত্ম-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা—কেমন করিয়া ফুটিয়া উঠে, তাহারই কথা বলিতেছি। এই সাহিত্যের দর্পণেই জাতি যেন আপনাকে আপনার মধ্যে অবলোকন করে—তাহার আত্মসাক্ষাৎকার হয়। যাঁহারা সাহিত্যের রসই উপভোগ করেন তাঁহাদের নিকটে এ তথ্যের কোনও মূল্য নাই; ঋতুবিশেষে জল ও মাটির কোন্ অবস্থায় উদ্যানলতা পুষ্পপ্রসব করে—সে সংবাদ তাঁহাদের নিষ্প্রয়োজন; তাঁহারা কেবল সদ্য-চয়নিত পুষ্পগুচ্ছের রূপ ও সৌরভ উপভোগ করিতে পারিলেই সন্তুষ্ট। কিন্তু এই ফুল যখন ফুরাইয়া আসে, তখন শুধুই বিলাসীর বিলাস-সঙ্কট উপস্থিত হয় না, জাতির প্রাণশক্তির অভাব ধরা পড়ে, এবং সে যে কত বড় দুর্দ্দিন, তাহা জাতির জীবনেই যাহারা জীবিত—যাহারা বিশ্বপ্রেমিক নয়, অতি অধম ও সঙ্কীর্ণমনা স্বজাতি-প্রেমিক—তাহারই তাহা জানে।

আমাদিগের গত যুগের সাহিত্যে এই জাতীয়তা ও তদনুবিদ্ধ প্রাণধর্ম্মের প্রকাশ রহিয়াছে। পশ্চিমের আকস্মিক সংঘাতে, এই জাতির বহুকাল-লুপ্ত চেতনা চমকিত হইয়া উঠিল, যে মুহূর্ত্তে তাহার মানস-শরীরে এই বিদ্যুৎ-স্পর্শ সঞ্চারিত হইল, সেই মুহূর্ত্তে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। হঠাৎ জাগরণে সে দিশাহারা হইয়াছিল। গুপ্তকবি ও রঙ্গলাল দিশাহারা হন নাই, কারণ তাঁহাদের সম্যক জাগরণ হয় নাই—একজন হাই তুলিয়া তুড়ি দিতেছিলেন, আর একজন জাগর-স্বপ্নের ক্ষণ-অবসরে এই রূঢ় আলোকের দ্বার রুদ্ধ করিয়া আপন গৃহকোণের স্তিমিত মৃৎপ্রদীপটি উস্কাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

কিন্তু জাগরণে বিলম্ব হয় নাই। পশ্চিমের প্রবল প্রভাব—শিক্ষা-দীক্ষা, রুচি ও আশা-বিশ্বাস—যাহাকে একেবারে জয় করিয়া লইয়াছিল, তাহার মধ্যেই বাঙ্গালীর বাঙ্গালী-তম প্রাণ, সেই পাশ্চাত্য প্রভাবের পীড়নেই ভিতরে ভিতরে গুমরিয়া উঠিল; তাহার

অন্তরের অন্তস্তলে—সুগভীর মর্ম্মমূলে, তাহার জাগ্রত চেতনারও অন্তরালে যে হাহাকার জাগিয়াছিল, বাহিরে বিদ্রোহচ্ছলে সেই অসীম আকুতিই মহাকাব্যের গীতোচ্ছ্বাসে প্লাবিয়া উচ্ছ্বসিয়া উঠিয়াছে। মেঘনাদবধকাব্য বাঙ্গালী কি কখনও ভাল করিয়া পড়িয়াছে?—কেহ কি এখনও পড়ে? এই কাব্য-কাহিনীর ঘনঘটার ফাঁকে ফাঁকে বাঙ্গালীর কুললক্ষ্মী, মাতা ও বধূর বেশে, কবিচিত্ত মথিত করিয়া ক্রন্দন-রবে দিক্‌দেশ বিদীর্ণ করিতেছে। সেই আলুলায়িত-কুন্তলা রোদনোচ্ছূননেত্রা অপরূপ মমতাময়ী মূর্ত্তি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কবির চক্ষে বিরাজ করিয়াছে। বাঙ্গালীর কাব্যে সত্যকার সৌন্দর্য্য আর কি ফুটিতে পারে?—তাহার জীবনে আর আছে কি? সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া, মনুষ্যত্ব হারাইয়া, নারীর যে প্রেম ও স্নেহের আত্মত্যাগ সে এখনও প্রাণে-প্রাণে অনুভব করে, এবং করে বলিয়াই এখনও একেবারে বিনষ্ট হয় নাই, সেই অনুভূতি মেঘনাদ-বধের কবির বাঙ্গালীত্ব অটুট রাখিয়াছে; বাঙ্গালীর গৃহ-সংসারের সেই পুণ্য-দীপ্তি—মধুসূদনের হৃদয়ে তাঁহার মায়ের সেই স্নেহ-ব্যাকুলতার অশান্ত স্মৃতি তাঁহাকে বিধর্ম্ম হইতে রক্ষা করিল। হোমার ভার্জ্জিল, ট্যাসোর কাব্য-গৌরব বিফল হইল—বীর-বিক্রমের গাথা অশ্রুধারে ভাঙ্গিয়া পড়িল; মাতা ও বধূর ক্রন্দনরবে বিজয়ীর জয়োল্লাস ডুবিয়া গেল—বীরাঙ্গনার যুদ্ধযাত্রা বাঙ্গালী-বধূর সহমরণ-যাত্রার করুণ দৃশ্যে, অদৃষ্টের পরম পরিহাসের মত নিদারুণ হইয়া উঠিল। স্বর্গ, নরক, পৃথিবী ও সমুদ্রতলব্যাপী এই আয়োজন, রাজসভার ঐশ্বর্য্য, রণসজ্জার আড়ম্বর, অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা এবং অযুত যোধের সিংহনাদ সত্ত্বেও, অশোক-কাননে বন্দিনী নারী লক্ষ্মীর মূক শোক-ঝঙ্কারে সমস্ত আকাশ ভরিয়া উঠিয়াছে; এবং শক্তিশেল-মূর্চ্ছিত ভ্রাতার-শ্মশান-শিয়রে রামের শোকোচ্ছ্বাস, অথবা সিন্ধুতীরে পুত্র ও পুত্রবধূর চিতাপার্শ্বে দণ্ডায়মান রাবণের সেই মর্ম্মান্তিক উক্তিকেও প্রতিহত করিয়া যে একটি অতি কোমল ক্ষীণ কণ্ঠের বাণী, লবণাম্বুগর্ভে নির্ম্মল উৎস-বারির মত উৎসারিত হইয়াছে—

> সুখের প্রদীপ, সখি! নিবাই লো সদা
> প্রবেশি যে গৃহে, হায় অমঙ্গলারূপী
> আমি। পোড়া ভাগ্যে এই লিখিলা বিধাতা!
> নরোত্তম পতি মম, দেখ, বনবাসী!
> বনবাসী, সুলক্ষণে! দেবর সুমতি
> লক্ষ্মণ! ত্যজিলা প্রাণ পুত্রশোকে, সখি,
> শ্বশুর। অযোধ্যাপুরী আঁধার লো এবে,
> শূন্য রাজসিংহাসন। মরিলা জটায়ু,
> বিকট বিপক্ষপক্ষে ভীম-ভুজ বলে,
> রক্ষিতে দাসীর মান! হাদে দেখ হেথা,—
> মরিল বাসবজিৎ অভাগীর দোষে।

—কবির কাব্য-লক্ষ্মীও সেই বাণী-মন্ত্রে কবির কণ্ঠে স্বয়ম্বর-মালা অর্পণ করিয়াছেন। ইহাই হইল বাঙ্গালীর মহাকাব্য। আয়োজনের ত্রুটি ছিল না,—ছন্দ, ভাষা, ঘটনা-কাহিনী,

হোমার-মিল্‌টনের ভঙ্গি, দান্তে-ভার্জ্জিলের কল্পনা এবং সর্ব্বোপরি বিদেশী কাব্যের প্রাণবস্তু —এমন কি বাক্য-ঝঙ্কার পর্য্যন্ত আত্মসাৎ করিবার প্রতিভা—সবই ছিল; কিন্তু কবি, সত্যকার কবি বলিয়া, সৃষ্টিরহস্যের অমোঘ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া যাহা রচনা করিলেন—তাহা মহাকাব্যের আকারে বাঙ্গালী-জীবনের গীতিকাব্য। দূর দিগন্তের সাগরোর্ম্মি তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিল, তিনি তাহারই অভিমুখে তাঁহার দেহ-মনের সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া কাব্য-তরণী চালনা করিয়াছিলেন। সমুদ্রবক্ষে তরণী ভাসিল; ছন্দে, ভাষায় ও বর্ণনা-চিত্রে নীলাম্বু-প্রসার ও জল-কল্লোল জাগিয়া উঠিল—কিন্তু কবি-কর্ণধারের মনশ্চক্ষু আধ-নিমীলিত কেন? সাগর-বক্ষে উত্তাল তরঙ্গরাজির মধ্যেও এ কার কুলু-কুলু ধ্বনি?—এ যে কপোতাক্ষ! তীরে, ভগ্ন শিবমন্দিরে, সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিতেছে, জলে "নূতন গগন যেন, নব তারাবলী", এবং গ্রাম হইতে সন্ধ্যারতির শঙ্খধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে! সমুদ্র গর্জ্জন করুক, ফেনিল জলরাশি তরণী-তটে আছাড়িয়া পড়ুক—তথাপি এ স্বপ্ন বড় মধুর! সমুদ্রতলে কপোতাক্ষের অন্তঃস্রোত তাঁহার কাব্য-তরণীর গতি নির্দ্দেশ করিল, সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া আর হইল না। তরী যখন তীরে আসিয়া লাগিল, তখন দেখা গেল,—"সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনী।"

*   *   *   *

এমনি করিয়া আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের ভিৎ-পত্তন হইয়াছিল। বাহিরের প্রচণ্ড সংঘাত ভিতরের প্রাণ-বস্তু আলোড়িত করিয়াছিল; এ আলোড়নের প্রয়োজন ছিল, এই সংঘাতেই তাহার প্রাণ জাগিয়াছিল। বাঙ্গালী হঠাৎ নূতন জগতে চক্ষুরুন্মীলন করিল, তাহার সমস্ত দেহ-মন-প্রাণে সাড়া জাগিল; এই প্রাণ ছিল বলিয়াই যে প্রবল প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইল তাহার ফলে এই নব-সাহিত্যের জন্ম হইয়াছিল। প্রথম দিশাহারা অবস্থায় সে একটা প্রবল আবেগ অনুভব করিয়াছিল; নব ভাব ও চিন্তার মন্থনে তাহার প্রাণের সেই অস্থিরতা সর্ব্বত্র সাহিত্যের আকারে সুপ্রকাশিত হয় নাই। প্রকাশের বেদনা ও ব্যাকুলতা আছে, কিন্তু ভাষা নাই, ছন্দ নাই; প্রাণে যাহা জাগিয়াছে তাহার অনুভূতি স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই, অথবা সেই অনুভূতিকে চাপিয়া রাখিয়া ইংরেজী সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের ভাব ও চিন্তারাজি মনের মধ্যে গোল বাধাইতেছে। সে সকল ভাব ও চিন্তার আবেগমূলক অনুকরণে যে সকল কাব্য ও মহাকাব্য রচিত হইয়াছিল তাহাতে আমরা খাঁটি কাব্যসৃষ্টির পরিচয় পাই না বটে, কিন্তু বাঙ্গালী কেমন করিয়া এই নব ভাবের প্লাবনের মধ্যে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়াও নিজের জাতি-কুল আঁকড়াইয়া ধরিতেছে, আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবার চেষ্টা করিতেছে—তাহার সম্যক পরিচয় পাই। হেমচন্দ্রের কাব্যে আমরা খাঁটি বাঙ্গালী প্রাণের পরিচয় পাই; কিন্তু সে প্রাণ বলিষ্ঠ হইলেও অলস, তাহা গভীরভাবে আন্দোলিত হয় নাই। যে বজ্রাগ্নির আলোকে মধুসূদনের জাগর-চৈতন্য স্তম্ভিত হইয়া, অন্তরের অন্তরে বাংলার কাব্যলক্ষ্মীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল—সে বজ্রাগ্নি হেমচন্দ্রের অতিশয় স্থূল,

আত্মতৃপ্ত বাঙ্গালীয়ানা ভেদ করিতে পারে নাই। নবীনচন্দ্রের আবেগ ছিল, কিন্তু সে আবেগ অন্ধ; তিনি আদৌ আত্ম-সচেতন ছিলেন না, অতিশয় আত্মাভিমানী ছিলেন; তাই তাঁহার মনে ভাব ও কল্পনার যেমন অবাধ অধিকার ছিল, প্রবলতাও ছিল, তেমনি তাহা উপর দিয়াই বহিয়া যাইত—অন্তরের মধ্যে কাব্যসৃষ্টির গভীরতর প্রেরণা হইয়া উঠিবার অবসর পাইত না। তাই এক একটা idea তাঁহাকে পাইয়া বসিত মাত্র; ইংরেজী-শিক্ষার অভিমানই ছিল তাহার মূল,—তাহার সহিত অতিশয় দেশী এবং অতি দুর্ব্বল ভাবাতিরেক যুক্ত হইয়া সে কাব্যগুলির জন্ম হইয়াছে তাহাতে ইংরেজী ভাব ও দেশী ভাবপ্রবণতার এতটি অদ্ভুত সংমিশ্রণ দেখিতে পাই—বাঙ্গালীর জাতি-ধর্ম্ম ও ইংরেজী-শিক্ষা উভয় উভয়কে বেড়িয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া কেমন ঘূর্ণীর সৃষ্টি করিয়াছে তাহাই দেখিয়া কৌতুক অনুভব করি। সুরেন্দ্রনাথের প্রকৃতি স্বতন্ত্র; সে যুগের সেই দিশেহারা অবস্থার প্রথম দিকে এই একমাত্র কবি ইংরেজী ভাব ও চিন্তার ধারাকে ধীরভাবে আত্মসাৎ করিতে চাহিয়াছিলেন; নব বিজ্ঞান, দর্শন ও ইতিহাসের আলোকে নিজের অন্তরের ধারণা ও ভাবনাকে যাচাই করিয়া লইতে চাহিয়াছিলেন—ভাবাতিরেক বা কবি-কল্পনাকে দমন করিয়া বাস্তব-প্রত্যক্ষের সঙ্গে বোঝাপড়া করিতে চাহিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজী সাহিত্যে যে ভাবমার্গ ও যুক্তিপন্থার প্রসার হইয়াছিল তাহাই তাঁহাকে বিশেষ করিয়া প্রভাবান্বিত করিয়াছিল; তিনি কল্পনা অপেক্ষা বুদ্ধিবৃত্তি, কাব্য অপেক্ষা বৈজ্ঞানিক তথ্য জিজ্ঞাসার দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন। বাস্তব ও প্রত্যক্ষ বস্তুনিচয়ের নূতন করিয়া মূল্য-নির্দ্ধারণের জন্য তিনি পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ও দেশীয় চিন্তাপ্রণালীর সমন্বয় সাধন করিতে উৎসুক হইয়াছিলেন। এই সত্য-নির্ণয়ের আবেগ, যুক্তি-কল্পনার আনন্দ, মনুষ্য-সমাজের নূতনতর মহিমা-আবিষ্কারের উৎসাহ তাঁহাতে যে কাব্যরচনায় ব্রতী করিয়াছিল, তাহাতে সম্যক রসসৃষ্টি না হইলেও একটা নূতন ভাবদৃষ্টির পরিচয় আছে; তাঁহার কাব্যে নব নব চিন্তা ও ভাবনার যে সকল চকিত-চমক আছে তাহা সত্যই বিস্ময়কর। পরবর্ত্তী কবি-গণের কাব্যে এইরূপ অনেক চিন্তাবস্তু কাব্যবস্তুতে পরিণত হইয়াছে—সুরেন্দ্রনাথ সেগুলিকে যেন চিন্তার আকারেই ছড়াইয়া গিয়াছেন। এ শক্তি ঠিক কবিশক্তি না হইলেও, ইহার মূলে কল্পনার আবেগ আছে; যে দৃষ্টান্ত ও উপমা-সমুচ্চয়ের দ্বারা তিনি তাঁহার বক্তব্যকে সমীচীন করিয়া তুলিতে চান, তাহার মধ্যেই তাঁহার কবি-শক্তির প্রমাণ আছে। তাঁহার রচনায় এই যুগের প্রধান প্রবৃত্তি নিখুঁতভাবে ধরা পড়িয়াছে। ভাবপ্রবণ বাঙ্গালীর প্রকৃতিতে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে সাড়া জাগিয়াছিল—তাহার ফলে সে যে নূতন চিন্তাভিত্তির অন্বেষণ করিয়াছিল, আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া আপনার প্রাণধর্ম্মের অনুযায়ী করিয়া যে পরস্ব-গ্রহণের প্রয়োজন সে অনুভব করিয়াছিল—তাহাতে দেশী ও বিদেশী চিন্তার সমন্বয়-সাধনে একটা সজ্ঞান চেষ্টাই স্বাভাবিক। এবং সে সমন্বয় সাধনে কতক পরিমাণে ভাবুকতারও প্রয়োজন—এই ভাবুকতাই সুরেন্দ্রনাথের কবিত্ব। সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে সে যুগের এই প্রধান প্রবৃত্তির

প্রথম উন্মেষ দেখিতে পাই। তাঁহার কাব্যরচনা এই হিসাবে সার্থক হইয়াছে যে, তাঁহার ভাববস্তু তাঁহার কাব্য অপেক্ষা কম বা বেশী হয় নাই—তাঁহার কথা তিনি তাঁহার মত করিয়া বলিতে পারিয়াছেন। হেমচন্দ্রের মহাকাব্য-রচনার মত অক্ষমের প্রয়াস-বিড়ম্বনা তাহাতে নাই ; তিনি নবীনচন্দ্রের মত মহাকাব্য-রচনার নামে ধর্ম্ম, রাজনীতি ও সমাজ-সংস্কারের বক্তৃতা অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিপিবদ্ধ করেন নাই। তিনি তাঁহার প্রিয় কবি Pope-এর মত কবিতায় ***Essay on Woman*** লিখিয়াছেন, সে বিষয়ে তাঁহার কার্য্য ও অভিপ্রায়ের মধ্যে কোনও লুকাচুরী নাই, বরং এই গদ্যাত্মক কাব্যে কবির নির্ভীক সত্যবাদের উৎসাহ, ভাব চিন্তার অভাবনীয় চমক, ভাষার একটি নূতন ভঙ্গী এবং স্থানে স্থানে অপ্রত্যাশিত ছন্দ-ঝঙ্কার তাঁহার 'মহিলা-কাব্য'খানিকে বাংলা কাব্য-সাহিত্যে বেশ একটু স্বতন্ত্র আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

এই সকল রচনা উৎকৃষ্ট সাহিত্য না হইলেও, যে প্রাণ-মনের নিগূঢ় আন্দোলনে সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব হয়, দুই বিভিন্ন সভ্যতার সংঘর্ষে জাতিবিশেষের সুপ্ত চেতনা মন্থিত হইয়া তাহার প্রাণভাণ্ডে অমৃত সঞ্চিত হইয়া ওঠে—সেই আন্দোলন-আলোড়নের প্রকৃষ্ট পরিচয় এই সকল রচনায় আছে। মাইকেল, বঙ্কিম, বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথ—আধুনিক সাহিত্যের এই চারিটি স্তম্ভ যে ভিত্তিভূমির উপরে দাঁড়াইয়া বঙ্গভারতীর এই অভিনব মন্দির-চূড়া ধারণ করিয়া আছেন, তাহার তলদেশ কোথায় এবং কত গভীর,—নির্ণয় করিতে হইলে, এই সকল কবির কাব্যপ্রচেষ্টা সযত্নে পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। কোনো যুগের অন্তরতম প্রবৃত্তির সন্ধান করিতে হইলে কেবল উৎকৃষ্ট প্রতিভার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে চলিবে না ; কারণ, প্রতিভার যে দিকটা আমাদিগকে মুগ্ধ করে সে তার অলৌকিক কীর্ত্তি—এই কীর্ত্তির অন্তরালে যে স্বাভাবিক নিয়ম রহিয়াছে তাহা সহজে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু যাঁহারা সেরূপ প্রতিভাশালী নহেন তাঁহাদের প্রয়াস-প্রচেষ্টা আরও স্বচ্ছ, তাঁহাদের মধ্যে আমরা যুগধর্ম্মকে আরও স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারি। মাইকেলের মেঘনাদবধ-কাব্যে বাঙ্গালীর প্রাণ যুগধর্ম্মবশে কি নিগূঢ় স্পন্দনে স্পন্দিত হইয়াছে, সে চিন্তা আমরা করি না—তাঁহার কাব্যরসের উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচার করি। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-কাব্যগুলির মধ্যে, পাশ্চাত্ত্য কাব্য-সাহিত্যের পূর্ণ রসস্রোত বাঙ্গালীর প্রাণে কেমন করিয়া সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা দান করিয়াছে, সেই সকল কাব্যে বাঙ্গালীর মনীষা ও কবি-প্রতিভা খাঁটি বিদেশী রস-রসিকতার আবেগে কি অপূর্ব্ব ভাব-জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে—তাহা চিন্তা করিতে গেলে আমরা কেবল বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া থাকি ; কোথায় কোন্ দিক দিয়া কবির প্রাণে সাড়া জাগিয়াছে, এবং আমরা পাঠকেরা, এই অতিশয় অপরিচিত ভাবলোকে প্রাণের কোন নবজাগরণে জাগিয়া উঠি, অথবা কোন্ স্বপ্নলোকে আমাদের চিরসুষুপ্ত কামনালক্ষ্মীর সন্ধান পাই—এই বিদেশী সাহিত্যকলার মোহন মুকুরে আমাদেরই প্রাণের প্রতিবিম্ব কেমন করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, কেমন করিয়া তাহা সম্ভব হইল, এ চিন্তার অবকাশ থাকে না। কিন্তু একথা কখনও বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে,

এই সাহিত্যরস যতই উৎকৃষ্ট হউক, যদি তাহার ভাষা আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিয়া থাকে, যদি তাহার ভাব-কল্পনায় কেবল আমাদের রস-পিপাসা উদ্রিক্ত না হইয়া তাহার সহিত আমাদের একটি মর্ম্মগত আত্মীয়তা উপলব্ধি করিয়া থাকি, তবেই তাহা আমাদের সাহিত্য হইয়াছে। বিদেশী ভাব-কল্পনা বিদেশী সাহিত্যেই আমরা উপভোগ করি; কিন্তু সেই ভাব-কল্পনাই যদি আমাদের মনের তৃপ্তি সাধন করিত, তবে কোনও পৃথক স্বকীয় সাহিত্যের প্রয়োজন হইত না—আমার ভাষায় তাহা অনুবাদ করিলেই আমার সাহিত্য হইত। এ যুগে সেই বিদেশী ভাব-কল্পনাকে যাঁহারা আত্মসাৎ করিয়াছিলেন—অর্থাৎ তাহা হইতে প্রেরণা লাভ করিয়া একটি স্বতন্ত্র স্বকীয় ভাব-জগৎ সৃষ্টি করিয়া নিজ প্রাণের স্বাধীন স্ফূর্ত্তির বিকাশ করিয়াছিলেন—তাঁহারাই এ যুগের সাহিত্য-স্রষ্টা। এই সৃষ্টিশক্তিই তাঁহাদের দিব্যশক্তি। এইখানেই সাহিত্যের সহিত জাতীয়তার সম্বন্ধ। কবির আত্মা নির্ব্বিশেষ মানবাত্মা নয়; যে রূপরসপিপাসা কবি-প্রকৃতির স্থায়ী লক্ষণ, যাহার বশে কবির ভাব রূপময় হইয়া উঠে, নির্ব্বিশেষ বিশেষে পরিণত হয়—কবির সেই কবিধর্ম্ম একটা বিশিষ্ট প্রাণমনের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন—প্রাণের সেই ছাঁচটি আছে বলিয়াই ভাব রূপের আকারে আকারিত হয়; এই প্রাণ না থাকিলে সাহিত্যের প্রাণসৃষ্টি অসম্ভব—এই প্রাণের মূল জাতির বহুকাল-লব্ধ চেতনা, তাহার অতীত ও বর্ত্তমান, তাহার জাগ্রত ও মগ্ন-চৈতন্যের মধ্যে প্রসারিত হইয়া আছে। মেঘনাদবধ-কাব্যের মধ্যে আমরা কবির এই অন্তরতম অন্তরের পরিচয় পাইয়াছি। বঙ্কিমের কাব্যে চৈতন্য আরও পরিস্ফুট, তাই তাঁহার মধ্যে এই দেশী ও বিদেশী ভাবের সংঘর্ষ আরও গভীর, আরও বিপুল। বঙ্কিমের কাব্যসৃষ্টিতে আমরা যে প্রাণের আলোড়ন দেখিতে পাই, তাহাতে বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের অধীর উচ্ছ্বাস, ফেনশীর্ষ তরঙ্গ-গহ্বরের অন্ধকার, এবং জলতলস্থ ভীষণা শান্তির আভাস পাই। সেকালে বাঙ্গালীর প্রাণে যে বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছিল—বিক্ষুব্ধ জলরাশির উপরে সর্ব্বপ্রথম মেঘনাদ-বধের তরঙ্গচূড়া দেখা দিয়াছিল—সেই পাশ্চাত্য-ঝটিকার আন্দোলনে প্রমত্ত বাঙ্গালীর প্রাণসাগর যে তুঙ্গতম তরঙ্গে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল তাহারই ফল—বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, সীতারাম, চন্দ্রশেখর, দেবী চৌধুরাণী ও আনন্দমঠ। কিন্তু এই তরঙ্গের স্রোত-নির্ণয় হইবে সুরেন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের কাব্যে।

তথাপি এই আলোড়নের সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। বিদেশী সংঘাতের প্রতিঘাতে যে সাহিত্যের জন্ম হইল, যে সাহিত্যের মূল-প্রেরণা ছিল—নবাবিষ্কৃত ভাব ও চিন্তার জগতে বাঙ্গালীর আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা; তাহার কামনা, বাসনা ও পিপাসাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া প্রত্যক্ষ-বাস্তবের সহিত দ্বন্দ্বকে আরো ঘনাইয়া তোলা—সহসা সে সাহিত্যের স্রোত উল্টা দিকে বহিল। এ দ্বন্দ্ব যেন তাহার বেশীক্ষণ সহ্য হইল না—প্রাণ হইতে মনে, ভাব হইতে ধ্যানে, সে বাস্তব-মুক্তির জন্য লালায়িত হইল। মাইকেল হইতে বঙ্কিম—অতি অল্পকাল, এক-পুরুষও নয়; বাঙ্গালীর নব জাগ্রত প্রাণ-চেতনা তখনও সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে

নাই, জাতির অতীত স্বপ্ন ও ভবিষ্যতের আশা তাহাকে চঞ্চল করিতেছে মাত্র—সেই কালেই সাহিত্য-প্রাঙ্গণের এককোণে ধ্যানাসনে বসিয়া কবি বিহারীলাল 'সারদামঙ্গল'-গান আরম্ভ করিয়াছেন। সেকালে, সে সুরে কান পাতিবার অবসর কাহারও ছিল না; কেহ জানিত না যে, অতঃপর বাংলার কাব্যলক্ষ্মী দেশ-কাল বিস্মৃত হইয়া যে ধ্যানরসে নিমগ্ন হইবেন—সাহিত্যে জাতীয় জীবনের স্পন্দন স্তিমিত হইয়া ক্রমশঃ যে সূক্ষ্মতর রসবিলাস ও বিশ্বজনীন ভাবলোকের প্রতিষ্ঠা হইবে—এই ভাবোন্মত্ত, উদাসীন, আত্মহারা ব্রাহ্মণ-কবি তাহারই সূচনা করিতেছেন।

বাঙ্গালী চরিত্রে ভারতীয় প্রকৃতি-সুলভ ধ্যানকল্পনার প্রভাব যে আছে, এবং থাকিবেই একথা বলা বাহুল্য। কিন্তু বাঙ্গালীর যে বৈশিষ্ট্যের কথা আমি পুনঃ পুনঃ নির্দ্দেশ করিতে চাই তাহাই বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্বের নিদান এবং তাহারই ফলে, এত অল্প সময়ের মধ্যে বাঙ্গালী একটা বিদেশী সাধনার সারবস্তু আত্মসাৎ করিয়া তাহার সাহিত্যে নবজন্মের পরিচয় দিয়াছে। আর কোনও ভারতীয় জাতি এমন করিয়া যুগযুগান্তরের অভ্যস্ত সংস্কার ভেদ করিয়া এত শীঘ্র এইরূপ একটি আধুনিক আদর্শকে বরণ করিয়া লইতে পারে নাই। মাইকেলের মহাকাব্যে যে বেদনা সঙ্গীতরূপে প্রকাশ পাইল, তাহা যেন—"Music yearning like a good in pain"; তাহাতে নবজন্মের সেই প্রাণপণ প্রয়াস বা আত্ম-স্ফূর্ত্তির আবেগ রহিয়াছে। অমিত্রাক্ষর ছন্দের ধ্বনি-বিন্যাসের মধ্যেই প্রাণের যে লীলা, মুক্তিগতির যে আনন্দ, কাব্যবস্তুর নিঃসঙ্কোচ সঙ্কলনে কল্পনার যে চিন্তালেশহীন স্বাধীন বিচরণ লক্ষ্য করা যায়, তাহাতেই এই নবসাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এই আত্মস্ফূর্ত্তির কারণ—নিজ দেহ-সংস্কারের দ্বারাই বহির্জগতের সহিত আত্মীয়তা উপলব্ধি করিয়া মানুষ যে সহজ রস আস্বাদন করিতে চায়, বাঙ্গালীর প্রকৃতিতে সেই অ-ভারতীয় প্রবৃত্তি সুপ্ত আছে; ভারতীয় প্রভাবের বশে যে কল্পনা অন্তর্মুখ, সেই কল্পনারই তলে তলে জীবন ও জগতের প্রতি তাহার এই মমতা অন্তঃশীলা হইয়া বহিতেছে। তাই বেদান্ত ও সন্ন্যাস বাঙ্গালীর যথার্থ ধর্ম্ম হইতে পারে নাই। দেশের জলবায়ু, কর্ম্ম অপেক্ষা স্বপ্নের অনুকূল; ইহার উপর আর্য্যসাধনার অধ্যাত্মবাদ চিত্তকে অন্তর্মুখী করিয়া তোলে; তথাপি বাঙ্গালীর মজ্জাগত প্রাণধর্ম্মকে এই মনোধর্ম্ম একেবারে নির্ম্মূল করিতে পারে নাই; এজন্য জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে তাহার যে স্বাস্থ্যকর আসক্তি তাহা ভোগ হইতে উপভোগে পর্য্যবসিত হয়। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের শ্বেতভুজা বীণাপাণি বাঙ্গালীর চিত্ত-শতদলে যখন আসন পাতিলেন, তখন সহসা তার কল্পনায় এক মহোৎসব পড়িয়া গেল। সে সাহিত্যে জগৎ ও জীবন, প্রকৃতি ও মানব-হৃদয়, প্রত্যক্ষ পরিচয়ক্ষেত্রে পরস্পরকে যে মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছে—মানুষের দেহই যে অপূর্ব্ব ভঙ্গিমায় সূর্য্যালোকিত

আকাশতলে ছায়া বিস্তার করিয়াছে, তাহাই বাঙ্গালীকে মুগ্ধ করিল, বহিঃপ্রকৃতির সংস্পর্শে আত্মপরিচয় সাধন করিতে সেও অধীর হইয়া উঠিল। মাইকেলের কাব্যপ্রেরণায় সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়াছে বহির্বস্তুর বাহিরের রূপ। কেবলমাত্র বিচিত্র বস্তু সংগ্রহ করিয়া সেগুলিকে দূরে ধরিয়া অথবা নিকটে সাজাইয়া দর্শন ও স্পর্শনের আনন্দে তিনি বিভোর; ক্ষুদ্র ও বৃহৎ চিত্র-চিত্রণ এবং তক্ষণ-শিল্পীর মত মূর্ত্তি-সুষমার সন্ধানে তাঁহার কল্পনার কি উল্লাস! উপমার পর উপমায় তিনি যে রূপ ফুটাইয়া তোলেন, তাহা ভাব বা চিন্তার চমক নহে—বাহিরের বস্তুবিন্যাসের সৌন্দর্য্য; বিষাদ-প্রতিমা বন্দিনী সীতার ললাটে সিন্দুরবিন্দু 'গোধূলি ললাটে আহা তারারত্ন যথা'। তিনি বস্তুকে ভাবের দ্বারা, বা ভাবকে বস্তুর দ্বারা উজ্জ্বল করিয়া তোলেন না; একই বস্তুর সৌন্দর্য্য ফুটাইবার জন্য বহু বস্তুর উপমা সন্নিবেশ করেন, চিত্রকে চিত্রের দ্বারাই সুন্দর করিয়া তোলেন। আলো ও ছায়া এই দুইটি মাত্র বর্ণে মর্ম্মর-মূর্ত্তি যেমন প্রকাশ পায়, তাঁহার সৃষ্ট মানব-মানবীও তেমনি অতিশয় সরল ও সার্ব্বজনীন সুখ-দুঃখের ছায়ালোকসম্পাতে আমাদের হৃদয়-গোচর হয়। এই জন্য আকারে ও ভঙ্গিমায় মহাকবি মিল্‌টন্‌কে অনুসরণ করিলেও মধুসূদন মানুষের সংসার বিস্মৃত হইয়া মহাকাব্যের অত্যুচ্চ কাব্যলোকে, সীমাহীন দিগ্‌দেশে, তাঁহার কল্পনাকে প্রেরণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু মানুষকে তিনি বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন; পুরুষের পৌরুষ ও নারীর নারীত্ব তাঁহার হৃদয়ে যে মহিমাবোধ জাগ্রত করিয়াছিল তাহারই আবেগ মহাকাব্যের রূপ-ভঙ্গিমায় ব্যক্ত হইয়াছে! মাইকেলের কাব্য পড়িয়া মনে হয় গীতি-প্রাণ বাঙ্গালী কবি যেন এক নূতন জগৎ আবিষ্কার করিয়াছেন; সেখানে হৃদয়-সমুদ্রের বেলাবালুকায় ভঙ্গ-তরঙ্গের অলস ফেন-রেখা বুদ্‌বুদ-মালায় মিলাইয়া যায়, কিন্তু সেই সঙ্গে দূরাগত জলোচ্ছ্বাস ও ভগ্নপোত-যাত্রীর আর্ত্তনাদ নিভৃত নিকুঞ্জের বংশীরবকেই এক অপূর্ব্ব বেদনায় প্রতিধ্বনিত করিয়া তোলে। কবিকল্পনার এই নূতন অভিযান নব্য সাহিত্যের গতি নির্দ্দেশ করিয়াছিল—মনের সূক্ষ্ম লীলা-বিলাস অগ্রাহ্য করিয়া মানুষকে দেহের রাজ্যে দাঁড় করাইয়া, তাহার স্বাভাবিক আকার, আয়তন ও রূপ-ভঙ্গিমা দুই চক্ষু ভরিয়া দেখিয়া লইবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল; পাপ-পুণ্য নির্ব্বিশেষে তাহার প্রাণের স্ফূর্ত্তি নিয়তির অমোঘ নিয়মে কেমন ভীষণ-মধুর হইয়া উঠে—বাঙ্গালী কবির চিত্তে তাহারই প্রেরণা জাগিয়াছিল।

কিন্তু মধুসূদনের যে আবেগ একটা 'great technique' ও 'prodigious art' -এর প্রেরণায় মানুষের জীবনকে কেবল মাত্র একটা বিশালতর পট-ভূমিকার উপরে সন্নিবেশিত করিয়া তাহার প্রাণের স্ফূর্ত্তি ও দেহের মুক্তগতি অঙ্কিত করিয়াই চরিতার্থ হইয়াছিল, মনুষ্যজীবনের রহস্য-চিন্তার সেই আবেগ পরিপূর্ণ আকারে প্রকাশ পাইল বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-কাব্যে। গীতিকাব্যের নিছক ভাবুকতায় এবং স্বল্প পরিসরে যে প্রেরণা স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না—ভাব-জগৎ হইতে বাহিরে আনিয়া মূর্ত্তি-জগতের চাক্ষুষ

আলো-অন্ধকারে হৃদয়-মণির দেহ-বিচ্ছুরিত রশ্মিচ্ছটা প্রতিফলিত করিবার জন্য যে নূতন আকারে কাব্যসৃষ্টির প্রয়োজন—মহাকাব্য বা কাহিনী-কাব্যে তাহার experiment শেষ হইবার পূর্ব্বেই, সেই প্রয়োজন সাধন করিবার জন্য, আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে অবতারকল্প প্রতিভার অভ্যুদয় হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বাংলা গদ্যচ্ছন্দ সহসা যে বাণী-রূপ ধারণ করিল, তাহাতে দেহেরই রূপ-রাগ প্রাণের মূর্চ্ছনায় স্পন্দিত হইয়া উঠিল। বঙ্কিম-চন্দ্রের পূর্ব্বে বা পরে আর কোনও বাঙ্গালী কবি এমন করিয়া 'দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবনের' গাথা গান করেন নাই; প্রকৃতির প্ররোচনায় মানুষের আত্মা এমন করিয়া দেহের দুয়ারে লুটাপুটি খায় নাই; মনুষ্য-হৃদয়ের চিরন্তন আকুতি কবি-কল্পনায় মণ্ডিত হইয়া দেহ-ধর্ম্মের তাড়নায় এমন সুদুর্লভ দুর্ভাগ্য-মহিমা লাভ করে নাই। য়ুরোপের কাব্যলক্ষ্মী তথাকার সাহিত্যে মানুষের যে পরিচয়টিকে যুগযুগান্তর ধরিয়া দেহ-চেতনার মধ্য দিয়াই অনির্ব্বচনীয় করিয়া তুলিয়াছেন—সে সাহিত্যের সেই গভীরতম প্রেরণা এমন করিয়া আর কোনও বাঙ্গালী কবিকে আবিষ্ট করে নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যে কামনার সেই সোমযাগ যে বেদীর উপরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহা মনুষ্য-জীবনের রোমান্স; যে উপকরণ-সমষ্টির দ্বারা তিনি এই বেদী নির্ম্মাণ করিয়াছেন, বাঙ্গালীর জীবনেতিহাসে তাহা নিত্য-প্রত্যক্ষ নয় বলিয়া যাঁহারা এই কাব্য অতিমাত্রায় কাল্পনিক বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের চক্ষে মানুষের জীবনই অতিশয় ক্ষুদ্র; বঙ্কিমের কল্পনায় মানব-ভাগ্য ও মানব-চরিত্রের যে রহস্য-সন্ধান আছে তাহা যদি কাহারও পক্ষে বাস্তবাতিরিক্ত হয়, তবে তাঁহার মতে হিমালয় অপেক্ষা উই-ঢিবি সত্য, এবং পদ্ম অপেক্ষা ঝিঙাফুল অধিক-তর বাস্তব।

কিন্তু বর্ত্তমান প্রসঙ্গে সে বিচার নিষ্প্রয়োজন। আধুনিক সাহিত্যে বাঙ্গালীর নব-জন্মের কথা বলিতেছিলাম। মানুষের দেহমন্দিরে যে দেবতা রহিয়াছেন তাঁহার প্রতি যে গোপন শ্রদ্ধা বাঙ্গালীর অস্থিমজ্জাগত, জগৎ ও মানব-জীবন সম্বন্ধে তাহার সেই ঔৎসুক্য এই নব-সাহিত্যের জন্ম-হেতু। যে কামনার নাম সৃষ্টি-কল্পনা, রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের যে মোহিনী মানুষের প্রাণে 'প্রেম' নামক মহাপিপাসার উদ্রেক করে,—যাহার বশে মানুষ আপনাকে স্বতন্ত্র না ভাবিয়া, এই জগৎ-রহস্যের সঙ্গে আপনাকে একটি অপূর্ব্ব রস-চেতনায় যুক্ত করিয়া নিজেরই স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হয়—বাঙ্গালী চরিত্রের সেই সুপ্ত প্রবৃত্তি য়ুরোপীয় সাহিত্য হইতে প্রেরণা পাইয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল। আধ্যাত্মিকতার প্রাণহীন জড়-সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া, জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে একটা তুচ্ছ ধারণা বা ঔদাসীন্য ত্যাগ করিয়া, বহিঃ-প্রকৃতির সহিত আত্মীয়তা স্থাপনের যে আকাঙ্ক্ষা, তাহারই নিদর্শন—বিষবৃক্ষ ও মেঘনাদবধ। মেঘনাদবধের কবি নাটক রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু নাটকীয় চরিত্র-সৃষ্টিতে কবির যে আত্মবিলোপ—সর্ব্ববস্তুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইবার যে কল্পনা-শক্তি—যাহার বলে কবিই আত্মচেতনার (সে যত গভীর হউক) সঙ্কীর্ণ গণ্ডি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রকৃত

মুক্তির অধিকারী হন—মধুসূদনের সে শক্তি ছিল না ; তাই তাঁহার কাব্যে যখন মেঘনাদের জিহ্বাগ্রে সরস্বতী বিরাজ করেন, তখন লক্ষ্মণ কথা খুঁজিয়া পায় না।—কবি-হৃদয়ের লিরিক্-পক্ষপাত স্পষ্ট হইয়া উঠে। তথাপি মধুসূদন সাহিত্যের এই মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ না করিলেও, মানুষের প্রতি মানুষ হিসাবেই তাঁহার যে শ্রদ্ধা, মানুষের বাসনা-কামনা, পাপ-পুণ্য, পৌরুষ ও দুর্ব্বলতার প্রতি তাঁহার যে শাস্ত্র-সংস্কার-মুক্ত সহজ সহানুভূতি, তাহাই এ যুগের কবিকল্পনাকে মুক্তিলাভের দুঃসাহসে দীক্ষিত করিয়াছে। অপরাপর প্রতিভাহীন কবি এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, মহাকাব্য বা কাহিনী-কাব্য রচনার আগ্রহ থাকিলেও, ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্ট হইয়া গীতিকাব্য বা কাহিনী কোনটাই আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। তার কারণ, এ কাব্যের উৎকৃষ্ট আর্ট বা technique তখনও বাংলা কাব্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই, প্রাচীন গীতি-কাব্যের কল্পনা ও রচনাভঙ্গীই তখনও ভাষাকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। বঙ্কিমের প্রতিভা এ সমস্যার সমাধান করিল—এ কাব্যের ছন্দ হইল গদ্য, ইহার আকার হইল উপন্যাস। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গেই এ কল্পনার পূর্ণবিকাশ ও অবসান ঘটিয়াছে—বঙ্কিমের সেই নাটকীয় প্রতিভা ও সৃষ্টিশক্তি, কল্পনার সেই ঐশ্বর্য্য আর কাহারও মধ্যে প্রকাশ পায় নাই।

তথাপি উপন্যাস ও গল্পসাহিত্যে এই ধারা কতকটা ভিন্নমুখী হইলেও আজও একেবারে লুপ্ত হয় নাই ; বাস্তব-প্রীতি বা মানুষের দেহ-জীবনের রহস্য-বোধ উৎকৃষ্ট কল্পনাশক্তির অভাবে অতিশয় সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে প্রবাহিত হইলেও তাহা আজ বাংলা গদ্যে বাস্তবেরই বিচিত্র ভঙ্গী বিশ্লেষণ করিতেছে। কিন্তু বাংলাকাব্যে এই বহির্মুখী কল্পনা আর আমল পাইল না। পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালাইয়া তাহারই আলোকে মূর্ত্তিপূজার যে আনন্দ, বাহিরের বিপুল জনস্রোতের কলকোলাহলে মিশিয়া মিলিত কণ্ঠস্বরের যে অপূর্ব্ব উন্মাদনা—বাংলাকাব্যে তাহার প্রতিষ্ঠা হইল না। মানুষ হইয়া মানুষের ভিড়ে আসিয়া দাঁড়াইবার সেই উৎসাহ যেমন বাঙ্গালীর পক্ষেই সম্ভব, তেমনি বৃন্দাবন-স্বপ্নও বাঙ্গালীরই ; এই দুই প্রবৃত্তির বিরুদ্ধ ধারায় বাঙ্গালী আত্মহারা। তাই নব-সাহিত্যের যে প্রেরণার কথা আমরা এতক্ষণ আলোচনা করিয়াছি, যে প্রেরণার বশে বাংলা সাহিত্যে বাঙ্গালীর নব জন্ম হইয়াছিল বলিয়া মনে করি, এবং যাহার সম্যক স্ফূর্ত্তি ঘটিলে সাহিত্যে ও তথা জীবনে আমরা একটা নূতন অধ্যায় আরম্ভ করিতে পারিতাম, সেই প্রেরণা সহসা আর এক পথে প্রবাহিত হইল। বাঙ্গালীর কাব্য-কল্পনা প্রাণের অন্তস্তল হইতে সরস্বতীর ধ্যানমূর্ত্তি আবিষ্কার করিল তাহাতে বাস্তবজীবন ও বহির্জগৎকে আত্মসাৎ করিবার এক অভিনব ভাবসাধনার পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইল—বাহিরের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রয়োজন আর রহিল না ; কাব্য জীবন হইতে পৃথক হইয়া পড়িল। আমি কবি বিহারীলাল ও তাঁহার "সারদামঙ্গলে"র কথা বলিতেছি।

বিহারীলালের গীতিকল্পনায় আত্মভাবসাধনার যে ভঙ্গীটি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা এতই নূতন যে, আমাদের দেশীয় গীতিকাব্যের ইতিহাসে কবিমানসের এতখানি স্বাতন্ত্র্য—কাব্যসাধনা-কেই আধ্যাত্মিক সংশয়-মুক্তির উপায়রূপে বরণ করার এই আদর্শ—ইতিপূর্ব্বে আর লক্ষিত

হয় না। বৈষ্ণব কবির কাব্যসাধনায় একটা ভাব-গভীর আধ্যাত্মিক প্রেরণার পরিচয় আছে—শুধু রসসৃষ্টিই নয়, প্রাণের গভীরতর পিপাসা নিবৃত্তির সাধনা আছে। তথাপি বৈষ্ণব কবির কল্পনায় এরূপ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য নাই, সে কল্পনা একটা বিশিষ্ট ভাব-সাধনার পদ্ধতিকে, একটা সঙ্কীর্ণ সাধন-তন্ত্রকে আশ্রয় করিয়াছে—সে সাধনার মন্ত্র কবির নিজ কবিদৃষ্টির ফল নহে। বিহারীলালের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ আধুনিক। সমগ্র জগৎ ও জীবনকে সম্পূর্ণ স্বাধীন স্বকীয় কল্পনার অধীন করিয়া, আত্ম-প্রত্যয়ের আনন্দে আশ্বস্ত হওয়ার যে গীতি-প্রেরণা, তাহারই নাম কবির ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য। বিহারীলালের কল্পনায় এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও আত্ম-প্রত্যয়ের আনন্দ, বাংলা কাব্যে সর্ব্বপ্রথম ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহা এতই অপ্রত্যাশিত যে, সহসা ইহার উৎপত্তি নির্ণয় করা যায় না। উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী গীতিকাব্যে কবির এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য প্রকট হইয়াছিল; এবং Wordsworth ও Shelleyর কল্পনা হইতে বিহারী-লালের কল্পনা যতই ভিন্ন হউক, উহা যে মূলে সম-গোত্র সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব বিহারীলালের কাব্য-সাধনায় ইংরেজী কাব্যের প্রভাব অনুমান করা অসঙ্গত নয়। তথাপি এ সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার আছে। প্রথমতঃ ইংরেজী সাহিত্য বা ভাষায় বিহারীলাল ততদূর ব্যুৎপন্ন ছিলেন বলিয়া মনে হয় না, যাহাতে ইংরাজ রোমান্টিক কবিগণের সঙ্গে তাঁহার খুব গভীর পরিচয় সম্ভব। তিনি বায়রণের কাব্য পড়িয়াছিলেন, তাঁহার নিজের কবিতায় বায়রণের ভাবানুবাদ আছে; এরূপ ইংরেজী জ্ঞান বা ভাবগ্রাহিতা খুব বিস্ময়কর নহে। কিন্তু শেলী অথবা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ভাব-কল্পনা অনুবাদ বা অনুকরণের বস্তু নয়; সেখানে কাব্যের আত্মাকে যেন আত্মসাৎ করিতে হয়, সে কাব্যে এবং সে-ভাষায় বিহারীলালের ততখানি প্রবেশ ছিল কিনা সন্দেহ। দ্বিতীয়তঃ, শেলী, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, বিহারীলাল প্রভৃতির গীতি-কবিতার বিশেষত্বই এই যে, শুধু তাহার ভাববস্তুই মৌলিক নয়, ভাবনার ভঙ্গীও মৌলিক; তাহা না হইলে তাঁহাদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য এমন ফুটিয়া উঠিত না। এ স্বাতন্ত্র্য যেন জন্মাগত, কোনও বহির্গত প্রভাবের ফল নয়। তাই বিহারীলালের কোনও কোনও শ্লোকে শেলীর কবিতাবিশেষের ছায়া লক্ষ্য করিলেও এরূপ ভাব-সাদৃশ্য অনুকরণাত্মক হইতে পারে না। অতএব এইরূপ প্রভাবকেই বিহারীলালের কাব্য-প্রেরণার কারণ বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে। তথাপি, বিহারীলাল এই সকল কবিদের সঙ্গে যে একেবারে অপরিচিত ছিলেন এমন না হইতে পারে; হয়তো ইংরেজী কাব্যে কবি-মানসের এই নূতন অভিব্যক্তির কথা তিনি তদানীন্তন পণ্ডিত-সমাজে আলোচনা-প্রসঙ্গে জানিতে পারিয়াছিলেন, এবং তাহাতে নিজের সাধনা সম্বন্ধে আশ্বাস ও উৎসাহ বোধ করিয়াছিলেন,—আচার্য্য কৃষ্ণকমলের মত বন্ধুর সংসর্গ যাঁহার জীবনে ঘটিয়াছিল, তাঁহার সম্বন্ধে এরূপ অনুমান মিথ্যা না হইতেও পারে।

তবে কি বাংলাকাব্যে বিহারীলালের অভ্যুদয় নিতান্তই আকস্মিক? তিনি কি সে যুগের কেহ নন?—সাহিত্যের ইতিহাসে এরূপ ঘটনা কুত্রাপি ঘটে না, আমাদের সাহিত্যেও ঘটে নাই; বিহারীলাল এই যুগেরই কবি, এবং প্রতিভাহিসাবে তিনি যেমন বঙ্কিম ও মধুসূদনের সমকক্ষ,

তেমনি, তাঁহার কাব্যপ্রেরণা সম্পূর্ণ বিপরীত হইলেও একই অবস্থার ফল। সে যুগের সাহিত্যে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে বাঙ্গালীর প্রতিভা যে নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিল, মধুসূদন, বঙ্কিম প্রভৃতি তাহাকে বাহিরের দিক হইতে বরণ করিয়া কল্পনাকে বহির্মুখী করিয়া য়ুরোপীয় আদর্শে রসসৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন—অন্তরকে বাহিরের নিয়মাধীন করিয়া সর্ব্বদ্বন্দ্ব ও সংশয়কে কাব্যরসে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। বিহারীলাল এই দ্বন্দ্ব স্বীকার করেন নাই—এই-খানেই তাঁহার ভারতীয় সংস্কার জয়ী হইয়াছে; কিন্তু তিনিও এ যুগের প্রভাব অস্বীকার করিতে পারেন নাই। অর্থাৎ বহির্জগৎ সম্বন্ধে যে সচেতনতা এ যুগে অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল, পূর্ব্বতন কোনও যুগে যদি তাহা ঘটিত, তবে ভারতীয় কবি কাব্য-সাধনার যে-পন্থা অবলম্বন করিতেন ও যে-মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিতেন, বিহারীলাল তাহাই করিয়াছিলেন। তিনি বহির্জগৎকে কতকটা আড়ালে রাখিয়া প্রাণের মধ্যে একটা আদর্শ ভাবজগৎ সৃষ্টি করিয়া সকল সংশয়ের সমাধান করিয়া লইয়াছিলেন। প্রীতি ও সৌন্দর্য্য-লুব্ধ কবি-প্রাণ ধ্যানযোগে বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে এমন একটা সত্তার সন্ধান পাইয়াছিলেন, যাহার ভাবনায় জীব-ধর্ম্মের গভীরতম প্রবৃত্তিও বাস্তব জগতের কঠোর কর্কশতার উপরে একটি কোমল প্রলেপ বুলাইয়া শান্ত আনন্দ-রসে পরিতৃপ্ত হইতে পারে। এ সাধনা ভারতীয় প্রকৃতির অনুবন্ধী—সকল রসের উপরে শান্ত-রসের প্রতিষ্ঠাই ভারতীয় কবির কবি-ধর্ম্ম। মানুষের বাস্তব জীবনের প্রত্যক্ষ-কঠোর নিয়তি, বাসনা-কামনার স্বর্গ-নরকব্যাপী আলোড়ন, সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি ট্রাজেডির অনুভাবনা, ভারতীয় কবির কল্পনাকে বিপথগামী করিতে পারে নাই। কিন্তু বিহারীলালের কাব্যসাধনায় এই মন্ত্রের প্রভাব থাকিলেও তাহা স্বতন্ত্র, তাঁহার কবিপ্রকৃতি অন্যদিকে সম্পূর্ণ আধুনিক। আলঙ্কারিক পণ্ডিতগণ কাব্যরসকে ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর বলিয়া ঘোষণা করিলেও—কাব্যকে চতুর্ব্বর্গফলপ্রদ বলিয়া স্বীকার করিলেও—কবির কাব্যসাধনাকে আধ্যাত্মিক সাধনা বলিয়া মনে করিতেন না। কারণ এই রসসৃষ্টিতে কাব্যের যে কলা-কৌশল নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, সেই কলাকৌশলের নিপুণ প্রয়োগই কবিপ্রতিভার মুখ্য কীর্ত্তি—রস যেন তাহার গৌণ পরিণাম; কবি যেন একটি আদর্শ স্থির রাখিয়া কাব্যের উপকরণগুলি প্রয়োজন মত ব্যবহার করিতেন; একটা বাঁধা নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া নিজ মানস বা প্রাণের প্রেরণাকে দমন করিয়া রাখিতেন। এজন্য কাব্যসাধনায় কবি-মানসের কোনও স্বাধীন বিকাশের সম্ভাবনা ছিল না। আধুনিক কালে আমরা কাব্যের মধ্যে কবি-মানসের যে আধ্যাত্মিক পরিচয় পাই—মানুষের স্বাভাবিক বোধশক্তি জগতের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কের ফলে যে পূর্ণ-চেতনা লাভ করে—কবি কীট্‌স্ যাহাকে 'soul-making' বলিয়াছেন, এই সকল কাব্যে তাহার নিদর্শন নাই। কাব্য বাস্তব জগতের রূপরসোদ্ভূত হইলেও তাহার লক্ষ্য যখন সেই 'রস'—যাহা ব্রহ্মাস্বাদের মত, তখন বস্তুজগতের সঙ্গে কাব্যের ঘনিষ্ঠ যোগ থাকিবার প্রয়োজন কি?—কলে-কৌশলে সেই অবস্থা ঘটাইতে পারিলেই যথেষ্ট। অতএব বাহিরের সঙ্গে অন্তরের কোনও বোঝাপড়া অনাবশ্যক—সে সমস্যা জ্ঞান-যোগী দার্শনিকের

অধিকারভুক্ত। এজন্য কবির পক্ষে একটা স্বাধীন ভাবসাধনার প্রয়োজন কখনও অনুভূত *হয় নাই। আধুনিক বাঙ্গালী কবি বিহারীলাল এই বহিঃসৃষ্টির প্রভাবকে অন্তরে অনুভব* করিয়াছেন, এবং তাহাকে নিজস্ব ভাবসাধনার মন্ত্রে জয় করিয়া লইয়াছেন। এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মূলে যে subjectivity আছে তাহা ভারতীয় সাধন-রীতির অনুকূল; কিন্তু তাহা যে কবিধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ নূতন; কারণ, এই ভাবসাধনার মূলে আছে মর্ত্ত্যমাধুরীলুব্ধ কবিপ্রাণ, তাহা ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের বিরোধী। কবিকল্পনার উপরে বহিঃপ্রকৃতির এই প্রভাব—যেমন ভাবেই হোক, মর্ত্ত্যজীবনের মাধুরী পান করিবার এই আকাঙ্ক্ষা—যে ধরণের আধ্যাত্মিকতায় মণ্ডিত হইয়াছে তাহাই বাংলা গীতিকাব্যে আধুনিকতার লক্ষণ। ইংরাজ রোমান্টিক কবিগণের মতই—প্রকৃতি ও মানব-হৃদয়কে একত্রে গাঁথিয়া একটা বৃহত্তর আদর্শের অনুপ্রাণনা, মানুষের মনোবৃত্তি ও দেহ-বৃত্তিকে একই তত্ত্বের অধীন করিয়া সত্যকে সুন্দর ও সুন্দরকে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিবার এই চেষ্টা,—মানুষের প্রাণে যে প্রেম ও সৌন্দর্য্যের পিপাসা রহিয়াছে, বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে তাহার উৎসরূপিণী এক চিন্ময়ী সত্তার কল্পনা—বাঙ্গালী কবিকেও এত শীঘ্র অভিভূত করিয়াছে, ইহাই বিস্ময়কর। কিন্তু তদপেক্ষা বিস্ময়কর তাঁহার কল্পনার মৌলিকতা। তাঁহার 'সারদা', Wordsworth-এর প্রকৃতিসর্ব্বস্ব বিশ্বচেতনাও নয়, Shelleyর রূপাতীত রূপময়ী, প্রেম-সৌন্দর্য্যের অপরা আদর্শ-লক্ষ্মী, বিশ্বাতীত বিশ্বাত্মাও নয়। তাঁহার 'সারদা' মানুষের স্বাভাবিক প্রীতি-প্রেমের প্রবাহরূপিণী, বিশ্বব্যাপ্ত সৌন্দর্য্য ও মানবীয় প্রেমের সমন্বয়রূপিণী, বহিরন্তর-বিহারিণী, বিশ্ববিকাশিনী "দেবী যোগেশ্বরী";—তিনি "প্রত্যক্ষে বিরাজমান, সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠান," অর্থাৎ "তুমিই বিশ্বের আলো (শুধু নয়), তুমি বিশ্বরূপিণী"—

> তুমি বিশ্বময়ী কান্তি, দীপ্তি অনুপমা,
> কবির যোগীর ধ্যান
> ভোলা প্রেমিকের প্রাণ—
> মানব-মনের তুমি উদার সুষমা।

—'যোগীর ধ্যান' ও 'প্রেমিকের প্রাণ',—তাঁহার 'সারদা'য় এই দুয়ের কোনও বিরোধ নাই, কারণ প্রেম ও সৌন্দর্য্য-পিপাসা তাঁহার নিকট অভিন্ন।

বাস্তব-প্রীতি বা প্রত্যক্ষের প্রতি প্রাণের আকর্ষণ যাহার নাই, তাহার সৌন্দর্য্য পিপাসাও নাই। সৌন্দর্য্য রূপাতীত বা বাস্তবাতীত নয়, এজন্য প্রেয়সী ও রূপসীর মধ্যে ভাবগত অসামঞ্জস্য নাই। যোগীর ধ্যানে যে সৌন্দর্য্যের প্রেরণা রহিয়াছে, প্রকৃত প্রেমের প্রেরণাও তাই। বিহারীলাল বিশ্বপ্রকৃতি ও মানব-হৃদয়ের যোগসূত্ররূপিণী এই 'যোগেশ্বরী' সারদার কল্পনা করিয়াছেন; ইহাতে কাব্যের সহিত জীবনের একটা নিগূঢ় সম্পর্কের কথা—সকল উৎকৃষ্ট কাব্য-প্রেরণার মর্ম্মকথা প্রকাশিত হইয়াছে। কবি কীট্‌সের সেই "Principle of Beauty in all things" বিহারীলালও কতকটা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। মনে হয়, কবি-প্রেরণার

পরম তত্ত্বটিকে তিনি যেমন করিয়া প্রাণের মধ্যে পাইয়াছেন, তেমন করিয়া Wordsworth বা *Shelley*ও পান নাই। কবি কীট্‌স্ যাহার সজ্ঞান চেতনায় অভিভূত হইয়াছিলেন, Shakespeare অজ্ঞানে তাহারই বশবর্ত্তী হইয়া কাব্যসৃষ্টির আনন্দে কবিজীবনের পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। বিহারীলালের ভারতীয় প্রকৃতি ধ্যানরসে পরিতৃপ্ত হইয়া নিজ অন্তরের উপলব্ধিকেই কবিপ্রাণের নিশ্চিন্ত মুক্তি মনে করিয়া কেবল মন্ত্র জপ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে।

বিহারীলালের কবিদৃষ্টি কাব্যসৃষ্টিতে সার্থক হয় নাই; তাঁহার কাব্য একরূপ তত্ত্বরসের (mysticism) আধার হইয়া আছে,—সে রসকে তিনি রূপ দিতে পারেন নাই; তিনি নিজে যাহা দেখিয়াছেন অপরকে তাহা দেখাইতে পারেন নাই। এ সম্বন্ধে একটু ভাবিয়া দেখিলে একটা কথা মনে হয়। বিহারীলালের এই মন্ত্র-দৃষ্টি যদি কাব্য সৃষ্টি করে, তবে সে কাব্য গীতিকাব্য হইতে পারে না; নাটকীয় রূপ-সৃষ্টি ভিন্ন আর কোনও উপায়ে ইহার পূর্ণ-প্রকাশ অসম্ভব। যে কল্পনা সুর্ব্ববস্তুকে সুন্দর দেখে, যে সৌন্দর্য্যবোধের মূল বাস্তবপ্রীতি, সে কল্পনার পরিণাম বিশ্বাত্মীয়তা। অতএব তাহা যদি কাব্য-সৃষ্টির প্রেরণা হয় তবে তাহা কোমল-কঠোর, সুন্দর-কুৎসিত, পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ—এক কথায় জগৎসৃষ্টির যত কিছু বৈচিত্র্যকে একটি সমান নির্দ্বন্দ্ব রস-চেতনার বশে কাব্যরূপে প্রতিফলিত করিয়াই চরিতার্থ হইতে পারে, লিরিকের আত্মভাবসর্ব্বস্বতা তাহার পক্ষে অসঙ্গত। এই জন্যই বিহারীলালের গীতি-কবিতাও সুস্পষ্ট আকার গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাঁহার রচনায় যথার্থ কাব্যসৃষ্টির পরিবর্ত্তে কাব্যরস-রসিকের একরূপ ভাবাবস্থার পরিচয় আছে। Keats এই ভাবকে রূপ দিবার—বহিরন্তরবিহারী এই সত্যসুন্দরকে কাব্যের সাহায্যে দৃষ্টিগোচর করাইবার জন্য আকুল হইয়াছিলেন; অসমাপ্ত কবিজীবনে তিনি কেবল ইন্দ্রিয়গোচরকে বাক্যগোচর করিতে পারিয়াছিলেন, নিজ প্রাণের আকুতিকেও অপরের হৃদয়গোচর করিতে পারিয়াছিলেন; তাই তাঁহার অসম্পূর্ণ কবিকল্পনাও কাব্যসৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু তিনিও বুঝিয়াছিলেন ব্যক্তি-নিরপেক্ষ (objective) রূপ-সৃষ্টি ব্যতিরেকে এ কল্পনা সার্থক হইতে পারে না। বিহারীলালের এ ভাবনা ছিল না, এ প্রেরণাই ছিল না; কেবল উৎকৃষ্ট ভাব-রসে নিমগ্ন হইয়া তিনি নিজ প্রাণের আনন্দ জ্ঞাপন করিয়াছেন—কাব্য-প্রেরণার যে রহস্য সেই রহস্যেরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; তাই তিনি প্রকৃত কবি না হইয়া mystic হইয়াই রহিলেন। একজন প্রসিদ্ধ কবি-সমালোচক যথার্থ ই বলিয়াছেন—

"The pure poet is not a mystic: contemplation of the mystery is no end in itself for him. He is a doer, a maker, a revealer, a creator."

তথাপি বিহারীলালের কাব্যসাধনায় ভারতীয় প্রভাব বিশেষ ভাবে থাকিলেও, তাহার একটা লক্ষণ বিস্মৃত হইলে চলিবে না—বিহারীলালের কবি-প্রকৃতিতে উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য্য-বোধ

এবং অতিশয় বাস্তব হৃদয়বৃত্তি এক সঙ্গে চরিতার্থ হইয়াছে। ইহার কারণ, তাঁহার কাব্য-সাধনায় বাঙ্গালীর বৈরাগ্যবিমুখ বাস্তবরস-পিপাসার সঙ্গে ভারতীয় ভাবনা যুক্ত হইয়াছে—এই দুইয়ের সম্মিলনেই এমন সত্যকার কবি-দৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের যে বাঙ্গালী-প্রতিভা বাস্তব-জীবনের কল্পনাগৌরবে কাব্যসৃষ্টি করিয়াছে, সেই বাঙ্গালী-প্রতিভাই ইংরেজী-প্রভাববর্জ্জিত হইয়া এবং ভারতীয় ধ্যান-প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া কাব্যের স্রষ্টা না হইয়া মন্ত্রদ্রষ্টা হইয়াছে। এজন্য শেলী বা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের তুলনায় বিহারীলালের কবি-দৃষ্টি আরও সম্যক ও সুসম্পূর্ণ হইলেও, কাব্যসৃষ্টির বিষয়ে তাঁহাদের বহু নিম্নে রহিয়া গিয়াছে।

বিহারীলালের এই কবি-দৃষ্টি আর কাহাকেও অনুপ্রাণিত না করিলেও তাঁহার কাব্য-রচনার ভঙ্গী এবং তাহার অন্তর্গত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের আদর্শ পরবর্ত্তী কবিগণের উপরে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ইতিমধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী কাব্য-সাহিত্য বাঙ্গালীর সুপরিচিত হইয়া উঠিল; তাহাতে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যে ভাবোন্মাদমাধুরী অপূর্ব্ব সঙ্গীতে উৎসারিত হইয়াছে, গীতি-প্রাণ বাঙ্গালীর কল্পনা তাহাতে আত্মসমর্পণ করিল; বিহারীলাল যে আত্ম-ভাবসাধনার পথ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন তাহাতে এই বিদেশী গীতিকাব্যের আদর্শ সহজেই বাংলা কাব্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু বিহারীলাল খাঁটি বাঙ্গালী-সুলভ প্রীতিকল্পনায়, বাহিরের সহিত অন্তরকে যুক্ত করিয়া একটি পরিপূর্ণ রসসাধনার যে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, সে ইঙ্গিত ব্যর্থ হইল; ইংরেজী কাব্যের প্রভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাই এ কাব্যের মূল-প্রেরণা হইয়া দাঁড়াইল। বিহারীলালের কাব্যে আত্মভাবনিমগ্নতার লক্ষণ থাকিলেও তাহাতে সজ্ঞান আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা নাই। কিন্তু সেই আত্মনিমগ্নতার মোহই বড়াল-কবির কাব্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষারূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাই বিহারীলালের 'সারদা'র একটি দিক—বিশ্বের অন্তঃপুরে তাঁহার সেই রহস্যময়ী মূর্ত্তি—শেলীর কাব্যরসে অভিষিক্ত হইয়া বড়াল-কবির অবাস্তব রসপিপাসার ইন্ধন যোগাইয়াছে। ব্যক্তির এই আত্মপরায়ণ কল্পনা, এই সম্পূর্ণ অসামাজিক আত্মরতির কবিতা বাংলা সাহিত্যে নূতন—কাব্যকে জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কবিকল্পনার হা-হুতাশ বাংলা সাহিত্যে এইখান হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। দেবেন্দ্রনাথের কবিতায় এই আত্মরতি আর একরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে; তিনি সর্ব্ববস্তুতে যে সৌন্দর্য্য দেখিতেছেন তাহা বস্তুগত নয়, বাস্তবই অবাস্তব-মনোহর হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহার প্রীতির অফুরন্ত উৎসমুখে সর্ব্ববস্তুই সুন্দর। এ বিষয়ে তিনিও বিহারীলালের কাব্যকল্পনার একাংশমাত্রের অধিকারী। বিহারীলাল তাঁহার সারদাকে যে 'ভোলা প্রেমিকের প্রাণ' বলিয়াছেন, দেবেন্দ্রনাথের কাব্য তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ বটে, কিন্তু 'কবির যোগীর ধ্যান' তাহা নহে।

তথাপি দেবেন্দ্রনাথের উচ্ছ্বাস-প্রবণ কবি-প্রতিভায়' বাংলা গীতি-কাব্যের যে একটি রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাতেও যেন পলকের জন্য, অন্ধকারে বিদ্যুৎ-চমকের মত, বাঙ্গালীর সেই চিরকালের বাঙ্গালীত্ব শেষবার ধরা দিয়াছে। এ যুগের কবিগণের মধ্যে এই বাঙ্গালী-সুলভ প্রীতির আবেগ আমরা বিহারীলালের কাব্যে দেখিয়াছি; মধুসূদন পাশ্চাত্ত্য মহাকাব্যের আদর্শ গ্রহণ করিয়াও এই প্রীতির বশে abstractions লইয়া থাকিতে পারেন নাই। হেমচন্দ্র এই প্রীতির উচ্ছ্বাসে অসংখ্য কবিতা লিখিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃত কবিশক্তির অভাবে তাঁহার প্রীতি ভাষায় ও ছন্দে কাব্যের অপূর্ব্বতা লাভ করে নাই। বিহারীলাল এই প্রীতিকেই অতি উচ্চ সৌন্দর্য্য-ধ্যানে নিয়োগ করিয়াছিলেন; সেই ধ্যানের সঙ্গে এই প্রীতির বিরোধ ছিল না বলিয়াই তিনি এমন সম্যক কবিদৃষ্টির অধিকারী হইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের কবিতায় এই প্রীতি একটি নূতন ভঙ্গীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে—আত্মভাবমূলক আবেগের তীব্রতায় এই প্রীতি যেন কবির হৃদয়-বাঁশরীর একমাত্র রন্ধ্রমুখে গীতোচ্ছ্বাসে বাজিয়া উঠিয়াছে। চিন্তালেশহীন নিছক emotion-এর এই আবেগ, এই ভাব-বিহ্বলতা বাংলা কবিতায় যে একটি সুর-যোজনা করিয়াছে, তাহা গীতিকাব্য হিসাবে অপূর্ব্ব; নিজ প্রাণের আহ্লাদকে উপুড় করিয়া ঢালিয়া নিঃশেষ করিয়া দেওয়ার এমন ভঙ্গী বাঙ্গালী কবি ভিন্ন অপর কাহারও পক্ষে সম্ভব হইত না। প্রীতি-সৌন্দর্য্যের এই মিলিত আবেগ দেবেন্দ্রনাথকে বিহারীলালের যতটা সমগোত্র করিয়াছে আর কাহাকেও তেমন করে নাই; মনে হয়, যে আবেগ বিহারীলালের ধ্যান-কল্পনায় গভীর হইয়া শান্তরসে পরিণত হইয়াছে, সেই আবেগই দেবেন্দ্রনাথের সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবশ করিয়াছে। বিহারীলাল 'বিচিত্র এ মত্তদশা'কে 'ভাবভরে যোগে বসা' বলিয়াছেন—দেবেন্দ্রনাথের সে যোগসাধনা ছিল না; তাঁহার কল্পনা একমুখী, আত্মহারা, অপ্রকৃতিস্থ; তিনি ধ্যান-ধারণার ধার ধারিতেন না, ভাবকে ভাবিয়া দেখিবার অবসর তাঁহার ঘটিত না। সেজন্য, প্রবল হইলেও তাঁহার কল্পনা সঙ্কীর্ণ, তাঁহার সৃষ্টিশক্তি অসমান ও বিক্ষিপ্ত।

আধুনিক সাহিত্যে বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যের আলোচনায় আমি যাহা বলিয়াছি তাহাতে এযুগের সাহিত্যসৃষ্টির মূল্য নির্দ্ধারণ করা আমার উদ্দেশ্য নয়, তথাপি কবিগণের মৌলিক প্রতিভা ও ব্যক্তিগত প্রেরণার যতটুকু আলোচনা প্রয়োজন তাহা করিয়াছি। এই আলোচনা হইতে বাঙ্গালীর কবি-প্রতিভা তাহার জাতীয় প্রবৃত্তির দ্বারা কতখানি নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে এবং এই সাহিত্যসৃষ্টিতে কি কারণে কোন্ দিকে তাহা কতখানি সফল বা নিষ্ফল হইয়াছে তাহা অনুমান করা দুরূহ হইবে না। বাঙ্গালীর স্বভাবে যে দুই প্রবল বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির উল্লেখ করিয়াছি তাহাও বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য, কারণ এই জন্যই এই সাহিত্যের ধারা একটা ঘূর্ণার মধ্যে পড়িয়া শেষে বিমুখবাহিনী হইয়াছে। যাহা নূতন, অথচ সত্য এবং সুন্দর,

তাহার আদর্শ বিদেশী বা বিজাতীয় হইলেও, তাহাকে আত্মসাৎ করিবার যে উদার কল্পনাশক্তি বাঙ্গালী জাতির বিশেষত্ব, তাহারই প্রভাবে এই নবসাহিত্যের জন্ম হইয়াছিল। কিন্তু জাতির প্রাণে সাড়া না জাগিলে, কেবলমাত্র অনুকরণের দ্বারা সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। তাই, য়ুরোপীয় সাহিত্যের অনুকরণে, এই নব সাহিত্যের কল্পনাভঙ্গী ও ভাব-প্রেরণায় জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে যে কৌতূহল, মনুষ্যজীবনের বাস্তব-নিয়তির ভাবনায় যে অভিনব উন্মাদনা আমরা লক্ষ্য করি—কল্পনাকে ভিতর হইতে বাহিরে আনিয়া বাস্তব-ক্ষেত্রে প্রসারিত করিয়া ইতিহাস বিজ্ঞান সমাজ ও মনস্তত্ত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে সফল ও নিষ্ফল সাধনার পরিচয় পাই, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, বাঙ্গালীর অন্তরে এই মর্ত্ত্যজীবনের প্রতি একটি সত্যকার মমতা, দেহপ্রীতি বা বাস্তবরসবুভুক্ষা চিরদিন বিদ্যমান আছে। কিন্তু দেশের জল-বায়ু, ভারতীয় কাল্চারের প্রভাব, ও বাহিরের নানা অবস্থার গুণে, এই ভোগস্পৃহা জীবনের বাস্তব আশা আকাঙ্ক্ষায় সত্য হইয়া উঠে নাই, অলস ভাববিলাস বা আত্মরতিকেই সে এই ক্ষুধানিবৃত্তির উপায় করিয়া লইয়াছে। তাই সাহিত্যে ও জীবনে কোনও বৃহৎ কল্পনা বা কীর্ত্তি-কামনা তাহার নিশ্চিন্ত পল্লী-বাস-সুখ বিঘ্নিত করিতে পারে নাই। কিন্তু গতযুগের সেই বৈদেশিক ভাবপ্লাবনে সে সহসা জাগিয়া দেখিল, তাহার গ্রামপ্রান্তের সেই নিভৃত নদীটির কূল-রেখা দূরবিসর্পী মাঠ-বাট-প্রান্তর একাকার করিয়া দিগন্ত-সীমায় মিশিয়াছে; এবং সেইখানে ঊষালোকে, নানারাগরঞ্জিত মণিহর্ম্ম্যের মত একটি মেঘস্তম্ভ যেন সেই জলের উপরেই দাঁড়াইয়া ছায়া বিস্তার করিয়াছে। বাস্তব জগতে কল্পনার এই আচম্বিত বিস্তারে তাহার প্রাণের স্ফূর্ত্তি হইল; যে-মেঘ আকাশকে মেদুর করিয়া, গৃহকোণ অন্ধকার করিয়া, তাহার অন্তরের দীপশিখা উজ্জ্বল করিয়া তুলিত, সেই মেঘ আজ নবপ্রভাতের কিরণচ্ছটায় কি অপরূপ মায়াপুরী রচনা করিয়াছে! সেই দিগন্তবিস্তৃত জলরাশি পার হইয়া অসীম সম্পদ-শোভার রহস্যনিকেতন অধিকার করিবার জন্য মধুসূদন তাঁহার অমিত্রাক্ষরছন্দে আহ্বান-সঙ্গীত গাহিলেন। এই কূলভাঙ্গা কল্পনা-স্রোত, এই মুক্তির আনন্দই বাংলাকাব্যে মধুসূদনের দান। কিন্তু মধুসূদন য়ুরোপীয় আদর্শে মানুষের মনুষ্যধর্ম্ম, পুরুষের পৌরুষকেই জয়যুক্ত করিতে চাহিলেও, মনুষ্যজীবনের তলদেশ বা ভীমকান্ত শিখর-মহিমা অপলক নেত্রে নিরীক্ষণ করিবার সাহস বা ধৈর্য্য সঞ্চয় করিতে পারেন নাই; বাঙ্গালীসুলভ মমতা ও প্রীতিবিহ্বলতার বশে তিনি তাঁহার অন্তরের অন্তরে য়ুরোপীয় আদর্শকে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রই সে প্রভাব পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন; তাঁহার কাব্যেই মানুষের সর্ব্বাঙ্গীণ মানুষ্যত্ব প্রকটিত হইয়াছে। কিন্তু অতঃপর বাংলা কাব্য-সাহিত্যে কল্পনার এ ধারা আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে —জীবন-সমুদ্র মন্থন করিয়া বিষামৃত-পানের সে আকাঙ্ক্ষা—দেহ, মন ও হৃদয় এই তিনেরই উদ্দীপনার সে পৌরুষ আর নাই। মনে হয়, যে প্রাণবহ্নি কেবল মাত্র কবি-প্রতিভা দ্বারা এক সাহিত্য হইতে আর এক সাহিত্যে জ্বালাইয়া লইয়া বাঙ্গালীর কল্পনা

বহির্মুখী হইতে চাহিয়াছিল, তাহাতে গোড়া হইতেই একটা অভাব, একটা দুর্ব্বলতা ছিল। বাঙ্গালীর মজ্জাগত গীতিপ্রবণতা বা আত্মভাববিহ্বলতাই শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হইয়াছে —বাস্তব-জীবন-সাধনার সেই নূতন আবেগ সাহিত্যেও সফল হয় নাই। যে-প্রবৃত্তি আধুনিক সাহিত্যের প্রারম্ভকে একটি নবতন ভঙ্গীতে প্রকাশ করিয়াছিল তাহা যেন অর্দ্ধপথেই নিঃশেষ হইয়াছে। বাঙ্গালীর একমাত্র সম্বল ছিল সুলভ ভাবোচ্ছ্বাস ও সহজ প্রীতিরস-রসিকতা—তাহাই লইয়া সে মহাকাব্য ও কাহিনীর দিকে ঝুঁকিয়াছিল—তাহার ফল হইয়াছিল শক্তিহীন অনুকরণ ও ভাব-কল্পনার স্বেচ্ছাচার। ইহারই প্রতিক্রিয়া আনয়ন করিলেন বিহারীলাল। তিনি একেবারে বাহির হইতে অন্তরে আশ্রয় লইলেন, এবং কাব্যসাধনার ধ্যানযোগে, উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য্যবোধ ও বাঙ্গালীসুলভ সহজিয়া প্রীতির যোগসাধন-প্রণালী নির্দ্দেশ করিলেন। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের যে নব অনুপ্রেরণা বাংলা কাব্যে প্রথম প্রথম একটা কোলাহলের সৃষ্টি করিলেও, কালে তাহা প্রাণমূলে রস-সঞ্চার করিয়া, শুধু সাহিত্যে নয়, বাঙ্গালীর জীবনেও প্রতিষ্ঠা পাইত—বিহারীলাল সেই অনুপ্রেরণাকে আদৌ অস্বীকার করিয়া—

'হা ধিক! ফেরঙ্গ বেশে
এই বাল্মীকির দেশে
কে তোরা বেড়াস সব উল্কিমুখি আয়া!'

এবং

'তপোবনে ধ্যানে থাকি এ নগর-কোলাহলে'

—বলিয়া, জীবনের সর্ব্বদায়িত্ব বিস্মৃত হইয়া তাঁহার সরস্বতীকে সম্বোধন করিয়া গাহিলেন—

তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী,
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি,
হোক্‌ গে এ বসুমতি যার খুশী তার।

ইহাতেই সর্ব্বদ্বন্দ্বের মীমাংসা হইল, বাঙ্গালী যেন মুক্তি পাইল। আত্মভাব-নিমগ্ন বাঙ্গালী কবি কখনো অন্তরে কখনোও বাহিরে স্বকীয় কল্পনা প্রসারিত করিয়া কাব্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের সাধনা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বিহারীলাল খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন, এই আত্মভাবনিমগ্নতার মধ্যেও তিনি একটি অপূর্ব্ব প্রীতিরসের সাধনা করিয়াছিলেন। এ প্রীতি শুধুই কাল্পনিক বিশ্বপ্রেম নয়, অথবা আর্টের সৌন্দর্য্য-লালসা নয়; এ রস জীবনের প্রত্যক্ষ বাস্তব হৃদয়-সম্পর্কের রস। এই প্রীতি ও সৌন্দর্য্য-পিপাসা একাধারে মিলিত হইয়াই বিহারীলালের কাব্যে (আধুনিক বাংলাকাব্যের একমাত্র সত্যকার) mysticism সঞ্চার করিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি কবিজীবনের আদর্শহিসাবে বিহারীলালের বাঙ্গালীত্ব এই যে ভাবদৃষ্টির সন্ধান পাইয়াছিল—কাব্যমন্ত্র ইহা অপেক্ষা বিশুদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু এ দৃষ্টিকে

বিহারীলাল কবিকর্ম্মে পরিণত করিতে পারেন নাই, তাহার কারণও উল্লেখ করিয়াছি। অতএব ইহাও আশ্চর্য্য নয় যে, পরবর্ত্তী যে সকল কবি কাব্যসৃষ্টিতে অধিকতর সাফল্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই এই যোগদৃষ্টির অধিকারী হন নাই, বা হইতে চান নাই। তাঁহারা বিহারীলালের নিকট হইতে কেবল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মন্ত্রটি গ্রহণ করিয়াছিলেন,—সে মন্ত্রের স্বতন্ত্র সাধনায় অতঃপর বাংলা কাব্য যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহা কাব্য-সৌন্দর্য্যে এ যুগের সাহিত্যকে যে পরিমাণে বিশ্ব-সাহিত্যের সমকক্ষ করিয়াছে, ঠিক সেই পরিমাণে তাহাতে বাঙ্গালীর জাতিধর্ম্ম তাহার ব্যক্তিধর্ম্মের নিকট পরাস্ত হইয়াছে; যে গীতি-কল্পনায় তাহা মণ্ডিত হইয়াছে তাহার ছন্দ ও সুর অতিশয় মোহকর হইলেও সে সুরে প্রাণের সুর মিলাইতে হইলে বাঙ্গালীকে জাতিসংস্কার-মুক্ত হইতে হয়—এমন কি জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ চেতনাও স্তম্ভিত করিতে হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার সেই অনন্যসাধারণ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বাংলাভাষা ও সাহিত্যের অসীম বৈচিত্র্য সাধন করিয়া অবশেষে ভাবের তুরীয়মার্গে বিচরণ করিয়া, বাঙ্গালীর সাহিত্যসাধনাকে জীবন-ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, যে অতীন্দ্রিয় ভাববিলাসের মোহে প্রাণহীন করিয়া তুলিয়াছে, এবং অতি-আধুনিক কালে তাহার যে প্রতিক্রিয়া, রসবোধের একান্ত অভাব অথবা কাব্য-বিদ্বেষরূপে অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে, তাহার বিস্তৃত আলোচনার জন্য স্বতন্ত্র প্রবন্ধের প্রয়োজন; এ প্রবন্ধ এইখানেই শেষ করিলাম।

শ্রাবণ, ১৩৩৬

বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিম-প্রসঙ্গের আরম্ভে, নর, নারায়ণ, নরোত্তম ও সর্ব্বশেষে দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয়োচ্চারণ* করি। ইহার কারণ, বঙ্কিম যে জীবনব্যাপী তপস্যা করিয়াছিলেন তাহাতে এই চারি দেবতারই উপাসনা ছিল। এই জন্যই আজ তাঁহাকে বিশেষ করিয়া স্মরণ করি। আজ আমরা তাঁহার প্রাণের মর্ম্মটি বুঝিতে চেষ্টা করিব। তিনি যে ভাষার মন্দির গড়িয়াছিলেন, তাহার কারুশিল্পের বিশ্লেষণ আজ করিব না,—সেই মন্দিরের মধ্যে তিনি নিজের প্রাণ উৎসর্গ করিয়া যে দেবতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহারই আরতি করিব।

বঙ্কিমের সাহিত্য-সাধনার প্রেরণা যোগাইয়াছিল, প্রত্যক্ষভাবে—স্বজাতি, স্বদেশ ও স্ব-সমাজ, এবং পরোক্ষভাবে—মানবের অদৃষ্ট ও মনুষ্যত্বের আদর্শ-সন্ধান। যে-জ্ঞান তত্ত্ব মাত্র, যে ধর্ম্ম শুষ্ক তর্ক মাত্র, এবং যে-কাব্য আর্ট মাত্র, বঙ্কিম তাহাকে বরণ করেন নাই—বুঝিতেন না বলিয়া নয়, তিনি তাহা চান নাই, তাঁহার প্রাণ নিষেধ করিয়াছিল। যে-ধর্ম্ম মানুষের সত্যকার প্রকৃতি বা চরিত্রগত স্বধর্ম্ম, যাহা জীবনের সর্ব্ববিধ প্রয়াসের মধ্যে সার্থক হইতে চায়—যে-ধর্ম্ম জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম ও কর্ম্মের সঙ্গতি রক্ষা করিয়া, পূর্ণ মনুষ্যত্ব-সাধনের উপায়, বঙ্কিম তাহাকেই বরণ করিয়াছিলেন। আবার, যে-দেশ, যে-জাতি ও যে-কুলে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—সেই দেশের ইতিহাস, সেই জাতির সাধনা, সেই সমাজের ধর্ম্মকে উদ্ধার করাও তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল, নিজের মহতী প্রতিভা তিনি তদর্থে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি সরস্বতীকে সেবায় প্রসন্ন করিয়া শ্রেষ্ঠ বর লাভ করিয়াছিলেন, অথচ নর, নারায়ণ ও নরোত্তমকে কদাপি বিস্মৃত হন নাই।

আজ সমাজ, ধর্ম্ম, নীতি কিছুরই জন্য আমাদের চিন্তা নাই; শিক্ষিত বাঙ্গালী এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। আত্মরক্ষার জন্য যে চিন্তাশক্তি ও হৃদয়-বলের প্রয়োজন তাহা অতিশয় ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে; অন্ন ও স্বাস্থ্য—এই দুইটি প্রাথমিক প্রয়োজন-সাধনেও আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা নিরুপায়। উচ্চচিন্তার পরিধি অতিশয় সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে; সাহিত্যের নামে যাহা করিতেছি তাহা দুর্ব্বলচিত্ত অশিক্ষিতের আত্মপ্রসাদ মাত্র; রাজনীতির সঙ্গে স্বধর্ম্মের যোগসাধন করিতে পারি নাই—ঘোর অচৈতন্য অবস্থায় বৃথা হাত-পা ছুড়িতেছি। সকল চিন্তা ও সকল কর্ম্মের মূলে যে আত্মজ্ঞান, ধর্ম্মবল ও পৌরুষের প্রয়োজন তাহারই একান্ত অভাব হইয়াছে। আমরা জাতীয় সাধনার ধারা হারাইয়াছি, ইতিহাস ভুলিয়াছি,—

---

* এখানে মূল সংস্কৃত শ্লোকটির অর্থ রক্ষা করি নাই—তজ্জন্য পণ্ডিতগণ যেন ক্ষুণ্ণ না হন।—গ্রন্থকার

দেড়শত বৎসর পূর্ব্বেও যে সহস্র বৎসরের ইতিহাস আছে, তাহার মধ্যে আমাদের জাতীয় প্রকৃতির পরিচয় কিরূপ, উত্থান ও পতনের কোন্ নিয়ম বা হেতু রহিয়াছে, কীর্ত্তি বা অপকীর্ত্তির পরিমাণ কি, এক কথায় আমরা কি ও কে, তাহা একেবারে ভুলিয়াছি। এজন্য আমরা স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছি, এবং বিদেশী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচ্ছিন্ন বাক্যসমষ্টির তাড়নায়, প্রতি দশবৎসর, পলকে প্রলয় জ্ঞান করিয়া প্রবল মন্বন্তরমুখে ভাসিয়া চলিয়াছি। তাই আজ বঙ্কিমের যুগ ও বঙ্কিমকে জানিতে ইচ্ছা হয়। বঙ্কিমের চরিত্রে ও প্রতিভায় সেই যুগের বাঙ্গালী হিন্দুর আত্ম-জাগরণের প্রয়াস ফুটিয়া উঠিয়াছিল। মৃতকল্প জাতির সুপ্ত প্রাণ-শক্তি ও অধ্যবসায় এই যুগন্ধর ব্যক্তিকেই বিশেষ করিয়া আশ্রয় করিয়াছিল। বাঙ্গালী যদি কখনো আত্ম-প্রবুদ্ধ হয়, তবে যতই দিন যাইবে ততই বঙ্কিম-প্রতিভার এই দিক্‌টির প্রতি তাহার শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর বাড়িবে, বঙ্কিমকে সে ভালো করিয়া বুঝিবার জন্য চেষ্টিত হইবে—কেবল সাহিত্যস্রষ্টা বঙ্কিমকে নয়, খাঁটি দেশ-প্রেমিক, আধুনিক বাঙ্গালী জাতির ঋষিকল্প শিক্ষাগুরু, দৈবী প্রতিভার অধিকারী বঙ্কিমকে চিনিয়া লইবে।

সে যুগে পশ্চিমের সঙ্গে হঠাৎ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে—ইংরেজী দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রচণ্ড প্রভাবে বিস্মিত ও সচকিত বাঙ্গালী-সন্তানের যে নব-জাগরণ ও ভাবান্তর উপস্থিত হইল, তাহার ফলে সে 'স্বনুষ্ঠিত পরধর্ম্মে'র প্রতি অবশে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। সেই আধ্যাত্মিক সঙ্কটে সত্যপিপাসু শিক্ষিত বাঙ্গালীর অনেকেই সহজলব্ধ পন্থায় গা ভাসাইবার উপক্রম করিলেন। চুপ করিয়া থাকিবার সময় সে নয়, স্ব-সমাজ ও স্বধর্ম্মের নিদারুণ অধোগতি তখন চাক্ষুষ হইয়া উঠিয়াছে। সত্যসন্ধ চিন্তাশীল পুরুষের মনে তখন একটা প্রবল কর্ত্তব্যের তাগিদ আসিয়াছে। য়ুরোপীয় যুক্তিবাদ, বিজ্ঞানের নির্ভীক তথ্য-সমুচ্চয়, এবং তাহারি আলোকে এক অভিনব মানবধর্ম্মের আদর্শ প্রাচীন বিশ্বাসের মূল পর্য্যন্ত বিচলিত করিয়া তুলিল। বিশ্বাস বলিতেছি এই জন্য যে, তখন চিন্তাশক্তি লোপ পাইয়াছে, বিচারবুদ্ধি অন্ধসংস্কারে পরিণত হইয়াছে, জাতীয় সাধনার অন্তর্নিহিত তত্ত্বগুলির সঙ্গে জ্ঞানবৃত্তি বা প্রাণবৃত্তি কোনটারই আর জীবন্ত যোগ ছিল না। এজন্য এই বীর্য্যবান পরধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত মুক্তিপন্থাই উদার, প্রশস্ত ও সুগম বলিয়া মনে হইল। -- তির পক্ষে ইহাই হইল কঠিন সঙ্কট। তথাপি সে ভালই হইল—এইরূপ সঙ্কটেরই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সঙ্কটকে কল্যাণে পরিণত করিবার মত মনীষা ও হৃদয়-বলের প্রয়োজন। বঙ্কিমের মধ্যে আমরা সেই দুর্লভ প্রতিভার পরিচয় পাই। বঙ্কিম য়ুরোপীয় সভ্যতা ও সাধনার ধারা শ্রদ্ধার সহিত বিচার করিয়াছিলেন। এই প্রভাবের প্রত্যক্ষ প্রমাণ তাঁহার যাবতীয় রচনা ও সাহিত্যসৃষ্টির আদর্শে পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু সেই প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইলেও, * তিনি তাহাকে যতটুকু সত্য বলিয়া মানিয়াছিলেন ঠিক ততটুকুই হিন্দুর সাধনা

* "তবে ইহাও আমাকে বলিতে হইতেছে যে, যে ব্যক্তি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং দর্শন অবগত হইয়াছে, সকল সময়েই সে যে প্রাচীনদিগের অনুগামী হইতে পারিবে, এমন সম্ভাবনা নাই। আমিও সর্ব্বত্র তাঁহাদের

ও সভ্যতায় অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাই বঙ্কিম-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য, এই জন্যই য়ুরোপীয় শিক্ষা-দীক্ষা অন্তরায় না হইয়া, তাঁহার মধ্য দিয়া, এবং বিশেষ করিয়া তাঁহার দ্বারাই, স্বধর্ম্ম, স্বসমাজ ও স্বজাতির কল্যাণপ্রসূ হইয়াছিল।

বঙ্কিমকে বুঝিতে হইলে তাঁহাকে কেবল জ্ঞানী চিন্তাবীর হিসাবে পরীক্ষা করিলে চলিবে না। জ্ঞানের সাধনা বা সত্যের প্রতিষ্ঠায় আরও অনেকে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, জাতির মুক্তিপথ-নির্দ্দেশে তাঁহাদের সহায়তা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া, আমরা সেই যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালীর চরিত কীর্ত্তন করিব। রমেশচন্দ্র দত্ত বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রকে 'the greatest man of the nineteenth century' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বঙ্কিমের সেই greatness-এর অর্থ কি? বঙ্কিম কেবলমাত্র চিন্তা-বীর বা সত্যপরায়ণ সমাজসংস্কারক ছিলেন না—আরও বড় ছিলেন। দেশপ্রেমের প্রেরণাযুক্ত এক অপূর্ব্ব প্রতিভায় তিনি সে যুগে স্বধর্ম্ম ও পরধর্ম্মের বিরোধ নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন—তাঁহার চিন্তায় শুধুই বিশ্লেষণী শক্তি নয়, সৃজনী শক্তি ছিল। মৃতপ্রায় বৃক্ষকাণ্ড উৎপাটন করিয়া তাহার স্থানে সুদৃশ্য ও সুদৃঢ় লৌহস্তম্ভ স্থাপন করিবার বুদ্ধি তাঁহার ছিল না—সেই মৃতবৃক্ষের মূলে তাহারই জন্মমৃত্তিকা হইতে রসসঞ্চার করাইয়া তাহার বৃক্ষত্ব সম্পাদন করিবার প্রতিভা একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রেরই ছিল। 'Our greatest thoughts come from the heart'—এই রহস্যময় চিত্তবৃত্তি, হৃদয়ের গভীর গহনের অনুভূতি না থাকিলে, কেহ কিছু সৃষ্টি করিতে পারে না। এইজন্য বঙ্কিম কবি, কিন্তু কবিত্বের অপেক্ষা বড় ছিল তাঁহার যে শক্তি—তাঁহার কবি-কল্পনা যে শক্তির একটা অংশমাত্র, একটা সাধন-প্রণালী মাত্র—আমি সেই শক্তির কথাই বলিতেছি। তিনি প্রকৃত জীবনের সমস্যা, পরিপূর্ণ জীবনের আদর্শ,—জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, কর্ম্ম—সর্ব্ববৃত্তির সামঞ্জস্য-মূলক একটি সত্যের সন্ধান করিয়াছিলেন, এবং তাহাকে নিছক জ্ঞান বা ধ্যানের মধ্যে নয়, জীবনের সমগ্র বাস্তবতার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। এই সত্যের সন্ধানই তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্ব।* হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহার

অনুগামী হইতে পারি নাই। যাঁহারা বিবেচনা করেন এদেশীয় পূর্ব্বপণ্ডিতেরা যাহা বলিয়াছেন তাহা সকলই ঠিক এবং পাশ্চাত্যগণ জাগতিক তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলেন তাহা সকলই ভুল, তাঁহাদিগের সঙ্গে আমার কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই।" বঙ্কিমচন্দ্রকৃত 'শ্রীমদ্ভগবদ্‌-গীতা'র অনুবাদ ও টীকার ভূমিকা।

* "মনুষ্যের কতকগুলি শক্তি আছে। আপনি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছেন। সেইগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতাই মনুষ্যত্ব। তাহাই মনুষ্যের ধর্ম্ম। সেই অনুশীলনের সীমা পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য। তাহাই সুখ। এই সকল বৃত্তির উপযুক্ত অনুশীলন হইলে ইহারা সকলেই ঈশ্বরমুখী হয়। সেই অবস্থাই ভক্তি।" অনুশীলন, অষ্টাবিংশ অধ্যায় [উপসংহার]

"বৃত্তি নিকৃষ্ট হউক বা উৎকৃষ্ট হউক, উচ্ছেদমাত্রই অধর্ম্ম। লম্পট বা পেটুক অধার্ম্মিক ; কেন না, তাহারা আর সকল বৃত্তির প্রতি অমনোযোগী হইয়া ওই একটার অনুশীলনে নিযুক্ত। যোগীরাও অধার্ম্মিক ; কেননা তাঁহারাও আর সকল বৃত্তির প্রতি অমনোযোগী হইয়া দুই একটির সমধিক অনুশীলন করেন।...

যে প্রীতি, তাহার কারণ তিনি তাহার নিগূঢ় তত্ত্বসকলের উদারতায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। প্রাণের সত্যকার পিপাসা, গভীর শ্রদ্ধা ও নিরন্তর যুক্তি-বিচারের সংযম তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির প্রাণপণ প্রয়াসকে মহিমান্বিত করিয়াছে।*

আমি বঙ্কিমের সৃজনী শক্তির কথা বলিয়াছি। সকল সৃষ্টির মূলেই আছে একটি সমগ্র-দৃষ্টি। এক খণ্ডবস্তু হইতে আর একটা বৃহত্তর খণ্ডবস্তুতে উপনীত হওয়াই সৃষ্টির লক্ষণ নয়। যাহা খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন তাহাকেই এমন একটি আলোকে উদ্ভাসিত করা যে, তাহারই মধ্যে সর্ব্ব-সামঞ্জস্য লক্ষিত হইবে—ইহাই সৃষ্টিশক্তি। কবিরা particular-কে universal-এর গৌরব দান করেন। শ্রেষ্ঠ কবির personality যতই সুনির্দ্দিষ্ট, ততই তাহার মধ্যে impersonal দিকটি পরিস্ফুট হইয়া থাকে। ইহাই অঘটনঘটনপটীয়সী প্রতিভা। বঙ্কিমের প্রতিভায় আমরা ইহাই লক্ষ্য করি। যাহা সর্ব্বকালাতীত, যাহা নিত্য ও শাশ্বত, তাহাকে তিনি কখনও ভুল করেন নাই, কিন্তু তাহাকে দেশকালের ইতিহাসের মধ্যে মূর্ত্তি ধরিতে দেখিয়াছিলেন। ধর্ম্মকে তিনি মানুষের সত্যকার জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একটি তত্ত্বরূপে উপলব্ধি করিয়া পরে তাহাকে মানুষের উপর চাপাইবার চেষ্টা করেন নাই। মানুষের বাস্তব প্রকৃতির মধ্য দিয়াই যে মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ খুঁজিতেছে, তাহাকে তিনি সত্যকার ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। হিন্দুজাতির ইতিহাসে, এই ধর্ম্মের বিশিষ্ট ধারাকে তিনি কোনও একটি যুগ বা দূর অতীতের একটি উৎসের মধ্যেই সম্পূর্ণ হইতে দেখেন নাই—তাহার সমগ্র ইতিহাসের মধ্য দিয়া তিনি সেই ধারাটিকে অনুসরণ করিয়াছিলেন, সেই বহুবিচিত্র প্রকাশ-ভঙ্গীর মধ্যে তাহার মূল প্রেরণাটিকে বুঝিয়া লইয়াছিলেন। এজন্য হিন্দু-ধর্ম্মের অন্তর্গত কোনও একটি তত্ত্বকে তিনি সত্য বলিয়া অপর সকলকে পরিহার করেন নাই। সুদীর্ঘ কালের বিস্তারের মধ্যে একটা জাতির জীবন তাহার সকল চেষ্টা ও প্রবৃত্তির রঙে ও রূপে, যে চাক্ষুষ দেহ ধারণ করিয়াছে তাহার

"আর, আমি কোনো বৃত্তিকেই নিকৃষ্ট বা অনিষ্টকর বলিতে সম্মত নহি। জগদীশ্বর আমাদিগকে নিকৃষ্ট কিছুই দেন নাই। আমাদের সকল বৃত্তিগুলিই মঙ্গলময়। যখন তাহাতে অমঙ্গল হয় সে আমাদেরই দোষে। নিখিল বিশ্বের সর্ব্বাংশই মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিরই অনুকূল, প্রকৃতি আমাদের সকল বৃত্তিগুলিরই সহায়। তাই যুগ-পরম্পরায় মনুষ্যজাতির মোটের উপর উন্নতিই হইয়াছে। যে বৈজ্ঞানিক নাস্তিক, ধর্ম্মকে উপহাস করিয়া বিজ্ঞানই এই উন্নতির কারণ বলেন, তিনি জানেন না, বিজ্ঞানও এই ধর্ম্মের এক অংশ; তিনিও একজন ধর্ম্মের আচার্য্য।" অনুশীলন, ষষ্ঠ অধ্যায়।

* "তিন চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের জন্য যে বিধি সংস্থাপিত হইয়াছিল আজিকার দিনে ঠিক সেইগুলি অক্ষরে অক্ষরে মিলাইয়া চালাইতে পারা যায় না। সেই ঋষিরা যদি আজ ভারতবর্ষে বর্ত্তমান থাকিতেন, তবে তাঁহারাই বলিতেন 'না, তাহা চলিবে না। আমাদিগের বিধিগুলির সর্ব্বাঙ্গ বজায় রাখিয়া এখন যদি চল, তবে আমাদিগের প্রচারিত ধর্ম্মের মর্ম্মের বিপরীতাচরণ করা হইবে'। হিন্দুধর্ম্মের সেই মর্ম্মভাগ অমর, চিরদিন চলিবে, মনুষ্যের হিতসাধন করিবে, কেননা মানবপ্রকৃতিতে তাহার ভিত্তি। তবে বিশেষ বিধিসকল সকল ধর্ম্মেই সময়োচিত হয়। তাহা কালভেদে পরিহার্য্য ও পরিবর্ত্তনীয়।" অনুশীলন, পঞ্চম অধ্যায়।

হৃদ্‌স্পন্দন তিনি অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি তাহার প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যেখানে তাহার হৃদয়ের সহস্রদল একটি বৃন্তে বিধৃত হইয়া আছে—সেই বৃন্তমূলটিকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সেইখানে পৌঁছিতে না পারিলে সামঞ্জস্য বোধ হয় না, বিরোধ ঘুচে না। এমনি করিয়া বিশেষকে ধরিতে পারিলে নির্ব্বিশেষের উপলব্ধি হয়। ইহাই প্রতিভার কাজ, ইহার জন্য শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভার প্রয়োজন। এই জন্যই এক অর্থে কবিও ঋষি, ঋষিও কবি। এই সমগ্র-দৃষ্টিই সৃষ্টিশক্তি। বঙ্কিম এই দৃষ্টির দ্বারা হিন্দুর বিশিষ্ট সাধনাকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন—সৃষ্টি করিয়াছিলেন। Particularকে এমনি করিয়া দেখিতে জানিলে তাহার মধ্যে Universal আপনিই প্রতিফলিত হয়। এই যোগসাধন কেবল যুক্তিতর্কের দ্বারা হয় না। মানুষ যে শুধুই জ্ঞানসাধনের যন্ত্র নয়—অতীতের ঐতিহ্য ও বর্ত্তমানের পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে তাহার প্রাণের একটি বিশিষ্ট রূপ আছে, তাহা তিনি ভুলিয়া যান নাই, অথচ তাহারই মধ্যে সার্ব্বজনীন মনুষ্যত্বের বীজ রহিয়াছে, ইহাও তিনি সব দিক দিয়া ভাল করিয়া বুঝিয়াছিলেন। এই বুদ্ধির মূলে ছিল তাঁহার প্রবল দেশাত্মবোধ, পরে এই বুদ্ধি হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মোদ্ধারকালে আরও দৃঢ় হইয়াছিল। যাহা দেশে, কালে ও পাত্রে খণ্ডরূপে দেখা দেয়, তাহাকেই অখণ্ডরূপে উপলব্ধি করা শ্রেষ্ঠ মনীষার লক্ষণ। আবার, অখণ্ডকে উপলব্ধি করিয়াও খণ্ডের মধ্যেই রসাস্বাদন করা অধিকতর শক্তির প্রমাণ—জ্ঞান তখন শাখাপল্লবেই শেষ হয় নাই, পুষ্পিত হইয়াছে—এই Concrete, Particular-এর প্রীতিই সকল সৃষ্টির মূলে। কি সাহিত্যে, কি সমাজে, কি রাষ্ট্রে, বাস্তবের সহিত এই সহানুভূতি যাহার নাই, যে বাস্তবের রসরূপের পরিচয় পায় নাই, কেবল তত্ত্বসন্ধান করিয়াছে, সে কিছু সৃষ্টি করিতে পারে না, কিছুর মধ্যেই প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না। তাহার মন্ত্র যত উৎকৃষ্ট হউক, সে মন্ত্র প্রাণদ হয় না। কথাটা অবান্তর নয়। যে দেশাত্মবোধ বঙ্কিমের প্রতিভাকে সঞ্জীবিত করিয়াছে, তাহার মধ্যে যদি এই গভীর অনুভূতি ও দৃষ্টিশক্তি না থাকিত, তাহা হইলে স্বধর্ম্মের সঙ্গে পরমধর্ম্মের বিরোধে তিনি সার্ব্বজনীন ও শাশ্বতকে হারাইয়া স্বধর্ম্মকেও হারাইতেন, তাহাকে উদ্ধার করিতে পারিতেন না।

এই দেশাত্মবোধ তাঁহার প্রতিভার মূল উৎস। এ-মন্ত্রে কেহ তাঁহাকে দীক্ষিত করে নাই, ইহা শিক্ষালব্ধ নয়, সহজাত মনীষার মত ইহা যেন তাঁহার প্রাক্তন সম্পদ। জাগ্রতে-স্বপনে, ধ্যানে-জ্ঞানে এক মুহূর্ত্ত তিনি ইহা হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চায় ধর্ম্মতত্ত্বের বিচারে, সাহিত্যসৃষ্টির অপূর্ব্ব উন্মাদনায়—যৌবনের স্বপ্নে, প্রৌঢ়ের কর্ম্ম-জিজ্ঞাসায়, বার্দ্ধক্যের স্মৃতি-কল্পনায়—এই দেশপ্রেম তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছিল, দেশের নামে তিনি আত্মহারা হইতেন। অত বড় গম্ভীর প্রকৃতিও দেশের কথায় বালকের মত অধীর হইয়া উঠিত—ক্ষোভে, লজ্জায়, হর্ষে, শোকে, ক্রোধে ও গর্ব্বে আত্মসংযম হারাইত। এই দেশ কোনও মনঃকল্পিত দেবতা নয়—যেন সাকার বিগ্রহ; এ প্রেম যেন রক্তের ধর্ম্ম—

ব্যক্তিগত সম্পর্কের নিবিড় চেতনা। কত ভাবে, কত প্রসঙ্গে, যে তিনি এই গভীর চেতনা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু সকল ভাবের মধ্যে যে ভাবটি তাঁহার হৃদয়ে আমরণ জাগরূক ছিল, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ কমলাকান্তের 'একটি গীত' হইতে এখানে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না। (সত্যকার অনুভূতি এবং তাহারই প্রকাশ-বেদনা যদি সাহিত্যসৃষ্টির কারণ হয়, এবং সে প্রকাশভঙ্গী অনবদ্য হইলে যদি তাহা সাহিত্য হয়, তবে কাব্যের মধ্যেই কবির অন্তরতম প্রকৃতির পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়।) সেই পরিচয় এই পংক্তিগুলিতে আমরা পাইতেছি—

"আর বঙ্গভূমি! তুমিই বা কেন মণিমাণিক্য হইলে না, তোমায় কেন আমি হার করিয়া কণ্ঠে পরিতে পারিলাম না? তোমার সুবর্ণের আসনে বসাইয়া, হৃদয়ে দোলাইয়া দেশে দেশে দেখাইতাম। ইউরোপে, আমেরিকে, মিসরে, চীনে দেখিত, তুমি আমার কি উজ্জ্বল মণি।...

"সম্পূর্ণ অসহ্য সুখের লক্ষণ শারীরিক চাঞ্চল্য, মানসিক অস্থৈর্য্য। এ সুখ কোথায় রাখিব, লইয়া কি করিব, আমি কোথায় যাইব? এ সুখের ভার লইয়া কোথায় ফেলিব? এ সুখের ভার লইয়া আমি দেশে দেশে ফিরিব; এ সুখ এক স্থানে ধরে না। এ জগৎ সংসার এ সুখে পুরাইব। সংসার এ সুখের সাগরে ভাসাইব।...

"এ সুখে কমলকান্তের অধিকার নাই—এ সুখে বাঙ্গালীর অধিকার নাই। গোপীর দুঃখ বিধাতা গোপীকে নারী করিয়াছেন কেন—আমাদের দুঃখ বিধাতা আমাদের নারী করেন নাই কেন—তাহা হইলে এ মুখ দেখাইতে হইত না।

তোমার যখন পড়ে মনে
আমি চাই বৃন্দাবন পানে
আলুইলে কেশ নাহি বাঁধি।

"এই কথা সুখ-দুঃখের সীমারেখা। যাহার নষ্ট সুখের স্মৃতি জাগরিত হইলে সুখের নিদর্শন এখনও দেখিতে পায়, সে এখনও সুখী—তাহার সুখ একেবারে লুপ্ত হয় নাই। যাহার সুখ গিয়াছে, সুখের নিদর্শন গিয়াছে—বঁধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে, এখন আর চাহিবার স্থান নাই—সেই দুঃখী, অনন্ত দুঃখে দুঃখী।

"আমার এই বঙ্গদেশে সুখের স্মৃতি আছে, নিদর্শন কই? দেবপালদেব, লক্ষ্মণসেন, জয়দেব, শ্রীহর্ষ,—প্রয়াগ পর্য্যন্ত রাজ্য, ভারতের অধীশ্বর নাম, গৌড়ী রীতি, এ সকলের স্মৃতি আছে, কিন্তু নিদর্শন কই? সুখ মনে পড়িল কিন্তু চাহিব কোন্ দিকে? সে গৌর কই? সে যে কেবল যবনলাঞ্ছিত ভগ্নাবশেষ। আর্য্য রাজধানীর চিহ্ন কই? আর্য্যের ইতিহাস কই? জীবনচরিত কই? কীর্ত্তি কই? কীর্ত্তিস্তম্ভ কই? সমরক্ষেত্র কই? সুখ গিয়াছে—সুখচিহ্নও গিয়াছে, বঁধু গিয়াছে বৃন্দাবনও গিয়াছে—চাহিব কোন্ দিকে?"

এ স্বদেশ-প্রীতি আমাদের আধুনিক কালের Nationalism নয়। বিজাতি প্রভুর নিকট স্বরাজের অধিকার সাব্যস্ত করিবার জন্য, সেই বিজাতির অনুকরণে কতকগুলি ছেঁদো বুলি আওড়ান নয়। যে দেশপ্রেমে দেশের সঙ্গে পরিচয় নাই, দেশের ইতিহাস, অতীত কীর্ত্তির অনুশীলন নাই, নিজের বংশ-পরিচয় নাই, জাতির বিশিষ্ট সাধনার ধারাকে নিজের জীবনে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা নাই—ইহা সেই স্বরাজ-কামনা হইতে স্বতন্ত্র। বঙ্কিমের দেশপ্রীতি ছিল যেন দেহেরই ক্ষুধা—মার্জ্জিত শিক্ষিত বুদ্ধিবৃত্তি নয়—একেবারে রক্ত-মাংসের সহজ সংস্কার।/ এই দেশপ্রীতির দ্বারাই তিনি আধ্যাত্মিক ক্ষুধারও নিবৃত্তি করিয়াছিলেন। মনুষ্যত্ব-

ধর্ম্মের বিচারে তিনি যে শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন, তাহারও একটি প্রধান অঙ্গ হইল এই স্বদেশপ্রীতি।* 'গীতার ব্যাখ্যা', 'অনুশীলন', 'ধর্ম্মতত্ত্ব'—সর্ব্বত্র উদার যুক্তিবিচারের ফাঁকে ফাঁকে তাঁহার হৃদয়ের এই শিখা স্ফুরিত হইতেছে; এই প্রাণের প্রেরণাই যেন সর্ব্ব সমস্যার মধ্য দিয়া তাঁহার পথটিকে সুগম করিয়া দিয়াছে। মনে হয়, সত্যই—'our best thoughts come from the heart'।

প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বঙ্কিম পথ খুঁজিয়াছিলেন, পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কবি হইয়াও কাব্যকলাই তাঁহার মুখ্য ভাবনা ছিল না। তিনি সারাজীবন সমগ্র জাতির জীবনপথের পাথেয় সংগ্রহের চিন্তায় ব্যাপৃত ছিলেন। জাতীয় জীবনে যে যুগান্তরের সমস্যা বিরাট হইয়া দেখা দিয়াছিল তাহারই স্পন্দনে তাঁহার সারাচিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল; জাতির জাতিত্ব বজায় রাখিয়া এই নবযুগের প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁহার একমাত্র সাধনা। আত্মনিহিত শক্তির প্রেরণায় বাংলা ভাষার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। যে নূতন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচণ্ড আক্রমণে প্রাচীন সমাজের ভিত্তি দুলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাকে অবিলম্বে ধারণ করিয়া আত্মসাৎ করিবার জন্য উপযুক্ত ভাষা নির্ম্মাণ করিতে হইবে—'বঙ্গদর্শনের প্রথম সূচনা'য় সেই অভিপ্রায়ই ব্যক্ত হইয়াছে। নিজ ভাষার ভিতর দিয়া পরিচয় না হইলে কোন বিদ্যাই জাতির পক্ষে স্বাস্থ্যকর হয় না—নিজ ভাষার ভিতর দিয়াই তাহাকে আত্মসাৎ করা সম্ভব। এই ভাষার সাহায্যে যে সাহিত্য তিনি গড়িয়াছিলেন, নিছক সৌন্দর্য্যপিপাসা চরিতার্থ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি জাতির মধ্যে

*"যে আক্রমণকারী তাহা হইতে আত্মরক্ষা করিব, কিন্তু তাহার প্রতি প্রীতিশূন্য হইব কেন? পর সমাজের অনিষ্ট সাধন করিয়া আমার সমাজের ইষ্ট সাধন করিব না, এবং আমার অনিষ্ট সাধন করিয়া কাহারেও আপনার সমাজের ইষ্ট সাধন করিতে দিব না। ইহাই যথার্থ সমদর্শন, এবং ইহাই জাগতিক প্রীতি ও দেশপ্রীতির সামঞ্জস্য।...আমি তোমাকে যে দেশপ্রীতি বুঝাইলাম তাহা ইয়ুরোপীয় patriotism নহে। ইয়ুরোপীয় patriotism একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ। ইয়ুরোপীয় patriotism ধর্ম্মের তাৎপর্য্য এই যে, পর-সমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির সর্ব্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে। জগদীশ্বর ভারতবর্ষে যেন ভারতবর্ষীয়দের কপালে এরূপ দেশবাৎসল্য-ধর্ম্ম না লিখেন।...

"মানুষের সকল বৃত্তিগুলি অনুশীলিত হইয়া যখন ঈশ্বরানুবর্ত্তিনী হইবে, মনের সেই অবস্থাই ভক্তি। এই ভক্তির ফল জাগতিক প্রীতি। এই জাগতিক প্রীতির সঙ্গে আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, এবং স্বদেশপ্রীতির প্রকৃত পক্ষে কোন বিরোধ নাই।...আত্মরক্ষা হইতে স্বজনরক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম, স্বজনরক্ষা হইতে দেশরক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম। যখন ঈশ্বরে ভক্তি এবং সর্ব্বলোকে প্রীতি এক, তখন বলা যাইতে পারে যে ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন, দেশপ্রীতি সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম।...

"ভারতবর্ষীয়দিগের ঈশ্বরে ভক্তি ও সর্ব্বলোকে সমদৃষ্টি ছিল। কিন্তু তাঁহারা দেশপ্রীতি সেই সার্ব্বলৌকিক প্রীতিতে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা প্রীতিবৃত্তির সামঞ্জস্যযুক্ত অনুশীলন নহে। দেশপ্রীতি ও সার্ব্বলৌকিক প্রীতি উভয়ের অনুশীলন ও পরস্পর সামাঞ্জস্য চাই। তাহা ঘটিলে ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির আসন গ্রহণ করিতে পারিবে।" 'অনুশীলন', চতুর্বিংশ অধ্যায়. ['স্বদেশপ্রীতি']।

চিন্তাশীলতা, রসবোধ, ইতিহাস-বিজ্ঞানের আলোচনা প্রসারিত করিবার জন্যই বঙ্গভারতীর উদ্বোধন করিয়াছিলেন,—তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল ধর্মসংস্থাপন ও চিত্তশুদ্ধি। 'কৃষ্ণচরিত্রে' তিনি যে আদর্শ-মানবের চরিত্রকীর্ত্তন করিয়াছেন, 'ধর্ম্মতত্ত্ব' ও 'অনুশীলন' প্রবন্ধে তিনি যে মানব-ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—সেই আদর্শ-মানবতার মন্ত্রে দেশবাসীকে দীক্ষিত করিবার জন্যই এই সাহিত্য-যজ্ঞে সকলকে আহ্বান করিয়াছিলেন। ভারতী তাঁহার লীলা-সহচরী ছিল না। এই যজ্ঞেরই দেবতা ছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 'সাহিত্যের মধ্যে দুই শ্রেণীর যোগী দেখা যায়, জ্ঞানযোগী ও কর্ম্মযোগী। বঙ্কিম সাহিত্যে কর্ম্মযোগী ছিলেন।' বঙ্কিম সম্বন্ধে এই কথাটি বিশেষ করিয়া মনে রাখা উচিত। তিনি যদি সাহিত্যসৃষ্টির আনন্দেই বিভোর থাকিতেন তবে আপনার সাধনা লইয়া আপনিই থাকিতেন, অপরকে এমন করিয়া যোগ দিতে আহ্বান করিতেন না। যে সকল বিষয়ে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল না, অপরকে উৎসাহিত করিবার জন্য, নিজের প্রতিভাকে ক্ষুণ্ণ করিয়া, তিনি সে সকলের বোঝা বহিয়াছেন। বিজ্ঞান ও ইতিহাস, এবং বিশেষ করিয়া ইতিহাস-উদ্ধারের জন্য তাঁহার সেই ব্যাকুলতা যখন লক্ষ্য করি, তখন দেশের কল্যাণ-কামনায় তাঁহার এই আত্মাহুতির পরিচয়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। আত্মাহুতি নয় ত কি? এত বড় কবি হইয়াও কাব্যরচনায় ভ্রূক্ষেপ নাই—উপন্যাস অপেক্ষা বাঙ্গালীর ইতিহাস গড়িবার জন্য কি ব্যাকুল বাসনা! ইতিহাস না জানিলে বাঙ্গালী যে মানুষ হইবে না।—

"বাঙ্গালার ইতিহাস চাই।…নহিলে বাঙ্গালী কখনও মানুষ হইবে না…বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে?

"তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী তাহাকেই লিখিতে হইবে। মা যদি মরিয়া যান, তবে মার গল্প করিতে কত আনন্দ। আর এই আমাদিগের সর্ব্বসাধারণের মা জন্মভূমি বাঙ্গালা দেশ, ইহার গল্প করিতে কি আমাদিগের আনন্দ নাই?…

"ইয়ুরোপ সভ্য কতদিন? পঞ্চদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ চারিশত বৎসর পূর্ব্বে ইয়ুরোপ আমাদিগের অপেক্ষাও অসভ্য ছিল। একটি ঘটনায় ইয়ুরোপ সভ্য হইয়া গেল। অকস্মাৎ বিনষ্ট বিস্মৃত অপরিজ্ঞাত গ্রীক সাহিত্য ইয়ুরোপ ফিরিয়া পাইল; ফিরিয়া পাইয়া, যেমন বর্ষার জলে শীর্ণা স্রোতস্বতী কূলপরিপ্লাবিনী হয়, যেমন মুমূর্ষু রোগী দৈব ঔষধে যৌবনের বল প্রাপ্ত হয়, ইয়ুরোপের অকস্মাৎ সেইরূপ অভ্যুদয় হইল। আজ পেত্রার্ক, কাল লুথার, আজ গেলিলিও, কাল বেকন, ইয়ুরোপের এইরূপ অকস্মাৎ সৌভাগ্যোচ্ছ্বাস হইল। আমাদিগেরও একবার সেই দিন হইয়াছিল। অকস্মাৎ নবদ্বীপে চৈতন্যচন্দ্রোদয়; তারপর রূপ সনাতন প্রভৃতি অসংখ্য কবি, ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত। এদিকে দর্শনে রঘুনাথ শিরোমণি, গদাধর, জগদীশ, স্মৃতিতে রঘুনন্দন, এবং তৎপরগামিগণ। আবার বাংলা কাব্যের জলোচ্ছ্বাস। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস চৈতন্যের পূর্ব্বগামী। কিন্তু তাহার পরে চৈতন্যের পরবর্ত্তিনী যে বাঙ্গালা কৃষ্ণবিষয়িনী কবিতা, তাহা অপরিমেয়, তেজস্বিনী, জগতে অতুলনীয়! সে কোথা হইতে?

"আমাদের এই Renaissance কোথা হইতে? কোথা হইতে সহসা এই জাতির এই মানসিক উদ্দীপ্তি হইল? এ রোশনাইয়ে কে কে মশাল ধরিয়াছিল? ধর্ম্মবেত্তা কে? শাস্ত্রবেত্তা কে? দর্শনবেত্তা কে?

জ্ঞায়বেত্তা কে? কে কবে জন্মিয়াছিল? কে কি লিখিয়াছিল? কাহার জীবন-চরিত্র কি? কাহার লেখার কি ফল? এ আলোক নিবিল কেন? নিবিল বুঝি মোগলের শাসনে। সকল কথা প্রমাণ কর।..."*

হায় বঙ্কিম! তুমি কি স্বপ্নই দেখিয়াছিলে—দিবাস্বপ্নই বটে! আজিকার দিনে বাঙ্গালীর জীবনে যে বান ডাকিয়াছে তাহা কি বঙ্কিমেরও কল্পনার অগোচর ছিল! আজ আবার যে Renaissance আসিয়াছে—সে রোশ্‌নাইয়ে কাহারা মশাল ধরিয়াছে?—ন্যুট হামসুন, গোর্কি, যোহান বোয়ের! মেটারলিঙ্কীয় কাব্যবাদ, নব্য জার্ম্মনির চিন্তাধারা, 'গীত-নাট্য' প্রভৃতির গবেষণায় বাঙ্গালীর ললাট উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। শ্মশান-ভূমির পচ্যমান আবর্জ্জনায় আলেয়ার দীপ্তি দেখা যাইতেছে! কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম। বঙ্কিম সাহিত্যের ধ্যানযোগী ছিলেন না, কর্ম্মযোগী ছিলেন, এই কথা মনে না রাখিয়া আজ যখন আমরা তাঁহার উপন্যাসগুলিরই বিচার করি, এবং আর কোনও সম্পর্কে তাঁহার নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ করি না, তখন শুধু মূর্খতা নয়—গুরুতর পাতকের ভাগী হই।

বঙ্কিম বলিয়াছিলেন, "কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে, কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য—অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি" †। কিন্তু চিত্তশুদ্ধি না হইলেও কাব্যের রসাস্বাদন সম্ভব। অথবা, কাব্যের রসাস্বাদন সময়ে সেই মুহূর্ত্তের জন্যও চিত্তশুদ্ধি ঘটে। এইজন্যই—'Music hath charms to soothe a savage breast'। আসল কথা, খাঁটি কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান ত নহেই, কাব্যের কোনও লৌকিক উদ্দেশ্য নাই; তথাপি উৎকৃষ্ট কাব্য পাঠ করার ফলে চিত্তশুদ্ধি হয়; বরং যে কাব্য যত খাঁটি, অর্থাৎ যাহা যত উদ্দেশ্যহীন, স্বাধীন, লীলাময়—তাহার দ্বারা তত উৎকৃষ্ট রসের উদ্বোধন হয়, তাহাতেই চিত্তশুদ্ধি হয়। কিন্তু তাহা স্থায়ী নয়, ক্ষণিক। এজন্য বঙ্কিম স্বতন্ত্র কাব্যনীতি স্বীকার করেন নাই। তিনি কুকাব্য ও সুকাব্য ভেদ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, "যাহারা কুকাব্য প্রণয়ন করিয়া পরের চিত্ত কলুষিত করিতে চেষ্টা করে তাহারা তস্করদিগের ন্যায় মনুষ্য-জাতির শত্রু, এবং তাহাদিগকে তস্করদিগের ন্যায় শারীরিক দণ্ডের দ্বারা দণ্ডিত করা বিধেয়।" ‡ তথাপি, সমাজনীতির বিরোধী হইলেই কাব্য যে কুকাব্য হয়, এমন কথা তিনি বলেন নাই। এক স্থানে কৃষ্ণের ব্রজলীলাকীর্ত্তন সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন, "যে এই ব্রজলীলার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিয়াছে, এবং যাহার চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে তাহার পক্ষে ইহার ফল সুফল।" অর্থাৎ প্রকৃত রসিক না হইলে এইরূপ কাব্য তাহার পক্ষে অনিষ্টকর। এখানে চিত্তশুদ্ধির অর্থ রসজ্ঞান তাহা হইলে কথাটা দাঁড়ায় এইরূপ। কাব্যের কোনও উদ্দেশ্য না কারণ কাব্যরচনার মূলে যে প্রেরণা আছে তাহা কোনও উদ্দেশ্য নয়—সেটা কবিচিত্তের স্বতঃস্ফূর্ত্ত লীলা। তথাপি, তাহার ফলে, কবির কোনও উদ্দেশ্য ব্যতিরেকেই,

* 'বিবিধ প্রবন্ধ', দ্বিতীয় খণ্ড ['বাঙ্গালার ইতিহাস-সম্বন্ধে কয়েকটি কথা']।

† 'উত্তরচরিত'-সমালোচনা দ্রষ্টব্য—বিবিধ প্রবন্ধ, প্রথম খণ্ড।

‡ 'অনুশীলন,' সপ্তবিংশ অধ্যায়।

পাঠক-চিত্তে রস-সঞ্চার হয়। যেখানে রসের উদ্রেক না হইয়া একটা কু বা সু প্রবৃত্তির উত্তেজনা হয়, সেখানে পাঠকই দায়ী—কাব্যের ফলাফল পাঠকের চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ বা অপকর্ষের উপর নির্ভর করে। কিন্তু যেখানে লেখকই দায়ী, অর্থাৎ, যে-লেখার মধ্যে একটা সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য ফুটিয়া ওঠে, এবং সে উদ্দেশ্য কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনা—বঙ্কিম তাহাকেই কুকাব্য বলিতেছেন। বলা উচিত—কুৎসিত অ-কাব্য। সবল সুস্থ স্বতঃস্ফূর্ত্ত রস-কল্পনায় যাহার জন্ম হয় নাই, তাহার ফলে রসোদ্রেক হইতে পারে না। এজন্য রসবিচারে এ সকল রচনার স্থান নাই। যেমন সদুদ্দেশ্যপূর্ণ অকাব্য-পাঠে নীতিজ্ঞানী অরসিক ব্যক্তির হৃদয় প্রফুল্ল হয়, তেমনি অসৎ উদ্দেশ্যপূর্ণ অ-কাব্য পাঠ করিয়া নীতিহীন অরসিক ব্যক্তির সুখ হয়। এ সকল রচনা সম্বন্ধে বঙ্কিমের শাসন-ব্যবস্থাই সমীচীন। বলা বাহুল্য, এ আলোচনায় আমি যাহা বলিলাম তাহার সবটাই বঙ্কিমের কথা নয়। বঙ্কিম সুকাব্য ও কুকাব্য-ভেদ মানিতেন এবং কাব্যের উদ্দেশ্যও স্বীকার করিতেন।* তিনি পূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শ-সন্ধানে ব্যস্ত ছিলেন, তাঁহার ধ্যান ছিল ধর্ম্ম; এ ধর্ম্মের লক্ষ্য মানুষের মনুষ্যত্ব-সাধন। একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাই বঙ্কিমের উপন্যাসে আদর্শবাদ প্রবল। যাহাকে আমরা সাহিত্যের realism বলি, সেই realism-এর প্রেরণায় তিনি অল্পই লিখিয়াছেন। সর্ব্বত্র তিনি একটা বড় ভাব ও বৃহৎ আদর্শ ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। সাহিত্যকে খাঁটি শিল্পকলার আদর্শে কল্পনা না করিয়াও তিনি যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা কাব্যাংশেও কি মহৎ, কত সুন্দর ও মহিমময়!

তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'তে সাহিত্যিক প্রেরণা ছাড়া আর কিছু ছিল না। 'দুর্গেশনন্দিনী' বাংলা ভাষার প্রথম রোমান্স—ইংরেজী রোমান্সের বাঁধা আদর্শে রচিত। 'মৃণালিনী', 'যুগলাঙ্গুরীয়', 'রাধারাণী'ও এই একই আদর্শে রচিত। কেবল 'মৃণালিনী'র কল্পনা-মূলে স্বদেশপ্রেম সর্ব্বপ্রথম দেখা দিয়াছে। দ্বিতীয় উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা' একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য। তারপর সমাজ-সমস্যা ও চরিত্রনীতির প্রেরণায় রচিত চতুর্থ উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ'; 'চন্দ্রশেখর' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এই একই প্রেরণার ফল। 'আনন্দমঠ' ও 'রাজসিংহে' দেশাত্মবোধ, 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারামে' ধর্ম্মসমস্যা, 'রজনী'তে

---

* "তবে এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুচিত অনুশীলন ও স্ফূর্ত্তিতে আর কতকগুলি কার্য্যকারিণী বৃত্তি দুর্ব্বলা হইয়া পড়ে। এই জন্য সচরাচর লোকের বিশ্বাস যে কবিরা কাব্য ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ে অকর্ম্মণ্য হয়। এ কথার যাথার্থ্য এই পর্য্যন্ত যে, যাহারা চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুচিত অনুশীলন করে, অন্য বৃত্তিগুলির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার চেষ্টা পায় না, অথবা 'আমি প্রতিভাশালী, আমাকে কাব্যরচনা ভিন্ন আর কিছুই করিতে নাই' এই ভাবিয়া যাঁহারা ফুলিয়া বসিয়া থাকেন তাঁহারাই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন।.......... বিজ্ঞান ও ধর্ম্মোপদেশ মনুষ্যত্বের জন্য যেরূপ প্রয়োজনীয়, কাব্যও সেইরূপ। যিনি তিনের মধ্যে একটিকে প্রাধান্য দিতে চাহেন, তিনি মনুষ্যত্ব বা ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম বুঝেন নাই।" 'অনুশীলন,' সপ্তবিংশতি অধ্যায় ['চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি']।

মনস্তত্ত্ব, এবং 'ইন্দিরা'র শুধু গল্প-রচনার আনন্দ আছে। খাটি উপন্যাস, অর্থাৎ যেগুলিতে সমাজনৈতিক বা ধর্ম্মনৈতিক কোনও অভিপ্রায় নাই, সেগুলির সংখ্যা খুবই কম, এবং তাহার মধ্যে 'কপালকুণ্ডলাই' উৎকৃষ্ট কাব্য হইয়াছে। যেগুলিতে স্বদেশ, সমাজ, ধর্ম্ম বা নীতির প্রেরণা আছে, সেইগুলিতেই স্থানে স্থানে বঙ্কিমের কল্পনার চরম স্ফূর্ত্তি হইয়াছে; চরিত্রের মহিমা ও ঘটনাসন্নিবেশের চাতুর্য্যে সেগুলি নাটকীয় সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইয়াছে। সমস্যার আওতায় বহুস্থানে গুরুতর ত্রুটি ঘটিলেও বঙ্কিমের যাহা কিছু শক্তি, তাহা যেন এই সমস্যার সংঘাতেই উপলাহত ইস্পাত-ফলকের মত স্ফুলিঙ্গবৃষ্টি করিয়াছে! অথচ এই ব্যক্তিই ভারতীয় অতুলন স্নেহ-হাস্য উপেক্ষা করিয়া, বেদীর নীচে না বসিয়া মন্দির-রক্ষায় তৎপর হইয়াছিল! চিত্তশুদ্ধি ও মনুষ্যত্ব আগে, কাব্য পরে—একথা বলিবার বঙ্কিমের কি প্রয়োজন ছিল? এ ভাবনা তাঁহার কেন?—কি জন্য? বঙ্কিম সম্বন্ধে সেই কথাটাই ভাবিবার সময় আসিয়াছে।

তথাপি বঙ্কিমের উপন্যাসের চেয়ে বঙ্কিম বড়। তিনি শুধু সাহিত্যস্রষ্টা শিল্পী নহেন—নব্য বঙ্গসাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতা। যে গুণে তাহা সম্ভব হইয়াছিল তাহা এই যে, তিনি যত বড় শিল্পী ছিলেন তার চেয়ে বড় ছিল তাঁহার ব্যক্তিত্ব, তাঁহার পৌরুষ। তাঁহার গ্রন্থাবলী পাঠ করিতে করিতে সর্ব্বাগ্রে এবং সর্ব্বদাই মনে হয়—Ecce Homo! Behold the Man! "The first and last word in literature as in life is character"—এই character আমাদের সাহিত্যে এত বড় আর কাহারও ছিল না। সজ্ঞান আদর্শনিষ্ঠা নিজের প্রতি গভীর বিশ্বাস, সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠ চিন্তাশক্তি, এবং সর্ব্বশেষে সমাজের কল্যাণের জন্য আপনাকে উৎসর্গ করিবার নিয়ত আকাঙ্ক্ষা—এই সকল গুণ একত্র হইলে জীবনে যে সত্য আচরিত হয়, সাহিত্যেও সেইরূপ সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়, সেই সত্যের জোরেই সাহিত্য বড় হয় ও বাঁচিয়া থাকে। সাহিত্য রচনায় আত্মবিস্মৃত শিল্পী যে আনন্দ-মুক্তির আস্বাদ পায়, বঙ্কিমের তাহাতে লোভ ছিল না; সে বিষয়ে এতখানি শক্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজের সেই মুক্তির পরিবর্ত্তে জাতির চিত্তশুদ্ধি চাহিয়াছিলেন। যে মনুষ্যত্বের বিকাশ হইলে, জাতির জীবনে উৎকৃষ্ট সাহিত্য আপনি সম্ভব হয়, বঙ্কিম সেই আদর্শের প্রতিষ্ঠায় তাঁহার সকল শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখক জন মর্লির সাহিত্য-সাধনার পরিচয় দিয়া একজন সমালোচক বলিয়াছেন—'Literature, in a word, was with John Morely not so much an end in itself as a means to a farther end, which was social, not individual.'—বঙ্কিমের মত একজন সত্যকার সাহিত্যস্রষ্টার পক্ষেও এ কথা খাটে, ইহাই বঙ্কিম-প্রতিভার গৌরব।

বঙ্কিম যাহা চাহিয়াছিলেন তাহা হয় নাই। আমরা বঙ্কিমকে ভাল করিয়া বুঝি নাই, এমনকি ইতিমধ্যেই তাঁহাকে ভুলিতে বসিয়াছি। আমরা তাঁহার উপন্যাসই পড়ি—হয় ত' তাহাও আর পড়ি না—পড়িয়া Literary Aesthetics-এরসূত্র ধরিয়া তাহার

দোষ-গুণ বিচার করি; হয় ত 'ভালো লাগে না' বলিয়া, এই সাহিত্যিক উন্নতির যুগে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া সূক্ষ্ম ও মার্জ্জিত রুচির পরিচয় দিই। বঙ্কিম যাহা চাহিয়াছিলেন তাহা হয় নাই; যেটুকু মোড় ফিরিতেছিল, অর্দ্ধপথেই তাহা ঘুরিয়া গিয়াছে। তিনি যে-ধর্ম্মের উপর মনুষ্যত্ব এবং মনুষ্যত্বের প্রয়োজনে সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাকে দূর করিয়া, আমরা এখন সর্ব্ববন্ধনমুক্ত হইয়া সাহিত্যের কামলোকে বিচরণ করিতেছি—জাতি-হিসাবেও ভব-বন্ধন-মুক্ত হইতে বোধ হয় আর বেশী বিলম্ব নাই! আমরা উচ্চাঙ্গের সাহিত্য আলোচনা করি—সৃষ্টি করিতে পারি না; বিশুদ্ধতায় আর্টতত্ত্বের রোমন্থন করি—কিন্তু জীবনে শক্তি সঞ্চার হইবে কিসে সে ভাবনা ভাবি না। জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তির মূলে যে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মসাধনার প্রয়োজন আছে তাহা আমাদের নিকট এতই তুচ্ছ, এবং সাহিত্যের আদর্শ এতই উচ্চ, যে বস্তু সাহিত্যও নয়—যাহার পঙ্কিল উচ্ছ্বাসে জাতীয় জীবনের অধঃপাত সূচিত হইতেছে, তাহার সমালোচনাও আর্টের দিক দিয়াই করিতে হইবে, ধর্ম্ম বা সমাজনীতির কথা সেখানেও চলিবে না! যদি সাহিত্য-হিসাবে আলোচনার যোগ্য হয়—আলোচনা কর, না হয়, কোন আলোচনাই করিও না—ইহাই সাহিত্যিক dilettante-দিগের অভিমত! যেন সাহিত্যের আদর্শই জীবনের একমাত্র আদর্শ, আর যাহা কিছু—তাহার পক্ষ হইতে কোন বিষয়েই কিছু বলিবার নাই। তাই এ দুর্দ্দিনে বিশেষ করিয়া বঙ্কিমকেই স্মরণ করি।

বৈশাখ, ১৩৩৫

বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী

'সারদামঙ্গলে'র কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর নাম সুপরিচিত হইলেও তাঁহার কাব্য যে তেমন পরিচিত নয়, আধুনিক কালের সাহিত্যরসিক-সমাজে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। অথচ আমরা জানি, যুগ-নায়ক রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আরও একাধিক সমসাময়িক কবি এককালে বিহারীলালকে কাব্যগুরু বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। আধুনিক বাংলা কাব্যের উৎস সন্ধান করিলে আমরা মাইকেল মধুসূদন দত্তের যে স্থান নির্দ্দেশ করি বিহারীলালের স্থান তাহা হইতে দূরে নহে। বরং উত্তরকালে বিহারীলাল-প্রবর্ত্তিত কাব্য সাধনাই সমধিক ফলবতী হইয়াছে; বিহারীলালের কাব্যপ্রেরণা আরও সরল ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত, বাঙ্গালীর জাতিগত ভাবনার অনুকূল। তাই আধুনিক বাংলা কাব্যের ইতিহাসে বিহারীলালও এক হিসাবে যুগপ্রবর্ত্তক কবি।

কিন্তু বিহারীলালের কবি-কীর্ত্তি নদীর উৎসস্থানের মত, গিরিদরীর অন্ধকারে অগোচর হইয়াই রহিল। আধুনিক কাব্যধারার সেই দুর্গম উৎসমুখ আবিষ্কার করিবার কৌতূহল ও দুঃসাহস যাঁহাদের আছে, তাঁহারাই এই উৎসমুখ খুঁজিয়া বাহির করিবেন, এবং তাহার গহন-গূঢ় তরঙ্গলীলা ও নির্জ্জনতা লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত ও পুলকিত হইবেন। আমি সেই দুঃসাহস করিয়াছি, কিন্তু সেই কবি-হৃদয়ের যে ভাবোন্মাদ ও ধ্যান-গভীর পরমানন্দের পরিচয় পাইয়াছি তাহা সত্যই অনির্ব্বচনীয়; অতএব, আমি বিহারীলালের যে কাব্য-পরিচয় লিপিবদ্ধ করিতেছি তাহাতে পাঠকের কৌতূহল পরিতৃপ্ত হইবে কিনা জানি না, কথঞ্চিৎ আভাসও যদি ফুটিয়া উঠে, তাহা হইলে আমার উদ্যম সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিব।

এই কাজ দুরূহ এই জন্য যে, বিহারীলালের কাব্যে প্রকৃত কাব্যসৃষ্টি অপেক্ষা কবির নিজ প্রাণের পরিচয়ই বিশেষ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার 'বাউলবিংশতি', 'সঙ্গীতশতক' প্রভৃতি কাব্য পাঠ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন এই কবির কাব্যসাধনার প্রধান লক্ষণ কি। বিহারীলালের কাব্য যেন আদি 'লিরিক' জাতীয়, তাহার প্রেরণা একেবারে গীতাত্মক। বাহিরের বস্তুকে, গীতি-কবি নিজস্ব ভাব-কল্পনায় মণ্ডিত করিয়া যে একটী বিশেষ রূপ ও রসের সৃষ্টি করেন, ইহা তাহা হইতেও ভিন্ন,—কবি নিজের আনন্দে ধ্যান কল্পনার আবেশে, সর্ব্বত্র নিছক ভাবের সাধনা করিয়াছেন; তাঁহার কাব্যের প্রধান লক্ষণ ভাব বিভোরতা। তাঁহার কল্পনা অতিমাত্রায় subjective; তিনি যখন গান করেন, তখন সম্মুখে শ্রোতা আছে এমন কথাও ভাবেন না, ভাবকে স্পষ্ট রূপ দিবার আকাঙ্ক্ষাই তাঁহার নাই। কিন্তু এই আত্মনিমগ্ন কবির স্বতঃ-উৎসারিত গীতধারায় এমন সকল বাণী

নিঃসৃত হয়, যাহাতে সন্দেহ থাকে না যে, তাঁহার মনোভৃঙ্গ সরস্বতীর আসন-কমলের মর্ম্মমধু পান করিয়াছে, সেই পদ্মের পরাগ-ধূলি সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া কবিজীবন সার্থক করিয়াছে। তাঁহার কাব্যে ভাবের ঐকান্তিকতা ও গভীরতা যতটা হৃদয়গ্রাহী, ভাবের মূর্ত্তি ততটা স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। এই কারণে, তিনি আধুনিক কাব্যে একটা নূতন সাধন-রীতির দীক্ষাগুরু হইলেও কাব্যরচয়িতা হিসাবে কাব্যামোদী পাঠকের পিপাসা মিটাইতে পারেন নাই।

তাঁহার কাব্যে কবি-মানুষ হিসাবে তাঁহার যে পরিচয় বহুস্থানে ছড়াইয়া আছে, আমি প্রথমে তাহার কিছু কিছু উদ্ধৃত করিব এমন সবল সহজ আত্মপ্রকাশ অতি অল্প কাব্যেই আছে। বিহারীলালের কাব্যগুলির মধ্যে এ হিসাবে এই কয়খানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—'প্রেমপ্রবাহিনী', 'বন্ধুবিয়োগ', 'নিসর্গসন্দর্শন',। এই কাব্যগুলি পড়িতে আরম্ভ করিলেই যে কোনও পাঠক লক্ষ্য করিবেন, ইহার ভাষা। কবি যেন কবিতা লিখিতে বসেন নাই, তাঁহার মনে যেন সে বিষয়ে এতটুকু ভানও নাই। তাঁহার ভাব যেন শিশুর মত সরল, ভাষাও তেমনই শিশুর মতই উলঙ্গ। এমন অসঙ্কোচ সারল্য, কবিতা লিখিবার কালে এমন আত্ম-বিস্মৃতি—এমন নিরহঙ্কার ও নিরলঙ্কারের স্ফূর্ত্তি আর কোনও কাব্যরচনায় দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। আজকাল যে প্রাচীন ও অর্ব্বাচীনের দল ভাষাকে সরল করিবার জন্য তথাকথিত কথ্যভাষার ওকালতী করিয়া থাকেন, তাঁহাদের আদর্শ কি তাহারাই জানেন, তথাপি বিহারীলালের এই সকল কাব্যের ভাষা যদি তাঁহারা দেখিয়া থাকেন তবে তাঁহাদিগকে হতাশ হইতে হইবে। কারণ, কৃত্রিম কথ্যভাষা অপেক্ষা অনায়াসসাধ্য সাধুভাষা যে বহুগুণে অকৃত্রিম, তাহাতে সন্দেহ নাই। এবং ভাষাকে যদি সহজ ও সরল করিতে হয় তবে বিহারীলালের মত, ভাবের সারল্যই শুধু নয়, খাঁটি বাংলাভাষাভাষী হওয়া চাই। এ ভাষা আমরা ভুলিয়াছি, এবং বিহারীলালের মত বুকে-মুখে এক হওয়ার মত আন্তরিকতাও দুর্লভ; কাজেই সরল হইতে গিয়া ভাষা যে কত কুৎসিৎ ও কৃত্রিম হইয়া ওঠে, তাহার প্রমাণ আজকাল সর্ব্বত্র। ইংরাজ কবি Wordsworthও এইরূপ ভাষাকেই কাব্যের বাহন করিবার পক্ষে ওকালতী করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও এ আদর্শ রক্ষা করিতে পারেন নাই। বিহারীলালের এই ভাষা লক্ষ্য করিলেই তাঁহার কবি-প্রেরণার বৈশিষ্ট্য সহজেই ধরা পড়িবে। কাব্যসৃষ্টিতে ভাষার আর্ট যেটুকু থাকিবেই—'unpremeditated art'-র ভাষাতেও কবি-প্রতিভা যে অনায়াস-দীপ্তি দান করে, ভাব-মুখর কবির বাণী শব্দের যে মণিমাণিক্যভূষণে আপনা হইতেই ভূষিত হইয়া উঠে—বিহারীলালের কাব্যে, বিশেষতঃ 'সারদামঙ্গলে', তাহার প্রচুর নিদর্শন আছে। কিন্তু সাধারণতঃ বিহারীলালের কবি-প্রকৃতিতে সে ধরণের উন্মাদনা—কবি কীট্‌স্ যে কবি-স্বপ্নকে—

> —upon the night's starred face
> Huge cloudy symbols of a high romance,

বলিয়াছেন, সে ধরণের রূপ-রসের উৎকণ্ঠা ছিল না। বায়ু, জল, সূর্য্যালোকের যে অতি

সহজ প্রীতি-প্রেরণা—সমাজ, সংসার ও প্রকৃতির সেই অতি পরিচিত পরিবেশের প্রভাবেই তাঁহার কবি-হৃদয় বিকশিত হইয়াছিল। এই নিত্যপরিচিত বহিঃপ্রকৃতিকে, এই নিত্যকার ভালো-মন্দ সুখ-দুঃখকেই তিনি অতি গভীর ভাবে অনুভব করিয়াছিলেন; এইজন্য তাঁহার কাব্যে আমরা ভাবনা অপেক্ষা ভাব, কল্পনা অপেক্ষা প্রীতি-বিভোরতা, যাহা-নাই তাহার উদ্ভাবনা অপেক্ষা যাহা-আছে তাহা হইতেই 'আনন্দলোক বিরচন' করিবার সাধনা লক্ষ্য করি। ইহারই প্রমাণ স্বরূপ আমি কিছু উদ্ধৃত করিব।

বাল্যবন্ধুদিগকে স্মরণ করিয়া কবি তাঁহার 'বন্ধুবিয়োগ'-নামক কাব্য রচনা করেন; সেই প্রীতি ও তাহার স্মৃতির একটী চিত্র এইরূপ—

স্নানের সময় পড়িতাম গঙ্গাজলে
সাঁতার দিতাম মিলে একত্র সকলে।
তুলার বস্তার মত উঠিতেছে ঢেউ,
ঝাঁপাতেছে, লাফাতেছে, গড়াতেছে কেউ।
আহ্লাদের সীমা নাই, হো হো করে' হাসি,
নাকে মুখে জল ঢুকে চক্ষু বুজে কাসি।
তবু কি নিবৃত্তি আছে, ধূম বাড়ে আরো,
ডুবাডুবি লুকাচুরী খেল যত পারো।

তারপর—

চীনের বাদাম কিনে মাঝখানে থোরে,
খেতেম সকলে মিলে কাড়াকাড়ি কোরে।
হেসে খেলে কোথা দিয়ে কেটে যেতো দিন,
সেদিন কি দিন হায়! এদিন কি দিন!

বাল্যবন্ধু পূর্ণচন্দ্রের উদ্দেশে বলিতেছেন—

পূর্ণচন্দ্র ছিলে তুমি পূর্ণ দয়া-গুণে;
কেঁদে ভেসে যেতে ভাই পরদুঃখ শুনে।
তাদৃশ ছিল না কিছু সঙ্গতি তোমার,
কোরে গেছ তবু বহু পর-উপকার।
সেইদিন চিরদিন রয়েছে স্মরণ
যে দিনেতে নেয়ে এলে উলঙ্গ মতন।
ন'টার সময় তুমি করিতেছ স্নান,
সেদিন হয়েছে গাঙে বেতর তুফান;
ঝড়ের ঝাপটে এক নৌকা ডুবে গেল,
একজন ডুবে ডুবে তীরে বেঁচে এল।
জল থেকে উঠিবার কি হবে উপায়,
বস্ত্র নাই কিন্তু কার কাছে গিয়ে চায়।
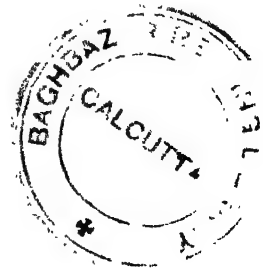
থর থর কাঁপিতেছে শীতেতে শরীর,
দর দর বহিতেছে দুই চক্ষে নীর।
দুর্দ্দশা দেখিয়া কেঁদে উঠিল পরাণ,
পরিধান-বস্ত্র তার করে করি দান,
ছেঁড়া গামছাখানি খুলে আপনি পরিয়ে,
হাসিতে হাসিতে এলে বাটিতে চলিয়ে।
আবরুর প্রতি ছিল বিলক্ষণ বোধ,
গ্রাহ্য কর নাই তবু তার অনুরোধ।
সেইদিন চিরদিন রয়েছে স্মরণ,
যেদিনেতে নেয়ে এলে উলঙ্গ মতন।

এ কাহিনীর মধ্যে কোনও কবিত্ব আছে? ভাষা, ছন্দ, উপমার কোন কারিগরি আছে? 'পলাশীর যুদ্ধ' বা বৃত্রসংহারে'র তুলনায় এ কবিতার কবিত্ব কোথায়? সাধারণ পাঠকের মনে কাব্যের যে আদর্শ আছে, তাহাতে এ কবিতা কোনও কবিনামধারী ব্যক্তির উপযুক্ত বলিয়া মনে হইবে কি? কিন্তু বিহারীলালের কাব্য বুঝিতে হইলে আগে কবি-মানুষটিকে বুঝিতে হইবে। এই সকল কবিতায় মানব-চরিত্রের যে দিকটির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছে, ইহাতে যে ধরণের বীরত্ব-স্পৃহা ও সৌন্দর্য্যপ্রীতির নিদর্শন আছে, তাহাই বিহারীলালের কবিকল্পনার উৎস—'সারদামঙ্গলের' কবির সেই ভাব-বিভোরতার মূলে, এই ধরণের বাস্তব-প্রীতিই প্রবল। পদ্ম যেমন তাহার সর্ব্বাঙ্গ-শতদল মেলিয়া বায়ু, আলোক ও হিমকণা পান করিয়া মধু-সৌরভে পরিপূর্ণ হয়, বিহারীলালের কবিহৃদয়ও সেইরূপ সহজ নৈসর্গিক পুষ্টিলাভ করিয়া বাংলা কাব্যে একটী গাঢ় ও গূঢ় রস সঞ্চার করিয়াছে।

বিহারীলালের ভাষা ও বর্ণনা-ভঙ্গির আরও কিছু নমুনা উদ্ধৃত করিলাম। 'নভোমণ্ডল'কে সম্বোধন করিয়া কবি বলিতেছেন—

তোমার প্রকাণ্ড ভাণ্ড অনন্ত উদরে
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রহ বোঁ বোঁ করে ধায়,
কিন্তু যেন তারা সব অগাধ সাগরে
মাছের ডিমের মত ঘুরিয়া বেড়ায়।

'ঝটিকা সম্ভোগ' নামক কবিতায় কবি 'আশ্বিনে-ঝড়ে'র সুখ-সম্ভোগ করিতেছেন—

খাটে শুয়ে আছি দেখ, বন্ধ আছে ঘর,
তবুও দুলিছে খাট লইয়া আমায়
বেশ ত' রয়েছি যেন বজরার ভিতর—
টলমল করে তরী লহরী-লীলায়।

কবি বলিতেছেন, এ ঝড়ে যদি সবাই মরে, আমারই বাঁচিয়া কি লাভ?

একা-ভেকা হয়ে আমি বাঁচিতে না চাই,
মরি, যদি সকলের সঙ্গে যেন মরি;

যত খুশী খোড় বাড়ি। লাফাই ঝাঁপাই—
খোরিয়া মেজাজ মোর, জোরে নাহি ডরি।

ভাষায় rhetoric বা declamation-এর লেশ নাই বলিয়া এই উচ্চ প্রাণপূর্ণ অনুভূতিও আমাদের চিত্ত স্পর্শ করে না, আমাদের কাব্য-সংস্কার এমনই মিথ্যা ও কৃত্রিম। পাঠকের বোধ হয় ধৈর্য্যচ্যুতি হইতেছে—এ কাব্য যে একেবারে সাদা জল! ইহাতে না আছে সুগন্ধি মসলার ঝাঁজ, না আছে রঙের নেশা—কিন্তু উপায় কি? কবি যেন পণ করিয়াছেন, তিনি কাব্যকলার দিক দিয়াও যাইবেন না—কেবল নিজের প্রাণের কথা মুখের ভাষায় ব্যক্ত করিবেন। নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকগুলিতে কবি যেন অনিচ্ছা সত্বেও একটু কবিত্ব করিয়া ফেলিয়াছেন—

কভু ভাবি' কোনো ঝরণায়—
উপলে বন্ধুর যার ধার,
প্রচণ্ড প্রপাত-ধ্বনি,
বায়ুবেগে প্রতিধ্বনি
চতুর্দ্দিকে হতেছে বিস্তার,—
গিয়ে তার তীরতরুতলে,
পুরু পুরু নধর শাদ্বলে
ডুবাইয়া এ শরীর
শব সম রব স্থির
কান দিয়ে জল-কলকলে।

* * * *

কভু ভাবি পল্লীগ্রামে যাই,
নাম ধাম সকলই লুকাই;
চাষীদের মাঝে র'য়ে
চাষীদের মত হ'য়ে
চাষীদের সঙ্গেতে বেড়াই।
বাজাইয়া বাঁশের বাঁশরী,
শাদা সোজা গ্রাম্য পথ ধরি।
সরল চাষার সনে
প্রমোদ-প্রফুল্ল মনে
কাটাই আনন্দে শর্ব্বরী।
বরষায় যে ঘোর নিশায়
সৌদামিনী মাতিয়ে বেড়ায়,—
ভীষণ বজ্রের নাদ,
ভেঙ্গে যেন পড়ে ছাদ,
বাবু সব কাঁপেন কোঠায়—

সে নিশায় আমি ক্ষেত্রতীরে
নড়বোড়ে পাতার কুটিরে,
স্বচ্ছন্দে রাজার মত
ঘুমে আছি নিদ্রাগত,
প্রাতে উঠি দেখিব মিহিরে।

বিহারীলালের কবিতার ক্রমবিকাশে, ভাব ও সুরের যে ভঙ্গী অতঃপর বাংলা কাব্যের মর্ম্মমূলে রস-সঞ্চার করিয়াছে তাহার প্রথম স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় তাঁহার 'বঙ্গ সুন্দরী'-কাব্যে; উপরি-উদ্ধৃত পংক্তিকয়টি এই কাব্যের অন্তর্গত। ইহার পরে আমি যে কবিতাটি উদ্ধৃত করিব তাহাতে বিহারীলালের কবিশক্তির পূর্ণ পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই কবিতাটি পড়িবার সময়ে পূর্ব্বোদ্ধৃত কবিতাগুলি স্মরণ করিলে—সেই কাব্য-বীজ কেমন অঙ্কুরিত হইয়া অপূর্ব্ব পুষ্পরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা সহজেই অনুমিত হইবে। কবিতাটির নাম—'নিশান্ত সঙ্গীত'। প্রথমে প্রভাত-সমীরণকে সম্বোধন করিয়া কবি বলিতেছেন—

আলুথালু হয়ে প্রিয়া
আছে সুখে ঘুমাইয়া,
আলুথালু কুন্তলে সুখে খেলা কর।
বড় তুমি চুলবুলে
গোলাপের দল খুলে
ছড়ায়ে কপোলে-চুলে হাসিয়া-আকুল।
তোমারি আনন্দোৎসবে
মত্ত ফুলতরু সবে
মুদিত নয়ন-পদ্ম করে ঢুল ঢুল।—

তারপর প্রেয়সীর মুখপানে চাহিয়া—

আহা এই মুখখানি
প্রেমমাখা মুখখানি—
ত্রিলোক সৌন্দর্য্য আনি কে দিল আমায়।

সদাই দেখিরে ভাই,
তবু যেন দেখি নাই,
যেন পূর্ব্বজন্মকথা জাগে মনে মনে;
অতিদূর দিগন্তরে
কে-যেন কাতর স্বরে
কেঁদে কেঁদে উঠে ক্ষণে ক্ষণে।

তারপর কবি তাঁর প্রিয়তমাকে জাগাইতেছেন; এই জাগরণী-গান অতুলনীয়। মিল্‌টনের মহাকাব্যে Eve-কে জাগাইবার জন্য Adam-এর উক্তি, এবং তাহারই অনুকরণে মেঘনাদবধকাব্যে নিদ্রিতা প্রমীলার কর্ণে ইন্দ্রজিতের সপ্রেম গুঞ্জরণ, অথবা Victor Hugo-র সুবিখ্যাত Serenade-গান—কাব্যসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ; কিন্তু এ কবিতায় শুধু কাব্য নয়—শিশিরবিন্দুতে সূর্য্যবিম্বের মত, কবির সমস্ত কল্পনা-মণ্ডল প্রতিফলিত হইয়াছে। একাধারে বাস্তব-প্রেম ও অবাস্তব সৌন্দর্য্য-পিপাসা মিটাইবার যে সাধনা তিনি করিয়াছিলেন, তাহারই একটি সহজ ও সরল, অথচ গভীর ও মধুর গীতোচ্ছ্বাস এই কয়টি শ্লোকে ধ্বনিত হইয়াছে—

উঠ প্রেয়সী আমার,
উঠ প্রেয়সী আমার,
হৃদয়-ভূষণ, কত যতনের হার!
হেরে তব চন্দ্রানন
যেন পাই ত্রিভুবন
অন্তরে উথলি উঠে আনন্দ অপার!
উঠ প্রেয়সী আমার!

প্রতিদিন উঠি' ভোরে
আগে আসি' দেখি তোরে,
মন-প্রাণ ভরি' ভরি' সাধে করি দরশন।
বিমল আননে তোর
জাগিছে মুরতি মোর,
ঘুমন্ত নয়ন দু'টি যেন ধ্যানে নিমগন।
তোমার পবিত্র কায়া—
প্রাণেতে পড়েছে ছায়া,
মনেতে জন্মেছে মায়া, ভালবেসে সুখী হই।
ভালবাসি নারী-নরে—
ভালোবাসি চরাচরে,
সদাই আনন্দে আমি চাঁদের কিরণে রই।
উঠ প্রেয়সী আমার,
উঠ প্রেয়সী আমার—
জীবন-জুড়ানো ধন, হৃদি-ফুলহার!
উঠ প্রেয়সী আমার।
মধুর মুরতি তব
ভরিয়া রয়েছে ভব,
সমুখে ও মুখশশী জাগে অনিবার।

কি জানি কি ঘুমঘোরে
কি চক্ষে দেখিছি তোরে,
এ জনমে ভুলিতে রে পারিব না আর।
নয়ন-অমৃতরাশি প্রেয়সী আমার!
ওই চাঁদ অস্তে যায়,
বিহঙ্গ ললিত গায়,
মঙ্গল-আরতি বাজে নিশি অবসান;
হিমেল হিমেল বায়,
হিমে চুল ভিজে যায়,
শিশির মুকুতাজালে ভিজেছে বয়ান—
উঠ প্রেয়সী আমার মেল নলিন-নয়ান!

এই 'নিশান্ত সঙ্গীত' শুধুই দাম্পত্য প্রেমের পূর্ণ সুখ-সম্ভোগ নয়; এ প্রেম বিশ্ব-নিখিলের সঙ্গে কবিহৃদয়কে যুক্ত করিয়াছে; কবির চিত্তাকাশে দিগন্তব্যাপিনী উধার সমারোহে মঙ্গল-আরতি-গানের সঙ্গে সঙ্গে 'নিশি অবসান' হইতেছে। এইখানেই এই গীতি-কল্পনার মৌলিকতা; এই মানব-সুলভ স্বাভাবিক প্রেমই শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য-ধ্যানের সহায় হইয়াছে—বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবহৃদয়ের এই যে মিলন-তীর্থ কবি আবিষ্কার করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার কাব্যসাধনার মূলমন্ত্র। প্রীতি, প্রেম, স্নেহ, ভক্তি প্রভৃতি সাধারণ হৃদয়বৃত্তি হইতে খাঁটি সৌন্দর্য্য-পিপাসা যে স্বতন্ত্র, আধুনিক Aesthetics-শাস্ত্রের ইহাই গোড়ার কথা। বাস্তব প্রয়োজনের মতই, বাস্তব হৃদয়বৃত্তির সঙ্গে খাঁটি সৌন্দর্য্যপ্রীতির সম্পর্ক নাই; সৌন্দর্য্য-বোধ মানব-মনের এমন একটা বৃত্তি যে, তাহার পূর্ণ স্ফূর্ত্তির কালে Intellect বা Emotion, এ দুয়ের কোনটাই ক্রিয়াশীল থাকে না; এজন্য কবি যখন সেই আদি সৌন্দর্য্যরূপিণীকে সম্বোধন করিয়া বলেন—

নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী
হে নন্দন-বাসিনী উর্ব্বশী!

—তখন কথাটা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু বিহারীলাল যখন ঠিক ইহার উল্টা কথাই বলেন, অর্থাৎ—তুমি মাতা, তুমি কন্যা, তুমি বধূ,—যথা—

মানবের কাছে কাছে
সদা সে মোহিনী আছে,
যে যেমন তার ঘরে
তেমনি মূরতি ধরে—

—তখন সৌন্দর্য্যের এই ধারণায় বাধা জন্মে। তবে কি বিহারীলালের সৌন্দর্য্য-বোধ খুব সূক্ষ্ম, সুমার্জ্জিত নয়? রসাবস্থার যে ব্রহ্মাস্বাদ শ্রেষ্ঠ কবি বা রসিকেরই আয়ত্ত তাহা কি বিহারীলালের ঘটে নাই?—এই প্রশ্নের মীমাংসাই বিহারীলালের কাব্য-আলোচনার

মূল সমস্যা। এইটী বুঝিয়া লইতে পারিলেই 'সারদামঙ্গলের' কবিকে আমরা কতকটা চিনিয়া লইতে পারিব। এইজন্য এইখানে বিহারীলালের কাব্য-পরিচয় একটু স্থগিত রাখিয়া আমি এই সৌন্দর্য্যতত্ত্বের একটা মোটামুটি আলোচনা করিব, তাহাতে বিহারীলালের কবি-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইতে পারে।

আলোচনার সুবিধার জন্য বিহারীলালের পরে যে একমাত্র কবির কাব্যে এই সৌন্দর্য্যতত্ত্বের একটা সজ্ঞান ধারণা বহুস্থলে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে—সেই রবীন্দ্রনাথের কাব্য হইতেই আমি উদাহরণ সংগ্রহ করিব। রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের ঠিক সমপন্থী না হইলেও তাঁহার কাব্যে বিহারীলালের প্রকৃষ্ট প্রভাব আছে, এইজন্য রবীন্দ্রনাথের তুলনায় বিহারীলালকে বুঝিবার সুবিধা হইবে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমি রবীন্দ্রনাথের এমন একটী কবিতা উল্লেখ করিব, যাহার বিচার এ প্রসঙ্গে বড়ই উপযোগী বলিয়া মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের 'উর্ব্বশী'—কবিতাটী ভাষা, ছন্দ ও চিত্র-রচনার ইন্দ্রজালে যতই মনোহর হউক, ঐ কবিতায় কবির মূল কল্পনা বিচলিত হইয়াছে। উর্ব্বশীর যে-চিত্র এখানে ফুটিয়াছে, তাহাতে সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী কামনা-লক্ষ্মীরূপেই দেখা দিয়াছে। উর্ব্বশীকে কামনা-লক্ষ্মীরূপেই বরণ করিতে কাহারও আপত্তি নাই, বরং তাহার সেই রূপই এখানে রসসৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু উর্ব্বশীকে কবি আদর্শ-সৌন্দর্য্যের আদি-প্রতিমা রূপে কল্পনা করিয়া এমন সকল চিত্র ও বিশেষণ যোজনা করিয়াছেন যে, তাহাতে স্ববিরোধী ভাবের সমাবেশ হইয়াছে। কবি এই কবিতায় কামনাকে যে-রূপ দিয়াছেন তাহাই পাঠককে মুগ্ধ করে, কিন্তু এই কামনার সম্পর্কে তিনি যে সৌন্দর্য্যের আদর্শ-খাড়া করিতে চাহিয়াছেন একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, তাহা এ কল্পনার কত বিরোধী। এইজন্য সৌন্দর্য্যতত্ত্বের দিক দিয়া আমি এই কবিতাটী একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে চাই।

কবি বলিতেছেন, এই উর্ব্বশী, 'আদিম বসন্তপ্রাতে উঠেছিল মন্থিত সাগরে' ডান হাতে সুধাপাত্র বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে।' বেশ,—কিন্তু বিষভাণ্ডের ভাবনা যেখানে আছে সেখানে খাঁটি সৌন্দর্য্যানুভূতির কথা আসিতে পারে না—কাম বা প্রেমের কথাই বড় হইয়া উঠে, কারণ—'a thing of beauty is a joy for ever'; খাঁটি aesthetic pleasure যেখানে আছে, সেখানে বিষও অমৃত হইয়া উঠে। উর্ব্বশীর রূপ যে কামনার উদ্রেক করে তাহাতে—

> মুনিগণ ধ্যান ভাঙ্গি দেয় পদে তপস্যার ফল,
> তোমার কটাক্ষঘাতে ত্রিভুবন যৌবন-চঞ্চল,
> অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা,
> নাচে রক্তধারা।

কবি এ কোন্ সৌন্দর্য্যের বন্দনা করিতেছেন? 'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ' বলিয়া যাহার উদ্বোধন করিয়াছেন, সে 'উষার উদয় সম অনবগুণ্ঠিতা', এবং 'অকুণ্ঠিতা' হইতে পারে;

কিন্তু তাহারই 'কটাক্ষঘাতে' যদি 'ত্রিভুবন যৌবনচঞ্চল' হইয়া উঠে, তবে মাতা, কন্যা বা বধূ না-হওয়াটা তার গৌরবের কারণ নয়—সে মোহিনী, শ্রেষ্ঠ ভাব-সমাধির বিঘ্নরূপিণী স্বর্গবেশ্যা মাত্র; তাই 'সর্ব্বাঙ্গ কাঁদিবে তাঁর নিখিলের নয়ন-আঘাতে' ইহাই অধিকতর সত্য। এইরূপ সৌন্দর্য্যের উদয়, শুধুই আদি যুগে নয়, যুগে যুগেই মানবচিত্তে হইয়া থাকে; এ সৌন্দর্য্য—স্বর্গের উদয়াচল নয়, মর্ত্ত্যেরই উদয়াচল ও অস্তাচল—উভয়াচলবাসিনী; এবং ইহার জন্য যে ক্রন্দন তাহা আদিযুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন হইয়া আছে। এই কবিতার স্ববিরোধী কল্পনার আরও প্রমাণ এই যে, যাহাকে কবি বালিকারূপে 'আঁধার পাথারতলে' 'অকলঙ্ক হাস্যমুখে প্রবাল-পালঙ্কে ঘুমাইতে' দেখিবার কল্পনা করিয়াছেন এবং যৌবনে যাহার 'কটাক্ষঘাতে ত্রিভুবন যৌবন-চঞ্চল' বলিয়াছেন, তাহাকেই নিত্যপূর্ণ ও স্বয়ম্প্রকাশ সৌন্দর্য্যের প্রতীক রূপে কল্পনা করিয়া প্রশ্ন করিতেছেন—'বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি কবে তুমি ফুটিলে উর্ব্বশী?' এখন প্রশ্ন হইতেছে রবীন্দ্রনাথের মত কবির কল্পনায় এমন গোল বাধিল কেন? ইহার একমাত্র উত্তর—রবীন্দ্রনাথ এই কবিতায়, য়ুরোপীয় কাব্যের অতিরিক্ত প্রভাবে নিজের কবি-ধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়াছেন, তাই কল্পনারও সঙ্গতি রক্ষা হয় নাই। এ উর্ব্বশী লক্ষ্মীও নয়, বেদ-পুরাণের উর্ব্বশীও নয়, অথবা রবীন্দ্রনাথের নিজের সৃষ্টিও নয়; এ উর্ব্বশী—কাম-জননী গ্রীক-দেবী Aphrodite-র নব্য য়ুরোপীয় রোমান্টিক সংস্করণ—"Mother of Love" এবং "Mother of Strife."। য়ুরোপীয় কাব্যে সৌন্দর্য্যের সহিত কামনার ও বেদনার যে অপূর্ব্ব উৎকণ্ঠা যুক্ত হইয়া সাহিত্যকে মানুষের জীবনের বাস্তবতম অনুভূতির প্রকাশ-কলায় পরিণত করিয়াছে—যার মর্ম্মস্থল হইতে 'Our sweetest songs are those that tell of saddest thought'—কবির এই কাতরোক্তি নিঃসৃত হওয়াই স্বাভাবিক, রবীন্দ্রনাথ এখানে সৌন্দর্য্যের সেই আদর্শে আকৃষ্ট হইয়াছেন; কিন্তু সে আকর্ষণ সত্ত্বেও রূপের এই পার্থিবতা, এই ইন্দ্রিয়-সর্ব্বস্বতাকে মনে-প্রাণে বরণ করিতে পারেন নাই। তাই তাঁহার উর্ব্বশী 'নন্দনবাসিনী' ও সুর সভার নর্ত্তকী হইলেও 'স্বর্গের উদয়াচলে মূর্ত্তিমতী তুমি হে উষসী'—ঋষির এই ঋক্‌মন্ত্রে তাহাকে বন্দনা করিতে তাঁহার বাধে না। আবার যাহার নৃত্যচ্ছন্দে—

ছন্দে ছন্দে নাচি' উঠে সিন্ধুমাঝে তরঙ্গের দল,
শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল,

—এমন কামনা-লেশহীন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-মহিমায় যে মহিমময়ী, 'যার স্তনহার হ'তে দিগন্তরে খসি পড়ে তারা', তাহারি 'কটাক্ষঘাতে ত্রিভুবন যৌবন চঞ্চল' এবং 'অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা, নাচে রক্ত-ধারা'! উর্ব্বশীর কল্পনায় এই স্ববিরোধী ভাব কবিতাটীর পূর্ণ রস-পরিণতির পক্ষে বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ, যে কামনার দিকটি ইহাতে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে পূর্ণ প্রকটিত করা হয় নাই; উর্ব্বশীর বাম করে কবি

যে বিষভাণ্ড দিয়াছেন তাহাতে 'অনন্ত যৌবনা' 'বিলোল হিল্লোল'-উর্ব্বশীর সেই কটাক্ষঘাত, এবং—

জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা,
ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণ শোণিমা—

ও 'মুক্তবেণী বিবসনে' প্রভৃতি সম্বোধনে পাঠকের মনে যে রসের উদ্রেক হয় তাহাই এই কবিতার প্রধান রস—সেই কামনা ও কামনার সেই বিষজর্জ্জরতার ক্রন্দন-উদ্দীপনেই এখানে সেই Sweetest song-এর সার্থকতা। যে ইংরেজী কবিতার প্রভাব এ কবিতায় আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস Swinburne-এর Atalanta in Calydon-এর সেই সুবিখ্যাত Chorus হইতে কিছু উদ্ধৃত করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, আমি প্রভাবের কথা কেন বলিয়াছি, এবং আরও বুঝিবেন, Swinburne-এর কবিতায় এই রস কেমন গাঢ় ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে—রবীন্দ্রনাথের কল্পনা, রক্ত-মাংসের বিক্ষোভ ও কামের প্রাধান্য স্বীকার করে না বলিয়া ইন্দ্রিয়ার্থকেও অতীন্দ্রিয় ভাববিলাসে কতকটা আচ্ছন্ন করিয়াছে। এই উর্ব্বশী বা Aphrodite-এর উদ্দেশে Swinburne গাহিয়াছেন—

An evil blossom was born
Of sea-foam and the frothing of blood,
Blood-red and bitter of fruit,
And the seed of it laughter and tears,
And the leaves of it madness and scorn;
A bitter flower from the bud,
Sprung of the sea without root,
Sprung without graft from the years.
The weft of the world was untorn
That is woven of the day on the night,
The hair of the hours was not white
Nor the raiment of time overworn,
When a wonder, a world's delight,
A perilous goddess was born;
And the waves of the sea as she came
Clove, and the foam at her feet,
Fawning, rejoiced to bring forth
A fleshly blossom, a flame
Filling the heavens with heat
To the cold white ends of the north.

* * * *

What hadst thou to do being born,
Mother, when winds were at ease,
As a flower of the spring time of corn,
A flower of the foam of the seas?

For bitter thou wast from thy birth,
Aphrodite, a mother of strife;
For before thee some rest was on earth,
A little respite from tears,
Earth had no thorn, and desire
No sting, neither death any dart;
What hadst thou to do amongst these,
Thou, clothed with a burning fire,
Thou, girt with sorrow of heart,
Thou sprung of the seed of the seas
As an ear from a seed of corn,
As a brand plucked forth of a pyre,
As a ray shed forth of the morn,
For division of soul and disease,
For a dart and a sting and a thorn?
What ailed thee then to be born?
* * * But thee
Who shall discern or declare?
In the uttermost ends of the sea
The light of thine eyelids and hair,
The light of thy bosom as fire
Between the wheel of the sun
And the flying flames of the air?
Wilt thou turn thee not yet nor have pity,
But abide with despair and desire
And the crying of armies undone,
Lamentation of one with another
And breaking of city by city;
The dividing of friend against friend,
The severing of brother and brother;
Wilt thou utterly bring to an end?
Have mercy, mother!

এই কবিতা আমি সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিলাম। এই কবিতা রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় কতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা নিরূপণ করা এ ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। রবীন্দ্রনাথ সম্প্রতি কাব্যবিচার -প্রসঙ্গে অনুকরণ ও স্বীকরণের যে প্রভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—তাহা এই প্রসঙ্গে পাঠককে স্মরণ করিতে বলি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উর্ব্বশীর কল্পনামূলে Swinburne-এর Aphrodite যে অনেকখানি আবেগ সঞ্চার করিয়াছে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ এই উদ্ধৃত অংশগুলির মধ্যে মিলিবে। Swinburne-এর Aphrodite-র সৌন্দর্য্য যেমন 'An evil blossom....blood-red and bitter of fruit....And the seed of it laughter and tears', রবীন্দ্রনাথের উর্ব্বশীও তেমনই 'উঠেছিল মন্থিত সাগরে ডান হাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে', Swinburne-এর Aphrodite

যেমন 'sprung of the sea without root, sprung without graft from the years তেমনই রবীন্দ্রনাথও তাঁহার উর্ব্বশীকে প্রশ্ন করিতেছেন—'বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি কবে তুমি ফুটিলে উর্ব্বশী! Swinburne-এর Aphrodite অবশ্য উর্ব্বশীর মত নর্ত্তকী নয়, তথাপি উর্ব্বশীর নৃত্যছন্দে যেমন 'সিন্ধুমাঝে তরঙ্গের দল' এবং 'শস্যশীর্ষে ধরার অঞ্চল' হিল্লোলিত হইয়া ওঠে, তেমনি Aphrodite-র সৌন্দর্য্যের ব্যাপ্তি ও বিকাশ এইরূপ—

> In the uttermost ends of the sea
> The lights of thine eyelid and hair,

—এখানে Aphrodite-র অপেক্ষা উর্ব্বশীর কবির কল্পনা অধিকতর স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। কিন্তু—

> The light of thy bosom as fire
> Between the wheel of the sun
> And the flying flames of the air ?

—এই পঙ্‌ক্তি কয়টির সংক্ষিপ্ত paraphrase—'তব স্তনহার হতে দিগন্তরে খসি পড়ে তারা' রবীন্দ্রনাথের উর্ব্বশীর সৌন্দর্য্যকে স্নিগ্ধ করিয়া তুলিয়াছে,—'flying flames of the air'-এর পরিবর্ত্তে 'খসি পড়ে তারা' original-এর চেয়ে যেন শতগুণে suggestive হইয়াছে। আবার—

> Wilt thou turn thee not yet nor have pity,
> But abide with despair and desire

এবং

> জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা,
> ত্রিলোকের হৃদি-রক্তে আঁকা তব চরণ-শোণিমা।

—প্রভৃতি, ভাবনার বিভিন্ন ভঙ্গী হইলেও, অথবা স্থানে স্থানে, যেমন—

> And the waves of the sea as she came
> Clove, and the foam at her feet
> Fawning,—
>
> তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মত
> পড়েছিল পদপ্রান্তে উচ্ছ্বসিত ফণা লক্ষ শত
> করি অবনত।

—একেবারে অনুবাদের মত হইলেও, উভয়ের মধ্যে যে বৈসাদৃশ্য আছে, তাহা এই 'উর্ব্বশী' কবিতাটীকে দুর্ব্বল করিয়াছে; এবং যেখানে কল্পনার যেটুকু সাদৃশ্য সেই-খানেই তাহা পাঠককে মুগ্ধ করে। দুয়েরই সৌন্দর্য্যের মূল কারণ কামনা। সেই কামনাকেই রবীন্দ্রনাথ একটী স্নিগ্ধ অতিন্দ্রিয়তায় মণ্ডিত করিতে গিয়া পারেন নাই, কেন্দ্রগত ভাবটী দ্বিধাভিন্ন হইয়া রসাভাস ঘটাইয়াছে।

এই কবিতাটী লইয়া এইরূপ বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন এক্ষেত্রে না থাকিলেও বিষয়টী একেবারে অপ্রাসঙ্গিক নয়। সৌন্দর্য্যকল্পনার একটা দিক—যে সৌন্দর্য্য মানুষের কামনায় প্রদীপ্ত হইয়া সাহিত্যের একদিক উজ্জ্বল করিয়াছে, এখানে তাহারই কিঞ্চিৎ পরিচয় করিলাম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্যেই সৌন্দর্য্যের যে আর একটী আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে এইবার সংক্ষেপে তাহারও উল্লেখ করিব; উদ্ধৃতি-বাহুল্য ভয়ে আমি সে সকল কবিতা উদ্ধৃত করিব না; নির্দ্দেশ করিব মাত্র। পাঠক দেখিবেন, 'বলাকা'র 'দুইনারী'-শীর্ষক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ উর্ব্বশী ও লক্ষ্মী দুয়েরই দুই-রূপ বর্ণনা করিয়া লক্ষ্মীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছেন। 'বিজয়িনী'-কবিতায় কবি অচ্ছোদ সরসীতীরে সৌন্দর্য্যের একখানি অনিন্দ্য-সুন্দর প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া মদনকে তাহার নিকট পরাভব স্বীকার করাইয়াছেন। 'চিত্রাঙ্গদা'-কাব্যে চিত্রাঙ্গদার স্বর্গীয় রূপ-লাবণ্য দর্শনে অর্জ্জুনের সেই চিত্ত-চমৎকার স্মরণ করুন—

"কেন জানি অকস্মাৎ
তোমারে হেরিয়া বুঝিতে পেরেছি আমি
কি আনন্দকিরণেতে প্রথম প্রত্যুষে
অন্ধকার মহার্ণবে সৃষ্টি-শতদল
দিগ্বিদিকে উঠেছিল উন্মেষিত হয়ে
এক মুহূর্ত্তের মাঝে—
" * * * চারিদিক হতে
দেবের অঙ্গুলি যেন দেখায়ে দিতেছে
মোরে, ওই তব আলোক আলোক মাঝে
কীর্ত্তিক্লিষ্ট জীবনের পূর্ণ নির্ব্বাপণ।"

অথবা অন্যত্র—

ভাবিলাম
কত যুদ্ধ, কত হিংসা, কত আড়ম্বর,
পুরুষের পৌরুষ-গৌরব, বীরত্বের
নিত্য কীর্ত্তিতৃষা, শান্ত হয়ে লুটাইয়া
পড়ে ভূমে, ওই পূর্ণ সৌন্দর্য্যের কাছে,
পশুরাজ সিংহ যথা সিংহবাহিনীর
ভুবন-বাঞ্ছিত অরুণ চরণতলে।"

—সৌন্দর্য্যবোধের এই আর এক আদর্শ। এখানে শুধু কামনা নয়, পুরুষের পৌরুষ স্তম্ভিত হইয়া যায়, যেন জীবন-মুক্তি ঘটে। এখানে কোনও কর্ম্ম-প্রবৃত্তি হৃদয়বৃত্তির অবকাশ নাই; আমরা জীবন বলিতে যাহা বুঝি, সেই দ্বন্দ্ব ও বিক্ষোভ এখানে শান্ত হইয়া যায়; ক্ষুদ্র চেতনা যেন এক বৃহত্তর চেতনায় বিলীন হয়—ইহারই নাম "জীবনের পূর্ণ নির্ব্বাপণ।"

কিন্তু এই সৌন্দর্য্যপ্রীতির নামই Aestheticism Artistic, Monasticism ; ইহাতে বাস্তব জীবন ও জগতের প্রতি ঔদাসীন্য ঘটে, অতএব ইহার মধ্যে সৃষ্টির পূর্ণ সত্য নাই—ইহাও সূক্ষ্মতর ইন্দ্রিয়বিলাস বা অতীন্দ্রিয় ভাববিলাস। কিন্তু নিছক সৌন্দর্য্যধ্যান ইহাকেই বলে। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কবিজীবনে এই আদর্শের বিচিত্র বিকাশ আমরা দেখিয়াছি। অনাসক্ত হৃদয়ে জগৎ ও জীবনকে রসসাধনার বস্তু করিয়া তিনি যে একটী সত্য উপলব্ধি করিবার ও করাইবার অপূর্ব্ব সাধনা করিয়াছেন, তাহাতে সত্য ও সুন্দরের একটা intellectual সমন্বয় ঘটিয়াছে বটে,—অবাস্তব বাস্তব এবং বাস্তব অবাস্তব হইয়া দ্বন্দ্বহীন হইয়াছে ; কিন্তু জীবনের সত্যকার বাস্তব অনুভূতি হইতেই এই অবস্থায় আরোহণ করার সোপান ইহাতে নাই। অতি উচ্চ মনোবিলাসের যে সৌন্দর্য্যবোধ তাহারই প্রয়োজনে, জগৎ ও জীবনকে একটী ভাবকল্পনার অধীন করিয়া, অতি সুন্দর pattern-এ সাজাইয়া লইয়া তাহা হইতে যে রস আস্বাদন করা যায়, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তাহাই অপূর্ব্ব সঙ্গীতে প্রকটিত হইয়াছে।

কিন্তু এমন করিয়া জীবন ও আর্টের দ্বন্দ্ব-নিরসন হয় না। অত্যুগ্র কামনার সৌন্দর্য্যসৃষ্টিও যেমন কাব্যের গৌরবহানি করে, তেমনই কামনাকে অতীন্দ্রিয়-লোকে প্রতিষ্ঠা করিয়া নিছক সৌন্দর্য্যের সাধনাও মানুষের আত্মাকে আশ্বস্ত করে না ; বরং বাস্তব হৃদয়-বেদনা যখন সুরময় হইয়া উঠে, তখন যে রসের উদ্রেক হয়, তাহাতে জীবনের সহিত, তথা নিজ গূঢ়তম সত্তার সহিত, গভীরতর পরিচয়ে একটা আনন্দ আছে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সৌন্দর্য্যবাদের মূলে আছে—কবির মনে প্রথমে একটা Principle of Beauty-র স্বগত উপলব্ধি ; পরে, জগতের মধ্যে সেই আদর্শের অনুযায়ী সৌন্দর্য্যের উদ্ভাবনা ; অর্থাৎ, জগতের যেটুকু কবির সেই মানস-আদর্শের অনুগত সেইটুকু স্বীকার করিয়া, অথবা বস্তু সকলের উপরে যতদূর সম্ভব সেই সৌন্দর্য্য আরোপ করিয়া, তাহা হইতেই একটী সুসঙ্গত মনোজগৎ সৃষ্টি করা। কবি-মানসের এই প্রবৃত্তিই আধুনিক। বাংলা কাব্যে এই আধুনিক ভঙ্গি সর্ব্বপ্রথম সুস্পষ্ট দেখা দিয়াছে বিহারীলালের কবিতায়। কিন্তু বিহারীলালের কল্পনায় বাস্তব-প্রীতি ও অবাস্তব সৌন্দর্য্য-ধ্যান একটা অতি অভিনব যোগসূত্রে—যোগসাধনার মত—কাব্যসাধনায় নির্দ্বন্দ্ব হইতে চাহিয়াছে। আমি অতঃপর, সেই সূত্রটীর সন্ধান করিয়া বিহারীলালের 'সারদামঙ্গলে'র 'সারদা'কে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিব।

বাংলা কাব্যে, বিশেষতঃ মাইকেল হেমচন্দ্রের যুগে, কবি-মানসের এই ভঙ্গি যেমন আচম্বিত তেমনি বিস্ময়কর। একালে কাব্যের আদর্শ বিচলিত হইয়াছিল—প্রাচীন আদর্শকে বর্জ্জন না করিয়া উপায় ছিল না। কিন্তু য়ুরোপীয় আদর্শের অনুকরণে যে নব-সাহিত্য-সৃষ্টির উদ্যোগ চলিয়াছিল, তাহাতে অনুকরণ-সর্ব্বস্ব কবি-প্রতিভার প্রাণের ফাঁকি বিহারীলালের মত কবির পক্ষে পীড়াদায়ক হইয়াছিল ; কারণ, য়ুরোপীয় আদর্শের প্রভাবে একালের অধিকাংশ কবি একটা বাহিরের উত্তেজনা অনুভব করিয়াছিলেন ; তাহার ফলে, কবিগণ আন্তরিকতা হারাইতেছিলেন, প্রকৃত ভাবানুভূতির পরিবর্ত্তে গুরুগম্ভীর

বাক্যঘোষনা ও কতকগুলি অতিসুলভ ভাবের উদ্দীপনাই তখন সকল কাব্যের প্রেরণা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বিহারীলাল প্রথম হইতেই ইহার বিরোধী ছিলেন। তিনি কেমন ভাষায় ও কি বিষয়ে কবিতা রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় পাঠকগণ ইতি-পূর্ব্বেই পাইয়াছেন। বাহিরের সকল প্রকার রীতি বা ফ্যাশন একেবারে বর্জ্জন করিয়া, বাহিরের প্রতিষ্ঠা, নিন্দা-প্রশংসা অগ্রাহ্য করিয়া বিহারীলাল আপনার প্রাণকেই প্রামাণ্য করিয়া নিজের সঙ্গে নিজেই নিভৃতে আলাপ করিতে বসিলেন; কাব্যের—কি দেশী কি বিদেশী—বাহিরের কোন আদর্শ গ্রাহ্য করিলেন না। অতি সহজ ও অতি সাধারণ জীবনযাত্রার পথে তিনি যাহা দেখিয়াছেন, শুনিয়াছেন ও প্রাণে অনুভব করিয়াছেন, তাহাই হইল তাঁহার কাব্যসাধনার দীক্ষা-মন্ত্র। তিনি কবিতার কোনও আদর্শ চিন্তা করেন নাই; কবির লক্ষ্য বা কাব্যরচনার কলা-কৌশল সম্বন্ধেও তিনি কোনও বিশেষ ধারণার ধার ধারিতেন না। ধর্ম্মনীতি বা দর্শনের কোনও তত্ত্ব তাঁহার হৃদয়ের স্বধর্ম্মকে বিচলিত করে নাই। মানুষের সঙ্গে নানা সম্পর্কে তিনি যে তৃপ্তি পাইতেন, সরল স্বার্থহীন অকপট প্রীতির পরিচয়ে তাঁহার প্রাণে মনুষ্যজীবন ও জগৎ সম্বন্ধে যে পুলক-রোমাঞ্চ ও বিস্ময়বোধ হইত, তাহাতেই তিনি একটী অপরূপ সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন প্রীতির যে অপূর্ব্ব পুলক—অতিশয় সরল স্বতঃস্ফূর্ত্ত যে রসমাধুরী—মানুষের প্রতি মানুষের অতিশয় সহজ কল্পনালেশহীন ভালবাসার আবেগে নানা ভঙ্গিতে উৎসারিত হয়, তাহার মধ্যেই জগৎ-রহস্য নিহিত আছে। কোন সৌন্দর্য্যই সৌন্দর্য্য নয় যাহা এই প্রীতির রসে সিঞ্চিত নয়—কারণ, মানুষ যদি ভাল না বাসে, তবে সৌন্দর্য্য যেমন হোক, তাহাকে উপলব্ধি করিবে কোন্ বুদ্ধির দ্বারা? প্রাণ যদি না জাগে তবে চোখে সেই দৃষ্টি আসিবে কোথা হইতে? এই প্রীতিমন্ত্রের সাধনায় বিহারীলাল যে সৌন্দর্য্যের আদর্শ সন্ধান করিয়াছিলেন তাহাতে বাহিরের রূপ বা বিশ্বপ্রকৃতির শোভা, ও অন্তরের অনুভূতি—বাস্তব ও কল্পনা, ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয়, সৌন্দর্য্য-পিপাসা ও হৃদয়বৃত্তি—একই রসচেতনায় নির্ব্বিরোধ নির্দ্বন্দ্ব হইয়া উঠিয়াছে। কথাটা আর একটু ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। পূর্ব্বে আমি সৌন্দর্য্যবাদের দুই দিক আলোচনা করিয়াছি; একটীতে, মানুষের কামনাকে, রক্তমাংসের সংস্কারকে, দেহ ও মনের ক্ষুধাকেই সৌন্দর্য্যের প্রতিষ্ঠাভূমি করিয়াছে—বিষ-পুষ্পের গন্ধ-মাধুরীর মত মানুষের প্রাণে সে একটী সান্ত্বনাহীন তীব্র উৎকণ্ঠার উদ্রেক করে; অপরটিতে মানুষের কামনা বা রক্তমাংসের বিক্ষোভকে অস্বীকার করিয়া সকল ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে অতিসূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়-বিলাসে পরিণত করিয়া, কামের বিষদন্ত ভাঙ্গিয়া তাহাকে হৃদয়হীন রূপ-মোহে পরিণত করিয়া, মানুষের সত্যকার সুখদুঃখকে আর্টের বিষয়ীভূত করিয়া নিশ্চিন্ত আনন্দবাদের প্রতিষ্ঠা হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, এই দুইয়ের মধ্যে একই তত্ত্বের প্ররোচনা রহিয়াছে,—সে তত্ত্বটি কাম। একটীতে কামের পূর্ণ প্রভাবে আত্মসমর্পণ, অপরটিতে কামকে স্তিমিত বা আবৃত করিয়া রক্তমাংসের ক্ষেত্র হইতে তাহাকে উঠাইয়া লইয়া কল্পনা-বিলাসের দর্পণে তাহার

তাপহীন শিখাটিকে চিত্রবৎ প্রতিফলিত করিয়া নিশ্চিন্ত সৌন্দর্য্যসম্ভোগ। কামই উভয়বিধ সৌন্দর্য্যের আদি প্রেরণা—

যে আনন্দ-কিরণেতে প্রথম প্রত্যূষে
অন্ধকার মহার্ণবে সৃষ্টি-শতদল
দিগ্বিদিকে উঠেছিল উন্মেষিত হয়ে
এক মুহূর্ত্তের মাঝে—

—সেও এই কামেরই প্রেরণা। কিন্তু এই দুই ধরণের সৌন্দর্য্যবাদের কোনটিতেই সৃষ্টির পূর্ণসত্যের অভিজ্ঞান নাই। তার একমাত্র প্রমাণ, ইহার কোনটাতেই মানুষের মনুষ্যত্ব চরিতার্থ হয় না। সৌন্দর্য্যের পূর্ণ উপলব্ধিতে কামনার আত্যন্তিক অভাব নাই, আবার কামনার উৎকট অভিব্যক্তিও নাই। বিহারীলাল যে সৌন্দর্য্যরূপিণীর ধ্যানে শেষে সর্ব্বদুঃখ ভুলিয়াছেন—সে সৌন্দর্য্য-পিপাসা ও প্রাণের পিপাসা একই; এই পিপাসা ইন্দ্রিয়ভোগাকাঙ্ক্ষার জ্বালা নয়, আপনাকে বিলাইয়া দেওয়ার যে সুখ, সেই সুখের পিপাসা।

আবার সেই পিপাসা আছে বলিয়াই তিনি Artistic Monasticism-এর পক্ষপাতী নহেন। অতএব আধুনিক গীতি-কবিগণ সৃষ্টির অন্তরালে যে সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর সন্ধানে নিজ নিজ ভাব-কল্পনাকে নিয়োজিত করিয়াছেন, আপনার অন্তরে বিশ্বজগৎকে প্রতিফলিত করিয়া যে আদি-রহস্যের ভাবনায় বিভোর হইয়াছেন—সৌন্দর্য্যকে একটি পরম তত্ত্বরূপে উপলব্ধি করিয়া তাহারই অখণ্ড অনুভূতিকে সত্য-দর্শনের সহায় বলিয়া স্থির করিয়াছেন—আধুনিক কাব্যের সেই কল্পনা, কবি-মানসের subjectivity, কেমন করিয়া বিহারীলালে ফুটিয়া উঠিল এইবার আমরা তাহাই দেখিব। কিন্তু এই প্রেম হইতেই সেই সৌন্দর্য্যের কল্পনা—যে সৌন্দর্য্য 'বিশ্ববিকাশিনী'—যে সৌন্দর্য্য বাস্তব প্রত্যক্ষের মধ্যেই অতিশয় বিশুদ্ধভাবে ও পূর্ণমহিমায় অধিষ্ঠান করিতেছে,—বিহারীলালের কল্পনায় প্রেম ও সৌন্দর্য্যের সেই অদ্বৈতসিদ্ধি বুঝিয়া লইবার কোনও যুক্তি পন্থা নাই; কবি তাহা নিজেও বুঝাইতে গিয়া বুঝাইতে পারেন নাই—কেবল সেই ভাবাবস্থাটি তিনি তাঁহার 'সারদামঙ্গল' কাব্যে, ভিতরে যেমন বাহিরেও তেমনই ভাবে ধরিয়াছেন; এবং 'সাধের আসন' নামক কাব্যে ইহাই একটু ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ইহাকে আরও অনির্ব্বচনীয় করিয়া তুলিয়াছেন।

প্রথমেই 'প্রেম-প্রবাহিনী' কাব্যের কিছু উদ্ধৃত করিলে ভাল হয়। এই কবিতায় কবি তাঁহার কবি-মানসের ইতিহাস নিজেই দিয়াছেন। তাঁহার প্রাণের বুভুক্ষা বন্ধু জায়া প্রভৃতির স্নেহে তৃপ্ত হইলেও তিনি যে কেন অধীর হইয়া কাব্যসুন্দরীর শরণাপন্ন হন, সেই কথাই এখানে বলিতেছেন। এই প্রীতি বা প্রেম শুধু তাঁহারই হৃদয়বাসী, অথবা দুই চারিজন আত্মীয়-বন্ধুর মধ্যেই তাহা গণ্ডি-বদ্ধ, এমন ধারণা কবির অসহ্য। তিনি এই প্রেমকেই সর্ব্বত্র উপলব্ধি করিতে চান—বাস্তব সীমার মধ্যে যাহার নিঃসংশয় প্রমাণ

পাইয়াছেন, তাহাই তাঁহার প্রাণে বিশ্বসৃষ্টির মূলাধাররূপে জাগিয়া উঠিয়াছে—যাহা ব্যক্তি-সম্পর্কের বাস্তব-প্রীতিরসে সমুজ্জ্বল তাহাকেই তিনি বিশ্বময় দেখিবার প্রয়াসী। ইহাই তাঁহার Idealism। 'প্রেম-প্রবাহিনী'তে তিনি বাস্তবের সহিত আদর্শের এই বিরোধ, শেষে আদর্শের জয়লাভ—যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য তাঁহারি কথায় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আমরা দেখিব, তিনি নিজ-হৃদয়ের সত্য-অনুভূতির উপরেই কতখানি আস্থাবান, এবং তৎকালীন কবিত্বের উপর তাঁহার কিরূপ অনাস্থা। যে হৃদয়হীনতার নামই কবিত্বহীনতা, এবং যে মহানুভবতার নাম তেজস্বিতা—বর্ত্তমানে তাহার একান্ত অভাব লক্ষ্য করিয়া কবি আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন, একালে তাঁহার মত কবির কোনও ভরসা নাই—

এই পোড়া বর্ত্তমানে নাই গো ভরসা,
তাই আরো দমে যাই ভেবে ভাবী দশা।

কিন্তু তথাপি স্বজাতির প্রতি তাঁহার বিশ্বাস আছে—

বাঙ্গালীর অমায়িক ভোলা খোলা প্রাণ
একদিন হবে নাকি তেজে বলীয়ান?
যদি হয়, নাহি ভয়, সেই দিন তবে
গিয়ে দাঁড়াতেও পার আপন গৌরবে।

এই সকল কথা তিনি তাঁহার অন্তর-বাসিনী প্রীতি-ঠাকুরাণীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন; সত্যকার প্রীতির অভাব যেখানে সেখানে কবিরা কি করিবে?—

পরের পাতড়া চাটা, আপনার নাই—
মতামত-কর্ত্তা তাঁরা, বাঙ্গালার চাই।
মন কভু ধায় নাই কবিত্বের পথে,
কবিরা চলুক তবু তাঁহাদেরি মতে।
জনমেতে পান নাই অমৃতের স্বাদ,
অমৃত বিলাতে কিন্তু মনে বড় সাধ।
সাধারণ ইঁহাদের ধামা ধরে আছে,
কাজে কাজে আদর পাবে না কারো কাছে।
এখন মোহন বীণা নীরবেই থাক,
এ আসরে পেঁচাদের নৃত্য হয়ে যাক।

পরে নিজের সম্বন্ধে বলিতেছেন—

মরিতে তিলার্দ্ধ মম ভয় নাহি করে,
ডুবিতে জনমে খেদ বিস্মৃতি-সাগরে।
রেখে যাব জগতে এমন কোন ধন,
নারিবে করিতে লোকে শীঘ্র অযতন।

তারপর কবি কোনখানে তাঁহার এই মনোমত আদর্শের সন্ধান না পাইয়া, তাঁহার অন্তরের সেই প্রেমকে বাহিরে খুঁজিয়া না পাইয়া, আপনার মধ্যে আপনি মরিয়া গিয়া, নূতন করিয়া বাঁচিয়া উঠিলেন; অর্থাৎ, আপনাকেই বিশ্বময় ব্যাপ্ত করিয়া দ্বন্দ্বের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন—

কিছুতেই তোমাকে যখন না পেলেম,
একেবারে আমি যেন কি হয়ে গেলেম!
শূন্যময় তমোময় বিশ্বসমুদয়,
অন্তর বাহির শুষ্ক সব মরুময়;
আসিয়ে ঘেরিল বিড়ম্বনা সারি সারি,
দুর্ভর হৃদয়ভার সহিতে না পারি;
কাতর চীৎকার স্বরে ডাকিনু তোমায়—
কোথা ওহে দেখা দাও আসিয়ে আমায়!

—এ কল্পনা নয়। সকল সত্য-সাধকের সাধনায় এই বিশেষ সোপানটীর কথা আমরা সকলেই জানি। বিহারীলালের কাব্য-সাধনায় শুধু কল্পনা নয়—তাঁহার প্রাণে যে আলোক জ্বলিয়াছিল তাহা কেবলমাত্র দৈবী প্রেরণার ফল নয়। তিনি এইরূপ সাধনাই করিয়াছিলেন, তাই আমরা তাঁহার কাব্যে কবি-মানুষটীর এমন আন্তরিকতা ও আত্ম-প্রত্যয়ের পরিচয় পাই। তারপর—

অমনি হৃদয় এক আলোকে পূরিত,
মাঝে বিশ্ববিমোহন রূপ বিরাজিত।
মধুময়, সুধাময়, শান্তিসুখময়
মূর্ত্তিমান প্রগাঢ় সন্তোষ-রসোদয়!
কেমন প্রসন্ন আহা কেমন গম্ভীর,
অমৃতসাগর যেন আত্মার তৃপ্তির!

এইবার আমরা 'সারদামঙ্গল'-কাব্যে কবির সিদ্ধিলাভের অবস্থা কিরূপ তাহা দেখিব।

এই 'সারদা' যে কে, আমরা এ পর্য্যন্ত বিহারীলালের কবিহৃদয়ের যেটুকু পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে কিঞ্চিৎ ধারণা করিতে পারি। তথাপি এই সারদার ধ্যানে তাঁহার যেন তিনটি অবস্থা আছে—জাগর, স্বপ্ন, সুষুপ্তি। প্রথম দুইটী অবস্থার কথা বুঝিব, কিন্তু সুষুপ্তির অবস্থাটি বুঝিবার বা বুঝাইবার নয়; তথাপি প্রথম দুইটী অবস্থা বুঝিতে পারিলে বোধ হয় কবির 'সুষুপ্তি' অবস্থাটিও (বা 'মত্তদশা'র অবস্থায় সারদার ধ্যান) যোগেযাগে বুঝিয়া লওয়া সম্ভব! কিন্তু এ কথা বুঝিতে ও মানিতে হইবে যে, এই তিন অবস্থাতেই সারদা সেই একই সারদা—কবির এই তিন অবস্থা একই সাধনার তর-তম অবস্থা মাত্র।

জাগর-অবস্থার সারদাকে আমরা কবির প্রেম-দেবতা বলিব—তিনি বাস্তব হৃদয়বৃত্তির উৎসরূপিণী। এই অবস্থায় কবি সারদাকে তাঁহার প্রেমময়ী পত্নীর রূপে দেখিতেছেন—

সদানন্দময়ী আনন্দরূপিণী
স্বরগের জ্যোতি মূরতিমতী।
মানস-সরস-বিকচ-নলিনী,
আলয়-কমলা করুণাবতী।
প্রিয়ে তুমি মোর অমূল্য রতন
যুগযুগান্তরে তপের ফল,
তব প্রেম-স্নেহ-অমিয়-সেবন
দিয়েছে জীবনে অমর বল।

এই সারদা-

সে যেমন তার ঘরে
তেমনি মূরতি ধরে,
মানবের কাছে কাছে
সদা সে মোহিনী আছে;

এই সারদাকেই সম্বোধন করিয়া কবি বলেন—

তুমিই মনের তৃপ্তি,
তুমি নয়নের দীপ্তি,
তোমা-হারা হলে আমি প্রাণহারা হই।

ইহাকে আমি জাগর-অবস্থা বলি। স্বপ্ন-অবস্থায় এই সারদা বিশ্বের সৌন্দর্য্যরূপিণী—

তুমিই বিশ্বের আলো তুমি বিশ্বরূপিণী।
প্রত্যক্ষে বিরাজমান,
সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠান,
তুমি বিশ্বময়ী কান্তি, দীপ্তি অনুপমা,
কবির যোগীর ধ্যান,
ভোলা প্রেমিকের প্রাণ,
মানব মনের তুমি উদার সুষমা।

এখানে জাগর হইতে স্বপ্নে কবির সঙ্গে যাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। কবি বাস্তব হৃদয়-পিপাসার বিশুদ্ধ পরিণতিকে—'ভোলা প্রেমিকের প্রাণ' ও 'মানব-মনের উদার সুষমা'—নাম দিয়া, তাহারই সহিত 'বিশ্বময়ী কান্তি'র অভিন্নতা উপলব্ধি করিয়াছেন। অর্থাৎ, তাঁহার মতে বাস্তব হৃদয়বৃত্তির প্রসার ঘটিলে তাহাতেই বিশ্বময়ী কান্তির অধিষ্ঠান হইয়া থাকে। অতএব, মানুষের জাগ্রত জীবনের যে প্রেম, এবং কবির স্বপ্নদৃষ্ট যে সৌন্দর্য্য, এই দুইএর মধ্যে কোন সত্যকার বিরোধ নাই। Ideal ও Real-এর এই সমন্বয় সাধন বিহারীলালের

কাব্যের একটী মৌলিক লক্ষণ। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব। কিন্তু তাঁহার এই স্বপ্ন আরো গাঢ় হয়, তখন কবি 'বিশ্ব-বিকাশিনী' সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর ধ্যান করিতে করিতে গাহিয়া উঠেন—

ব্রহ্মার মানস-সরে
ফুটে ঢল ঢল করে
নীল জলে মনোহর সুবর্ণ নলিনী!
পাদপদ্ম রাখি তায়
হাসি হাসি ভাসি যায়
ষোড়শী রূপসী বামা পূর্ণিমা যামিনী।

ফটিকের নিকেতন,
সর্ব্বদিকে দরপণ—
বিমল সলিল যেন করে তক্ তক্,
সুন্দরী দাঁড়ায়ে তায়,
হাসিয়ে যে দিকে চায়
সেই দিকে হাসে তার কুহকিনী ছায়া,
নয়নের সঙ্গে সঙ্গে,
ঘুরিয়া বেড়ায় রঙ্গে,
অবাক দেখিলে চক্ষে পড়েনা পলক।
তেমনি মানস-সরে
লাবণ্য-দর্পণ ঘরে
দাঁড়ায়ে লাবণ্যময়ী দেখিছেন মায়া।

যেন তারে হেরি হেরি
শূন্যে শূন্যে ঘেরি ঘেরি
রূপসী চাঁদের মালা ঘুরিয়া বেড়ায়;
চরণ-কমল তলে
নীলনভ নীল জলে
কাঞ্চন কমলরাজি ফুটে শোভা পায়।

চাহিয়ে তাঁদের পানে
আনন্দ ধরেনা প্রাণে,
আনত আননে হাসি জলতলে চান;
তেমনি রূপসী-মালা
চারিদিকে করে খেলা,
অধরে মৃদুল হাসি আনত বয়ান।

রূপের ছটায়ে ভুলি
শ্বেত শতদল তুলি
আদরে পরাতে যান সীমন্তে সবার ;
তাঁরাও তাঁহারি মত
পদ্ম তুলি যুগপত
পরাতে আসেন সবে সীমন্তে তাঁহার !

অমনি স্বপন প্রায়
বিভ্রম ভাঙ্গিয়া যায়,
চমকি' আপন পানে চাহেন রূপসী—
চমকে গগনে তারা,
ভূধরে নির্ঝরধারা,
চমকে চরণ-তলে মানস-সরসী।

তারপর এই ধ্যান-স্বপ্ন হইতেই সুষুপ্তির অবস্থা, সে অবস্থা অনির্ব্বচনীয়। কবির 'সারদা' তখন কবির মুগ্ধ-চেতনায় একটী অপূর্ব্ব অনুভূতিরূপে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন; সে যেন—

কায়াহীন মহা ছায়া,
বিশ্ববিমোহিনী মায়া,
মেঘে শশী-ঢাকা রাকা-রজনীরূপিণী
অসীম কানন-তল
ব্যেপে আছে অবিরল,
উপরে উজলে ভানু, ভূতলে যামিনী।

যেন—

প্রগাঢ় তিমিররাশি
ভুবন ভরেছে আসি,
অন্তরে জ্বলিছে আলো, নয়নে আঁধার

কবি বলেন-

বিচিত্র এ মত্তদশা,
ভাবভরে যোগে বসা—
হৃদয়ে উদার জ্যোতি কি বিচিত্র জ্বলে
কি বিচিত্র সুরতান
ভরপুর করে প্রাণ—
কে তুমি গাহিছ গান আকাশমণ্ডলে !

বিহারীলাল এই 'সারদা'কে যেমন 'কান্তিরূপিণী' বলিয়াছেন, তেমনই তাঁহার আর এক নাম 'করুণা'। বিহারীলালের কাব্যে এই 'করুণা' শব্দটির একটী বিশেষ অর্থ আছে

—শুধুই ব্যথিত-বেদনের সহানুভূতি নয়, ভক্তি প্রেম স্নেহ মমতা প্রভৃতির এক সাধারণ নাম 'করুণা'। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, বিহারীলাল আদর্শবাদী হইলেও বাস্তব কামনা বা কামকেই প্রীতির আকারে শোধন করিয়া লইয়া সেই বিশুদ্ধ কামমন্ত্রে তিনি তাঁহার সারদা বা সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এইরূপে, তিনি একদিকে যেমন বাস্তবকে পরিহার করেন নাই, তেমনই অপরদিকে, প্রাণের শ্রেষ্ঠ প্রেরণার যে সৌন্দর্য্যবোধ তাহাকেও ক্ষুণ্ণ করেন নাই। অতএব আমি পূর্ব্বে যে সৌন্দর্য্যতত্ত্বের দুইদিক আলোচনা করিয়াছি, এখানে তাহা অপেক্ষা একটা পূর্ণতর তত্ত্বের সন্ধান মিলিতেছে। বিহারীলাল তাঁহার সারদাকে যে আদর্শ-কল্পনায় মণ্ডিত করিয়াছেন, তাহার সহিত শেলীর আদর্শ-সৌন্দর্য্যরূপিণী Archetypal Beauty-র একটা সাদৃশ্য আছে বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু বিহারীলাল বস্তু-জগৎকে Idealise করিলেও কোথাও তাহাকে অস্বীকার করেন নাই; বরং বারংবার ইহাই বলিয়াছেন যে এই 'বিশ্ববিকাশিনী' কান্তি-দেবতা শুধুই 'বিশ্বের আলো' নয়—'বিশ্বরূপিণী'। বিহারীলাল কায়ারই সৌন্দর্য্যচ্ছায়া—প্রত্যক্ষেরই অপ্রত্যক্ষ মহিমায় মুগ্ধ ও চরিতার্থ হইয়াছিলেন। শেলী Idea-কেই শরীরিণী দেখিতে চাহিয়াছিলেন—

"In many mortal forms I rashly sought
The shadow of that idol of my thought."

—এবং পরিশেষে হতাশ হইয়া এই কায়াকে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। তিনি এই বহু ও বিচিত্রকে অস্বীকার করিয়া গাহিয়াছিলেন—

The One remains, the many change and pass;
Heaven's light for ever shines, Earth's shadows fly;
Life, like a dome of many-coloured glass,
Stains the white radiance of Eternity,
Until Death tramples it to fragments.

বিহারীলাল এই কায়াকে বাদ দিয়া শুধু ছায়া বা কান্তিটুকুই চান না; তিনি বলেন—

মহা প্রলয়ের কথা,
কি বিষম বিষণ্ণতা,
বিশ্ব গেছে, কান্তি আছে—অনুভবে আসে না।

ইহার কারণ তিনি মানুষকে ভালবাসেন, মর্ত্ত্যজীবনের প্রীতি-পিপাসা তাঁহার প্রবল। কবি কীট্‌স্ নিছক সৌন্দর্য্য-সাধনায় ক্লান্ত হইয়া যাহাদের কথা স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেন—

"They seek no wonder but the human face."

—কবি বিহারীলাল আদর্শ-সৌন্দর্য্যের পূজারী হইয়াও তাহাদেরই একজন। তিনি কল্পনায় স্বর্গের উৎকৃষ্ট সুখচিত্র রচনা করিয়াও তৃপ্তি পান না; কারণ সেখানে সকলই কামনাহীন,

কিছুই যেন জীবন্ত নয়; সেখানে মানব-মায়ার অবকাশ নাই। তিনি কল্পনায় এই স্বর্গ ভ্রমণ করিয়া আসিয়া বলিতেছেন—

স্বর্গেতে অমৃত সিন্ধু—
পাই নাই এক বিন্দু,

কারণ, যে 'অশ্রুবিন্দু' 'অমৃত-অধিক ধন,' তাহা সেখানে নাই। তিনি বলেন—

'অমরের অপরূপ স্বপ্নসুখ নাহি চাই।

কেবল পরমানন্দ,
কি যেন বিষম ধন্দ,
বিকল্পবিহীন দশা না জানি কেমন!

* *

অনন্ত সুখের কথা—
শুনে প্রাণে পাই ব্যথা,
অন্-অনন্ত নরকেও ততটা যন্ত্রণা নাই।'

তাই স্বর্গের কল্পধেনুর উদ্দেশে কবি বলিতেছেন—

থাক মায়াবিনী গাভী,
সকল দেবতা পাবি,
পাবি নি আমায়।

মায়া-দুগ্ধ পানে তোর
তারাও নেশার ভোর;
পয়োধর দিয়া মুখে
সাধের স্বপন-সুখে
দেবতাদিগের মত
অঘোরে ঘুমাব কত?

এবং ব্রহ্মের 'নাম-গোত্রহীন' নির্লিপ্ত অবস্থার জ্বালা স্মরণ করিয়া বলিতেছেন—সেই ব্রহ্ম

জ্বালা জুড়াবার তরে
এলেন নন্দের ঘরে
নব কুতূহলভরে, মুখে হাসি ধরে না!—
কত কান্না কত হাসি, কত মান অভিমান!

বিহারীলালের কবি-হৃদয় ও কাব্যসাধন-রীতির পরিচয় বোধ হয় আর অধিক দিবার প্রয়োজন নাই। এইবার আমি যথাসাধ্য তাঁহার কবি-প্রতিভার মূল্যনিরূপণের চেষ্টা করিব।

বিহারীলালের কবি-প্রতিভার বিশিষ্ট লক্ষণ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই কিছু আলোচনা করিয়াছি, এক্ষণে দুইটি প্রধান লক্ষণ সম্বন্ধে পুনরায় কিছু বলিব। প্রথম লক্ষণ—তাঁহার কবিদৃষ্টির মৌলিকতা; দ্বিতীয়—তাঁহার কবিতায় 'রূপ' অপেক্ষা 'ভাবের' প্রাধান্য। এই দুয়েরই কারণ এক—তাঁহার অভিনব ও ঐকান্তিক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য। তাঁহার কল্পনার মৌলিকতা এই যে, তিনি কবি-প্রেরণাকে বাহির হইতে ভিতরে ফিরাইয়াছেন, কাব্য অপেক্ষা কবিকে বড় করিয়াছেন। তাঁহার নিকট কাব্যকলা অপেক্ষা কবি-হৃদয় বা কবি-চরিত্র বড়। সরস্বতীকে আবাহন করিবার অধিকার পাইতে হইলে খাঁটি মানুষ হইতে হইবে। 'সারদা-মঙ্গলের' কবি এই বলিয়া আক্ষেপ করিতেছেন—

আহা সে পুরুষবর
না জানি কেমনতর—
দাঁড়ায়ে রজতগিরি অটল সুধীর।
উদার ললাটঘটা,
লোচনে বিজলীছটা,
নিটোল বুকের পাটা, নধর শরীর!

* *

সৌম্য মূর্ত্তি স্ফূর্ত্তি-ভরা,
পিঙ্গল বল্কল-পরা,
নীরদ-তরঙ্গ-লীলা জটা মনোহর;
শুভ্র অভ্র উপবীত
উরস্থলে বিলম্বিত,
যোগপাটা ইন্দ্রধনু রাজিছে সুন্দর।

* *

সে মহাপুরুষ-মেলা,
সে নন্দনবন-খেলা,
সে চিরবসন্ত-বিকশিত ফুলহার—
কিছুই হেথায় নাই;
মনে মনে ভাবি তাই,
কি দেখে আসিতে মন সরিবে তোমার!

—পড়িয়া কীট্‌সের সেই উক্তি মনে পড়ে—"I am convinced more and more every day that a fine writer is the most genuine being in the world" এই

'genuine being'-এর আদর্শ যে কবির যেমনই হোক, মূলে একটা সত্য আছে। কবি মিল্‌টনেরও বোধ হয় এমনই একটা আদর্শ-নিষ্ঠা ছিল বলিয়াই তিনি তাঁহার মহাকাব্য-রচনায় প্রবৃত্ত হইতে বহুদিন সাহস পান নাই। কাব্যসৃষ্টির প্রতিভা ও কবি-জীবনের এই আদর্শ উভয়ের মধ্যে সত্যকার সম্পর্ক যাহাই হোক, বিহারীলালের পরবর্ত্তী বাংলা কাব্য যে কবি-জীবন বা কবি-চরিত্রের পরিবর্ত্তে কবি-কল্পনা বা কাব্যনির্ম্মাণ-কৌশলের প্রতিভাকেই জয়যুক্ত করিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; এবং তাহারই ফলে বাংলা কাব্য আবার যেখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহার প্রমাণ নকল হুইট্‌ম্যান হইতে নকল ওমার খৈয়াম পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র জাজ্জ্বল্যমান।

বিহারীলালের এই আদর্শ তাঁহার ব্যক্তিগত কাব্যসাধনায় যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। প্রাচীন বাংলা কাব্যে বৈষ্ণবকবিগণের কাব্য-সাধনা যেমন আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গ হইয়াছিল, বিহারীলালের কবিজীবনেও সেইরূপ সাধক-জীবনের পরিচয় রহিয়াছে, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কাব্য এবং সমগ্র অন্তর ও বহির্জীবনের এই যোগসাধনার আদর্শ তাঁহার পরে আর কোনও কবির জীবনে প্রকাশ পায় নাই; বিহারীলাল intellect বা মনের উপর হৃদয়কে প্রাধান্য দিয়া বাঙ্গালী কবিকে তাঁহার মত হৃদয়বান করিয়া তুলিতে পারেন নাই, বরং কবি-মানস হইতে বস্তু-জগৎকে অনেক পরিমাণে অপসারিত করিবার প্রবৃত্তি দিয়া, উল্টা দিকে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এইরূপ ফল হওয়াই স্বাভাবিক। তথাপি আরও কারণ ছিল; বিহারীলাল কাব্য অপেক্ষা কবি-হৃদয়কে বড় করিয়াছিলেন; উভয়কে সমান বড় করিয়া একই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। কারণ, মানুষের হৃদয়বৃত্তি অর্থে শুধুই প্রীতি-প্রেমের ভাবসাধনা নয়; বাস্তবের সঙ্গে কবি-হৃদয়ের সম্পর্ক যতদূর সম্ভব ব্যাপক হওয়া চাই। জগতের সব-কিছু কোমল, মধুর, উদার ও মহৎ নয়—কঠোর, কঠিন, কুৎসিতও আছে। কবি-হৃদয় আরও উন্মুক্ত ও প্রসারিত না হইলে জগৎ ও জীবনের সমগ্রতা বোধ হয় না, কবি-কল্পনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। উৎকৃষ্ট কবি-কল্পনার লক্ষণ এই যে, তাহাতে কিছুই বাদ যায় না,—সৃষ্টির সর্ব্ব বিরোধ বা বৈচিত্র্যের মধ্যেই একটী harmony বা সঙ্গতি ফুটিয়া উঠে, তখন বাস্তবের বাস্তবতাই একটী অপূর্ব্ব রসের উদ্রেক করে, বাহিরের সঙ্গে অন্তরের বিরোধ আর থাকে না, মৃত্যু মৃত্যু-রূপেই অমৃত হইয়া উঠে। কবি-হৃদয় বলিতে আমরা সেই অনুভূতি বুঝিব, যাহাতে সর্ব্ব বস্তু সহজে ও সমভাবে ইন্দ্রিয়-চেতনার বিষয় হয়, এমন একটি বোধের বিকাশ, হয় যাহাতে কবির আত্ম-চেতনা ও জগৎ-চেতনা এক হইয়া সৃষ্টির মর্ম্মদ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়। এই আত্ম-চেতনার আশ্রয়—মানুষের মন; কিন্তু জগৎ-চেতনার আশ্রয়, সকল ইন্দ্রিয়ানুভূতির রসায়নাগার—হৃদয়। ইন্দ্রিয়ানুভূতি যখন হৃদয়ের সেবায় নিয়োজিত না হইয়া মনেরই সেবায় নিয়োজিত হয়, তখন আমরা কবি-হৃদয় বলিতে যাহা বুঝি তাহার সম্যক্‌ বিকাশ হয় না। কিন্তু মনের ক্রিয়ারও আবশ্যকতা আছে। মনের ধর্ম্ম—কৌতূহল; মন ভ্রমণ করিতে চায়, বস্তু

সংগ্রহ বা experience-এর প্রসার কামনা করে; হৃদয়ের ধর্ম্ম—একনিষ্ঠা। মন আত্ম-চেতনা ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার যন্ত্রস্বরূপ, তাহার বস্তুজ্ঞান অন্তর ও বাহিরের ভেদ-জ্ঞানকেই দৃঢ় করে। আত্ম-চেতনা ও জগৎ-চেতনা এই রস-চেতনায় নির্দ্বন্দ্ব হইয়া, যে ঐক্য-বোধের সৃষ্টি করে—উৎকৃষ্ট কবি-কল্পনার যে সত্য, যে উপলব্ধি, আর কোনও শক্তিতে সম্ভব নয়—মন তাহার অন্তরায়। যেখানে ইন্দ্রিয়ানুভূতি প্রবল, অর্থাৎ হৃদয়ের সিংহদ্বারে জগৎ আসিয়া প্রবেশ করে, এবং মন তাহার বৈচিত্র্যবোধ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই হৃদয়ের অধীন হইয়া কাজ করে, সেইখানেই উৎকৃষ্ট কবি-প্রতিভার জন্ম হয়। এই জন্যই কবি কীট্‌স্ কবি-মানসের দুর্ভেদ্য রহস্য ভেদ করিবার যে আশ্চর্য্য প্রয়াস করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার এই উক্তি অতিশয় মূল্যবান—"The Heart is the Mind's Bible," অর্থাৎ উৎকৃষ্ট কাব্য-সাধনায় জীবন ও জগতের যে রহস্য ভেদ হয়, তাহাতে মন হৃদয়কেই গুরুরূপে বরণ করে। এ রহস্য-ভেদ শ্রেষ্ঠ কবির পক্ষেই সম্ভব, এবং সেইজন্যই যিনি জগতের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ কবি তাঁহার মুখে, মানুষের মন ও মানুষের হৃদয়, এই দুই-এর মিলিত চরম অভিজ্ঞতার বাণী এমন সত্য ও সুন্দর হইয়া উঠে—

> "We must endure
> Our going hence even as our coming hither:
> Ripeness is all."

কিন্তু বিহারীলাল তাঁহার 'সারদা'কে যে কবি-হৃদয়ের সহধর্ম্মিণী করিয়াছেন, সে কবি-হৃদয় সঙ্কীর্ণ, তাহাতে বাস্তবের সমগ্রতার উপলব্ধি নাই। এজন্য তিনি শুধু প্রীতি-প্রেমকে সম্বল করিয়া বাস্তবের সঙ্গে যেটুকু যোগ রক্ষা করিয়াছেন, তাহার তুলনায় তাঁহার নিজেরই সৌন্দর্য্য-কল্পনা এত বড় যে, এই উভয়ের মধ্যে যোগসূত্রটী তিনিও আবিষ্কার করিতে পারেন না; তাই তাঁহার মনে যেমন বিস্ময় তেমনি সংশয় জাগে—

> তবে কি সকলই ভুল ?
> নাই কি প্রেমের মূল ?—
> বিচিত্র গগন-ফুল কল্পনা-লতার ?
> মন কেন রসে ভাসে,
> প্রাণ কেন ভালবাসে
> আদরে পরিতে গলে সেই ফুলহার ?

ইহার উত্তর নাই, উত্তরে কেবল ইহাই মনে হয়—

> এ ভুল প্রাণের ভুল,
> মর্ম্মে বিজড়িত মূল,
> জীবনের সঞ্জীবনী অমৃত-বল্লরী !
> এ এক নেশার ভুল,
> অন্তরাত্মা নিদ্রাকুল—
> স্বপনে বিচিত্ররূপা দেবী যোগেশ্বরী !

এইজন্যই বিহারীলাল তাঁহার সারদাকে প্রায়ই 'যোগেন্দ্রবালা', 'যোগেশ্বরী', 'যোগানন্দময়ী তনু', 'যোগীন্দ্রের ধ্যান-ধন' প্রভৃতি নামে সম্বোধন করেন; তিনি এই বাস্তব ও অবাস্তবের দ্বন্দ্ব একটি গভীরতর ভাবানুভূতি বা ধ্যান-কল্পনার সাহায্যে উত্তীর্ণ হইতে চাহিয়াছেন। কবি বলেন—

রহস্য ভেদিতে তব আর আমি চাব না;
না বুঝিয়া থাকা ভাল,
বুঝিলেই নেবে আলো,
সে মহাপ্রলয়-পথে ভুলে কভু যাব না।

এই 'রহস্য'কেই কবি বরণ করিয়া লইয়াছেন—

রহস্য মাধুরীমালা,
রহস্য রূপের ডালা,—
রহস্য স্বপন-বালা
খেলা করে মাথার ভিতরে,
চন্দ্রবিম্ব স্বচ্ছ সরোবরে।
কবিরা দেখেছে তাঁরে নেশার নয়নে,
যোগীরা দেখেছে তাঁরে যোগের সাধনে।

এই রহস্য-ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া কবি কাব্যসৃষ্টি না করিয়া কাব্যলক্ষ্মীরই আরতি করিয়াছেন। ইহাই তাঁহার কাব্যের যে দ্বিতীয় লক্ষণটির কথা বলিয়াছি—তাঁহার সেই Mysticism বা তত্ত্বরস-রসিকতার কারণ; এই Mysticism প্রকৃত কাব্যসৃষ্টির পক্ষে বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইজন্য বিহারীলালের কাব্য হইতে অতি উৎকৃষ্ট বিচ্ছিন্ন শ্লোক বা শ্লোক-সমষ্টি উদ্ধার করা যত সহজ, ভাবে ও আকারে একটি সম্পূর্ণ কবিতা সংগ্রহ করা তার তুলনায় কঠিন। বিহারীলাল যে রহস্যভেদ করিতে চান না বলিয়াছেন, কবিকে সে রহস্যভেদ করিতে হয় না বটে—অর্থাৎ, তাহার কোনও অর্থ করিবার প্রয়োজন হয় না, সে কাজ কবির নয়; কিন্তু সেই রহস্যকে সকল কবিকেই কাব্য-সৃষ্টি দ্বারা এমন একটি রস-রূপে সুপ্রকাশ করিতে হয়, যে তাহাতেই রসিক-চিত্ত চরিতার্থ হয়। কবি এই রহস্য-ধ্যানে বিভোর থাকিলে চলিবে না—সে রহস্য কবিরই মাথার ভিতরে, স্বচ্ছ সরোবরে চন্দ্রবিম্বের মত খেলা করিলেই কাব্যের উদ্দেশ্য সাধন হয় না। এ প্রসঙ্গে, আমি অন্যত্র একজন কবি-সমালোচকের যে উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি এখানেও তাহা পাঠককে স্মরণ করিতে বলি—

"The poet is not a mystic: contemplation of the mystery is no end in itself for him. He is a doer, a maker, a revealer, a creator."

তথাপি বিহারীলাল সৌন্দর্য্য-পিপাসাকে হৃদয়বৃত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত করিয়া কবি-প্রাণকে নূতন করিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন; তিনি কবিধর্ম্মকে মানুষের মনুষ্যত্বের সঙ্গে

যুক্ত করিয়া, বাস্তব ও অবাস্তবের দ্বন্দ্ব একটি নূতনতর রস-সাধনার দ্বারা উত্তীর্ণ হইবার পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মাইকেল যেমন কাব্যে নব নব রূপ সন্ধান করিয়া বঙ্গকবি-প্রতিভাকে বিচিত্র ও বৃহত্তর কাব্যসৃষ্টির কারুকলায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, বিহারীলাল তেমনই কাব্য ও কবি-মানসের এমন একটা নিগূঢ় সম্বন্ধের ইঙ্গিত করিয়াছিলেন যে, অতঃপর বাংলা কাব্যে একটা সম্পূর্ণ নূতন ভাব-কল্পনার লীলা চলিয়াছে—কবিগণ জগৎ ও জীবনকে নিজেদের মানস-দর্পণে প্রতিফলিত করিয়া বাংলার কাব্য-কানন একটি অপূর্ব্ব সুর-মূর্চ্ছনায় প্লাবিত করিয়াছেন। কাব্যে আত্মভাব-সাধনার এই ভঙ্গী বিহারীলাল হইতেই আরম্ভ।) পরবর্ত্তী কবিগণের উপরে বিহারীলালের এই প্রভাব ঠিক কিরূপ বা কতকখানি সে আলোচনার অবকাশ এখানে নাই; তথাপি, আমি অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের কাব্য হইতে কিছু কিছু নিদর্শন উদ্ধৃত করিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিব।

অক্ষয়কুমার বড়াল—

ফুটোনা, ফুটোনা রবি,
থাক্ ঘোর-ঘোর ছবি,—
ধরা যেন ঋষি-স্বপ্ন মদির মধুর!
নাহি শোক নাহি তাপ,
নাহি মোহ নাহি পাপ!—
কেটো না আবছা-জাল—প্রত্যক্ষ নিষ্ঠুর!

অন্যত্র,—

দাও শিক্ষা যোগময়ী যেখানে থাক না তুমি
কিসে দেখি সৌন্দর্য্য তোমার,
তোমাতে মগন হয়ে সত্তা তব ভুলে গিয়ে
একা হই পূর্ণ অবতার!
ভাবিয়া বিন্দুরে এক ব্যাপ্ত হই বিশ্বময়—
শিখারে শিখা সে প্রেমযোগ,
ছিঁড়ে যাক্ নাভি-শিরা ঘুচে যাক্ জীবনের
চির-জন্মগত স্বার্থ-রোগ!

আবার—

কবি যোগী ঋষি লয়ে সে প্রেম উধাও হয়ে
পলায়েছে স্বর্গে কিম্বা নন্দনে, নির্ব্বাণে—

* * *

লয়ে তার শুভহাসি গড়ি টীকা রাশি রাশি
প্রাণ-গত অশ্রু লয়ে বাদ-প্রতিবাদ!

দেবেন্দ্রনাথ সেন—

হে প্রকৃতি একি লীলা বুঝিবারে নারি—
যে-দিকে তাকায়ে দেখি সেই দিকে সখা-সখি
তরুরাজ্যে জীবরাজ্যে যত নরনারী।
প্রজাপতি উড়ে ঘুরে বসে আসি মোর শিরে
মুচকিয়া হাসে সব কুসুম-কুমারী ;
প্রতিবেশী ব্রাহ্মণের শিশুটি পেয়েছে টের
আমিগো স্বজন তার।—রঙ্গ দেখ তার—
সম্মুখে আসিয়া দেয় নৃত্য-উপহার।
শ্যামলীর বৎসপাশে কাছে গিয়ে মহাত্রাসে
সকলে পলায়ে আসে ; আমি কাছে গেলে
সহর্ষ সুরভি-সুতা কিছুই না বলে।

* *

উষার দিগন্তপানে চেয়ে দেখি, ম্লানাননে
শশী অস্ত যায় যায়, নেহারি আমায়
শিথিল করিয়া গতি থমকি দাঁড়ায়।
হে প্রকৃতি, জানিয়াছি হে জননী বুঝিয়াছি—
এই ভাঙ্গা দেহমাঝে (এ কি গো তামাসা।)
ঢালিয়াছ একরাস প্রীতি-ভালবাসা।
কবিত্বের অহঙ্কার হয়েছে মা চুরমার
আমিত্ব ডুবিয়া গেছে প্রীতি-পারাবারে ;
ডুবুক মা ক্ষতি নাই, একরাশি ভগ্নী ভাই
আমি-বিনিময়ে মাগো, পেয়েছি সংসারে।

এইবার রবীন্দ্রনাথের কাব্য হইতে আমি এমন একটি কবিতা উদ্ধৃত করিব, যাহাতে বিহারীলালের কাব্যসাধন-রীতিই যেন অতি সংক্ষেপে, অতি অপূর্ব্ব ভাষায় ও ছন্দে বিবৃত হইয়াছে। এই কবিতাটির নাম 'চিত্রা'। রবীন্দ্রনাথ এই কবিতায় কবি ও কাব্য সম্বন্ধে, তাঁহার মনোগত আদর্শের একটি গভীর উপলব্ধি ছন্দোবদ্ধ করিয়াছেন। এই কবিতাটির প্রথম স্তবকে তিনি নিখিল-কাব্যকলা বা কবিকর্ম্মের প্রেরণারূপিণী সৌন্দর্য্যদেবতার বন্দনা করিয়াছেন ; ইহার দ্বিতীয় স্তবকে তিনি এই সৌন্দর্য্যদেবতাকে কাব্যকলা হইতে বিমুক্ত করিয়া, নিভৃত অন্তর-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কবির যে ভাবাবস্থা হয়, তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। এই দ্বিতীয় স্তবকে রবীন্দ্রনাথ কাব্যলক্ষ্মীকে যে ধ্যানমন্ত্রে আরাধনা করিয়াছেন, সেই মন্ত্র একান্তভাবেই বিহারীলালের ; এ মন্ত্র যদি কখনও কোনও কবির জীবনে সত্যকার কাব্যসাধনার মন্ত্র হইয়া থাকে, তবে সে কবি যে বিহারীলাল, আশা করি, এই দীর্ঘ

পরিচয়ের শেষে সে বিষয়ে কেহ সন্দেহ মাত্র করিবেন না। এই দ্বিতীয় স্তবকটিই এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

অন্তর মাঝে তুমি শুধু একা একাকী,
তুমি অন্তরব্যাপিনী।

। মুগ্ধ সজল-নয়নে,
একটি পদ্ম হৃদয়-বৃন্ত-শয়নে,
একটি চন্দ্র অসীম চিত্ত-গগনে,
চারিদিকে চির-যামিনী।

অকূল শান্তি, সেথায় বিপুল বিরতি,
একটি ভক্ত করিছে নিত্য আরতি,
নাহি কাল দেশ, তুমি অনিমেষ মুরতি,
তুমি অচপল দামিনী।

ধীর গম্ভীর গভীর মৌন-মহিমা,
স্বচ্ছ অতল স্নিগ্ধ নয়ন-নীলিমা,
স্থির হাসিখানি উষালোকসম অসীমা,
অয়ি প্রশান্তহাসিনী।

অন্তর মাঝে তুমি একা একাকী,
তুমি অন্তরবাসিনী।

পাঠক লক্ষ্য করিবেন, এই কবিতার একস্থানে রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, বিহারীলালের শুধু ভাব নয়, ভাষাও কেমন প্রতিধ্বনিত হইতেছে—

'একটি চন্দ্র অসীম চিত্ত-গগনে,
চারিদিকে চির-যামিনী।'

—ইহার সহিত বিহারীলালের পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোক কয়টি পাঠ করুন—

প্রগাঢ় তিমির রাশি
ভুবন ভরেছে আসি—
অন্তরে জ্বলিছে আলো, নয়নে আঁধার।

এবং

কায়াহীন মহা ছায়া,
বিশ্ববিমোহিনী মায়া,
মেঘে শশী-ঢাকা রাকা-রজনীরূপিণী
অসীম কাননতল
ব্যেপে আছে অবিরল,
উপরে উজলে ভানু, ভূতলে যামিনী।

রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের নিকট এই মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করিয়াও কাব্যসৃষ্টির প্রাচুর্য্যে নিজের প্রতিভাকে এমন সার্থক করিয়াছেন কোন্ কৌশলে, তাহার ইঙ্গিতও এই কবিতাটিরই প্রথম স্তবকে আছে। তাঁহার কাব্য-লক্ষ্মী শুধু 'অন্তর মাঝেই একা একাকী' নহেন—জগতের মাঝেও তিনিই 'বিচিত্ররূপিণী'। বিহারীলালের একনিষ্ঠ কবি-হৃদয় এই 'বিচিত্ররূপিণী'র প্রতি তেমন আকৃষ্ট হন নাই, তিনি তাঁহার 'অন্তরব্যাপিনী' হইয়াই আছেন। বিহারীলাল এ বিষয়ে অদ্বৈতবাদী; রবীন্দ্রনাথ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী; মন ও প্রাণ এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে তিনি মনকে প্রশ্রয় দিলেও সর্ব্বত্র প্রাণের একটি সূক্ষ্ম আবরণ রক্ষা করিয়াছেন; বিহারীলাল মনকে বড় একটা আমল না দিয়া প্রাণকেই প্রামাণ্য করিয়াছেন।) রবীন্দ্রনাথের কাব্যও 'ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা'র তত্ত্ব কতটা রস-স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে, এখানে সে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক; কেবল এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবির প্রতিভা-বিকাশে বিহারীলালের কাব্য-মন্ত্র, মুখ্যভাবে না হইলেও গৌণভাবে, কতখানি সাহায্য করিয়াছে, তাহারই ইঙ্গিত করিয়া আমি বিহারীলালের কাব্য-পরিচয় শেষ করিলাম।

আশ্বিন, ১৩৩৬

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

(১)

নব্য বাংলা সাহিত্যের—বিশেষতঃ কাব্যের—উদ্ভবকাল ১৮৬০-১৮৮০ খৃষ্টাব্দ ধরা যাইতে পারে। মাইকেলের 'মেঘনাদ-বধ', বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল', হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী', নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ', এই কালের মধ্যেই রচিত হইয়াছিল। নব্য বাংলা সাহিত্যের সূচনার কথা বলিতেছি না, সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ব্যাপিয়া এই সাহিত্যের আয়োজন চলিয়াছিল; তথাপি বিশেষ করিয়া কাব্য-সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়াছিল ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর পরেই, এবং তাহার মধ্যে একটু আকস্মিকতার আভাস আছে। তার কারণ বোধ হয় এই যে, প্রথমতঃ, গদ্যসাহিত্যের মত কাব্যসাহিত্য একেবারে অতর্কিত ও অভাবনীয় রীতি-প্রকৃতির অবস্থায় ছিল না; দ্বিতীয়তঃ কবি-প্রতিভা একটি দৈবী-শক্তি, সেই শক্তির জন্য কবিচিত্তের জাগরণ প্রধানতঃ দায়ী; কখন কি কারণে এসব ঘটনা ঘটে তার সম্বন্ধে সূক্ষ্ম গবেষণা চলিতে পারে, কিন্তু একথা সত্য যে, যাহাকে অনুকূল অবস্থা বলা যায় তাহা সত্ত্বেও এরূপ জাগরণ না ঘটিতে পারে। কবিচিত্তের জাগরণও সব সময়ে সত্য ও গভীর হয় না, তজ্জন্য কাব্যসৃষ্টিতে নানা ত্রুটী থাকিয়া যায়। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের কারণ-সন্ধান যেমন দুরূহ, খাঁটি কবি-প্রতিভাও তেমনই কোনও কার্য্যকারণ তত্ত্বের অধীন নয়। একটা যুগের সাধারণ কাব্য-প্রবৃত্তির কার্য্যকারণ-তত্ত্ব কতকটা অনুমান করা অসম্ভব নয়, কিন্তু উৎকৃষ্ট প্রতিভার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য যুগ ও কালকে অতিক্রম করিয়া বিরাজ করে। একটি যুগের অন্তর্ব্বর্ত্তী অধিকাংশ লেখকের মানস-ধর্ম্ম একটা সাধারণ লক্ষণে চিহ্নিত করা হয়ত সম্ভব, কিন্তু ঐ যুগের এক বা একাধিক লেখকই যুগস্রষ্টা রূপে দেখা দেন, অপর সকলে অল্পাধিক পরিমাণে তাঁহারই ছন্দানুবর্ত্তন করেন। কিন্তু তাই বলিয়া সাহিত্যের ইতিহাস-রচনায় যে-বুদ্ধি বিশেষ করিয়া কাজ করে, কেবলমাত্র যদি তাহারই শরণাপন্ন হওয়া উচিত হয়, তবে যেমন একদিকে প্রতিভার দৈবীশক্তিকে একরূপ অস্বীকার করা হয়, তেমনই অনেক কবি-লেখকের সাহিত্য-সাধনার সম্যক মূল্য-নিরূপণের প্রয়োজন থাকে না; সাধারণ যুগপ্রবৃত্তির সঙ্গে যাঁহাদের ব্যক্তিগত প্রেরণার মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, এবং সম্ভবতঃ সেই কারণেই যাঁহারা সমসাময়িক খ্যাতিলাভে বঞ্চিত হইয়া থাকেন—তাঁহাদের পরিচয় সাধনে বিলম্ব ঘটে। সাহিত্যের ইতিহাস-রচনার মূল্য অস্বীকার করি না, কিন্তু অনেক সময়ে এই সকল বিস্মৃত ও অখ্যাত লেখককে আবিষ্কার করিয়া যথাযোগ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে যুগধর্ম্ম ও কার্য্যকারণ-তত্ত্বের দিকেই দৃষ্টি রাখিলে চলে না—প্রতিভার যে দিব্য লক্ষণ সকল যুগেই সমান তাহার প্রতি চিত্তকে উন্মুখ রাখিতে হয়, রসবোধকেই দীপ-বর্ত্তিকার মত সন্তর্পণে সঙ্গে লইয়া চলিতে হয়।

আমি বলিতেছিলাম সেকালে নব্য বাংলাকাব্যের অভ্যুদয় কতকটা আকস্মিক বলিয়া বোধ হয়। ইহারও একটা কারণ দেওয়া যায়। যাঁহারা বলেন সকল কাব্যের মূলীভূত প্রেরণা বিস্ময়-রস, তাঁহাদের উক্তি অযথার্থ নয়। একটা কিছু অতিশয় অভিনব, বাহিরে হোক, ভিতরে হোক, যখন আচম্বিতে আমাদের দৃষ্টি-গোচর হয় তখনই আমরা বিস্ময় বোধ করি। এই বিস্ময় বোধ করার শক্তি অনুসারে এবং বিস্ময়ের কারণ অনুসারে মানুষের চিত্তে যে ধরণের সাড়া জাগে তাহা হইতেই অন্তরে বিপ্লব ঘটে—যিনি রসিক তিনি ইহাকে রসরূপে আত্মসাৎ করেন, যিনি চিন্তাশীল তিনি এই অভিনব অভিজ্ঞতাকে পূর্ব্বধারণার সহিত সমন্বিত করিয়া নিজ চিত্তবিক্ষেপ শান্ত করিতে প্রয়াস পান। নূতন জ্ঞান ও নূতন অভিজ্ঞতার মধ্যে মনের ক্ষুধা যখন অপরিমেয় খাদ্যের সন্ধান পাইয়া পুলকিত হইয়া উঠে, তখনও সহসা সেই সম্পদ লাভ করিয়া এমন একটা উৎসাহ ও আনন্দ জন্মে যে, জ্ঞান-পিপাসার সঙ্গে কতক পরিমাণে রসোল্লাসও ঘটে। তাই গত শতাব্দীর বাংলাকাব্যের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি লক্ষ্য করিলে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই, তৎকালীন কবিগণের চিত্তে রসকল্পনার সঙ্গে অধিক পরিমাণে নূতন জ্ঞান-সম্পদের উত্তেজনা ও উৎসাহ জাগ্রত হইয়াছিল। ইহারই কারণে ১৮৬০ হইতে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আমরা বাংলা কাব্যে যে আকস্মিক ভাবাবেগ উৎসারিত হইতে দেখি, তাহাতে শান্ত সমাহিত রসকল্পনা অপেক্ষা বিবৃত, ব্যাখ্যা ও বক্তৃতামূলক প্রেরণা, নবলব্ধ জ্ঞানের উগ্র অধীরতাই কাব্যাকারে প্রকাশিত হইতে দেখি। আকস্মিক বিস্ময়বোধের যে কথা বলিয়াছি তাহাই মুখ্যতঃ এই কাব্যপ্রেরণার মূল। বাঙ্গালীর চরিত্রগত ভাবপ্রবণতা এই নূতন জ্ঞানের সংস্পর্শে নূতন করিয়া সাড়া দিয়াছিল—এই ভাবপ্রবণতার মধ্যে যেখানে যেটুকু কবি-প্রতিভার অবকাশ ঘটিয়াছিল সেইখানে কিছু সত্যকার কাব্যসৃষ্টি হইয়াছে—নতুবা, সেকালের অধিকাংশ কবিতাই সুসম্পন্ন আকার অথবা সুন্দর বাণীমূর্ত্তি লাভ করিতে পারে নাই। নব্যসাহিত্যের সেই প্রথম যুগে আমরা দুইজন মাত্র কবির কবিশক্তির সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইতে পারি ; সেই দুইজন—মধুসূদন ও বিহারীলাল। বাকি যে সকল কবি খ্যাতিলাভ করিয়াছেন তাঁহাদের কবিযশঃ সম্বন্ধে বা বাংলা কাব্যসাহিত্যে তাঁহাদের স্থান-নির্দ্দেশ সম্বন্ধে এখনও সম্যক আলোচনা হয় নাই—খাঁটি রসবিচার-পদ্ধতির প্রয়োগ এখনও হইতে পারে নাই। বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসও যেমন এখনও পর্য্যন্ত অলিখিত আছে, তেমনই আধুনিক পদ্ধতিতে, রসের বিশুদ্ধ আদর্শ অনুসারে, কাব্য-সমালোচনা আমাদের দেশে এখনও অজ্ঞাত।

আমাদের নব্য-সাহিত্যের প্রথম যুগে কাব্য-প্রেরণার প্রকৃতি ও তাহার কারণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতে একটি কথা আমি বিশেষ করিয়া স্মরণ করিতে বলি। তাহা এই যে, সে যুগ জাতীয় চেতনার এমন একটি উন্মেষ-কাল (এবং আমাদের জাতি এরূপ ভাবপ্রবণ) যে, তখন সাহিত্যের সর্ব্ববিভাগে কাব্যের প্রভাবই প্রবল হইবার কথা। যাহার বিষয়বস্তু খাঁটি গদ্য তাহাও কাব্যের আবেগে ছন্দোময়—জ্ঞানবস্তু ও রসবস্তু তখন

একাকার হইয়া গেছে; চিন্তার জটিলতাও পুলক-বিস্ময়ের আবেগে কাব্য-প্রেরণার অনুকূল হইয়াছে।

মহাকবি গ্যেটের একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে বড় সত্য বলিয়া মনে হয়—

Poetry as a rule exerts the greatest influence either when a community is in its infancy, whether it be crude or only half cultivated; or else when its culture is undergoing a transformation and it becomes alive to some new or foreign culture; it may consequently be said that the effect of novelty invariably makes itself felt.

এই উক্তির শেষ কথাটি আমাদের নব্য-সাহিত্যের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সত্য—"When its culture is undergoing a transformation and it becomes alive to some new and foreign culture"—এই অবস্থাই উনবিংশ শতকে বাংলাসাহিত্যে যেমন ভাবে প্রকটিত হইয়াছে, তেমন আর কোথাও হইয়াছে কি জানি না। সেই যুগের বাংলা কাব্যের মূল প্রবৃত্তি বিচার করিয়া দেখিলে নিঃসন্দেহে ইহা বলাই সঙ্গত হইবে যে, এ কাব্যে উৎকৃষ্ট কবি-প্রেরণা সন্ধান করিবার কালে সে যুগের স্বাভাবিক মানস-বিপ্লবের কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে। কবি-প্রেরণার সঙ্গেই একটা নূতন ভাবচিন্তার বিক্ষোভ সেকালের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী—ভাবের আবেগ যেমন অনিবার্য্য, তেমনই সেই সঙ্গে পুরাতন চিন্তাধারার সঙ্গে এক অতিশয় নূতন চিন্তাপ্রণালীর সংঘর্ষও অবশ্যম্ভাবী। সেকালের কবি-প্রতিভা এই দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত নহে—এইজন্য সর্ব্বত্র ভাবের আবেগ প্রবল হইলেও উৎকৃষ্ট রসসৃষ্টি সম্ভব হয় নাই।

গত যুগের বাংলাসাহিত্য আজিও ঐতিহাসিক আলোচনা অথবা রসবিচারের বিষয়ীভূত হয় নাই, তাই সেকালের লেখকগণ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা ও অজ্ঞতা এখনও ঘুচে নাই। মাইকেল অথবা বিহারীলাল সম্বন্ধে অজ্ঞতা বা বিস্মৃতি না ঘটিবার কারণ আছে; কিন্তু হেমচন্দ্র বা নবীনচন্দ্রের কবি-প্রতিভা সম্বন্ধে যাঁহারা এত কথা বলিয়া থাকেন, তাঁহারা সেকালের এমন একজন কবির প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন, যাঁহার রচনায় সে যুগের একটি সহজ ও স্বাভাবিক ভাবোৎকণ্ঠাই নয়, খাঁটি সাহিত্যিক প্রতিভা ও ভাবকল্পনার মৌলিকতা এত স্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে। আমি 'মহিলা'-কাব্যের কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের কথা বলিতেছি। বড় বড় ঘটনা ও কাহিনী অবলম্বন করিয়া যে ভাবোচ্ছ্বাসময় কাব্য হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র রচনা করিয়াছিলেন—আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহাতে বক্তৃতার বাগ্‌ভঙ্গী ছাড়া, খাঁটি কাব্যগুণযুক্ত বাণী সৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় না; ইংরাজীতে যাহাকে 'gift of phrase-making' বলে, এই দুই বিখ্যাত কবির বিপুলায়তন কাব্যরাশির মধ্যে তাহার প্রমাণ এতই অল্প যে, একটিও মনে পড়ে কিনা সন্দেহ। সুরেন্দ্রনাথের স্বল্পায়তন কাব্য-গুর প্রসঙ্গে দুইটি গুণের বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে—প্রথম, তাঁহার

বাক্য-যোজনার মৌলিক ভঙ্গী; দ্বিতীয়, তাঁহার ভাব-চিন্তার মৌলিকতা। তথাপি তাঁহার কবিশক্তির অসম্পূর্ণতার কথা স্মরণ করিলে স্বতঃই এই প্রশ্ন জাগে যে, ভাব ও ভাষার এমন শক্তি সত্ত্বেও তিনি হেম-নবীনের মত কাব্যরচনার প্রয়াস পাইলেন না কেন? তিনি যখন সে ধরণের কাব্য লেখেন নাই তখন বুঝিতে হইবে তাঁহার সে শক্তি ছিল না। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই প্রশ্নের একটু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন আছে। ব্যক্তিগত প্রতিভা ও যুগপ্রভাব এই দুয়ের সম্বন্ধ-বিচারে আমরা যে তত্ত্বে উপনীত হই, মনে হয় সুরেন্দ্রনাথের কবিকীর্ত্তির মধ্যে তাহারই একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। সুরেন্দ্রনাথের প্রতিভার এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা সেকালের পক্ষে একটু অসাধারণ; তাঁহার রচনাগুলির মধ্যে এমন কয়েকটি গুণ বর্ত্তমান যাহা সেকালের খ্যাতনামা কবিগণের রচনায় যুক্ত হইলে, তাঁহাদের কবিকীর্ত্তি কেবল সাময়িক প্রতিষ্ঠা লাভ না করিয়া পরবর্ত্তী কালের উন্নত রসপিপাসার উপযোগী হইতে পারিত—কল্পনার সহিত সংযম, ভাবের সহিত ভাবুকতা এবং বৃথা শব্দাড়ম্বরের পরিবর্ত্তে বাক্যরচনায় গূঢ়তর রসধ্বনি ও অর্থগৌরবের সমাবেশ হইত।

বাঙ্গালার কবিসমাজে উপেক্ষিত এই কবির সম্বন্ধে আর একটা কথাও মনে হয়। বাঙ্গালী হুজুগ-প্রিয়, অর্থাৎ বর্ত্তমানের সাফল্যকে সে যেমন বরণ করিয়া লইতে উৎসুক, চোখের সামনে প্রত্যক্ষভাবে যাহাকে বড় হইয়া উঠিতে দেখে তাহার প্রতি বাঙ্গালীর যেমন শ্রদ্ধা, তেমন আর কিছুর প্রতি নহে। কোনও কিছুর শ্রেষ্ঠত্ব-প্রমাণে একটা দেশকাল-নিরপেক্ষ আদর্শের সন্ধান ও তাহার প্রতিষ্ঠা যেন এই অতিশয় বর্ত্তমান-সর্ব্বস্ব, ব্যস্তবাগীশ জাতির প্রকৃতিবিরুদ্ধ। জানি না এই অর্থেই বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি কিনা। কবি সুরেন্দ্রনাথের জীবদ্দশায়, তাঁহারই দোষে তাঁহার রচনাগুলি সুপ্রকাশিত হয় নাই। প্রথমতঃ তিনি সে বিষয়ে অতিশয় নিস্পৃহ ছিলেন; তারপর, যাহা কিছু প্রকাশিত হইত তাহার অধিকাংশে কবির নাম থাকিত না; যাহাতে নাম থাকিত তাহারও অধিকাংশ অতিশয় ক্ষণজীবী পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় ও পরে সংগৃহীত না হওয়ায় নষ্ট হইয়াছে। এবং সর্ব্বশেষে, কবির শ্রেষ্ঠ রচনা মহিলা-কাব্য তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হইয়াছিল।

যাঁহারা দীর্ঘজীবী নহেন—এহেন সমাজে তাঁহাদের পরিচয় লুপ্ত হওয়া আশ্চর্য্য নহে। রসবোধ বা রসের উচ্চ আদর্শের কথা নয়, বাঙ্গালী শিক্ষিত ও অশিক্ষিত—সকলেই জনরবের, বহুল প্রচারের, হুজুগের এবং ব্যক্তিগত সামাজিক প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী। এই জন্যই আমাদের সাহিত্যে, বিশেষ করিয়া নব্যসাহিত্যের ইতিহাসে, অসাধারণ প্রতিভা অথবা সাময়িক নানা অনুকূল অবস্থার সুযোগ ব্যতিরেকে কেহ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই। এবং এই একই কারণে সাময়িক প্রতিষ্ঠা ভিন্ন আর কিছু বড় বেশী কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। একটি দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান হইতেই দিব। কবি সত্যেন্দ্রনাথের যশোভাগ্য ইতিমধ্যেই ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে—জীবিতকালে তাঁহার যে কারণে যে প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছিল,

বাঁচিয়া থাকিলে হয়ত তাহা এখনও অটুট থাকিত। অবশ্য যদি তিনি প্রতিমাসে একগুচ্ছ কবিতা (সাময়িক ঘটনা অবলম্বনে লিখিত হইলে আরও ভাল) প্রকাশ করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি বাঁচিয়া নাই,—ইহাই তাঁহার সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য।

(২)

মনে রাখিতে হইবে তখন হেম-নবীনের যুগ; মাইকেল কেবল মহাকবি নামটি মাত্র খেতাবস্বরূপ লাভ করিয়া বিদায় হইয়াছেন, কবি বিহারীলাল তখন কবিই নহেন। সেই কালে, কাব্যের সেই বিষয়-গৌরব ও ভাষায় বক্তৃতাত্মক ঘনঘটার যুগে, আমরা এমন একটি কবিতার সাক্ষাৎ লাভ করি—

হের দেখ জ্বলিয়াছে প্রদীপ সন্ধ্যার
দেবরূপ দৃশ্য ধরা 'পরে।
চারিদিকে ছায়া পড়ে কাঞ্চন-কায়া,
আলো-দ্বীপ আঁধার-সাগরে।
ললিত লীলায় কায়
হেলে দুলে বিনা বায়,
শিখার শরীর মাঝে নড়ে যেন প্রাণ,
দীপ নয়—যেন কোন দেব বিদ্যমান।

দূর হতে রূপ কিবা হয় দরশন,
চৌদিকে কিরণ পড়ে চিরে,
আঁধারের মাঝে তায় দেখায় কেমন—
জবা যেন যমুনার নীরে।
আঁধারের কালো কায়,
তায় অস্ত্রাঘাত প্রায়,
দীপ দেখি রক্তমাখা ক্ষত স্থান হেন;
কাল কেশে কামিনীর পদ্মরাগ যেন!

কি ফুল ফুটেছে আহা অন্ধকার-বনে—
নদীপারে প্রদীপ সন্ধ্যার।
প্রিয়মুখ-ধ্যান যেন প্রবাসীর মনে,
যেন শিশুসুত বিধবার;
হ'য়ে গেছে সর্ব্বনাশ
আছে মাত্র এক আশ—
যেন নর-হৃদয়ের দেখায় আভাস,
মেঘের মণ্ডলে যেন মঙ্গল প্রকাশ।

বদনের কাছে বাতি জননী-চুলায়,
খল খল হাসে শিশু তায় ;
আভায় আভায় মিশে শোভায় শোভায়—
হেরে মাতা স্নেহের নেশায়।
আগারে বালক-মেলা,
ছায়া-ধরাধরি খেলা,
হেরি প্রবীণেরা হাসে, গণে না আপন—
ছায়া ধরা খেলাতেই কাটালে জীবন।

১২৮৭ সালে, 'নলিনী' নামক পত্রিকায় এই কবিতাটি প্রকাশিত হয়, তারপর ইহাকে আর কোথাও পাওয়া যায় নাই। সুরেন্দ্রনাথের কবি-কল্পনার বৈশিষ্ট্য এই কবিতাটির মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া আছে। অতএব আমি এই কবিতাটি একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিব। প্রথমেই চোখ পড়ে ইহার গঠন-সৌষ্ঠব ; ইহাতে যে stanza form ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা সেই সময়েই বাংলা কবিতায় সর্ব্বপ্রথম আমদানি হয় বটে, কিন্তু আর কাহারও কবিতায় stanza-র এইরূপ সুসম্বদ্ধ ছন্দোরূপ দেখা যায় না। ইহাতে কবির কাব্যরীতি এবং কবি-মানসের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন শব্দগ্রন্থনে, তেমনই চরণবিন্যাস ও ছন্দ-সুষমায় কবি ক্লাসিক্যাল রীতির পক্ষপাতী। তাঁহার কবি-মানস ভাব-প্রধান বা sentimental নয়, ভাব-অর্থের সুসংযত প্রকাশ ও সুস্পষ্ট বাণীরূপের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় নিষ্ঠা আছে। ভাবের দিক দিয়া এই কবিতা কোন কোন বিষয়ে, সে যুগের অপেক্ষা পরবর্ত্তী যুগের গূঢ়তর কবি-দৃষ্টির লক্ষণাক্রান্ত। সুরেন্দ্রনাথ ও হেমচন্দ্রের কবিতা পাশাপাশি রাখিলেই উহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। হেমচন্দ্রের 'আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে', কিংবা 'ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা উটি লজ্জাবতী লতা'—কবিতা দুইটি অনেকেরই স্মরণ আছে। ওই দুই কবিতার ভাব-বস্তু একটা সুলভ উচ্ছ্বাস ভিন্ন আর কিছুই নয়। তাহাতে যে ভাবুকতা আছে, তাহা আমাদের দেশে যাঁহাদিগকে স্বভাব-কবি বলা হয় তাঁহাদেরই মত। রূপসৃষ্টি অপেক্ষা ভাবোচ্ছ্বাসই তাহার প্রধান প্রেরণা। সুরেন্দ্রনাথের কবিতা শুধু ভাবময় নয়, তাহা চিত্রময়। বর্ত্তমান কবিতাটিতে আমরা যে ধরণের চিত্রাঙ্কণ দেখিতে পাই, তাহা ইংরেজী রোমান্টিক কবিদের picturesque-প্রিয়তার অনুরূপ। বস্তুর বাস্তব আকারটার প্রতিই কবির দৃষ্টি দৃঢ়নিবদ্ধ ; সেই বাস্তব আকারের অবাস্তব-মনোহর ইঙ্গিত—তাহারই রূপ, রঙ, এবং রেখা আশ্রয় করিয়া, নানা উপমায় ধরা দিয়াছে। এই জাতীয় কবিদৃষ্টি অনুসন্ধান করিতে হইলে রবীন্দ্রনাথের যুগে আসিতে হয়, সে যুগে ইহা অনন্যসাধারণ। কবির এই রূপসন্ধানী দৃষ্টি যেমন তীক্ষ্ণ তাঁহার বাণীসৃষ্টিও তেমনই যথাযথ। ভাবের উপযুক্ত বাণীরূপের আবিষ্কার বস্তুগত রূপকে শব্দগত রূপে অনুবাদ করার যে শক্তি—যাহার মূলে আছে চোখের পিপাসা, এবং তদনুসঙ্গী রসকল্পনা—তাহাই এই কবিতাটির স্থানে স্থানে প্রকাশ পাইয়াছে, এবং তাহাতেই বাংলা

গীতিকাব্যে ভাবকল্পনা ও প্রকাশরীতির একটি সম্পূর্ণ নূতন ভঙ্গী দেখা যাইতেছে। বিষয়-গৌরব কিংবা সুপ্রসন্ন কল্পনাই কাব্যের উৎকর্ষের প্রমাণ নয়, বরং তাহা বিশেষভাবে বা একান্তভাবে প্রকাশ পায় কাব্যের বাণী-ভঙ্গিতে। সেকালের সুপ্রসিদ্ধ কবিগণের মধ্যে মধুসূদন ও বিহারীলাল ব্যতীত আর কাহারও কাব্যে এই বাণী-নিষ্ঠার পরিচয় নাই। অখ্যাত ও বিস্মৃতপ্রায় কবি সুরেন্দ্রনাথই আর একজন মাত্র, যাঁহার রচনায় কাব্যশিল্পের সেই প্রধান লক্ষণটি একটি বিশিষ্ট ভঙ্গিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে দেখা যায়। এই একটিমাত্র গুণের দ্বারাই আমরা কবিকে চিনিয়া লইতে পারি—প্রতিভার ছোট-বড় বিচার তার পরে। যে রূপ-পরায়ণ দৃষ্টির ফলে ভাষায় এই গুণ বর্ত্তে, তাহার প্রমাণ উপরি-উদ্ধৃত কবিতাটির মধ্যে আছে, যথা—

"ললিত লীলায় কায়
হেলে দুলে বিনা বায়,
শিখার শরীর মাঝে নড়ে যেন প্রাণ!"—

* *

"দুর হতে রূপ কিবা হয় দরশন,
চৌদিকে কিরণ পড়ে চিরে"—

* *

"বদনের কাছে বাতি জননী দুলায়
খল খল হাসে শিশু তায়—
আভায় আভায় মেশে শোভায় শোভায়,
হেরে মাতা স্নেহের নেশায়"—

এ ভাষা বক্তৃতার ভাষা নয়, শব্দঝঙ্কারের ঘনঘটাই এই কাব্যের অধিষ্ঠান-ভূমি নয়। ইহাতে আছে কবিদৃষ্টির বস্তুরূপ-নিষ্ঠা, এবং সেই রূপকে তদনুরূপ শব্দযোজনার দ্বারা পাঠকেরও চক্ষুগোচর করা। 'হেলে দুলে বিনা বায়' এবং 'চৌদিকে কিরণ পড়ে চিরে' —যেমন বস্তুরূপ-নিষ্ঠার পরিচয়, তেমনই 'আভায় আভায় মেশে শোভায় শোভায়' কবির সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য-দৃষ্টি, এবং 'হেরে মাতা স্নেহের নেশায়'—ঐ 'স্নেহের নেশায়' বাক্যটি —ভাব-প্রকাশক ভাষাসৃষ্টির নিদর্শন। বস্তুতঃ 'স্নেহের নেশায়' বাক্যটি যে-স্থানে যে-অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহাতে উহা একটি inevitable phrase হইয়া উঠিয়াছে। কত সহজ সরল, অথচ কত যথাযথ! কবিতাটির মধ্যে কয়েকটি উপমা আছে—উপমাগুলি ভাবের চিত্ররূপ, অথবা ভাবময় চিত্র। একটি দীপশিখা দেখিয়া কবিচিত্তে রসসঞ্চার হইয়াছে, তাহারই প্রেরণায় কবি নানারূপে সে সৌন্দর্য্য দেখিতেছেন। এই দেখারও যেমন মৌলিকতা আছে, তেমনই তাহার সঙ্গে সঙ্গে যে যে ভাবের উদয় হইয়াছে তাহাও বাস্তব রূপকে অতিক্রম করে নাই; তাহা কষ্টকল্পনার conceit নহে। বস্তুর অন্তরালে তাহারই যে ছায়া ভাবরূপে বিরাজ করে—যে রূপ, যে রং, যে রেখা চাক্ষুষ করিতেছি, তাহারই সহিত

যে আর এক সত্তা ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া আছে—কবি-কল্পনা তাহাকে আবিষ্কার করিয়া বস্তুজগৎ ও ভাবজগতের মধ্যে যে সেতু যোজনা করে, এই কবিতাটির কল্পনামূলে কবির সেই প্রেরণা কাজ করিয়াছে। অনেক কাব্যে উপমা কবিতার অলঙ্কার মাত্র, উহা মূল কল্পনাকে পল্লবিত করিয়া তোলে; কিন্তু এই কবিতায় উপমাই মুখ্য, তাহাই উহার রস, তাহাই রূপ। তথাপি উপমাগুলি একজাতীয় নহে—আলঙ্কারিক উপমাও আছে, কিছু conceit বা কৃত্রিমতার ছাপ দুই একটিতে আছে, যেমন—'জবা যেন যমুনার নীরে', কিন্তু—

আঁধারের কালো কায়,
তাহে অস্ত্রাঘাত প্রায়—
দীপ দেখি রক্তমাখা ক্ষতস্থান হেন।

—এখানে কল্পনার আতিশয্য আছে, কিন্তু কৃত্রিমতা নাই; বরং এই ধরণের উপমাই কাব্যের রোমান্টিক প্রবৃত্তির—অননুভূতপূর্ব্ব বিস্ময়-রসের, grotesque ও bizarre-এর নিদর্শন। ইহা সম্পূর্ণ modern। কল্পনার এই দুঃসাহস, অথচ অনিবার্য্যতা, সুরেন্দ্রনাথের কবি-ধর্ম্মের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। তাঁহারই কাব্যে এক একটি মৌলিক ভাব-চিন্তা একটিমাত্র উপমায় নিঃশেষ হইয়াছে—তড়িৎ-চমকের মত প্রকাশ পাইয়া মিলাইয়া গিয়াছে। এমন অনেক ভাব—এমনই মৌলিক কল্পনার চকিত আভাস—পরবর্ত্তী কালের কবিগণের কাব্যে এক একটি সম্পূর্ণ কবিতার আশ্রয় হইয়াছে।

কি ফুল ফুটেছে আহা অন্ধকার-বনে।

—ইহার মধ্যেও আলঙ্কারিকতার প্রয়াস আছে—তথাপি উপমাটি কাব্য-হিসাবে সার্থক হইয়াছে। বনের সহিত অন্ধকারের তুলনা, এবং সেই বনে প্রস্ফুটিত একটিমাত্র ফুলের সঙ্গে দীপকান্তির সাদৃশ্য-কল্পনা চাতুর্য্যের পরিচায়ক হইলেও, এক প্রকার সুন্দর-বোধের তৃপ্তিসাধন করে। উপমাটি আরও সুন্দর হইয়াছে ভাষার গুণে—সুরেন্দ্রনাথের ভাষার সংক্ষিপ্ত স্বল্পাক্ষর-ভঙ্গি সংস্কৃত কাব্যের উৎকৃষ্ট উপমা-সৌন্দর্য্যের অনুকূল। কেবলমাত্র 'অন্ধকার বনে' এই phraseটিই উপমার সবটুকু রস ধারণ করিয়া আছে। কিন্তু—

নদীপারে প্রদীপ সন্ধ্যার,
প্রিয়মুখ-ধ্যান যেন প্রবাসীর মনে—
যেন শিশুসুত বিধবার!

এই দুইটি পর-পর দ্রুত-অনুসারী উপমায় শুধু ভাবের অকৃত্রিম চমৎকারিত্ব নয়, বাস্তব অনুভূতির যে প্রাণময়তা প্রকাশ পাইয়াছে—'যেন শিশুসুত বিধবার' এই অতি সংক্ষিপ্ত বাক্যটির মধ্যে যে বস্তুনিষ্ঠ কল্পনার পরিচয় আছে—সে যুগের সেই সুলভ ভাবোচ্ছ্বাসময় কবিত্বের দিনে তাহা সচরাচর মিলিত না; অথবা মিলিলেও তাহা প্রকাশ-কৌশলের অভাবে

কাব্য-শ্রী লাভ করে নাই। বিপুল অন্ধকারের মধ্যে একটি মাত্র প্রদীপ মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছে, সে কেমন? 'যেন শিশুসুত বিধবার!'—কেবল বিধবার একমাত্র পুত্র নয়, 'শিশুসুত'! দুই তিনটি মাত্র শব্দেই সবটুকু অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে—তাহার অধিক আর একটিমাত্র শব্দ থাকিলেও যেন উপমাটি এমন অর্থপূর্ণ হইত না। এই উপমা দুইটির প্রথমটি ভাবপ্রধান, দ্বিতীয়টি বাস্তব অনুভূতি-প্রধান। এই দুইটিই পাশাপাশি বিদ্যমান। শেষেরটি খাঁটি ক্ল্যাসিক্যাল। যাহা প্রত্যক্ষ, সুপরিচিত ও লোকায়ত, যাহা ব্যক্তিগত কল্পনাবৃত্তির আশ্রয় নহে—যাহা চিরযুগের সাধারণ মানব-প্রকৃতি ও মানব-ভাগ্যের অভিজ্ঞতামূলক, তাহাকেই যদি Classical বলা যায়, তবে সুরেন্দ্রনাথের কাব্য-প্রকৃতি ক্ল্যাসিক্যাল, ইহাই তাহার প্রবলতর প্রবৃত্তি। উপরি-উক্ত উপমাটি তাহারই নিদর্শন। এখানে যে অভিজ্ঞতা কবিকল্পনার আশ্রয় হইয়াছে, তাহা মানুষমাত্রেরই সুপরিচিত, এজন্য এরূপ রসসংবেদনার কোনও বাধা নাই, হৃদয়তন্ত্রী সহজেই বাজিয়া উঠে। মেঘনাদবধের এই পংক্তিকয়টিও এই জাতীয় কাব্যের দৃষ্টান্তস্থল। মেঘনাদ হত হইলে, কৈলাসে ধূর্জ্জটি রাবণের অবস্থা স্মরণ করিয়া হৈমবতীকে বলিতেছেন—

> এই যে ত্রিশূল, সতি! হেরিছ এ করে
> ইহার আঘাত হ'তে গুরুতর বাজে
> পুত্রশোক! চিরস্থায়ী হায় সে বেদনা—
> সর্ব্বহর-কাল তারে না পারে হরিতে।

এখানে কবি যাহা বলিয়াছেন তাহা সর্ব্বজনহৃদয়বেদ্য। স্থান, কাল ও পাত্রের সংযোগে এই অতিসাধারণ ভাববস্তু অপূর্ব্ব রসকল্পনায় মণ্ডিত হইয়াছে; স্বয়ং মহাকালের দ্বারা তাঁহার করধৃত ত্রিশূলের আঘাতের সহিত উপমিত হইয়া, মানুষের সন্তানবিয়োগ-যাতনা যেমন ভীষণতা লাভ করিয়াছে, তেমনই তাহা ভাবগম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। মহাকাব্যের উপযুক্ত উপমাই বটে। এই Epic-সুর অবশ্য সুরেন্দ্রনাথের উপমায় নাই, থাকিতে পারে না; তথাপি কল্পনার যে ক্ল্যাসিক্যাল প্রবৃত্তির কথা বলিয়াছি, সুরেন্দ্রনাথের গীতিকবিতায় তাহাই প্রবল। কিন্তু বাস্তবানুভূতি ও তজ্জনিত ভাবুকতাই কিছু অতিরিক্ত হওয়ায় কল্পনা অপেক্ষা চিন্তার দিকেই কবি-মানসের পক্ষপাত দেখা যায়, এই জন্যই কবিতাটির শেষের কয় ছত্রে যে ভাবুকতার ভঙ্গি আছে, তাহা খাঁটি কাব্যরসের উপাদান নহে—ভাব অপেক্ষা ভাবনা, কল্পনা অপেক্ষা জল্পনা, এবং রাগ অপেক্ষা বৈরাগ্যের প্রাধান্যই তাহাতে বেশী; তথাপি 'ছায়া-ধরাধরি খেলা' এই একটি phrase লেখকের কবিশক্তির পরিচয় দিতেছে। অব্যর্থ শব্দ-যোজনার যে কবিশক্তি—যে শক্তির অভাব ঘটিলে কবি বাণীর প্রসাদলাভে বঞ্চিত আছেন বুঝিতে হইবে—সুরেন্দ্রনাথের রচনায় মৌলিক ভাবসম্পদের সঙ্গে সেই শক্তির পরিচয়ে মুগ্ধ হইতে হয়।

সেকালের বাংলা গীতিকাব্যে, কবিকল্পনার সঙ্গে বাহিরের বস্তুজগতের ঘনিষ্ঠতর সংস্পর্শে যে গূঢ়তর ভাব-চিন্তা, ও তদনুযায়ী নূতন ভাষানির্ম্মাণের স্বাভাবিক প্রেরণা আসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, সুরেন্দ্রনাথের কবিতায় তাহার সূচনা লক্ষ্য করা যায়। অতিশয় সুস্থ ও সবল চেতনা, তীক্ষ্ণ বস্তুগত দৃষ্টি, ঐকান্তিক সহানুভূতি, এবং অতিশয় সহজ রসাবেশ—এই সকলের সমবায়ে তাঁহার কবি-প্রকৃতি এমন একটি স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে, যাহাতে সহজেই তাহাকে পৃথক করিয়া লওয়া যায়। মনে হয়, বাঙ্গালী প্রতিভার যে আর একটি লক্ষণ আছে—কেবল ভাবোচ্ছ্বাসই নয়, প্রখর ভাবুকতা; কল্পনাবিলাস নয়, অতিজাগ্রত বুদ্ধিবৃত্তি—বাস্তবচেতনা-প্রসূত রসবোধ;—সুরেন্দ্রনাথের প্রতিভায় তাহারই এক অভিনব উন্মেষ ঘটিয়াছে। আমি যে কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়া কবি-পরিচয় আরম্ভ করিয়াছি তাহা সুরেন্দ্রনাথের কল্পনা-ভঙ্গি ও প্রকাশ-কৌশলের একটি সুন্দর নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইতে পারে, রসিক পাঠকমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন ইহাতে কোন্ ধরণের কবি-প্রেরণা আছে।

(৩)

সুরেন্দ্রনাথের জীবনকাহিনী যতটুকু পাইয়াছি—তাহা হইতে আমি তাঁহার সাহিত্যচর্চ্চার ইতিহাসটুকু সঙ্কলন করিব এবং তাহা হইতেই তাঁহার শিক্ষা ও মনঃপ্রকৃতির কিছু আভাস দিবার চেষ্টা করিব। সুরেন্দ্রনাথের কাব্য-সংস্কার বা কবি-প্রবৃত্তি বুঝিবার পক্ষে তাহার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

১২৪৪ সালের ফাল্গুন মাসে যশোহর জেলার জগন্নাথপুরে তাঁহার জন্ম হয়। জন্ম-পল্লীতেই তাঁহার শৈশব ও বাল্য অতিবাহিত হয়। অতি অল্প বয়সেই তিনি ফার্সী পড়িতে আরম্ভ করেন এবং সেই সঙ্গে মুগ্ধবোধসূত্র এবং হিতোপদেশ প্রভৃতি নীতিগ্রন্থ অভ্যাস করেন। অল্পবয়সে পিতৃহীন হওয়ায় তাঁহাকে প্রথম হইতে লোকচিত্তচর্চ্চা ও বুদ্ধির অনুশীলন করিতে হইয়াছিল।

একাদশ বর্ষে কলিকাতায় আসিয়া ইংরেজী শিক্ষার জন্য তিনি ফ্রি চর্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউশন, ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি, ও পরে হেয়ার স্কুলে কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। "বিদ্যালয়ের সীমাবদ্ধ শিক্ষালাভে তাঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইত না, গৃহে নিয়ত স্বাধীন চর্চ্চার দ্বারা গভীর জ্ঞান আত্মসাৎ করিতেন"। প্রথম হইতেই ভাবালুতা অপেক্ষা বিষয়-জ্ঞানের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার প্রমাণ পাওয়া যায়। পাঁচ বৎসর মাত্র তিনি বিদ্যালয়ের সাহায্য পাইয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন—"শুধু গ্রন্থ দেখিয়া লাভ কি? সংসার দর্শন কর, অন্যবিধ সংস্কার লাভ করিবে"।

১২৬৬ সালে তিনি প্রথম অপস্মার রোগাক্রান্ত হন—এ রোগ হইতে তিনি কখনও মুক্ত হন নাই। ঐ বৎসরেই, অর্থাৎ একুশ বৎসর বয়সেই তিনি প্রথম প্রকাশ্য সাহিত্যসেবা আরম্ভ করেন। 'মঙ্গল-উষা' নামক একখানি পত্রিকা প্রচার করিয়া, তাহাতে

কবি পোপের 'Temple of Fame' কবিতার পদ্যানুবাদ প্রকাশ করেন। এই সময়ে 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'র কোনও এক সংখ্যায় তাঁহার 'প্রতিভা'-বিষয়ক গদ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাহাতে লেখকের নাম নাই। ইহারই সমকালে 'বিশ্বরহস্য' নামে একটি প্রাকৃতিক ও লৌকিক রহস্য-বিষয়ক সন্দর্ভ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৯৩৪ সংবতে নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে উহা মুদ্রিত হয়। কিন্তু উহাতেও প্রণেতার নাম নাই।

বিষয়-বুদ্ধি বা লোকচরিত্র-চর্চ্চার আরও উন্মেষ হয় তাঁহার জীবিকাকর্ম্মে। বাল্যকাল হইতে সঙ্গীতে তাঁহার খুবই আসক্তি ছিল, এ জন্য যৌবনে সঙ্গীতচর্চ্চার আগ্রহে তিনি কিছুকাল এমন স্থানে যাতায়াত করিতেন যাহাকে সুরা ও বারাঙ্গনার রঙ্গভূমি বলা যাইতে পারে, এবং সঙ্গদোষ হইতে তিনি অব্যাহতি পান নাই। যে মৌলবী সাহেব এই সঙ্গীতচর্চ্চায় তাঁহার সতীর্থ ছিলেন, "তিনি দিল্লীর সম্রাট-মান্য সৈয়দবংশীয় অতি তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসম্পন্ন সুপণ্ডিত। আরব্য, পারস্য, উর্দ্দু প্রভৃতি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন, এবং ইংরেজীও কিছু কিছু জানা ছিল। দর্শন ও সঙ্গীতশাস্ত্রে প্রকৃষ্ট অধিকার ছিল, কিন্তু ঘোর নিরীশ্বরবাদী"। সুরেন্দ্রনাথের জীবনের এই সর্ব্বাপেক্ষা দুঃসময়ে (অথবা তাঁহার কবিপ্রতিভার সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল—জীবনের এই বিষমন্থন-কালে) তাঁহার বন্ধুকে লিখিত পত্রাবলী হইতে কবির কিছু উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতে সুরেন্দ্রনাথের কবি-স্বভাবের সুস্পষ্ট পরিচয় আছে—

> "স্বদেশহিতৈষিতা, ন্যায়পরায়ণতা, ও করুণা,—পরস্পরের অভাবেও অবস্থান করিতে দেখা যায়। কিন্তু পানানুরাগ, কামোন্মত্ততা, মিথ্যাকথন প্রভৃতি দোষগুলির পরস্পর কি প্রণয়। একের অবস্থানকালে একে একে প্রায় সকলগুলিই সমবেত হয়। **তুমি জ্ঞাত আছ, এক কাম ভিন্ন অন্য স্বভাবদোষ আমার ছিল না, কিন্তু সেই এক দোষের প্রভাবে ক্রমে সমুদয় দোষের আধার হইয়া এখন প্রকৃতি-প্রদত্ত স্বভাবকে নিহত করিয়াছি। বিধাতা যেরূপ মানুষ আমাকে করিয়াছিলেন, আমি আর সেরূপ নাই—আপনি আপনাকে পুনঃসৃষ্টি করিয়াছি।"
>
> "আমি দুর্ব্বল দরিদ্রকে ঘৃণা করি, সবল ধনীকে ভয় করি; যাহাদিগকে জ্ঞানী ও বিজ্ঞ বলে তাহাদিগকে অবিশ্বাস করি।"

সুরেন্দ্রনাথের জীবনে এই ঘূর্ণীপাক ঘটিয়াছিল ২৩।২৪ বৎসর বয়সে—সেই বয়সের সেই অবস্থায় তাঁহার এই সকল উক্তি পাঠ করিলে, তাঁহার চিত্তবৃত্তির প্রখরতা ও চিন্তাশীলতা প্রতিভাশালী ব্যক্তির উপযুক্ত বলিয়াই মনে হয়। দৈবশক্তির অধিকারী যে পুরুষ তাহার বয়সের মাপ সাধারণের মত নয়; এ চরিত্র কবির, এবং এইরূপ অভিজ্ঞতা কবির জীবনেই ঘটে—সে পুরুষ মাটি মাখিয়াই আরও শক্তিমান হইয়া উঠে।

এই সময়ে সুরেন্দ্রনাথের পত্নীবিয়োগ হইয়াছিল—পরে চব্বিশ বৎসর পূর্ণ হইবার কালে তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন এবং ইহারই পরে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার চরিত্রে কঠোর আত্মসংযম কখনও শিথিল হয় নাই। ইহারই ফলে তাঁহার কাব্যকল্পনায় সহজ রস-রসিকতার পরিবর্ত্তে অতি কঠিন তত্ত্ব-প্রীতি ও নৈতিক উৎসাহ প্রবল হইয়াছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। চব্বিশ বৎসর বয়সের মধ্যেই তাঁহার মনঃপ্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া

গেল—কবি-প্রাণ সুরেন্দ্রনাথ তত্ত্বান্বেষী হইয়া উঠিলেন; তাঁহার নিজের ভাষায়—"বিধাতা যেরূপ মানুষ আমাকে করিয়াছিলেন আমি আর সেরূপ নাই। আপনি আপনাকে পুনঃসৃষ্টি করিয়াছি"। এই সময়েরই একখানি পত্রে তাঁহার বন্ধুকে কবি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাতেও বুঝিতে পারি, প্রথম যৌবনেই, অর্থাৎ তাঁহার কবি-প্রতিভার পূর্ণ উন্মেষের মুখেই, তাঁহার সারাচিত্ত মর্ম্মান্তিক অনুশোচনায় বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। অতঃপর সাহিত্যসাধনার যে আদর্শ তিনি অবলম্বন করিলেন তাহাতে কবিত্বের স্ফূর্ত্তি অপেক্ষা তত্ত্বজিজ্ঞাসাই প্রবল হইয়া উঠিল; তাঁহার স্বভাবে যাহা ছিল তাহা মোচড় খাইয়া কঠিন হইয়া উঠিল। তাই সুরেন্দ্রনাথের কাব্যে কবি যেন সর্ব্বদা আত্মদমন করিয়া আছে; ভাব-কল্পনার অপূর্ব্ব চমক সত্ত্বেও তীক্ষ্ণ ধী-শক্তিকেই প্রকট হইতে দেখি। কিন্তু সে কথা পরে। তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তের * লেখক বলিতেছেন—"তাঁহার (সুরেন্দ্রনাথের) চিত্তক্ষেত্রে জ্ঞান ও প্রেম যেন মল্লযুদ্ধে মত্ত হইয়াছিল"।

ইহার পর কিছুকাল তিনি যাহা রচনা করিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশই অনুবাদ—মহাভারতের 'কিরাতার্জ্জুনীয়', পোপের 'ইলৈসা ও আবেলার্ড', গোল্ডস্মিথের 'ট্রাভেলার' ও মূরের 'আইরিশ মেলডিস্'-এর অধিকাংশ ছন্দে গ্রথিত হইয়াছিল।

১২৭৪ হইতে, দ্বিতীয়বার অপস্মার রোগের পর, সুরেন্দ্রনাথ যাহা রচনা করেন তাহার কয়েকটি এই—গ্রের 'এলিজীর' অনুবাদ, 'নবোন্নতি' (আখ্যায়িকা), 'মাদকমঙ্গল' (কবিতা), 'সবিতা-সুদর্শন', ও 'ফুলরা' নামে দুইটি গাথা, 'ব্রাভো অব ভিনিসে'র (Bravo of Venice) অনুবাদ। এ সকল ব্যতীত তিনি একটি অতি দুরূহ অনুবাদ-কার্য্য সুসম্পন্ন করেন—Plato-র *Immortality*-র অনুবাদ নিজকৃত ব্যাখ্যা ও অবতরণিকা সমেত। এই পুস্তকের সমগ্র পাণ্ডুলিপি পরে নষ্ট হইয়া যায়। বহু আয়াস সহকারে, দীর্ঘকাল গবেষণা ও তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া তিনি এই পুস্তক রচনা করেন। "ইহাতে সক্রেটিসের জীবনীও ছিল,এবং টিপ্পনীতে পৃথিবীর ভূত-বর্ত্তমান ধর্ম্মবিশ্বাস, নব্য-বৃদ্ধ দার্শনিক সত্য এবং প্রাচীন গ্রীক ও ভারতের আচারগত সাদৃশ্য প্রভৃতি সাবধানে আলোচিত হয়"। এই রচনা নষ্ট হওয়ায় সুরেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন—"আমার আজন্মের যত্নসঞ্চিত আর আর লেখা নষ্ট হইয়া যদি এই একটিমাত্র অবশিষ্ট থাকিত, এত দুঃখিত হইতাম না"। এবম্বিধ পরিশ্রমসাধ্য জ্ঞান-গবেষণা, এবং কাব্যরচনা অপেক্ষাও তৎপ্রতি কবির এই আসক্তি, সুরেন্দ্রনাথের কবিজীবন ও কবি-স্বভাবের বিপরীত পরিণতির প্রমাণ দিতেছে। অথচ এইকালেই তিনি কয়েকটি উৎকৃষ্ট কবিতাও রচনা করিয়াছিলেন। ১২৮৮ সালে 'নলিনী' পত্রিকায় 'সন্ধ্যার প্রদীপ', 'চিন্তা', 'খদ্যোতিকা' 'উষা' প্রভৃতি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। স্পষ্টই দেখিতে পাই, শক্তি থাকিতেও সুরেন্দ্রনাথ নিছক কবিকল্পনার নিকটে আত্মসমর্পণ করিতে আর রাজী নহেন।

---

* শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সরকার লিখিত সুরেন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনী। সুরেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী, বসুমতী সংস্করণ।

অতএব দেখা যাইতেছে, অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই সুরেন্দ্রনাথের কবি-মানস প্রৌঢ়ত্ব লাভ করিয়াছিল, ক্রমে তিনি জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে একটা পরমতত্ত্বের আশ্রয় গড়িয়া লইতে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহাতেও তাঁহার প্রকৃতিগত কবিধর্ম্মই জয়ী হইয়াছিল। তাঁহার জীবনী-লেখক বলিতেছেন—"জগৎ-কারণের অস্তিত্ব ও স্বরূপ পরিজ্ঞান-পক্ষে তিনি সহজাত সংস্কার-কেই অভ্রান্ত মনে করিতেন"। তাঁহার ধর্ম্মমত সম্বন্ধে উক্ত লেখক বলিয়াছেন—"কবি আদৌ শঙ্করভাষ্যযুক্ত বেদান্ত-সূত্র দেখিয়া অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী হইতে যান, কিন্তু তাঁহার হৃদয় তাহাতে আশ্বস্ত হইল না। তিনি শীঘ্র ঐ মতের অপূর্ণতা বুঝিয়া দেশীয় ধর্ম্মের দর্শন-শাস্ত্রসিদ্ধ ঈশ্বরোপাসনা অবলম্বন করেন। এই উদ্যমে দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্রের যথেষ্ট চর্চ্চা হইয়াছিল"।

১২৭৮ সালে, পুনরায় স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় কবি কিছুকাল মুঙ্গেরে বাস করেন। সেইখানেই তিনি তাঁহার 'মহিলা-কাব্য' রচনা করেন। ১২৮০ সালে তিনি কর্ণেল টড্-কৃত 'রাজস্থান' অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন। পাঁচ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতেও অনুবাদকের নাম গোপন ছিল। অতঃপর কোনও বন্ধু অভিনেতার অনুরোধে তিনি 'হামির' নাটক রচনা করেন। ইহাই তাঁহার শেষ সারস্বত কর্ম্ম বলিয়া মনে হয়; যদিও তিনি পূর্ব্বারব্ধ রাজস্থানের অনুবাদ মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে আবার আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের অনুবাদ অসমাপ্ত রাখিয়া ১২৮৫ সালের ৩রা বৈশাখ প্রাতে তিনি বিসূচিকা রোগে মাত্র ৪০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

ইহাই সুরেন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনেতিহাস, এবং মনে হয়, তাঁহার কবি-মানস ও সাহিত্য-সাধনার মূল মর্ম্ম বুঝিবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। সুরেন্দ্রনাথ কখনও হৃষ্টপুষ্ট সবল ছিলেন না, তাঁহার দুরারোগ্য অপস্মার-ব্যাধিও ছিল। এ সকল সত্ত্বেও তাঁহার জীবনে সাহিত্যসাধনার একাগ্রতা লক্ষ্য করিবার যোগ্য। তাঁহার জীবনীকার বলিয়াছেন—"তাঁহার আয়ুষ্কালের সহিত তাঁহার রচনার পরিমাণ করিলে তাঁহাকে অতিশ্রমী বলিতে হয়"। আমার মনে হয়, তাঁহার রচনার পরিমাণ অল্প না হইলেও অধ্যয়ন অনুশীলন আরও অধিক ছিল। রচনাও অল্প নহে, কারণ ইহাই প্রতীতি হয় যে, প্রকাশিত কাব্য, কবিতা ও নিবন্ধ ব্যতীত অপ্রকাশিত ও অসমাপ্ত রচনাও বিস্তর ছিল। এককালে যাহাও প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাও সমুদয় সংগৃহীত হয় নাই, বহু খণ্ডকবিতা লুপ্ত হইয়াছে, বহু গদ্যরচনাও আর পাওয়া যায় না। এই অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলেই সুরেন্দ্রনাথের দুর্ব্বল দেহ আরও দুর্ব্বল হইয়াছিল, তাঁহার অকাল মৃত্যুর কতকটা কারণ ইহাই।

সুরেন্দ্রনাথের সাহিত্যসাধনার আর একটি লক্ষণ আজিকার দিনে আরও অদ্ভুত বলিয়া মনে হইবে। সে লক্ষণ পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। তিনি যাহা রচনা করিতেন তাহা যেন প্রকাশ করিতে চাহিতেন না। ইহার জন্যই অনেক রচনা নষ্ট হইয়াছে। যাহা প্রকাশিত হইত তাহাতেও নাম দিতে চাহিতেন না। প্লেটোর *Immortality*-র সটীক অনুবাদ এই

জন্য কীটদষ্ট হইয়াছিল ; এই জন্যই 'মহিলা-কাব্য' তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়। "জনৈক আত্মীয় চুরি করিয়া তাঁহার 'সবিতা-সুদর্শন' ছাপাইয়া দেন। ইহাতে কবির নাম ছিল বলিয়া মুদ্রাঙ্কণে ভ্রম প্রদর্শন করিয়া তিনি তাবৎ পুস্তক আবদ্ধ করেন"। 'বর্ষবর্ত্তন' কাব্যখানি কোনও বন্ধু কর্ত্তৃক মুদ্রিত হয়, উহাতে লেখকের নাম ছিল না। সুরেন্দ্রনাথের এই আচরণের অন্য যে কারণই থাকুক—তিনি কবিযশের জন্য লালায়িত ছিলেন না, নিজ সন্তোষ ও বিশেষ করিয়া আত্মানুশীলনের জন্যই কাব্য রচনা করিতেন ইহাও সত্য।

সুরেন্দ্রনাথের গদ্যরচনা পড়ি নাই, তাহার যেটুকুর সংবাদমাত্র পাওয়া যায় তাহাতেই তাঁহার মনস্বিতা ও মৌলিক চিন্তার নিদর্শন আছে। 'প্রতিভা'-বিষয়ক প্রবন্ধের উল্লেখ পূর্ব্বে করিয়াছি—এ ধরণের রচনা অধ্যয়নলব্ধ জ্ঞান ও স্বকীয় ভাবগ্রাহিতার পরিচায়ক। 'শাসন প্রথা' অথব' 'ভারতে বৃটিশ শাসন' প্রভৃতি রচনার বিষয় হইতেই বুঝা যায় সুরেন্দ্রনাথের চিন্তা কেমন সর্ব্বতোমুখী ছিল। তাঁহার ধর্ম্মমত অথবা তাঁহার নিজস্ব দার্শনিক মতবাদ সেকালের পক্ষে যথেষ্ট আধুনিক ছিল। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর বলিয়া মনে হয় লোকব্যবহার সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা। বিজ্ঞান বা বাস্তব তথ্যের প্রতি তাঁহার নিরতিশয় শ্রদ্ধা ছিল—মনে হয়, এই বাস্তব-প্রীতি কবিস্বভাবকে অতিরিক্ত নীতি-নিষ্ঠার পক্ষপাতী করিয়াছিল। তিনি বহির্জগতে যে নিয়ম-শাসন প্রত্যক্ষ করিতেন, মানুষের স্বভাবেও তাহার অখণ্ড প্রভাব স্বীকার করিতেন। অদৃষ্ট বা দৈব-শাসনকেও তিনি নিয়ম-শৃঙ্খলার বহির্ভূত বলিয়া মনে করিতেন না। এই বিশ্বাস যেমন একদিকে তাঁহার কবিশক্তি ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল, তেমনই অপর দিকে ইহারই প্রেরণায় তিনি এক ধরণের দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন—তাঁহার কবিতায় সর্ব্বত্র অতি সরল সহজ ভাব-গভীর উক্তি, মানব-চরিত্র ও মানবভাগ্য সম্বন্ধে অতি উৎকৃষ্ট বচনরাশি, ছড়াইয়া আছে।

সুরেন্দ্রনাথ সেকালের ইংরেজীশিক্ষিত বাঙ্গালী—সহজাত শক্তির বলে তিনি এই শিক্ষাকে আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছিলেন। বিদেশী সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাস এবং সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ বৈজ্ঞানিক তথ্য তাঁহার ভাব-প্রবণ চিত্তে যে তরঙ্গ তুলিয়াছিল তাহা সমসাময়িক অন্য কবি-মনীষীর মানসেও ঘটিয়াছিল। তাহার ফলে সেকালের অনেকেই সাহিত্য-সৃষ্টিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন—কবিযশও লাভ করিয়াছিলেন। এই বিদেশী বিদ্যার প্রভাবে জ্ঞান-গবেষণার প্রবৃত্তি যেমন জাগিয়াছিল তেমনই কল্পনার প্রসারও ঘটিয়াছিল; ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী আবার স্বপ্ন দেখিতে সুরু করিয়াছিল, কল্পনায় নূতন জগৎ সৃষ্টি করিয়া স্ব-মহিমা আস্বাদন করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু সে যুগের পক্ষে জ্ঞান গবেষণার প্রবৃত্তিই আরও স্বাভাবিক; এত তথ্য ও তত্ত্ব যখন চারিদিক হইতে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল তখন বাস্তব সত্যের সঙ্গে বোঝাপড়ার আবশ্যকতা গুরুতর হইয়া উঠিবারই কথা। তাছাড়া, বাংলাসাহিত্যে যখন গদ্যসৃষ্টির যুগ—গদ্যচ্ছন্দের অভিনব ঝঙ্কার তখন বড়ই লোভনীয় হইয়া উঠিতেছিল। গীত-সর্ব্বস্ব ভাব-প্রবণ বাঙ্গালী তথ্য ও কল্পনা, গদ্য ও পদ্যের দোটানায় পড়িয়া তখন হাবুডুবু খাইতেছে; গদ্য

পদ্য হইয়া উঠা এবং পদ্য গদ্য হইয়া উঠা, অথবা সাহিত্যিক প্রতিভার উভচর-বৃত্তি তখন অনিবার্য্য। দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালী আজও খাঁটি গদ্য লিখিতে পারিল না—আমাদের সাহিত্যে "our indispensable Eighteenth Century" এখনও আসিল না। সুরেন্দ্রনাথের রচনায় সে যুগের সে প্রবৃত্তি অতিমাত্রায় পরিস্ফুট; ভাবুকতা ও ভাবালুতা এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে তিনি ক্রমশঃ ভাবুকতাকেই প্রশ্রয় দিয়াছিলেন। তাঁহার সহজাত কবিত্বশক্তি, যুগপ্রভাবের বশে কল্পনাকে তত্ত্বসন্ধানে নিযুক্ত করিয়াছে, তাহার ফলে আমরা বাংলাসাহিত্যে সুরেন্দ্রনাথের মারফতে ইংরেজী গদ্যের না হউক, কবিতার—Eighteenth Century—Gray, Pope, Goldsmith-এর কাব্য-রীতির সাক্ষাৎ পাই। সুরেন্দ্রনাথের কাব্যকল্পনাও যুক্তিপন্থী—তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্য প্রত্যক্ষ বাস্তবকে ভুলিতে চাহেন না—সেই বাস্তবের লক্ষ্যভেদ করিয়াই সত্যের সন্ধান পান, তাহাতেই তিনি মুগ্ধ ও চমৎকৃত—অন্য রসের আস্বাদনে তাঁহার প্রবৃত্তি নাই। এই তথ্য ও তত্ত্বের অরণ্যের মধ্যেই তিনি একটি সুসমঞ্জস সুশৃঙ্খল জগতের আভাস পাইয়াছিলেন—ইহাই তাঁহার কাব্য-জগৎ। তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান ও দার্শনিক আলোচনা তাঁহাকে এ বিষয়ে যতই সাহায্য করুক না কেন, তাঁহার একটি নিজস্ব স্বাধীন পন্থা ছিল—তাঁহার আত্ম-প্রত্যয়ের সহায় ছিল স্বতন্ত্র ভাবসাধনা; এই জন্যই তিনি তত্ত্ব বা নীতি-কথা বলিতে গিয়াও উৎকৃষ্ট কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। জ্ঞান-গবেষণাকে ভাব-কল্পনার উপরে স্থান দিলেও তিনি কবি-প্রতিভাকেই উৎকৃষ্ট জ্ঞানের মূলাধার বলিয়া জানিতেন। কাব্য-চর্চ্চাও এক শ্রেষ্ঠ জ্ঞানযোগ—ইহাও একপ্রকার অধ্যাত্ম-সাধনা, ইহা দ্বারা কেবল চিত্তশুদ্ধি নয়, জ্ঞানবৃদ্ধি হয়, ইহাও তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনিও ধ্যান করিতেন—চক্ষু মুদিয়া নয়—চক্ষু খুলিয়া; কাব্য সৃষ্টি-গ্রন্থের টীকা, উহাই বাস্তব জীবন-যাত্রার উৎকৃষ্ট পাথেয়, উহা চিত্তরঞ্জিনী কল্পনারই একাধিকার নহে—এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যগুলি লিখিয়াছেন।

(৪)

এবার আমি সুরেন্দ্রনাথের কাব্যগুলি হইতে কিছু কিছু উদ্ধার করিয়া তাঁহার কবি-কীর্ত্তির কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব। পূর্ব্বে আমি তাঁহার প্রতিভা ও কবি-মানসের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়াছি—এবার যতদূর সম্ভব কাব্য হইতেই কবি-পরিচয় সঙ্কলন করিব।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার নিজের কবি-প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আত্মচেতন ছিলেন। তাঁহার দুইটি উক্তি ইহার সাক্ষ্য দিবে। 'সবিতা-সুদর্শন' কাব্যের নায়ক তাহার অধ্যাপক গুরুকে বলিতেছে—

লভিলে জীবনে মুক্তি তব অধ্যাপনে
রাম-নাম না চাই মরণে।

* * *

বিধির বিনোদ বিশ্ব-রচনা কেমন
যদি প্রভু দেখাও আমায়।

—বিশ্ব-রচনার রহস্য যে জানিয়াছে—সেই 'জীবনের মুক্তি' লাভ করিয়াছে ; রামনামে মুক্তি চাই না। জীবন ও বাস্তব প্রত্যক্ষ জগতের প্রতি এই অতি-গভীর অনুরাগ ও শ্রদ্ধা—ইহাই আমাদের নব্যসাহিত্যের প্রধান প্রেরণা, এই মানস-মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই বাঙ্গালার দ্বিতীয় Renaissance-এর মূল প্রবৃত্তি। সুরেন্দ্রনাথ যেন একটু আতিশয্য সহকারে এই মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার চিত্তে সর্ব্বপ্রকার উদ্ভট কল্পনার বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ জাগিয়াছিল, তিনি কাব্যেও কোন কাল্পনিক তত্ত্বকে আমল দিবেন না। যে অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতা ও তরল Sentimentalism সে যুগের কবিগণকে মাতাল করিয়াছিল তাহাকেই যেন ব্যঙ্গ করিয়া সুরেন্দ্রনাথ আর একস্থানে বলিতেছেন—

হে কবিকল্পনা-মায়া, সত্যের সোণালী ছায়া,
কাব্য-ইন্দ্রজাল ভানুমতী,
সুখে তুমি যথা ইচ্ছা থাক ক্রীড়াবতী।
চড়িয়া পুষ্পক রথে
ভ্রম গিয়া ছায়াপথে,
কর ইন্দ্রচাপ বিরচন,
কিংবা কর পরীসনে চন্দ্রিকা ভোজন,
আমি না করিব দেবি! তব আবাহন।

বিধাতার এ সংসারে যারে না তুষিতে পারে—
যে কবির মহতী কামনা,
সে কবি করিবে দেবী তব উপাসনা।
তোমার মুকুর প'রে
হেরে সে হরষভরে
ছায়া তার কায়া নাই যার—
তত লোকাতীত নয় বাসনা আমার,
লক্ষ্য মম সামান্য এ সত্যের সংসার।

বাঙ্গালার উনবিংশ শতকের শেষভাগে ইংরেজী সাহিত্যের অষ্টাদশ শতাব্দী আসিয়া কবি-কল্পনার উদ্দাম গতি শাসন করিতেছে—এ রহস্য মন্দ নয়! বিশ্ব-রচনার রহস্যকে কল্পনায় ভেদ না করিয়া, জাগ্রত জ্ঞানবুদ্ধির সাহায্যে তাহার মধ্যে শৃঙ্খলা ও সুসামঞ্জস্য আবিষ্কার করিয়া দুর্জ্জেয় নিয়তিকে বুদ্ধিসঙ্গত ও ন্যায়নীতির অধীনরূপে কল্পনা করিবার এই প্রবৃত্তি—উৎকৃষ্ট কবিকল্পনার অনুকূল নয়। তথাপি সুরেন্দ্রনাথের ভাবুকতায় এমন একটা প্রবল স্বাধীনতা আছে—জীবন ও জগৎকে বাস্তবরূপে বরণ করিবার একটি সবল মুক্ত মানসিকতার আবেগ আছে যে, তাঁহার কাব্যে ইংরেজী অষ্টাদশ শতাব্দীর কৃত্রিম বিলাস-কলা-কুতূহল নাই; ভাবের মধ্যে যথেষ্ট প্রাণগত উৎকণ্ঠা ও দুঃসাহস আছে, এবং ভাষায় ও ছন্দে অতিরিক্ত ভব্যতা ও মসৃণতার পরিবর্ত্তে অকপট প্রকাশ-ব্যাকুলতা আছে।

এইবার কাব্যপাঠ আরম্ভ করিতেছি। 'সবিতা-সুদর্শন' নামক কাব্যের নায়ক সায়ংসন্ধ্যায় সূর্য্য-বন্দনা করিতেছে—

"জীবন-কিরণাকর ভুবন-প্রকাশ!
তুমি আদি সৃষ্টি অনাদির;
সে পূর্ণ রূপের তুমি প্রতিভা-আভাস,
স্ফুলিঙ্গ সে রুচির বহ্নির।

"দীধিতি-নিধান! দীপ্ত দেব দৃশ্যমান!
পালক জীবন-উরুতার,
বিশ্ব-আত্মা বৈশ্বানর বেদে করে গান,
সব শব বিহনে তোমার।

"অসীম আকাশ-ক্ষেত্রে বালক-ক্রীড়ায়
সদা তব মণ্ডল-ভ্রমণ,
রাশি হতে রাশি 'পরে ললিত লীলায়
পরশিত কাঞ্চন-চরণ।

"এলোচুলে হেলে দুলে মিলে করে করে
আগে আগে নাচে হোরাগণ,
একচক্র-রথ চলে, চলে তার পরে,
পরে পরে ঋতু ছয়জন।

"পারদ মাখায় কেবা শারদ-শরীরে—
কাশফুল কাননে দোলায়!
কুয়াশার যবনিকা-অন্তরালে ধীরে
হাসো বসি হেমন্ত উষায়।

"হেসে হৈমবতী উষা ডাকিছে তোমায়,
হেসে তুমি চলিতেছ তায়,
আসিছে পশ্চাতে তব আবরিয়া কায়
ছায়া-সতী সপত্নী ঈর্ষায়।"

পূর্ব্বে বলিয়াছি, সে যুগ নূতন গদ্যসৃষ্টির যুগ। সে যুগে কবিতার ভাষা যমক-অনুপ্রাস-শিঞ্জিত—পয়ারের ঘুঙুর-বোলে বিগলিত; ঈশ্বরগুপ্তের যুগ তখনও অবসান হয় নাই। তথ্য ও তত্ত্ব, চিন্তা ও ভাবুকতার যে জোয়ার তখন আসিয়াছে, তাহারই প্রকাশের প্রয়োজনে বাংলা ভাষার নব-সাহিত্যিক রূপ গড়িয়া উঠিতেছিল—সেই রূপ গদ্যের ভিতরেই বিকাশ লাভ করিতেছিল। এই রূপ—ভাষার নব-সংস্কৃত রূপ; ইহা সংস্কৃত শব্দ ও পদযোজনাপদ্ধতির দ্বারা সুসংবদ্ধ ও সুবলয়িত। এই নূতন ধ্বনি পুরানো পয়ারকে আশ্রয় করিয়া তাহার ঢঙ্

বদ্‌লাইয়া দিল। ত্রিপদী, দীর্ঘ ত্রিপদী ও চৌপদীর একঘেয়ে যতিবিন্যাস ও সে সকল যতির মুখে ঘন ঘন মিলরক্ষা, বাংলা কবিতাকে ভাব-গদগদ ও মেরুদণ্ডহীন করিয়া তুলিয়াছিল। পয়ার হইতেই মধুসূদন নূতন সঙ্গীত সৃষ্টি করিয়াছিলেন—এই ভাষার নব-সংস্কৃতির বলে। হেম ও নবীন এই গদ্যধ্বনিকে পদ্যের কাজে লাগাইয়াছিলেন, কিন্তু অমিত্রাক্ষর বা মিত্রাক্ষর কোন ছন্দেই সে ভাষাকে কাব্যের উপযুক্ত সুষমা দান করিতে পারিলেন না—ছন্দোময়ী ওজস্বিনী গদ্য-বক্তৃতাই তাঁহাদের কাব্যগুলিকে ভারাক্রান্ত করিয়াছে। হেমচন্দ্র ত্রিপদী, দীর্ঘ ত্রিপদী ও চৌপদীকে তাঁহার বহু কবিতার বাহন করিয়াছেন, অথচ সেগুলির ভাষা আদৌ সে ছন্দের উপযোগী নয়। বিহারীলাল নূতন গীতচ্ছন্দের প্রবর্ত্তক; তিনি পয়ারকেও গানের সুরে ঢালিয়া গড়িয়াছেন—তাঁহার ভাষা তরল ও সরল। সুরেন্দ্রনাথ এই নূতন ধ্বনিকে তাহার উপযোগী ছন্দ-রূপ দান করিবার অভিপ্রায়ে ইংরেজী কাব্য হইতে Stanza-র ছাঁচটিকে আয়ত্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। Stanza-ও গীতিচ্ছন্দ, তথাপি মাইকেল পয়ারকে যে কৌশলে মহাকাব্যের সুরে বাঁধিয়াছিলেন, সুরেন্দ্রনাথের Stanza-রচনায় পয়ারকে সেইরূপ কৌশলে অন্যরূপে আয়ত্ত করিবার প্রয়াস আছে। উপরি-উদ্ধৃত শ্লোকগুলিতে যে সুর বাজিয়াছে তাহাকে পয়ারের স্তোত্রছন্দ বলা যাইতে পারে। এই কবিতার ভাবসম্পদ ও ভাষা সর্ব্বত্র সমান নয়; তথাপি, ছন্দের উপযোগী গাঢ় বিন্যাসই যে ইহার অন্তর্গূঢ় শক্তি ও সুষমার কারণ তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। এই কবিতার প্রত্যেক চরণে ছন্দোগত যতি ভাবগত সংযমে মনোহর হইয়াছে; অতি সাধারণ ভাব-চিন্তাও ভাষা এবং ছন্দের নিয়ম-সংযমে রসধ্বনিময় হইয়া উঠিয়াছে। সুরেন্দ্রনাথের হাতে বাংলা ছন্দের এই Stanza-রূপ এবং তাহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার এই আদি আভাস লক্ষ্য করিয়াই আমি এই কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়াছি। মনে রাখিতে হইবে, কবির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি—ভাবের দেহ-নির্ম্মাণ, ভাবের উপযোগী ভাষা ও ছন্দসৃষ্টি। এ কথাও মনে রাখিতে হইবে, যেখানে ভাষা ও ছন্দের সঙ্গে ভাবের সঙ্গতি নাই, অর্থাৎ, হয় ভাব ভাষাকে ত্যাগ করিয়াছে অথবা ভাষা ও ছন্দ-কৌশল ভাবকে ছাড়াইয়া গিয়াছে সেখানে ভাষা ও ছন্দ কোনটাই 'সৃষ্টি' হয় নাই; তাহা কোনও জাতির কাব্যসাহিত্যকে এতটুকু সমৃদ্ধ করে না।

ইহার পর আমি কয়েকটি কাব্যখণ্ড পর পর উদ্ধৃত করিব। মহিলা-কাব্যের অবতরণিকায় কবি বলিতেছেন—

বর্ণিতে না চাই হ্রদ নদী সরোবর
সিন্ধু শৈল বন উপবন;
নির্ম্মল নির্ঝর, মরু বালুর সাগর,
শীত-গ্রীষ্ম-বসন্ত-বর্ত্তন।
হৃদয়ে জেগেছে তান,
পুলকে আকুল প্রাণ
গাবো গীত খুলি হৃদি-দ্বার—
মহীয়সী মহিমা মোহিনী মহিলার।

'হৃদয়ে জেগেছে তান'—তার প্রমাণ এই কয় ছত্রেই আছে; 'প্রাণ পুলকে আকুল' কিনা তাহা নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকগুলি প্রমাণ করিবে।—

সবিলাস বিগ্রহ মানস-সুষমার,
আনন্দের প্রতিমা আত্মার;
সাক্ষাৎ সাকার যেন ধ্যান কবিতার,
মুগ্ধমুখী মূরতি মায়ার;
যত কাম্য হৃদয়ের,
সংগ্রহ সে সকলের—
কি বুঝাব ভাব রমণীর,
মণি-মন্ত্র-মহৌষধি সংসার-ফণীর!

বিকচ পঙ্কজ-মুখে শ্রুতি-পরশিত
সলাজ লোচন ঢল ঢল,
চাচর চিকুর চারু চরণ-চুম্বিত,
কি সীমন্ত ধবল সরল!
কাতর হৃদয়ভরে,
স্বচ্ছমুক্তা-কলেবরে
ঢল ঢল লাবণ্যের জল।
পাটল কপোল কর-চরণের তল।

পূজিবার তরে ফুল ঝরে' পড়ে পায়,
হৃদি-ফল পরশে পাখীতে;
মুগ্ধমুখে কুরঙ্গিনী মুগ্ধমুখে চায়,
ধায় অলি অধরে বসিতে!
স্পর্শে পদরাগভরা
অশোক লভিল ধরা,
এলোকেশে কে এল রূপসী—
কোন্ বনফুল, কোন্ গগনের শশী।

শেষ দুই ছত্রের ছন্দ হিল্লোলে খাঁটি লিরিকের সুর ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবির কানে পয়ারের যে একটি বিশেষ সুর ধরা দিয়াছিল তাহার প্রমাণ এই কাব্যের মধ্যে যথেষ্ট আছে।

লতাপর্ণ-পল্লবে নিকুঞ্জ মনোহর
রচে নব বাসরের ঘর;
ফুল্লতল্পে কামিনীর ফুল্ল কলেবর,
ফুলশরে পুরুষ কাতর।

নর-পশু বনচারী,
গৃহস্থ করিল নারী ;
ধরা 'পরে করিল রোপণ
সমাজ-তরুর বীজ—দম্পতী-মিলন ।

* * *

কামিনী-কিরাত রূপ-জাল বিস্তারিয়া
ভক্ষ্যরূপে তনু সমর্পিয়া
ধরণী-অরণ্যে নর-বানর ধরিয়া,
বান্ধি তারে প্রেম-ডুরি দিয়া,
বাস-ভূষা দিয়া অঙ্গে
নাচাইয়া নানা রঙ্গে
নির্ব্বাহিছে সংসার-ব্যাপার ;
ছেড়ে দিলে ডুরি বন্য বানর আবার ।

এই দুইটি নিতান্ত গদ্যময় পদ্য-স্তবকে যে ভাব-চিন্তা রহিয়াছে তাহাকেই যেন পরবর্ত্তী কালের এক খ্যাতনামা কবি অপূর্ব্ব কাব্য-সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়াছেন—

নারি !
তুমি বিধাতার স্ফূর্ত্তি, কঠোরে কোমল মূর্ত্তি,
শুষ্ক জড়-জগতের নিত্য-নব ছলা,
উপচয়ে দশহস্তা, অপচয়ে ছিন্নমস্তা,
মায়াবদ্ধা মায়াময়ী সংসার-বিহ্বলা ।

* * *

আমি জগতের ত্রাস, বিশ্বগ্রাসী মহোচ্ছ্বাস,
মাথায় মত্ততা-স্রোত, নেত্রে কালানল,
শ্মশানে মশানে টান, গরলে অমৃত-জ্ঞান,
বিষকণ্ঠ শূলপাণি প্রলয়-পাগল ।
তুমি হেসে বসে বামে, সাজাইয়া ফুলদামে
কুৎসিতে শিখালে, শিবে হইতে সুন্দর,
তোমারি প্রণয়-স্নেহ বাঁধিল কৈলাস-গেহ,
পাগলে করিলে গৃহী, ভূতে মহেশ্বর ।

[অক্ষয় কুমার বড়াল ।]

তারপর—

সংসার পেষণী, নর অধঃশিলা তায়,
রেখে মাত্র আলম্বন যার,
নারী ঊর্দ্ধখণ্ড, কার্য্য করিছে লীলায়—
কীল-রন্ধ্রে মিলন দোঁহার !

ভাব-চক্ষে নিরখিয়া
দেখ হে ভবের ক্রিয়া,
বিপরীত বিহার অতুল!—
রমণী-রমণ-রসে পুরুষ বাতুল।

এই পংক্তিগুলি সুরেন্দ্রনাথের কবিমনের মনস্বিতা—তত্ত্ব-চিন্তার সহিত রূপক-কল্পনার অপূর্ব্ব মিশ্রণের নিদর্শন। বলা বাহুল্য, এ ধরণের ভাবদৃষ্টি ভারতীয় সংস্কৃতির ফল। তথাপি আধুনিক ফ্রয়েডীয় যৌনতত্ত্বের মূলকথা অতি সংক্ষেপে এখানে একটি মাত্র উপমায় কেমন সূচিত হইয়াছে! কবি অবশ্য সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্ব হইতে এই উপমাটির প্রেরণা পাইয়াছেন।

ইহারই ব্যাখ্যা করিয়া কবি বলিতেছেন—

সংসার তখন ছিল এখন যেমন—
ছিল নর জড়ের প্রকার,
আদি-নারী দিয়া তার সুখ-আস্বাদন
বিকশিল বোধ-কলি তার।
মুসা মিলে সাংখ্যসনে,
বুঝ বিচারিয়া মনে,
সুখবোধে দুঃখের সন্ধান—
বিপরীত বিনা কোথা বিপরীত-জ্ঞান!

'বিকশিল বোধ-কলি তার'—এই উক্তি ফ্রয়েডীয় যৌনতত্ত্বেরও পূর্ব্বে বাংলা সাহিত্যে দেখা দিয়াছে।

মহিলা-কাব্যের 'অবতরণিকা' অংশ হইতে আর দুইটি স্তবক উদ্ধৃত করিব—কল্পনার দৃপ্ত আবেগে এই পংক্তিগুলি কি অপূর্ব্ব!—

যদি মৃত্যু এনে থাকে মহিলা ধরায়
সে ক্ষতি সে করেছে পূরণ,
যম-যানে জরাজীর্ণে লোকান্তরে যায়—
নারী করে প্রসব নূতন।
কোন্ দুঃখ ধরা ধরে
নারী যারে নাহি হরে?
তাই পুনঃ মুসার লিখন—
নারী-বীজে হবে ফণী-ফণার দলন!

নারী-মুখ সংসারের সুষমার সার,
শ্রেষ্ঠ গতি নারীর গমন,
জ্যোতির প্রধান লোল আঁখি ললনার—
আত্মা-নট-নৃত্য-নিকেতন।
নারী-বাক্য গীত জানি,
নারী কাব্য অনুমানি
সকরুণ লীলা বিধাতার,
মর্ত্ত্যে মূর্ত্তিমতী মায়া অঙ্গ অঙ্গনার।

তারপর নারীদেহে যৌবনের রূপ—

ইন্দ্রজালী মোতি করে মাটি-গুটিকায়—
যৌবনে বর্দ্ধিত হেন কামিনীর কায়।
ছদ্মবেশী দেব-বরে
যেন নিজ রূপ ধরে,
ধূলিচারী তন্তুকীট বালিকা তখন—
কি বিচিত্র প্রজাপতি যুবতী এখন!

সেদিন না ছুঁইয়াছি যারে ঘৃণাভরে,
আজ তার স্পর্শ পেলে চাঁদ পাই করে।
কাল ছুটাছুটি, আজ গজেন্দ্র-গমন;
কাল না চেয়েছি যায়,
আজ সে না ফিরে চায়,
ধূলা-খেলা ছেড়ে আজ কেড়ে লয় মন—
আত্ম-অশ্বে করে কশা-কটাক্ষ-শাসন!

কোথায় উপমা দিব যুবতী-শোভার!
অতি চারু শশাঙ্ক শারদ পূর্ণিমার?
শারদ সরসী বটে পরম শোভার;
বিমল রসাল-কায়
মন্দ-আন্দোলিত বায়;
কিন্তু কোথা পাব তায় বিহার আত্মার—
মদালস সে লোল লোচন লালসার!

শেষের স্তবকটির সঙ্গে নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটির যে সাদৃশ্য আছে তাহা যেন কলি ও ফুলের সাদৃশ্য। দেবেন্দ্রনাথের কবিত্ব সুরেন্দ্রনাথের ভাবুকতার উপরে জয়ী হইয়াছে, কিন্তু ভাবের কি প্রতিধ্বনি!—

কেহ বলে পূর্ণশশী প্রিয়ার আনন;
সুরভি সুবাস কোথা হিমাংশু-হিয়ায়?

কেহ বলে প্রিয়ামুখ বিদ্যুৎবরণ—
সুকুমার জ্যোৎস্না কোথা বিদ্যুৎ-বিভায় !
কেহ বলে প্রিয়া-মুখ ফুল্ল কমলিনী—
ব্রীড়ার বিক্ষেপ হায় কমলে কোথায় ?
কেহ বলে উষাসম উজ্জ্বল-বরণী—
আলাপী চাহনি কোথা গোলাপী উষায় ?
সাদাসিদে লোক আমি, উপমার ঘটা
নাহি জানি, নাহি জানি বর্ণনার ছটা ;
যদি কিছু থাকে মোর কবিত্ব-বড়াই—
অবাক ও মুখ হেরে, সব ভুলে যাই।
এই দুটি কথা আমি বুঝিয়াছি সার—
"চুম্বন-আস্পদ" মুখ প্রিয়ার আমার।

[দেবেন্দ্রনাথ সেন]।

এই তুলনা হইতে সুরেন্দ্রনাথের পর দেবেন্দ্রনাথ—বাংলার গীতি-কবিতার বিবর্ত্তন বুঝিতে পারা যাইবে। সে পর্য্যন্ত বাংলা কবিতায় খাঁটি বাঙ্গালীয়ানা আছে; তখনও সহজ ভাবুকতা, এবং ভাবুকতা হইতে রসের উদ্ভব—বাঙ্গালীর হৃদয় ও মনঃপ্রকৃতি—বাংলা কাব্যে প্রবল ; তখনও আধুনিক লিরিকের subjectivity ও আত্মমানস-বিশ্লেষণ দেখা দেয় নাই।

সুরেন্দ্রনাথের ভাবুকতা ও সুগভীর মনস্বিতার নিদর্শনস্বরূপ কয়েকটি স্থান উদ্ধৃত করিব—এই ভাবুকতাই তাঁহার কবিপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য, একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

স্মৃতি-স্বপ্নময় শৈশবের কথা স্মরণ করিয়া কবি বলিতেছেন—

যেন বা প্রবাস-বাসে
দূর হতে ভেসে আসে
দেশ-প্রিয় গীতখণ্ড সন্ধ্যা-সমীরণে।
বৃদ্ধকালে অন্বেষিয়া
পূর্ব্বস্মৃতি মিলাইয়া
স্বধাম-সন্ধান বা কিশোর-সন্ন্যাসীর ;
জাতিস্মর-হৃদে হেন
প্রথম প্রকাশ যেন
বিয়োগ-বিষণ্ণ মুখ পূর্ব্ব-প্রেয়সীর।

সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব সম্বন্ধে কবির উক্তি এইরূপ—

কোথা রূপ বসে কেবা না জানে সংসারে,
কারে রূপ বলি কেবা কহিবারে পারে ?

তারপর, 'রূপ'কে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

তপনে কিরণ তুমি, কিরণে প্রকাশ,
হৃদয়ের প্রেম তুমি, বদনের হাস ;
জড়ে অবয়ব তুমি, বিজ্ঞান আত্মার ;
তুমি শীত-গুণ জলে,
তুমি গন্ধ ফুলদলে,
মধুর মাধুরী স্বরে সঙ্গীতে সঞ্চার,
কাঞ্চনের কান্তি তুমি বল অবলার।

*   *   *

হিয়া হিয়া বিয়া করে, তুমি দূতী তার।

নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলি কবি পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন-

তোমা ছেড়ে পরলোকে যেতে যদি হয়,
তবু জেনো কভু আমি তোমা-ছাড়া নয়।

*   *   *

প্রভাতে হাসিব আমি বসিয়া তপনে
হেরে তব রক্তমুখ নব জাগরণে।
দ্বার-রন্ধ্রে রবিকর নয়ন আমার ;
অলস-কলুষভরে
বসিবে শয্যার পরে,
চিরদৃষ্ট সে সুষমা হেরিব তোমার—
বেশ ভূষা দলিত, গলিত বেণীভার।

প্রদীপ জ্বালিয়া তুমি সমীর-শঙ্কায়
আনিবে অঞ্চলে ঢাকি যখন সন্ধ্যায়,
হেরে উচ্চ রক্তশিখা প্রকম্পিত তার—
জেনো আমি রাগভরে,
বসিয়া সে শিখা পরে
চঞ্চল হয়েছি মুখ চুম্বিতে তোমার ;
নিবিলে জানিবে খেলা কৌতুক আমার।

—রবীন্দ্রনাথের 'শিশু'-কাব্যের 'লুকোচুরি' কবিতাটির সঙ্গে এই কয়টি পংক্তি পড়া যাইতে পারে। কবির অপর একটি উক্তি যেমন অদ্ভুত তেমনই গভীর বলিয়া মনে হইবে।—

আত্মার স্বাধীন গতি প্রেম নাম তার—
সে প্রেম ধরায় মাত্র প্রেয়সী তোমার।

জননীর শুদ্ধ প্রেম স্বভাব-বেদন—
কলেবরে ব্যথা যথা
স্বতঃ কয় যায় তথা,
তারে না বলিতে পারি ইচ্ছার মনন,
নেত্র পীড়াভরে যথা সহজ রোদন।

—পড়িয়া Schopenhauer-এর একটি উক্তি মনে পড়ে—যদিও কবি মাতৃস্নেহকে ততটা হেয় বলেন নাই। Schopenhauer তাঁহার বিখ্যাত ***Essay on Woman***-এর এক স্থানে বলিতেছেন—

"The first of a mother as that of animals and men, is purely instinctive, and consequently ceases when the child is no longer physically helpless. After that, the first love should be reinstated by a love based on habit and reason, but this often does not appear, specially where the mother has not loved the father."

(মূলের ইংরেজী অনুবাদ)

সুরেন্দ্রনাথের উক্তিও এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত করিতে পারে।

আমি অতঃপর এইরূপ ভাব-সাদৃশ্যের কয়েকটি বিশেষ দৃষ্টান্ত দিব—দেশী ও বিদেশী দূরবর্ত্তী ও পরবর্ত্তী কয়েকজন কবির কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দিব। সে সকল হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে, এই সাদৃশ্য কবি-মানসের ; এবং সুরেন্দ্রনাথের ভাবদৃষ্টির মৌলিকতা ও ভাবসম্পদের প্রাচুর্য্য বিস্ময়জনক বলিয়া মনে হইবে।

প্রথমেই আমি Swinburne হইতে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিব—

Before the beginning of years
There came to the making of man
Time, with a gift of tears;
Grief, with a glass that ran;

Strength without hands to smite;
Love that endures for a breath:
Night, the shadow of light,
And life, the shadow of death.

He weaves, and is clothed with derision;
Sows, and he shall not reap;
His life is a watch or a vision
Between a sleep and a sleep.

নর-ভাগ্য সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথও বলিতেছেন—

এ হেন অভাগ্যবান্
ধরণী কি আছে জীব কোথাও তোমার?
জন্ম যার দীনতায়,
বুভুক্ষায় নগ্নকায়,
গ্রাস-বাস শ্রমসাধ্য, শক্তিহীন তায়।
আশায় অসুর যেন—
কার্য্যকালে কীট-হেন,
অতি দূরে দৃষ্টি যায়, অতি ক্ষুদ্র কর;
আয়ু বর্ষা ঘনতম,
আশা ক্ষণপ্রভাসম!—
ইন্দ্রধনু-চিত্রলেখা সম্পদনিকর,
অশ্রুবৃষ্টি-কারণ ভঙ্গুর কলেবর!

উভয় কবিতার ভাব এক—স্থানে স্থানে কথাও প্রায় এক, যাহা কিছু পার্থক্য তাহা কাব্যকলার—ভাষার সঙ্গীত ও ভাবের রস-মূর্চ্ছনার। তথাপি সুইন্‌বার্ণের অনুসরণ বলিয়া মনে হয় না—হওয়ার সম্ভাবনাও কম। সুরেন্দ্রনাথের নিজস্ব ভাবসম্পদ এত প্রচুর—বাস্তব জীবনের বিশ্লেষণ ও পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির পরিচয় তাঁহার কাব্যে এত অধিক পাওয়া যায় যে, এরূপ সাদৃশ্য আশ্চর্য্যজনক হইলেও অসম্ভব নহে। ভাবুকতার আর একটি নিদর্শন এখানে উদ্ধৃত করিব। এক স্থানে স্বপ্ন সম্বন্ধে কবি এইরূপ উক্তি করিতেছেন—

স্বপন! অলীক-খ্যাতি অলীক তোমার,
আছে তব পৃথক সংসার,
নাহি জানি সেই হবে ছায়া কি ইহার,
অথবা এ ছায়া বুঝি তার।

দেখিয়াছি স্বপ্ন থেকে জরায়ু-শয়নে,
দেখিতেছি সংসার-স্বপন,
দেখাবে স্বপন পুনঃ যামিনী-মরণে—
কবে তবে লভিব চেতন?
অজ্ঞান-আঁধার রাত্রে শরীর-শয্যায়—
থেকে জায়া-মায়া-আলিঙ্গনে,
বিবেক-নয়ন মুদে মোহের নিদ্রায়
ভব-স্বপ্নে আছি অচেতনে!

স্বপ্ন সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি খুব মৌলিক নহে—হিন্দুর সংসার-বৈরাগ্য এইরূপ কল্পনারই অনুকূল। তথাপি এই পংক্তি কয়টির প্রকাশ-ভঙ্গিমায় কবিজনোচিত বিশেষত্ব আছে। সে বিশেষত্বের প্রমাণ—অপর এক বিখ্যাত বিদেশীয় কবি প্রায় এমনই ভাব তাঁহার নাটকের নায়ক-মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন। Calderon-এর নাটক '*Life is a Dream*' হইতে সেই কয় পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি—

For in this world of stress and strife
The dream, the only dream is life;
And he who lives, it's proved too well,
Dreams till he wakes at Fate's loud knell.
—A dream that is broken at a breath,
And wakens to the dream of death?

What then is life? A frenzied fit,
A trance that mocks man's puny wit,
A mist, where flickering phantoms gleam,
Where nothing is, but all things seems,
—All but the shadow of a dream.

এইরূপ সাদৃশ্য বোধ হয় স্বাভাবিক। ইহাতে প্রমাণ হয়, সকল দেশের সকল ভাবুকের মনে যে ভাবনা বিশ্বজনীন মানবতার সঙ্গে জড়িত, তাহার ভঙ্গি একই রূপ হওয়া বরং স্বাভাবিক। তথাপি স্পেনীয় কবি ও ভারতীয় কবির মনোধর্ম্মে হয়ত কোথাও মিল আছে; হিন্দুর ত কথাই নাই, স্পেনীয় কবির ভাবনায় প্রাচ্য ভাব-বীজ অঙ্কুরিত হওয়া অসম্ভব নহে। সেকালে সুরেন্দ্রনাথের পক্ষে Calderon-এর নাটক—ইংরেজী অনুবাদেও—পাঠ করা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না; এমন সন্দেহ করিবার কারণও নাই।

(৫)

সুরেন্দ্রনাথের কাব্যে ভাবচিন্তার প্রাচুর্য্যের কথা উল্লেখ করিয়াছি। এই সকল ভাব যে বহুস্থলেই মৌলিক ইহাও মনে হইতে পারে। আমি এ পর্য্যন্ত তাঁহার কাব্য হইতে উদ্ধৃত পংক্তির সহিত ভাবসাদৃশ্য দেখাইবার জন্য ভিন্ন কবির রচনাও উদ্ধৃত করিয়াছি। বলা বাহুল্য, এই ভাবসাদৃশ্য যে সকল স্থানেই সাদৃশ্য মাত্র, অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী কবির অনুসরণ বা অনুকরণ নহে, তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। সুরেন্দ্রনাথের জীবনে কাব্যসাধনা অপেক্ষা জ্ঞানানুশীলনের আগ্রহ অধিক ছিল বলিয়াই বুঝা যায়। তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনী হইতে স্পষ্টই জানা যায় যে তিনি অতিরিক্ত অধ্যয়নশীল ছিলেন। এ জন্য তাঁহার রচনায় দেশী ও বিদেশী কবি-মনীষীর বহু উৎকৃষ্ট ভাব ও চিন্তা বিন্যস্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান লেখকের পক্ষে সর্ব্বত্র তাহার সন্ধান দেওয়া সহজ নহে। ভাবসাদৃশ্য দেখাইবার কালে যাহা সুরেন্দ্র-

নাথের মৌলিক সম্পদ বলিয়া মনে হইয়াছে পরে হয়ত দেখা যাইবে তাহা অপর কোনও কবির উক্তি। তথাপি স্থলবিশেষে এইরূপ সন্দেহের কারণ অল্প বলিয়াই আমি সেগুলিকে সুরেন্দ্রনাথের ভাবসম্পদের মৌলিকতার নিদর্শন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। বিদেশী কাব্য হইতে সুন্দর ভাববস্তু আহরণ করিয়া নূতন আকারে ও ভঙ্গীতে বাংলা কাব্যরচনা করিবার বাসনা অগৌরবের নয়। সে যুগের সকল কবিই কথায় ও কার্য্যে তাহার পরিচয় দিয়াছেন। মাইকেল, রঙ্গলাল, হেম, নবীন সকলেই প্রসিদ্ধ ইংরেজ কবিগণের অনুসরণ করিয়া নবশিক্ষিত সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে চাহিয়াছিলেন। ইহাই যেন ছিল নব্য বঙ্গসাহিত্যের আভিজাত্যের প্রমাণ। সুরেন্দ্রনাথের কাব্যেও ইহার যথেষ্ট নিদর্শন আছে। আমি কয়েকটি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব। কিন্তু তৎপূর্ব্বে সুরেন্দ্রনাথের কাব্যে এই ভাবসাদৃশ্য ও মৌলিকতার প্রমাণ-প্রসঙ্গে বর্ত্তমান লেখকের একটি বিড়ম্বনার কাহিনী পাঠকের পক্ষে কৌতুককর হইবে। ইতিপূর্ব্বে অন্যত্র (বঙ্গশ্রী, ১৩৪১) এই আলোচনারই ব্যপদেশে আমি সুরেন্দ্রনাথের কয়েকটি কাব্যপংক্তি উদ্ধৃত করিয়া মিসেস্ ব্রাউনিঙের কবিতার সহিত তাহার আশ্চর্য্য ভাবসাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলাম—এবং যেহেতু সুরেন্দ্রনাথের পক্ষে মিসেস্ ব্রাউনিঙের মত তদানীন্তন অতি-আধুনিক কবির অনুকরণ প্রায় অসম্ভব, অতএব উভয়ের কবিতায় সেই একই ভাবের সন্নিবেশ অতিশয় চমকপ্রদ মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু কয়েকদিন পরেই আমার স্মরণ হইল এই ভাবটি অন্যত্র কোথায়ও পাইয়াছি। অনুসন্ধানে জানিলাম একজন প্রসিদ্ধ সুফী কবির অতি প্রসিদ্ধ কবিতার ইংরেজী তর্জ্জমায় উহা পড়িয়াছিলাম। সুরেন্দ্রনাথের পংক্তি কয়টি এই—

> নবচ্ছিদ্র বাঁশরীর স্বরের আলাপ
> শুনে মর্ম্ম কে বুঝিবে তার,
> নয় সে সঙ্গীত, শুধু শোকের বিলাপ—
> যেতে চায় বংশে আপনার।

এই ভাব-বস্তুই মিসেস্ ব্রাউনিঙের 'A Musical Instrument' নামক কবিতাটিতে অতি সুন্দর ও অভিনব রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথের শেষের পংক্তি ও ইংরেজী কবিতার এই কয়ছত্র একেবারে এক—

> The true gods sigh for the cost and pain—
> For the reed that grows never more again
> As a reed with the reeds in the river.

এইবার জালালুদ্দিন রুমীর 'বাঁশী' কবিতাটির ইংরেজী অনুবাদ হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিলেই বুঝা যাইবে, পূর্ব্বকবিতাদ্বয়ের ভাবকল্পনার মূল উৎস কোথায়।—

> Oh hear the flute's sad tale again,
> Of separation I complain:

Since it was my fate to be
Thus cut off from my parent tree,
Sweet moan I've made with pensive sigh—

সুরেন্দ্রনাথ কেবল এইটুকুরই সংক্ষিপ্তসার গ্রহণ করিয়াছেন। মিসেস্ ব্রাউনিঙ্ এই ভাবটিকে আপনার কল্পনায় রূপান্তরিত করিয়া কাজে লাগাইয়াছেন। কিন্তু উপরি-উদ্ধৃত ইংরেজী অনুবাদ ও তার সঙ্গে আরও দুইটি ছত্র—

Man's life is like a hollow rod
One end is in the lips of God—

পড়িলে ফার্সী কবির নিকট তাঁহার ঋণ অল্প বলিয়া মনে হইবে না। সুরেন্দ্রনাথের কাব্যে এইরূপ অনুকরণ বা অনুসরণের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিব।

হে প্রেম! অদ্বৈত-জ্ঞান-নলিনী-তপন!

কাঞ্চন-শৃঙ্খল তুমি—
বিপুল এ বিশ্বভূমি
একপ্রান্তে আছে বাঁধা প্রলম্বিত যার,
অপরান্ত কীলে পদপ্রান্তে বিধাতার।

ইহার শেষের কয়ছত্রের উপমাটি স্পষ্টই Tennyson-এর অনুকরণে, যথা-

For so the whole round earth is every way
Bound by gold chains about the feet of God.

আর একটি, যথা-

হে শোভিতা শ্যামলা সফলা বসুমতী!
বিদরে হৃদয় ভাবি তোমার দুর্গতি।
বনস্পতি ওষধি মধুর ফুল-ফল,
মধুময়ী স্রোতস্বতী,
মধুর ঋতুর গতি,—
যত কিছু ধর তুমি মধুর সকল;
অমঙ্গল-মূল মাত্র মানব কেবল!

ইহাতেও Wordsworth-এর কবিতার সুস্পষ্ট ছায়া রহিয়াছে—

Through primrose tufts in that sweet bower,
The periwinkle trailed its wreath;
And 'tis my faith that every flower
Enjoys the air it breathes.

From Heaven if this belief be sent,
If such be Nature's holy plan,
Have I not reason to lament
What man has made of man?

ইহাকে শুধু ছায়া নয়, সজ্ঞান অনুসরণ বলা যাইতে পারে। অথবা—

প্রেমের বিলাপ যথা সঙ্গীত-শ্রবণ—
শুনি যত হৃদে তত কামনা-বন্ধন ;

ইহারও মূলে যে Shakespeare-এর—

If music be the food of love, play on—

তাহা মনে হইতে পারে, যদিও কল্পনার পার্থক্য আছে। সেইরূপ নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলি—

শ্রী, কান্তি, সৌন্দর্য্য—তুমি ধর যেবা নাম—
কি তুমি কি প্রকৃতি তোমার ?
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধে তব ধাম,
—আকর্ষণী উন্নত আত্মার।

Tennyson-এর এই রচনাটির অনুবাদ বলিয়া সন্দেহ হয়—

To look on noble forms
Makes noble through the sensuous organism
That which is higher.

এইরূপ আর একটি স্থান উদ্ধৃত করিব, যথা—

পূর্ব্বে নর-নেত্র যাহা, এবে ফুল্ল ফুল তাহা,
এই যে শ্রীফল লম্বমান—
হ'তে পারে তরুণীর স্তন-উপাদান।

ইহাও ওমর খৈয়ামের মূল অথবা ইংরেজী অনুবাদের ছায়া হওয়াই সম্ভব। তথাপি, উপরি-উদ্ধৃত উদাহরণের সবগুলিকে নিঃসংশয়ে অনুকরণ বলা যায় না। এইরূপ আর একটি মাত্র স্থল উদ্ধৃত করিব ; মহিলা-কাব্যে জায়াকে সম্বোধন করিয়া কবি বলিতেছেন—

সে জ্ঞান কি এই যাহা লভেছি তোমায়—
মুসা-উক্তি মানব পতিত হ'ল যা'য় ?
এই কি প্রলোভ-ফল আদিম-জায়ার ?
সত্য বটে আস্বাদনে
নব মতি ওঠে মনে,
এ জনমে ভুলিবনা সে বিকার আর—
ক্ষতি নাই যায় স্বর্গ বিনিময়ে তার।

বায়রণের এই কয়টি পংক্তি ইহার মূলে আছে কিনা তাহা নির্ণয় করিবার ভার পাঠকের উপরেই দিলাম—

But sweeter still than this, than these, than all,
Is first and passionate love—it stands alone,
Like Adam's recollection of his fall;
The tree of knowledge has been plucked—all's known,
And life yields nothing further to recall
Worthy of this ambrosial sin,—

বিদেশী কাব্যের প্রসঙ্গ এই পর্য্যন্ত। এইবার আমি পরবর্ত্তী বাংলাকাব্য হইতে কয়েকটি ভাবসাদৃশ্যের উদাহরণ দিব—কেহ যে জ্ঞাতসারে অনুসরণ বা অনুকরণ করিয়াছেন, এমন কথা অবশ্যই বলি না, কিন্তু এই ভাবসাদৃশ্য হইতে সুরেন্দ্রনাথের ভাবুকতার প্রসার ও অগ্রগামিতার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। ইতিপূর্ব্বে আমি এইরূপ দু' একটি স্থল অন্য প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিয়াছি, এক্ষণে আরও কয়েকটি উদ্ধৃত করিয়া সুরেন্দ্রনাথের প্রতিভার পরিচয় দিব।

সুরেন্দ্রনাথ—

বেশ ভূষা অলঙ্কার
গন্ধ মাল্য উপহার—
ইথে কি নারীর শোভা বাড়ায় তেমন,
যথা ধৃত অঙ্কোপর
কোমলর-কলেবর
শিশু, ফুল্ল-কপোল স-কজ্জল নয়ন?

দেবেন্দ্রনাথ সেন—

খোঁপায় গোলাপ চাঁপা দিলাম বসায়ে,
গলে পড়াইয়া দিনু মালতীর মালা,
সিঁথিটি অশোক-পুষ্পে দিলাম সাজায়ে,
দু' করে পরায়ে দিনু অতসীর বালা;
উরস-কলসযুগে নাগেশ্বর-হার
হেসে হেসে সযতনে দিলাম জড়ায়ে,

দুইটি কদম্ব দিয়ে কর্ণে দিনু দুল,
তারপর ধীরে ধীরে থোকা-পুষ্প দিয়া
সুন্দরীর চারু অঙ্গ দিনু সাজাইয়া
লোচন-ভ্রমরযুগে করিয়া আকুল!
আমার এ রূপতৃষ্ণা হইয়া মালিনী
মালঞ্চের মধ্যভাগে বসিল, ভামিনী!

আরও আশ্চর্য্য ও অধিকতর সাদৃশ্য নিম্নোদ্ধৃত স্তবক দুইটি পড়িলেই বুঝা যাইবে—এ যেন রবীন্দ্রনাথের 'স্বর্গ হইতে বিদায়' শীর্ষক কবিতাটির সার-সঙ্কলন!

চাই না সে স্বর্গ, যথা না পাই তোমায়!
ভুলে কি আমার মন অমর-বালায়?
কোথায় পাইব প্রেম—করুণ এমন!
নাই দুখলেশ যথা,
করুণা না বসে তথা—
বেদনা বিহনে কোথা প্রেম-আস্বাদন?
অপ্রেমের ভোগ সে ব্যঞ্জন অলবণ!

হে মাতঃ ধরণি! যদি হৃদয়ে তোমার—
সুখে দুখে কিশোরীর আহার আমার,
পরলোক পারসায় নাহি চায় প্রাণ,
তব ভাল মন্দ যাহা,
আমার অভ্যাস তাহা;
পরলোক?—পরলোক সংশয়-বিধান,
বিশেষ তোমায় মম প্রিয়া বিদ্যমান।

রবীন্দ্রনাথের—

থাক স্বর্গ হাস্যমুখে, কর সুধাপান
দেবগণ! স্বর্গ তোমাদেরি সুখস্থান,
মোরা পরবাসী। মর্ত্ত্যভূমি স্বর্গ নহে,
সে যে মাতৃভূমি—তাই তার চক্ষে বহে
অশ্রুজল ধারা…
স্বর্গে তব বহুক অমৃত,
মর্ত্ত্যে থাক্ সুখে দুঃখে অনন্ত মিশ্রিত
প্রেমধারা…
ধরাতলে দীনতম ঘরে
যদি জন্মে প্রেয়সী আমার, নদীতীরে
কোন এক গ্রামপ্রান্তে প্রচ্ছন্ন কুটীরে
অশ্বত্থচ্ছায়ায়, সে বালিকা বক্ষে তার
রাখিবে সঞ্চয় করি সুধার ভাণ্ডার
আমারি লাগিয়া সযতনে,…

রবীন্দ্রনাথের মূল কল্পনাটি যেন সুরেন্দ্রনাথের কবি-মানসেও বিদ্যমান, নাই কেবল তার পুষ্পিত রূপটি। রবীন্দ্রনাথের কল্পনামূলে যদি কাহারও সাক্ষাৎ প্রভাব থাকে তবে অবশ্য তাহা সুরেন্দ্রনাথের নহে; কারণ, রবীন্দ্রনাথের কবি-চিত্তে যাহার প্রভাব বিশেষ করিয়া পড়িয়াছিল, সুরেন্দ্রনাথের সমসাময়িক সেই অপর শ্রেষ্ঠতর কবি বিহারীলাল এই ভাবের ভাবুক ছিলেন—মর্ত্ত্যের প্রেমকে, বিশেষ করিয়া করুণার অশ্রুজলধারাকে, তিনিই স্বর্গের অমৃত অপেক্ষা অধিক মর্য্যাদা দিয়াছিলেন। কল্পনায় স্বর্গভ্রমণ করিয়া তিনি বলিতেছেন—

অমরের অপরূপ স্বপ্নসুখ নাহি চাই
* *
কেবল পরমানন্দ
কি যেন বিষম ধন্দ,
বিকল্প-বিহীন দশা না জানি কেমন?
* *

অনন্ত সুখের কথা
শুনে প্রাণে পাই ব্যথা,
অন্-অনন্ত নরকেও ততটা যন্ত্রণা নাই।

সেখানকার পথে এক মর্ত্ত্যবাসিনীকে দেখিয়া কবির উক্তি এইরূপ—

স্বর্গেতে অমৃত-সিন্ধু,
পাই নাই এক বিন্দু,
সাধ্বী পতিব্রতা সতী।
সুখেতে না কয় গতি ;
তব অশ্রুকণাটুকু—অমৃত-অধিক ধন—
পেয়ে এ অদ্ভুত লোকে জুড়াল তৃষিত মন।

এই ভাবের কবিতাপ্রসঙ্গে একটা কথা বলিব। বাংলাসাহিত্যের আধুনিক, এবং বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রীয় যুগে, যে মন্ত্রে কবি-কল্পনার পুনরুজ্জীবন হইয়াছে তাহা এই মর্ত্ত্য-প্রীতি। ইহজীবন ও মানবের মানবীয় মহিমার প্রতি এই শ্রদ্ধা—পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রভাবে আমাদের চিত্তে যে পরিমাণে জাগিয়াছিল, তাহাতেই সাহিত্যে আমাদের নব-জন্ম হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি সে আমার নয়'—এই উক্তি এযুগের বাঙ্গালীর প্রবুদ্ধ আত্মার বাণী। ইহারই অজ্ঞান এবং পরে সজ্ঞান প্রেরণায়, মাইকেল হইতে রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ হইতে আধুনিক কবি পর্য্যন্ত, বঙ্গ-সরস্বতীকে নব নব সৃষ্টি-সম্পদে ভূষিত করিয়াছেন। যাঁহার প্রাণে এই প্রেরণা জাগে নাই, যিনি এই জীবন ও জগৎকে পরম বিস্ময়ের চক্ষে দেখিতে পারেন নাই, যিনি ইহলোকের মধ্যেই লোকাতীতকে উপলব্ধি করেন নাই, তাঁহার কাব্যপ্রেরণা নিষ্ফল হইয়াছে। বাঙ্গালীর ভাবসাধনায়—নরদেবতার পূজায়—এই যে মর্ত্ত্যমাধুরীর আরতি আদি-কবি হইতে রবীন্দ্রনাথের গান অবধি অপূর্ব্ব রসমূর্চ্ছনার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাই বাঙ্গালী-জাতির প্রাণ-মনের গূঢ় প্রবৃত্তি। 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই,'—কোন্ আদি কবি-সাধক সর্ব্বপ্রথমে মানব-বেদের এই ঋক্-মন্ত্রটির দ্রষ্টা হইয়াছিলেন, ইহার পশ্চাতে কতকালের গুরুপরম্পরাগত সাধনার ইতিহাস রহিয়াছে তাহা আজ নির্ণয় করা দুরূহ, কিন্তু বাঙ্গালীর সাহিত্যগত, এবং বোধ হয় ধর্ম্মগত, সংস্কৃতির মূলে এই বাণী যে ভাবে পরিস্ফুট হইয়া আছে তাহা তাহার জাতীয় বৈশিষ্ট্য বলিয়াই মনে হয়। ইহাই বাঙ্গালীর প্রতিভা। জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রাণের এই প্রবৃত্তিই তাহার শক্তি ও অশক্তির কারণ হইয়া আছে ও থাকিবে। আমাদের নব্যসাহিত্য যে অল্পকালের মধ্যে এমন একটা সুপরিণত আকার লাভ করিয়াছে, তাহার কারণ, য়ুরোপীয় সাহিত্যের প্রভাব সেই সুপ্ত মনোবীজকে অঙ্কুরিত করিবার মত আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল ; মাটি ও বীজ উভয়েই এ-দেশী, রস ও সার যোগাইয়াছে বিদেশী মালাকর।

সুরেন্দ্রনাথের কাব্য-পরিচয় দীর্ঘ হইয়া পড়িল। ভাবসাদৃশ্যের উদাহরণ আর একটি

আর উদ্ধৃত করিয়া এ বিষয়ের আলোচনা শেষ করিব। জায়াকে সম্বোধন করিয়া কবি বলিতেছেন—

এ সংসারে আশাভঙ্গ, অরির পীড়ন,
খলের খলতা, নাহি ভোগে কোন জন?—
সব দুখ ভুলি দেখে বদন তোমার।
বাঁচে মরে মম তরে
আছে হেন ধরা' পরে—
এ হ'তে কি আছে আর ক্ষোভ-প্রতিকার?
আছে যদি—নির্ভরিতে হৃদয় আমার।

ইহার পর রবীন্দ্রনাথের—

কোথা হতে দুই চক্ষে ভরে নিয়ে এলে জল
হে প্রিয় আমার?
হে ব্যথিত, হে অশান্ত, বল আজি গাব গান
কোন সান্ত্বনার?
* * *
কোথা বক্ষে বিঁধি কাঁটা ফিরিলে আপন নীড়ে
হে আমার পাখী!
ওরে ক্লিষ্ট, ওরে ক্লান্ত, কোথা তোর বাজে ব্যথা
কোথা তোরে রাখি?
* * *
রুদ্ধকণ্ঠ গীত-হারা। কহিওনা কোন কথা,
কিছু শুধাব না।
নীরবে লইব প্রাণে তোমার হৃদয় হ'তে
নীরব বেদনা।

অথবা—

নিশি দুপহরে পঁহুছিনু ঘর
দু'হাত রিক্ত করি',
তুমি আছ একা সজল নয়নে
দাঁড়ায়ে দুয়ার ধরি'।
চোখে ঘুম নাই, কথা নাই মুখে,
ভীত পাখীসম এলে মোর বুকে—
আছে আছে, বিধি, এখনো অনেক
রয়েছে বাকী,
আমারও ভাগ্যে ঘটেনি ঘটেনি
সকলই ফাঁকি।

—পড়িয়া কেবল ইহাই মনে হয়, সুরেন্দ্রনাথে যাহা নিছক ভাব বা ভাবনারূপে দেখা দিয়াছে সুসম্পূর্ণ কাব্য-প্রেরণার মুখে তাহাই এখানে রস-কল্পনায় মণ্ডিত হইয়া অনবদ্য কবিতার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

এই কথাটিই সুরেন্দ্রনাথের কাব্য পাঠকালে বার বার মনে হইয়াছে। পরবর্তী যুগের কবিগণের কাব্যপ্রেরণায় যে সকল ভাব রসোচ্ছল গীতিকবিতার বিষয়ীভূত হইয়াছে, তাহার যে কত সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট আভাস সুরেন্দ্রনাথের কবি-চিত্তে প্রতিফলিত হইয়াছিল, তাহা লক্ষ্য করিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। হেম-নবীনের ভাবনা ইহা হইতে স্বতন্ত্র,—আধুনিক বাংলা কাব্যের অন্তর্নিহিত ভাবধারার ক্রমানুবদ্ধ অনুসরণ করিলে, সে পথে হেম-নবীনকে পাওয়া যাইবে না; কিন্তু মাইকেল ও বিহারীলালের মত, সুরেন্দ্রনাথকেও পাওয়া যাইবে। জ্ঞান-গবেষণার অত্যধিক উৎসাহে যুগোচিত প্রতিভার অপর প্রতিনিধি এই কবি বিশুদ্ধ কাব্য-সাধনা হইতে যে কতটা দূরে প্রস্থান করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ভাবসম্পদ ও রচনারীতির তুলনা করিলে, সহজেই চোখে পড়ে। ভাবুকতা ও রসিকতার অসামান্য পরিচয় সত্ত্বেও তিনি যুক্তি ও চিন্তা, নীতি ও উপদেশকে তাঁহার রচনায় মুখ্য স্থান দিয়াছিলেন। তাঁহার রচনা হইতেই তাঁহার কবিমানসের এই দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব অনুমিত হয়—যুগপ্রভাব ও সেই সঙ্গে তাঁহার নিজ জীবনের গুরুতর অবস্থাবিপর্যয় ইহার জন্য কতকটা দায়ী বটে। তথাপি শব্দ-যোজনার নিপুণ ও মৌলিক ভঙ্গী, নবতর শব্দঝঙ্কার ও উপমা-প্রয়োগের অসাধারণত্ব লক্ষ্য করিলে সুরেন্দ্রনাথের কবি-শক্তি—অর্থাৎ ভাবুকতার সঙ্গে ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা, বা বাণী-প্রতিভা, স্বীকার করিতে হয়। আমি তাঁহার ভাবুকতার নিদর্শনই অধিক উদ্ধৃত করিয়াছি; তাঁহার কাব্যের বহু স্থানে প্রকাশ-ভঙ্গীর যে অতর্কিত চমক আছে, তাহা উদ্ধৃত অংশগুলির মধ্যেও কাব্যরসিক পাঠকের চোখে পড়িবে। এইরূপ একটি মাত্র স্থল আমি দৃষ্টান্তস্বরূপ এইখানেই পুনরুদ্ধৃত করিব।

> অর্দ্ধ রাত্রে নিদ্রাভঙ্গে জলদ-গর্জ্জন,
> জেগে শুনি অবিরাম বর্ষণ-নিঃস্বন,
> দামিনীর দ্যুতি করে গবাক্ষ রঞ্জন—

ইহার শেষ পংক্তিটিতে বর্ণনার যে বর্ণ-যোজনা আছে তাহা উৎকৃষ্ট কবি-শক্তির নিদর্শন—'দামিনীর দ্যুতি করে গবাক্ষ রঞ্জন'—বিশেষ ঐ 'রঞ্জন' শব্দটি বর্ণনা-শক্তির পরাকাষ্ঠা হইয়াছে। বর্ষারাত্রির মধ্যযামে মেঘের ডাকে ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, অনবরত বৃষ্টির শব্দ ও মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ-চমক—ইহার মধ্যে বর্ণনার অসাধারণত্ব কিছুই নাই; কিন্তু বিদ্যুতের আলোকে জানালার গায়ে যেন রঙের প্রলেপ লাগিতেছে—বর্ণনার এই ভঙ্গী বিদ্যুৎ-চমকের মতই চমকপ্রদ, যেন অক্ষরগুলার মধ্যেই বিদ্যুৎকে ধরিয়া দিয়াছে। অথচ ভাষার কি সংক্ষিপ্ত ও অতর্কিত ভঙ্গী!—যেন আপনি আসিয়া পড়িয়াছে, কবির কোন খেয়ালই নাই।

সুরেন্দ্রনাথের ভাষার অতিশয় স্বল্পাক্ষর-ভঙ্গী অনেক সময়ে তাঁহার রচনাকে দুর্ব্বোধ এবং ছন্দপ্রবাহকে পীড়িত করিলেও, ইহা তাঁহার ভাষার বৈশিষ্ট্য সম্পাদন করিয়াছে—এ কথা

পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই স্বল্পাক্ষরতা এবং তাহারই মধ্যে যমক ও অনুপ্রাসের সন্নিবেশ, অনেক স্থলে তাঁহার বাগ্‌বিন্যাসকে—ইংরেজীতে যাহাকে বলে epigrammatic—সেই অলঙ্কার-শোভায় শোভিত করিয়াছে। যথা,—'সমজাতি শিলা হীরা পুরুষ অঙ্গনা,' 'না পিয়ে না বুঝি সুরা, পিয়ে জ্ঞান যায়', 'রসনা না, ললনা নয়নে কথা কয়,' 'নরকে না ডরে, ডরে নরের কথায়'। কিন্তু অতিরিক্ত সমাস-প্রিয়তাই তাঁহার রচনারীতির দোষও গুণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একদিকে ইহা দ্বারা যেমন বাক্যের মিতাক্ষর-গাঢ়তা ঘটিয়াছে, তেমনই এই রীতির অত্যধিক অনুশীলনে ছন্দপীড়া ও দুর্ব্বোধ্যতা-দোষ জন্মিয়াছে। তথাপি, ইহারই গুণে সুরেন্দ্রনাথের রচনায় একটি ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনার আদর্শ সমসাময়িক সাহিত্য-সমাজের পক্ষে কিছু উন্নত ছিল—নিজের উন্নত আদর্শ সম্বন্ধে তাঁহার একটা অভিমান ছিল। সম্ভবতঃ তিনি যাহা রচনা করিতেন তাহাও তাঁহার আদর্শ-অনুযায়ী উৎকৃষ্ট মনে করিতেন না বলিয়া সেগুলি প্রকাশ করিতে এত অনিচ্ছুক ছিলেন। তাঁহার ভাষা ও রচনারীতি তাঁহার ভাব-চিন্তার মতই ভ্রূক্ষেপহীন; হেম-নবীনের মত তিনি সাধারণ পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া পরের ও নিজের আত্মপ্রসাদ সম্পাদন করিয়া সুলভ খ্যাতিলাভের প্রয়াসী ছিলেন না। লেখকোচিত আত্মমর্য্যাদা-বোধ তাঁহার কিছু বেশি মাত্রায় ছিল। এই জন্যই ভাষায় যথেষ্ট অধিকার সত্ত্বেও খুব সাধারণ-বোধ্য বাক্যরীতি অবলম্বন করেন নাই। ইহা তাঁহার রচনার দোষ হইলেও, অক্ষমতাই ইহার কারণ বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার রচনারীতির কয়েকটি নির্দ্দোষ অথচ স্বকীয় ভঙ্গিমাযুক্ত নিদর্শন উদ্ধৃত করিলে আমার বক্তব্য আরও স্পষ্ট হইবে।

ফুটেছে অতুল ফুল উদ্যান-ধরায়—
নরত্ব বিখ্যাত নাম তার;
বৃন্তদল, কলেবর—পুরুষের তায়,
নারী—বর্ণ, মধু, গন্ধ যার!
আছে কাঁটা অগণিত,

শুধু এই শোক তার তরে—
কাল-অলি-মধুপান-অবসানে ঝরে!

* * *

সংসারে যেদিকে চাই, করি বিলোকন
বিপরীত দুই ভাব মেলা—
বাহ্যে দোঁহে অরি, মনে মধুর মিলন,
কোমলে কঠিনে কিবা খেলা!
একে পোষে, অন্যে পোষে,
একে রোষে, অন্যে তোষে,

একে দ্বয়, অঙ্গে অভিকৃতী—
হরগৌরী-রূপ বিশ্ব পুরুষ-প্রকৃতি।

* * *

ত্রাসে, ক্রোধে শোকে সুখে
আগে নাম ঊর্দ্ধ্বে মুখে—
কিবা একাক্ষরী মন্ত্র—মানব-তারণ।
যার শব্দে যমচরে
নিকটে আসিতে ডরে—
এ-ভব-অশুভ-ঘন-দক্ষিণ-পবন।
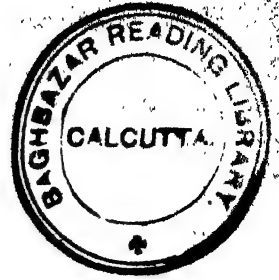
প্রদীপ লইয়া করে, সমীর-শঙ্কায়
এলো বালা সুমন্দ গমনে,
দীপ্ত মুখ দীর্ঘ রক্ত প্রদীপ-শিখায়—
চুম্বিত চঞ্চল সমীরণে।

[এই চৌপদী Stanza-টিতে যুক্তাক্ষর-বিন্যাসের দ্বারা যে rhythm বা ছন্দ-স্পন্দের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা অনবদ্য—অতি আধুনিক কালের কোনও কবিতার পক্ষেও এরূপ ছন্দ-সৌষ্ঠব প্রশংসনীয়।]

আশা কি করেছ প্রেম রাখিবে গোপনে,
কহিবেনা অতি-মিত্রজনে?—
পরিচয় নীরবে জানাবে প্রতিজনে
সরস সজীব দুনয়নে!
হাস্যাননে আঁখি করে নিরশ্রু রোদন,
কপট অশ্রুতে ওষে হাসে—
বিশেষতঃ বাতুলের প্রেমিকের মন
সদাই চোখের 'পরে ভাসে।

* * *

আপনি করেন ধাতা যে হৃদে আঘাত
বেদনা কি হরে, নরে বুলাইলে হাত?

উপরি-উদ্ধৃত উদাহরণগুলিতে আমি সুরেন্দ্রনাথের রচনাভঙ্গী লক্ষ্য করিতে বলি; শব্দ-গ্রন্থনের ও প্রয়োগের যে রীতি তাঁহার নিজস্ব, তাহাই প্রদর্শন করা আমার অভিপ্রায়। শব্দ-সংক্ষেপের জন্য কবির যে একটি বিশেষ যত্ন দেখা যায়, তাহারই ফলে ভাষায় অতিরিক্ত সংস্কৃত-প্রভাব ঘটিয়াছে—বাক্যগুলিকে গাঢ়-বদ্ধ করিবার জন্য এত সমাসের ছড়াছড়ি। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষাতেও সন্ধি-সমাসের প্রতি এত পক্ষপাত এই কারণেই। ঈশ্বরগুপ্তের যুগের কবিওয়ালার—টপ্পা ও পাঁচালীর—ভাষা এমনই করিয়া রূপান্তরিত হইয়াছিল—ইংরেজী-

শিক্ষিত বাঙালী এমনি ভাবে নব্য সাহিত্যের প্রতিষ্ঠায় সংস্কৃতের বারস্থ হইয়াছিল। ভাষার এই আদর্শ এখনও আছে—বাংলা সাহিত্যে ক্লাসিক্যাল রীতি কখনও লুপ্ত হইবে বলিয়া মনে হয় না—ভাব-গাম্ভীর্য্য, অর্থগৌরব এবং পুরুষোচিত প্রজ্ঞা যেখানেই কবি-মানসের সাধন-বস্তু হইবে, সেখানেই ভাষার এই রীতি সুমার্জ্জিত ও সুষমাযুক্ত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাই পরবর্ত্তী যুগের একজন শক্তিশালী কবির কাব্যে সুরেন্দ্রনাথের রচনারীতির এই আদর্শই পূর্ণতর ঝঙ্কারে প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখি—

জীবনের এ সঙ্গীত পবিত্র সুন্দর—
প্রকৃতির অসংবৃত বক্ষঃ নীলাম্বর।
সুমেরু-চুচুক-পাশে
সুকুমারী ঊষা হাসে;
বিসর্পী হোমাগ্নি-ধূমে মরুৎ কাতর।
তুষার, নীবার দলি'
ঋষিকন্যা যায় চলি',
চরে সরস্বতী-তটে কপিলা নধর।
আহরি সমিধ-ভার
আসে শিষ্য সুকুমার;
যজ্ঞকুণ্ডে ঢালে হবিঃ ঋত্বিক ভাস্বর।
সোমগন্ধে সামছন্দে
নামিছেন কি আনন্দে
অরুণ বরুণ ইন্দ্র উজলি' অম্বর।—
জীবনের এ সঙ্গীত পবিত্র সুন্দর।

[অক্ষয় কুমার বড়াল]

সুরেন্দ্রনাথের কবিতার ছন্দ-ধ্বনি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিবার কিছু নাই—ভাব-অর্থ-প্রধান গদ্যময় স্তবকগুলিতে ছন্দঃস্রোত অধিকাংশ স্থলেই ব্যাহত হইয়াছে; কিন্তু যেখানে কবি ক্ষণকালের জন্য আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন সেইখানেই পয়ার-ছন্দের নবতন ধ্বনি-সঙ্গীত ধরা দিয়াছে—যুক্তাক্ষর ও যতিবিন্যাসের কারিগরী পুরাতন পয়ার-ছন্দকে লীলায়িত করিয়াছে। উদ্ধৃত কবিতাগুলিতে বহু স্থলে ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। তথাপি এ স্থলে সুরেন্দ্রনাথের ছন্দ-সঙ্গীতের একটা নিয়ম উল্লেখযোগ্য। পয়ারের চৌদ্দমাত্রার একঘেয়ে যতিবিন্যাস ভাঙ্গিয়া দিয়া সুরেন্দ্রনাথও পয়ারের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন—যাহাকে শাস্ত্র-মতে যতিভঙ্গ বলা যায়, মাইকেলের মত, তাহাকেই তিনি ছন্দের স্বাধীন সাবলীল গতির একান্ত প্রয়োজনীয় উপায় বলিয়া বুঝিয়াছিলেন; তাঁহার কাব্যে ছন্দের এই গূঢ়তর প্রকৃতি ধরা পড়িয়াছিল, ইহা সেকালের অন্যান্য কবিগণের তুলনায় কম গৌরবের কথা নয়। উদাহরণ-স্বরূপ আমি এখানে কয়েকটি মাত্র চরণ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। যতিবিন্যাসের দুইটি রীতি

সুরেন্দ্রনাথের বড় প্রিয় ছিল—আট-ছয়ের পরিবর্ত্তে ছয়-আট ও সাত-সাত, ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

ইন্দু-কুন্দ-বিনিন্দিত বরণা বিমল,
সিত কণ্ঠহার, সিত বাস,
সারদে! চরণাম্বুজে চিত-শতদল
বিকাশি আসিয়া কর বাস;

*

নর-হর মোহিনী-মুরতি-বিমোহিত;

*

রসনা না, ললনা নয়নে কথা কয়।

*

নিরখি যুগল লোল লোচন প্রিয়ার।

*

বসনে ভূষণে রূপ আবরি বাড়ায়
যথা কাচ-কলস প্রদীপ-কলিকায়!

*

নিমীলিত নয়ন সঘন বিকম্পিত—
অমল পল্লবে মণি-নীলিমা লক্ষিত।

*

চিরদৃষ্ট সে সুষমা হেরিব তোমার—
বেশভূষা দলিত, গলিত বেণীভার!

ফল-ফুল-পল্লবে পরম বিভূষিত
সুবিশাল শাখার প্রসার,
বাসনার পাখীদলে বসে' গায় গীত—
নর হেন তরুর প্রকার:
কাল-নট তট 'পরে হেন রূপে শোভা করে
প্রতিক্ষণ মূল ক্ষত তার:
সে কি জানে পতন আসন্ন আপনার?

তরুপত্র-প্রান্তভাগে লম্বিত নীহার
কামিনীর কটাক্ষ-ইঙ্গিত,
সুচিত্রিত, চারু ইন্দ্রচাপ বরিষার
উড্ডীন পাখীর কলগীত,

সন্ধ্যার রক্তিম ঘটা পতিত তারার ছটা
সুরোজল-হিল্লোল-নর্ত্তন,—
এ হ'তে ভঙ্গুর রম্য মানব-জীবন।

সুরেন্দ্রনাথের কাব্য-পাঠ এইখানেই শেষ করিলাম। পাঠকালে এবং প্রসঙ্গের অবতরণিকায় সুরেন্দ্রনাথের কবিমানস ও কাব্য-কীর্ত্তির সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা বলিয়াছি, আশা করি তাহাতেই কবি-পরিচয় যথেষ্ট হইয়াছে। তথাপি সর্ব্বশেষে সমগ্রভাবে আরও দুই চারি কথা বলিয়া আমি এই দীর্ঘ আলোচনা সমাপ্ত করিব।

সুরেন্দ্রনাথের 'মহিলা-কাব্য'ই সমধিক প্রসিদ্ধ—ইহা তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হইয়াছিল, কাব্যখানির শেষভাগ অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে; মাতা, জায়া ও ভগ্নী এই তিন অংশে—মহিলার এই তিন রূপের বন্দনাই কবির অভিপ্রেত ছিল, 'ভগ্নী' অংশ লিখিয়া যাইতে পারেন নাই। মহিলা-কাব্যের বিষয়টি সেকালের কবি-প্রেরণার একটা সাধারণ উপজীব্য বলিয়া মনে হয়। উনবিংশ শতকের শেষের দিকে বাঙ্গালী কবি, প্রতিভার প্রকৃতিনির্ব্বিশেষে, নারী-মহিমার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। গীতিকাব্যের ত কথাই নাই, মহাকাব্য, কাহিনী-কাব্যেও কবিগণের প্রাণময় উচ্ছ্বাস নারীকে ঘেরিয়াই চরিতার্থ হইয়াছে। রঙ্গলালের তিনখানি উপাখ্যান-কাব্যই নারীর নাম বহন করিতেছে; মাইকেলের 'বীরাঙ্গনা' প্রেমিকা নারীগণের চরিত্র ও হৃদয়-রহস্য উদ্‌ঘাটনে সার্থক হইয়াছে; 'মেঘনাদ-বধে'ও কবি প্রমীলা ও সীতা-চরিত্র আঁকিতে বসিয়া তাঁহার বর্ণভাণ্ডের সকল রঙ্‌ নিঃশেষ করিয়াছেন—প্রমীলার চরিত্র একটি প্রকৃত সৃষ্টি; দেশী ও বিদেশী আদর্শের এমন নিপুণ মিশ্রণ সেকালের কবিকল্পনায় আর কোথাও নাই; মনে হয় কবি-মানসের আদর্শ-নারী কাব্যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। বিহারী-লাল 'বঙ্গসুন্দরী'তে নারীর মহিমা গান করিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ মহিলা-কাব্য লিখিয়াছেন। পরবর্ত্তী যুগের গীতিকাব্যে দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'নারীমঙ্গল' প্রভৃতি সেই সুরেরই ধ্বনি-প্রতিধ্বনি; কবি অক্ষয়কুমার বড়াল তাঁহার কবি-জীবনের আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত নারীস্তোত্র রচনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এরূপ বিশেষভাবে উল্লেখ করিবার কিছু নাই। ইহা হইতে অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, জাতীয় জাগরণের প্রথম প্রহরে বাঙ্গালী বিশেষ করিয়া তাহার গৃহলক্ষ্মীর সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছিল—নিজের পুরুষ-মহিমা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু খুঁজিয়া পায় নাই, কিন্তু নিজ গৃহের সর্ব্বংসহা স্নেহ-শালিনী নারীর দিকে চাহিয়া সহসা তাহার বিস্ময় বোধ হইল। অক্ষম অকৃতী পুরুষের পাশে সহচরীবেশে এই শক্তিরূপিণীর সাক্ষাৎলাভ করিয়া সে মুগ্ধ ও আশ্বস্ত হইয়াছিল। নারীর মধ্যেই সে হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা এমন কি পৌরুষ-বোধেরও পরিতৃপ্তি চাহিয়াছে—নারীর শক্তি হইতে সে নিজেও শক্তিসঞ্চয় করিতে চাহিয়াছে; নিজের আত্মগ্লানি ও অক্ষমতার ঊর্দ্ধে নারীকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া হৃদয়ের শ্রেষ্ঠবৃত্তি চরিতার্থ করিতে চাহিয়াছে। ইহাই—আমার মনে হয়—নবযুগের বাংলাকাব্যে কবিগণের এই নারীস্তুতির প্রধান প্রেরণা। পরবর্ত্তী যুগের যুগ-নায়ক রবীন্দ্রনাথ তাঁহার

'মাভৈঃ' শীর্ষক প্রবন্ধে বাঙালী নারীর প্রতি বাঙালী পুরুষের এই প্রচ্ছন্ন শ্রদ্ধার কথা স্পষ্টাক্ষরে কবুল করিয়াছেন; ইহাও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিধ্বনি। মহাকবি বঙ্কিমচন্দ্রের অতি ঊর্দ্ধগ রোমান্টিক কল্পনার মূলে ছিল নারী সম্বন্ধে এই বিস্ময়-বোধ, তাঁহার কল্পনা বিশেষ করিয়া উদ্রিক্ত হইয়াছিল দুই বস্তুর দ্বারা—এক, জাতির অতীত সাধনার স্বরূপ বা বিস্মৃত ইতিহাস; অপর, এই নারী-চরিত্র। পুরুষের সহধর্ম্মিণী, জায়া বা প্রণয়িনী রূপেই নারীচরিত্র রহস্যময় হইয়া উঠিল—বঙ্কিমচন্দ্র সে রহস্যের শেষ পান নাই। মাইকেলের 'প্রমীলা'ই এই রহস্যের আদিসৃষ্টি। শরৎচন্দ্রের—শেষ প্রশ্নের 'কমল' নয়—শ্রীকান্তের 'অন্নদাদিদি'-তে এখনও তাহার জের চলিতেছে। সে যুগ ছিল নারীবন্দনার যুগ—প্রথম পরিচয়ের বিস্ময়ই তখন প্রবল। এই বিস্ময়ই নারীচরিত্র-সৃষ্টির প্রেরণা হইয়াছিল একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের লোকোত্তর প্রতিভায়। কবিগণের মধ্যে এই বিস্ময়-বোধ ব্যর্থ হইয়াছিল; নবীনচন্দ্রের যে আবেগ-চাঞ্চল্য আছে, হেমচন্দ্রের অতিশয় সমতল-প্রবাহিণী কল্পনায় তাহাও নাই; বৃত্রসংহারের নারী-চরিত্রগুলির মত অক্ষম সৃষ্টি—এমন স্থবির ও স্থাবর বাঙ্গালীয়ানার নিদর্শন—সে যুগের কোনও খ্যাতনামা কবির রচনায় নাই।

সুরেন্দ্রনাথের মহিলা-কাব্যও নারীস্তোত্রমূলক বটে, কিন্তু তাহাতে বিস্ময় অপেক্ষা সজ্ঞান শ্রদ্ধা, কল্পনার রসাবেশ অপেক্ষা বাস্তবের বস্তু-পরীক্ষাই অধিক। সুরেন্দ্রনাথ নারী-চরিত্রের গূঢ় রহস্য চিন্তা না করিয়া সংসারে ও সমাজে, ইতিহাসে ও লোকব্যবহারে, নারীর নানা গুণের যে প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাই সবিস্তারে নানা দৃষ্টান্ত, উপমা ও অলঙ্কারে মণ্ডিত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনার ভঙ্গিই মহিলা-কাব্যের প্রধান কাব্যগুণ। মোহিনী ও মহীয়সী মহিলার গুণবর্ণনায় তাঁহার যে উৎসাহ, তাহার অধিকাংশ ওকালতী করিতেই ব্যয় হইয়াছে বটে, তথাপি সেই ওকালতীর মধ্যে, অতিশয় নীরস গদ্যময় তর্কযুক্তি ও তত্ত্বালোচনার ফাঁকে ফাঁকে যে সহানুভূতি, চিত্তের প্রদীপ্ত ও বাস্তবদৃষ্টির পরিচয় আছে তাহা অনন্যসুলভ। এই জন্যই মহিলা-কাব্য এককালে সুরেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিকীর্ত্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। আমিও মহিলা-কাব্য প্রসঙ্গেই সুরেন্দ্রনাথের কবি-প্রকৃতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আরও কিছু বলিয়া কবি-পরিচয় শেষ করিব। তৎপূর্ব্বে কেবল একটি কথা বলিয়া রাখি; 'বর্ষবর্ত্তন' নামক আর একখানি খণ্ডকাব্য পাঠ না করিলে সুরেন্দ্রনাথের কাব্য-পাঠ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে; আমার মনে হয়, মহিলা-কাব্য অপেক্ষা এই ক্ষুদ্রতর কাব্যখানিতে সুরেন্দ্রনাথের কবি-স্বভাবের—তাঁহার স্বচ্ছন্দ ভাবুকতার আরও বিশিষ্ট পরিচয় আছে। কিন্তু 'অলমতিবিস্তরেণ' বলিবার সময় আসিয়াছে। আমি মহিলা-কাব্য হইতেই বিদায় লইব।

এ পর্য্যন্ত, এই বিস্মৃতপ্রায় কবির পরিচয়-সাধন মানসে আমি যে দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে আশা করি, আমার উদ্দেশ্য কতক পরিমাণেও সফল হইবে। সুরেন্দ্রনাথের জন্য আমি বাংলার কবিসমাজে কোনও অত্যুচ্চ আসন দাবী করি নাই—সুরেন্দ্রনাথ যে সে যুগের একজন শক্তিশালী সাহিত্যসেবী, এবং সে যুগের অপরাপর কবিগণের মধ্যে তিনি যে একটি

বিশিষ্ট আসনের অধিকারী—ইহাই আমি দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছি। কাব্যের আদর্শ সম্বন্ধে রুচিভেদ ও মতভেদ আছে—এদেশেও যেমন আছে, বিদেশেও তেমনই আছে; পূর্ব্বেও ছিল, আজিও আছে। সুরেন্দ্রনাথের আদর্শও একটা আদর্শ; যাঁহারা নিছক রসবাদী তাঁহারা সে আদর্শ স্বীকার করিবেন না। সুরেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

> সারঙ্গীর সুর সনে সঙ্গীত যোজন,
> বিদ্যা আর কবিতার মিলন যেমন।

—এ আদর্শ সকলের নহে। বিদ্যার সঙ্গে কবিতার মিলন ঘটিতে পারিলেও সুরেন্দ্র-নাথে তাহা ঘটিয়াছে কিনা, তাহাও আর এক প্রশ্ন। আমার মনে হয়, কাব্যের কোনও বহির্গত আদর্শ না ধরিয়া প্রত্যেক কবির কাব্যে তাঁহারই আদর্শ কতখানি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে, তাহাই দ্রষ্টব্য। সে সাফল্যের প্রমাণ আর কিছুই নয়, লেখকের শক্তির প্রমাণ। তাহাতে দেখা যাইবে, আদর্শ যেমনই হোক, লেখকের শক্তি তাহাকে সার্থক করিয়াছে—রচনা ভাবে ও অর্থে একটা পরিস্ফুট বাণী-রূপ লাভ করিয়াছে। কোনও একটা ধ্রুব আদর্শ খাড়া না করিয়া এইরূপে রচনার মূল্য নিরূপণ করিলে প্রত্যেক শক্তিমান কবির রচনাই একটা বিশিষ্ট ও বিচিত্র রসের আস্বাদন করাইবে; চিন্তা-প্রধানই হোক, ভাব-প্রধানই হোক, কিম্বা রস-প্রধানই হোক—প্রত্যেক কবিতাই কোনও না কোনও দিক দিয়া সার্থক হইতে পারে। সুরেন্দ্রনাথ বিদ্যাবত্তাকেই কবিত্বের দৃঢ়ভিত্তি বলিয়া মনে করিতেন—জ্ঞানের আনন্দই তাঁহাকে কাব্যরচনায় প্রণোদিত করিয়াছিল; তাঁহার কাব্যগুলিতে তাহার প্রমাণ কিছু অতিরিক্তই আছে। কিন্তু তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়াও তিনি বাস্তবকে পরিহার করেন নাই—বরং সংসারকে স্বীকার করিয়াই আশ্বস্ত হইতে চাহিয়াছিলেন। বহুকালাগত ভারতীয় হিন্দু-মনের সংস্কারকে দমন করিয়া জীবন ও জগৎকে এমন ভাবে স্বীকার করিবার এই প্রবৃত্তি সেকালের পক্ষে নূতন ও মৌলিক; সুরেন্দ্রনাথের কাব্যে, বিশেষ করিয়া তাঁহার মহিলা-কাব্যে, এই প্রবৃত্তির সম্যক্ পরিচয় আছে।

সুরেন্দ্রনাথের প্রেমের আদর্শে, ও তথা নারী-পূজায়, পূর্ব্বতন কবিগণের আদিরস বা দেহসম্ভোগের নীতি পুরামাত্রায় আছে। ভারতচন্দ্র হইতে ঈশ্বরগুপ্তের কাল পর্য্যন্ত বাংলা কাব্যে যে স্থূল ইন্দ্রিয়-লালসার ঝাঁজ দেখা যায়, গুপ্ত-কবি যাহাকে নিজকাব্য হইতে তিরস্কৃত করিয়া, নারীমাত্রের প্রতিই একটা সঘৃণ উপেক্ষার ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন—সেই অতিশয় প্রাকৃত প্রেমের সংস্কারকেই অবলম্বন করিয়া সুরেন্দ্রনাথ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা তাহাকে শোভন ও বুদ্ধি-সম্মত করিয়া তুলিয়াছেন। যে subjective বা লিরিক কল্পনা, য়ুরোপীয় কাব্যের প্রভাবে, অতঃপর বাংলা গীতি-কাব্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, সুরেন্দ্রনাথের ভাবনায় তাহার চিহ্ন নাই; পূর্ব্বরাগ প্রভৃতির বর্ণনায় তিনি গভীরতর আবেগের পরিচয় দিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার প্রেম সর্ব্বত্রই অতিশয় বাস্তব রক্ত-মাংসের সম্বন্ধযুক্ত। এজন্য তাঁহার 'মহিলা' অর্থে—আমরা আজকাল 'নারী' বলিতে যাহা বুঝি তাহা নয়—সত্যকার

সামাজিক বন্ধনযুক্ত পত্নী, মাতা ও ভগ্নী প্রভৃতি। মহিলা-কাব্যের 'জায়া-'খণ্ডে—তিনি নর-নারীর যৌন সম্বন্ধকেই, সামাজিক ও পারিবারিক আদর্শের উচ্চ চিন্তায় মণ্ডিত করিয়া মহিমান্বিত করিয়াছেন। এই জন্য, স্থানে স্থানে প্রেম সম্বন্ধে অতি উচ্চ ও গভীর কবিত্ব প্রকাশ পাইলেও, বৈষ্ণব কবির মত ভাব-গভীর আধ্যাত্মিকতা, অথবা পাশ্চাত্ত্য কবিগণের মত, নর-নারীর অপূর্ব্ব হৃদয়-বেদনার অসীম রহস্যের দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত হন নাই। যাহা অতি সাধারণ, প্রত্যক্ষ এবং পরীক্ষিত সত্য, প্রেমকে তিনি তাহা দ্বারাই যাচাই করিয়া তাহার মূল্য প্রমাণ করিয়াছেন।

প্রেমকে এইভাবে গ্রহণ করিয়া, নারীকে উচ্চতর ভোগের সহায়-রূপে বর্ণনা করিয়া তিনি কোনও আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা করেন নাই সত্য, কিন্তু সে যুগে এইরূপ নারী-বন্দনার প্রয়োজন ছিল; হয়'ত আজিও আছে। ভোগের বস্তু বলিয়াই নারীর প্রতি যে একটা অবজ্ঞার ভাব, ভাক্ত বৈরাগ্যের আবরণে, তদানীন্তন গানে ও কবিতায় প্রকট হইয়াছিল, তিনি তাহারই বিরুদ্ধে নারীর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্য-সাধনায় এই যুক্তি-বাদ, জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে উন্নতি-বাদ এবং ভোগ ও সংযমের সমন্বয়-চিন্তা লক্ষিত হয়। এজন্য সে যুগের মনীষিগণের মধ্যেও তাঁহার একটি স্বতন্ত্র স্থান আছে।

কার্ত্তিক, ১৩৪১

দীনবন্ধু

গত শতাব্দীর বাংলা-সাহিত্যে, বঙ্কিম-মাইকেলের যে যুগ বাঙ্গালীর কবি-প্রতিভার অভিনব উন্মেষের পরিচয় বহন করিয়া এ সাহিত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে—যে-যুগে বাঙ্গালী বিজাতীয় শিক্ষার প্রভাবকে আত্মসাৎ করিয়া নিজের জাতীয়তা ও জীবনশক্তির জয় ঘোষণা করিয়াছিল—স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র সেই যুগের সেই সাহিত্যের অন্যতম যুগন্ধর। তাঁহার প্রতিভায় এমন একটি মৌলিক শক্তি ও সৃষ্টি-নৈপুণ্যের পরিচয় আছে, যাহার আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব, কোনও সাহিত্যের উৎকৃষ্ট প্রেরণা কোথা হইতে রস সঞ্চয় করে—এবং জাতির জীবনের সঙ্গে জাতীয় সাহিত্যের যোগ বিচ্ছিন্ন না হইলে সাহিত্য-সৃষ্টি কোন্ পথে কি পরিমাণ সত্যকার এবং সহজ সাফল্য লাভ করিতে পারে। গত যুগের সাহিত্য সম্বন্ধে যতই আলোচনা করি ততই একটা সত্য আমরা কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারি না যে, এই সাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ এবং গৌরবের কারণ, এ যুগে বাঙ্গালী বাহিরের আক্রমণে অভিভূত হইয়াও স্বকীয় প্রতিষ্ঠাভূমিকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করিবার শক্তি হারায় নাই—এ সাহিত্যে বাঙ্গালীর বাঙ্গালিয়ানা নানাছন্দে নানারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তাই, আজিকার উন্নত আর্ট-সর্ব্বস্ব সাহিত্য-চর্চ্চার দিনে যখন আমরা আত্মভ্রষ্ট হইয়া, কায়ার পরিবর্ত্তে ছায়া, ও ভাবের পরিবর্ত্তে অভাবকে সাহিত্যের উপাদানরূপে বরণ করিয়া, সত্যকার রসিকতার পরিবর্ত্তে কাল্‌চারের অভিনয় করিতেছি, তখন এই বিগত যুগের সাহিত্যে কোনও শক্তি, কোনও প্রতিভার পরিচয় আর পাই না; তাই কাল্‌চারের মর্কট-লীলার অভিমানে যে বাঙ্গালী আজ লাঙ্গুল-দৈর্ঘ্যের আস্ফালন করে, তাহার মতে এ-যুগের সাহিত্য সাহিত্যপদবাচ্যই নয়। ইহার কারণ, বাঙ্গালী সাহিত্যকে স্ব-জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছে; জাতির জীবন হইতে ব্যক্তির জীবনকে পৃথক করিয়াছে; দেশ-কাল-পাত্রের দাবীকে অস্বীকার করিয়া রস-পিপাসাকে ভূমি হইতে ভূমায় তুলিয়াছে। দীনবন্ধুর সাহিত্যিক-প্রতিভা এই ভাবের এমনই প্রতিকূল যে, আজিকার দিনে তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে হইবে। খুব সংক্ষেপে বলিতে গেলে ইহার একমাত্র কারণ, আজিকার সাহিত্য-বিলাসীরা এ-কালের বাঙ্গালীও নহেন; এবং দীনবন্ধু সেকালের হইলেও চিরকালের বাঙ্গালী। ইংরেজী সাহিত্যের আধুনিকতার অভিমানে আজ যাহারা সাহিত্য-ক্ষেত্র মুখর করিয়া তুলিয়াছে তাহাদের তুলনায়,—দীনবন্ধু সে কালের যে সমাজে বিচরণ করিতেন, তাঁহারা ছিলেন যথার্থ রসিক ও বিদ্বান; ইংরেজী সাহিত্যের যে সুধা একালে আধুনিকতার ট্রেড্‌মার্কেও সস্তা হইয়া উঠে নাই—এবং কখনও হইবে না—সেই সুধা তাঁহারা কণ্ঠ ভরিয়া পান করিয়াছিলেন, এবং প্রাণধর্ম্ম সুস্থ ছিল বলিয়াই তাহাতে তাঁহারা অধিকতর প্রাণবন্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের স্বাস্থ্য অটুট ছিল বলিয়াই পদব্রজে খানা ডোবা পার হইয়া তাঁহারা জীবনের গ্রাম্যতা

আবিষ্কারেও ভয় পাইবেন না। যে কৃত্রিম নাগরিক মনোবৃত্তি, এ-যুগের বাংলা-সাহিত্যকে বাঙ্গালী-সাধারণের জীবন হইতে দূরে লইয়া গিয়াছে, সেই অস্বাভাবিক জীবন, সেই বিজাতীয় কালচার মোহের কথা স্মরণ করিয়া যে ভাবুক চিন্তাশীল রসিক বাঙ্গালী সন্তপ্ত না হন, দীনবন্ধু-প্রসঙ্গ তাঁহার জন্ত নহে। গত পঁচিশ বৎসর যাবৎ বাঙ্গালীর জীবনে ও সাহিত্যে যে মূলহীন শৈবালস্তর জমিয়া স্বাভাবিক ভাবস্রোত রুদ্ধ করিয়াছে, রুচিকে কৃত্রিম ও সূক্ষ্ম, রসকে তুরীয় এবং ভাষাকে কুলত্যাগিনী বেশ-বধূ করিয়া তুলিয়াছে, তাহার মোহ দমন করিতে না পারিলে দীনবন্ধুর মত খাঁটি বাঙ্গালীর সাহিত্য-সৃষ্টি ও তাহার সাফল্য-সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। কারণ, দীনবন্ধুকে বুঝিতে হইলে বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালীকে বুঝিতে হইবে; এবং সাহিত্যের আদর্শ সম্বন্ধে নিছক মনোবিলাসের abstraction পরিহার করিয়া, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মহিমা খর্ব্ব করিয়া—সাহিত্যের যে-প্রেরণা দেশের আলো-বায়ু-জল ও জাতির জীবিত-চেতনা হইতে রস সংগ্রহ করে—তাহাকেই বরণ করিতে হইবে।

দীনবন্ধুর নিজ প্রতিভার পরিচয়ের সঙ্গে আর একটি বাহিরের পরিচয় যুক্ত হইয়া আছে—তিনি যুগনায়ক বঙ্কিমের প্রিয় সুহৃদ ছিলেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এমন সৌহার্দ্দের কাহিনী বড় বেশী নাই—সে একটা জীবনঘটিত কাব্য বলিলেও চলে। কিন্তু সেরূপ সৌহার্দ্দের মূলে যে গভীর ব্যক্তিগত প্রীতির বন্ধন ছিল তাহা যে সাহিত্যরস-সূত্রেও দৃঢ়তর হইয়াছিল, এ অনুমান অসঙ্গত নহে। এত বড় প্রীতির সম্বন্ধ যেখানে, এবং উভয়েই যখন সাহিত্যসেবী, তখন মূলে যে এই দুই ব্যক্তির মধ্যে সাহিত্যিক সমপ্রাণতাই তাঁহাদের সখ্যকে দৃঢ়তর করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু উভয়ের প্রতিভা ও সাহিত্যিক প্রকৃতিতে পার্থক্য অল্প নহে। এই দুইজন যেন সে যুগে দুই বিভিন্ন রীতিতে দুই দিক দিয়া সাহিত্যের পুষ্টিসাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন। একজনের প্রতিভা যত বড়, আর একজনের তত বড় নয়—কিন্তু একই সাহিত্য-রসরসিকতায় উভয়ে উভয়কে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সাহিত্যের যে-আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন দীনবন্ধুও সেই মন্ত্রে সেই আদর্শের পূজারী ছিলেন। উভয়ের দৃষ্টি ছিল সাহিত্যের সত্যের দিকে—উভয়ে দেখিতে চাহিয়াছিলেন মানুষকে; মনুষ্য-চরিত্র ও মনুষ্য-জীবনের অপার রহস্য উভয়েই পরম বিস্ময়ে রসরূপে উপভোগ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমের প্রতিভা ও মনীষা ছিল বড়—তাঁহার কবি-দৃষ্টি ছিল গভীরতর, তিনি বাস্তব জীবন ও জগতের মধ্যে গূঢ়তর কার্য্য-কারণ-নীতি, জটিলতর সুষমা, ও বৃহত্তর পরিকল্পনার আভাস পাইয়াছিলেন; তিনি মানুষের নিয়তিকে—তাহার মর-জীবনের দুঃখসুখকে—ট্রাজেডির উচ্চতর ক্ষেত্রে তুলিয়া ধরিয়া সে জীবনের আদি-অন্তকে যুগপৎ উপলব্ধি করার যে চরম কাব্যরস, তাহারই সাধনা করিয়া-ছিলেন; কল্পনার সে শক্তি কেবল তাঁহারই ছিল—তিনি ছিলেন জীবন-মহাকাব্যের কবি। দীনবন্ধু সেই জীবনকেই আর একদিক দিয়া দেখিবার ও তাহার রস-রূপ সৃষ্টি করিবার সাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টি, প্রত্যক্ষের অন্তরালে যে পরোক্ষ আছে তাহা ভেদ

করিতে চাহে নাই; যাহা নিকট, যাহার সঙ্গে প্রাণ-মনের সম্পর্ক অব্যবহিত, যাহা বাহিরের বিকাশভঙ্গিমাতেই, অতি উচ্চ ভাবুকতা ও কল্পনা ব্যতিরেকেই, রস-সম্পৃক্ত হইয়া উঠে—তিনি ছিলেন সেই জীবনের মুগ্ধ উপাসক।) সাহিত্য-সৃষ্টিতেও যেন উভয়ে উভয়ের পার্শ্বচর—একের অভাব অপরে পূরণ করিয়াছিলেন। বঙ্কিম আঁকিয়াছিলেন—নগেন্দ্র, গোবিন্দলাল; দীনবন্ধুর সৃষ্টি—তোরাপ, হেমচাঁদ; বঙ্কিমের—কুন্দনন্দিনী; দীনবন্ধুর ক্ষেত্রমণি; বঙ্কিমের দেবেন্দ্র দত্ত, দীনবন্ধুর নিমচাঁদ। আবার, বঙ্কিমের প্রতাপ ও দীনবন্ধুর নবীনমাধবে যে প্রভেদ, দীনবন্ধুর রাজীবলোচন ও বঙ্কিমের বিদ্যাদিগ্‌গজেও সেই প্রভেদ।

সে যুগের বাংলা সাহিত্যে যে প্রেরণা বঙ্কিমের গদ্যকাব্যগুলিতে সার্থক হইয়াছে, দীনবন্ধুর নাটকগুলিতেও সেই প্রেরণা অপর পথে রস-সৃষ্টি করিয়াছে। য়ুরোপে রেণেসাঁসের যুগে এই জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে যে বিস্ময়বিহ্বলতা, যে শ্রদ্ধাবোধ ও রহস্য-সন্ধান, তথাকার সাহিত্যে অভিনব প্রাণসঞ্চার করিয়াছিল—সাহিত্যকে একরূপ মানবজীবন-সংহিতার রূপেই রূপান্তরিত করিয়া মানুষেরই মহিমা ঘোষণা করিয়াছিল, আমাদের সাহিত্যে তাহারই একটু প্রেরণাস্পর্শ ঘটিয়াছিল। তাহারই ফলে (মাইকেল কবি-কল্পনাকে জড়তামুক্ত করিলেন; বঙ্কিমচন্দ্র সেই কল্পনাকে কাব্যসৃষ্টিতে নিয়োগ করিলেন; দীনবন্ধু সেই কল্পনার তীব্র আলোক প্রশমিত করিয়া, অতি উচ্চ ভাবুকতাকে সহজ হৃদয়ধর্ম্মের অধীন করিয়া, যথাপ্রাপ্ত দেশ ও সমাজের মধ্যেই, মানুষের চিরন্তন দুর্ব্বলতা, ভ্রান্তি ও মোহকে রসসমৃদ্ধ করিয়া তুলিলেন। বঙ্কিম যে-রসকে জীবনের নিম্নতর সংস্থানে উপভোগ করিতে পরাঙ্মুখ ছিলেন, দীনবন্ধু সেই রসকেই প্রত্যক্ষ প্রবহমান জীবনধারার উর্ম্মিনৃত্যে, হাস্য-অশ্রুর অগভীর স্রোতেই প্রাণ ভরিয়া পান করিতে চাহিয়াছিলেন।) গীতি-প্রাণ কল্পনাবিলাসী বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা যে সম্ভব হইয়াছিল তাহার কারণ, এই রসিকতাও বাঙ্গালীর জাতিগত ধর্ম্ম। ট্রাজেডি বা মহাকাব্য বাঙ্গালীর স্বভাবগত না হইলেও, প্রাচীনকাল হইতে বাংলাকাব্যে লিরিকের সোনার তারের সঙ্গে এই উৎকৃষ্ট মানব-ধর্ম্মের পরিচয়টি রূপার তারের মত জড়াইয়া আছে। ব্যঞ্জনে লবণের মত, এই রস সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-প্রেরণায় প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে। ইহা যদি বাঙ্গালীর মানস-চরিত্রের একটি বিশেষ লক্ষণ না হইত তাহা হইলে বাঙ্গালীর সাহিত্য এত সমৃদ্ধিলাভ করিত না। কবিকঙ্কণ ও ভারতচন্দ্রে আমরা প্রতিভার যে যে লক্ষণে বিশেষ করিয়া মুগ্ধ হই; বাঙ্গালীর গ্রাম্য সাহিত্যে, এককালের সৌখিন নাগরিক কাব্যকলাতেও, আমরা যে রসের উৎসার-প্রাবল্য লক্ষ্য করি; বাংলার অসংখ্য প্রবচনের মধ্যে বাঙ্গালীর যে তীক্ষ্ণ রসবুদ্ধির পরিচয় আজও প্রোজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে—সেই রস রসিকতা এ-পর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট সাহিত্যসৃষ্টি না করিলেও, তাহার সে সম্ভাবনা চিরদিনই ছিল। বাংলাসাহিত্যের নবযুগের প্রাক্‌কালে যাহা কবির গান, পাঁচালী প্রভৃতির অধঃপথে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল—ঈশ্বর গুপ্তের বালক-ভক্ত দীনবন্ধু যৌবনে সেই রসকেই সাহিত্যসৃষ্টির সুগভীর প্রেরণায় সার্থক করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহারই আলোচনায় অতঃপর আমি তাঁহার হাস্যরস-কল্পনা ও নাটকীয় প্রতিভার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব;

বাংলা-সাহিত্যে এ পর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট নাটকের উৎপত্তি হয় নাই। তাহার কারণ অনুমান করা দুরূহ নয়। প্রথমতঃ, বাঙ্গালী অতিমাত্রায় ভাবপ্রবণ ;—নাটক-রচনায় মানুষের জীবন ও মানুষকে যে চক্ষে দেখিবার শক্তি আবশ্যক হয়, বাঙ্গালীর সে দৃষ্টি স্থির নহে, অতিশয় চঞ্চল। যে ঘটনাস্রোতে আপামর মানব-সমাজের বিভিন্ন চরিত্র বিভিন্ন গতি-মুখে নিরন্তর ভাসিয়া চলিয়াছে—সেই স্রোতের একটা অংশকে সমগ্রতায় উপলব্ধি করিয়া, অবিন্যস্ত ঘটনারাশির মধ্যে একটা অর্থের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া, ঘটনার দৈবরূপ ও মানবচরিত্রের অন্তর্নিহিত নিয়তিরূপকে কার্য্যকারণ-সূত্রে বিধৃত করিয়া যে নাটক-রচনা সম্ভব হয়, বাঙ্গালীর চরিত্রে ও মনে তাহার প্রতিকূল প্রবৃত্তিই নিহিত আছে ; এবং শুধু বাঙ্গালী বলিয়াই নহে, ভারতীয় হিন্দু বলিয়াও বটে—জীবনকে তেমন করিয়া দেখিবার শিক্ষা বা সংস্কার এজাতির নাই। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের সমাজে জীবনের সে অভিজ্ঞতা—সে অন্তরঙ্গ মূর্ত্তির পরিচয় সুলভ নহে। আমি শ্রেষ্ঠ নাটকীয় কল্পনার কথাই বলিতেছি। তেমন কল্পনা না হইলেও, সকল সমাজে সকল যুগে জীবনের একটা না একটা রূপ আছেই ; কারণ মানুষ থাকিলেই তাহার জীবনলীলাও আছে। সে লীলা শ্রেষ্ঠ কবি-কল্পনার বিষয় না হইলেও তাহারও রস আছে, এবং সহৃদয় রসিকচিত্তে যথাযথ প্রতিফলিত হইলে তাহা হইতেও কাব্যসৃষ্টি হয়। আমরা নাটকরচনায় সেই আদর্শের অনুকরণ করিয়াছি—জীবনে যাহার সত্যকার অবকাশ নাই। কতকগুলি বড় বড় sentiment-এর উচ্ছ্বাসে রঙ্গমঞ্চকে বক্তৃতামঞ্চে পরিণত করিয়াছি—না হয়, নিকৃষ্ট রঙ্গরসের লোভে কৃত্রিম কথাবস্তুর সাহায্যে আমরা নাটক রচনা করিয়া থাকি। আমাদের সাহিত্যে নাটকীয় প্রেরণার এই দৈন্য আধুনিক ভাবপ্রধান ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগে আমরা যেন আর অনুভব করিতেও পারি না। সাহিত্যের খাঁটি রসাস্বাদ এখনকার দিনে একমাত্র গল্পে ও উপন্যাসেই সন্ধান করিতে হয়—উৎকৃষ্ট চরিত্রসৃষ্টির বা জীবন-অনুভূতির যাহা কিছু রস তাহা আমরা কথা-সাহিত্যেই পাইয়া থাকি।

কিন্তু নাটক ও কথা-সাহিত্যে উপাদান-সাদৃশ্য থাকিলেও দুইটির গঠন বা সৃষ্টিনৈপুণ্যে যে পার্থক্য আছে, কবির অনুভূতির ভঙ্গিই সে পার্থক্যের কারণ ; অতএব সে পার্থক্য এই দুইএর তুলনামূলক বিচারে একটা বড় কথা। নাটকের নির্ম্মাণ-কৌশলই স্বতন্ত্র। তাহা দৃশ্য, পাঠ্য নহে ; পাঠ করিবার কালেও আমরা একটুকু কল্পনার সাহায্যে সে কাব্যকে চাক্ষুষ করিয়া থাকি—তাহাতে পাত্র-পাত্রী সম্মুখে উপস্থিত, কাল বর্ত্তমান। উপন্যাস বা কাহিনীতে যে কথাবস্তুকে সাজাইয়া গুছাইয়া বলিবার বা বর্ণনা করিবার ভঙ্গিতে লেখকের কলা-নৈপুণ্য প্রকাশ পায়, এখানে সেই কথাবস্তু বিবৃতি নয়, কাহিনী নয়—একটি প্রবহমান ঘটনা-স্রোত-রূপে প্রদর্শিত হয় ; সেই ঘটনাগত অবস্থায় চরিত্রগুলির স্ব স্ব প্রবৃত্তিমূলক কার্য্য ও বাক্য ভিন্ন লেখকের স্বতন্ত্র কোন প্রকাশ-রীতির অবকাশ নাই। এই ঘটনা ও চরিত্রের অন্তরালে লেখককে এমন করিয়া আত্মগোপন বা আত্মনিমজ্জন করিতে হয় যে, নাটকে যাহা ঘটিতেছে তাহা যে কেহ ঘটাইতেছে এমন ত নহেই, তাহা যে কাহারও ব্যক্তিগত বিচার-বিশ্লেষণ—

কাহারও স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গি অথবা আদর্শ বা রুচির দ্বারা মার্জ্জিত, পরিশুদ্ধ ও সুবিন্যস্ত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে, এমন সংশয়ও মনে জাগিতে পারিবে না। উপন্যাস বা গল্পে, বা কাহিনী-কাব্যে, যে চরিত্রচিত্রণ ও কথাবস্তুর রচনানৈপুণ্য আমাদিগকে মুগ্ধ করে, তাহার মধ্যে সর্ব্বক্ষণ লেখকও আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকেন—আকারে-ইঙ্গিতে, ভাবে-ভঙ্গিতে, ব্যাখ্যায়-বিশ্লেষণে, বর্ণনা ও বিবৃতির ব্যপদেশে, তিনি তাঁহার কল্পনা, তাঁহার অভিজ্ঞতা, তাঁহার ভাব ও ভাবনা—জীবন ও জগতের কোন একটা দিক তিনি কেমন রূপে উপলব্ধি করিয়াছেন—তাহাই আমাদিগকে জানাইয়া থাকেন। কিন্তু নাটককারের সে আকাঙ্ক্ষা নাই, থাকিলে তিনি নাটক লিখিতেন না। যাঁর যাহাতে নিগূঢ় আনন্দ বা রসোল্লাস হয়, তিনি তাহারই আবেগে কাব্যসৃষ্টি করেন। জীবনকে বর্ণনীয় না করিয়া তাহাকে দর্শনীয় করিবার আবেগেই নাটকের সৃষ্টি হয়। এ আবেগের মূল—কল্পনার objectivity, বাহিরের নিকট আত্ম-সমর্পণ—আত্মগত রসকল্পনায় বস্তুসকলকে মণ্ডিত না করিয়া, বস্তুসকলের রস-সত্তায় আপনাকে বিলাইয়া দেওয়া। যাঁহার মধ্যে বিষয়-রসানুভূতি এতই প্রবল যে আপনার চিত্ত তাহাতেই ভরপুর হইয়া উঠে—বিষয়াতিরিক্ত কোন ভাবের দ্বারা, আত্মগত অভাব-পূরণের প্রয়োজন হয় না—তিনিই নাটকীয় প্রতিভার অধিকারী। জীবনের যাহা-কিছু প্রত্যক্ষ অনুভূতি-গোচর তাহাই যখন আপনারই ভঙ্গিতে আপনারই নিয়মে, একটি সুসমঞ্জস রসমূর্ত্তি পরিগ্রহ করে—যাহা আছে তাহাকে তদ্বৎ উপভোগ করিবার শক্তিই যখন পরমানন্দের কারণ হয়—এই জীবন ও জগৎ যখন স্বাতন্ত্র্যাভিমান-বর্জ্জিত মনকে হাত ধরিয়া নিজের পথে পথ দেখাইয়া বস্তুসকলের সুগভীর রহস্য-নিকেতনে লইয়া যায়, তখন এই যথাপ্রাপ্ত জগৎই অপূর্ব্ব সুষমায় মণ্ডিত হইয়া যে রসের আস্বাদন করায়—নাট্য-কবি সেই রসের রসিক। তাই তাঁহার সৃষ্টিকল্পনায়, প্রকৃতি ও মানব-সমাজ লেখকের অহং-ভাবমুক্ত হইয়া যে রসরূপ ধারণ করে, তাহার মধ্যে লেখককে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—যাহা যেমন আছে তাহাই, লেখকের সকল অভিমান ও ব্যক্তি-সংস্কারের অবিরোধে, এমনই একটি স্বাভাবিক সত্য-সুন্দরের স্ফূর্ত্তি লাভ করে যে, তাহাতেই রস উছলিয়া উঠে—মানুষের সকল সংস্কারের মূল যে সংস্কার, সেই গভীরতম প্রাণ-চেতনার প্রীতিসাধন করে।

কল্পনার এই objectivity, উৎকৃষ্ট নাটকীয় প্রতিভার এই লক্ষণ, আমাদের সাহিত্যে অতি অল্পই প্রকাশ পাইয়াছে—সেই অল্পের মধ্যে দীনবন্ধুর প্রতিভাই আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আজিকার দিনে এই কথাটি বুঝিবার ও বুঝাইবার বিঘ্ন অনেক। আমাদের দেশে সাহিত্য-বিচারে রসের একমাত্র উৎকর্ষ তাহার কাব্যগুণে—ভাবপ্রধান ঊর্দ্ধগ কল্পনায়, অতি উচ্চ আদর্শে; এবং শব্দ ও ছন্দঝঙ্কারে যাহা শ্রবণ-মনোহর তাহা ভিন্ন আর কিছুই উৎকৃষ্ট সাহিত্য নয়। এ-পর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট সাহিত্য যাহা কিছু রচিত হইয়াছে, সমালোচন-পদ্ধতির দোষে এবং কাব্যের আদর্শ-নির্ণয়ের অভাবে তাহার প্রকৃত কাব্যগুণ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এমনই যে, সাহিত্যের রূপভেদ-রসভেদ সম্বন্ধে আমরা সজ্ঞান নহি। নাটক বলিতে সাধারণতঃ আমরা

অঙ্ক ও দৃশ্যে বিভক্ত রোমান্সই বুঝি—চমকপ্রদ কল্পনার বিলাস এবং ভাবাতিরেকের অনুকূল ঘটনা-বিন্যাসকেই আমরা সকল রচনার একমাত্র কৃতিত্ব বলিয়া বিশ্বাস করি। আমাদের দেশে নাটকের অভিনয়-সাফল্য নির্ভর করে দর্শকের প্রাণ-মনের সরল স্বাভাবিক সমর্থনের উপরে নয়—নিজের সহিত নিজের নিবিড় আত্মপরিচয়ের আহ্লাদেই সে-রসের উপলব্ধি হয় না। যাহা যেমন আছে তাহারই রসমাধুর্য্যে মুগ্ধ হইবার সামর্থ্য আমাদের নাই বলিয়া, স্বতঃ-উৎসারিত জীবন-ধর্ম্মের মধ্যেই যে অবাঙ্‌মনসগোচর পরম-সত্তার ইঙ্গিত রহিয়াছে তাহাতে আকৃষ্ট হই না বলিয়া, আমরা দুরূহ আদর্শ, দুরূহ ধর্ম্ম ও দুরূহ নীতির আবেগ অনুভব করাকেই নাটকের মুখ্য ফল বলিয়া গণনা করি। আমাদের দেশে উচ্চ নাট্যকলাসম্মত রচনার প্রবৃত্তি এই কারণেই চিরদিন বাধা পাইতেছে। বর্ত্তমানে আরও গুরুতর বাধা হইয়াছে এই যে, আমাদের সাহিত্যের একমাত্র আদর্শ দাঁড়াইয়াছে—ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা; এই individualism ও তদানুষঙ্গিক লিরিক-আদর্শ নাটকীয় কল্পনার objectivity-কে আদৌ স্বীকার করিতে চায় না। আর একটি বাধা রুচির বাধা। সাহিত্যের যে যুগে আমরা বাস করিতেছি, এ-যুগের যথার্থ নামকরণ করিতে হইলে, ইহাকে বাংলা সাহিত্যের ব্রাহ্ম-যুগ বলাই সঙ্গত। এ-যুগে বাঙ্গালীর জীবন, বাংলা সাহিত্যে প্রকাশ পাইতে হইলে, তাহার বন্যতা ও বর্ব্বরতা, তাহার অর্দ্ধনগ্নতা ও অশ্লীলতা বর্জ্জন করিয়া, খুব ধব্‌ধবে ইস্ত্রি-করা পোষাক পরিয়া একমাত্র বৈঠকখানায় ছাড়া আর কোথাও দেখা দিতে পারিবে না। সে জীবন যত সত্য, যত স্বাভাবিক এবং যতই আন্তরিক হউক—কথাবার্ত্তায়, বেশভূষায়, আদব-কায়দায় সম্পূর্ণ অবাঙ্গালী, অর্থাৎ ইংরেজিশিক্ষাভিমানী রুচিবিলাসী নাগরিক না হইলে, সাহিত্যে তাহার স্থান নাই। দীনবন্ধুর নাটকীয় প্রতিভার আলোচনা প্রসঙ্গে এইরূপ বিস্তৃত ভূমিকার প্রয়োজন আছে।

দীনবন্ধুর প্রথম নাটক 'নীলদর্পণ'। এই নাটক হইতেই তাঁহার প্রতিভার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এই নাটকখানি অবলম্বন করিয়াই আমি তাঁহার সাহিত্যিক প্রবৃত্তি ও প্রেরণা, তাঁহার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনা করিব। 'নীলদর্পণ' রচনায় যে সাময়িক উদ্দেশ্য স্পষ্ট হইয়া আছে, তাহার উল্লেখের প্রয়োজন নাই—এই নাটকে, তাঁহার সকল ত্রুটি সত্ত্বেও, আমরা বাংলাসাহিত্যে যে নূতন প্রতিভার পরিচয় পাই এবং যাহা এ-পর্য্যন্ত আর কোন নাট্যকারের কল্পনায় তেমন করিয়া স্ফূর্ত্তিলাভ করে নাই, তাহারই কিঞ্চিৎ বিস্তারিত উল্লেখ করিব। 'নীলদর্পণে'র ঘটনাবস্তু (action) melodrama-য় অবসিত হইয়াছে, মাত্রাতিরিক্ত emotion-এর উপর বিশেষ জোর দেওয়ার প্রয়োজনে লেখকের কল্পনা সংযম হারাইয়াছে; তা' ছাড়া লেখক এখানে স্বল্পবস্তু-সম্বল লইয়া, সাধারণ চরিত্র অবলম্বনে নাটকখানিকে ট্রাজেডির ছাঁচে ঢালিতে গিয়া বিফলমনোরথ হইয়াছেন। এই সকল কথা ছাড়িয়া দিয়াও 'নীলদর্পণ' নাটকে এক শ্রেণীর চরিত্র-চিত্রণে লেখকের যে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়—তাহা সত্যই বিস্ময়কর। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে—'পরচিত্ত অন্ধকার,'

কিন্তু যে উৎকৃষ্ট নাটকীয় কল্পনায় এই পরচিত্ত আর অন্ধকার থাকে না, এই নাটকে দীনবন্ধু বাংলার কৃষক ও কৃষক-কন্যাদের চিত্ত সেইভাবে আলোকিত করিয়াছেন—দেশ-কালপাত্র-পরিচ্ছিন্ন মানব-হৃদয়ের অতি নিগূঢ় সংবেদনা আশ্চর্য্য লিপি-কৌশলে সাহিত্যে প্রতিফলিত করিয়াছেন। ট্রাজেডি-রচনার অবকাশ এখানে ছিল না; পূর্ব্বেই বলিয়াছি দীনবন্ধুর রস-প্রেরণা ট্রাজেডির অনুকূল নহে,—এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব। প্রতিকূল ঘটনার বজ্রবিদ্যুতালোকে কোনও একটি সামান্য চরিত্রকে গভীরভাবে উদ্ভাসিত করার যে কাব্যকল্পনা, তাহা হইতেও ট্রাজেডির সৃষ্টি হয়—সে নাটক-রচনায় নাটকীয় প্রতিভার সঙ্গে অত্যুৎকৃষ্ট কবি-প্রতিভাও যুক্ত থাকে। কিন্তু নাটকীয় প্রতিভার যথার্থ বৈশিষ্ট্য ইহাই নহে; যে বিশিষ্ট শক্তির জন্য সেক্‌স্‌পীয়ারের এত বড় কবিগুণকেও অতিক্রম করিয়া তাঁহার নাটকীয় প্রতিভাই বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে তাহা—সর্ব্বসমাজের ও সর্ব্বশ্রেণীর ব্যক্তি-চরিত্রে, পরকায়-প্রবেশের মত প্রবেশ করিবার শক্তি। দীনবন্ধু এই নাটকে সেই শক্তির যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা সত্যই অনন্যসুলভ। তিনি একশ্রেণীর বাঙ্গালী-জীবনে যে ভাবে প্রবেশ করিয়াছেন, সে জীবনের সাধারণ অনুভূতির ভাষা ও ব্যক্তিগত অনুভূতি-প্রকাশের স্বরভঙ্গী পর্য্যন্ত যেভাবে আত্মসাৎ করিয়াছেন তাহাতেও যদি বিস্মিত হইবার কারণ না থাকে, তাহা হইলে, তিনি এই নাটকের সেই চরিত্রগুলিকে যে স্ব-ভাবের সূক্ষ্ম সমগ্রতায় চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নাটকীয় কল্পনার অসামান্যতাই সূচিত হইয়াছে। আজিকার এই তথাকথিত realism-এর দিনে এই চরিত্রগুলির পর্য্যালোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি, সকল 'ism'-এর মত এই realism-ও একটা তত্ত্ব—একটা মানস-প্রসূত অভিমান মাত্র; যে কল্পনাশক্তি সকল সাহিত্যসৃষ্টির প্রথম ও শেষ উপজীব্য তাহার ফলে real যে সত্যকার real-রূপ পরিগ্রহ করে তাহার প্রমাণ ইহাতে আছে। রস যে কি বস্তু তাহা বাক্যের দ্বারা, সংজ্ঞার দ্বারা, নির্দ্দিষ্ট হয় না বটে, কিন্তু দীনবন্ধুর এই সকল real চরিত্র-সৃষ্টির মধ্যেই সর্ব্ববিধ তুচ্ছতা ও মলিনতা ভেদ করিয়া সেই রস উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ রস-সৃষ্টির দুই একটি দৃষ্টান্ত দিব। আধুনিক 'কাঁচি-ছাঁটা'-পন্থী রুচিবাগীশ পাঠক শিহরিয়া উঠিবেন জানি; কিন্তু আমরা এখানে লিরিক-কল্পনার বেল-জুঁইএর কথা বলিতেছি না—নাটকীয় কল্পনায় ঝিঙাফুল ও মটরফুলের পরিচয় করিতেছি; আবশ্যক হয়, রুচিবাগীশেরা চক্ষু আবৃত করুন।

বেগুনবেড়ের কুঠির গুদামঘরে কয়েকজন রাইয়ত বসিয়া আছে; ইহাদিগকে জোর করিয়া নীলের দাদন লওয়াইবার জন্য এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার জন্য, নীলকর সাহেবের কর্ম্মচারী ধরিয়া আনিয়াছে। তাহাদের তিনজনের কথোপকথনের আরম্ভটি মাত্র উদ্ধৃত করিলাম; পাঠক দেখিবেন, ইহার মধ্যেই, চাষার বুদ্ধি ও চাষার প্রাণ, চাষার ভাষায় কি

সহজ ও সুস্পষ্ট ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে—তাহাদের মুখভঙ্গি পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে; একই অবস্থায় একই শ্রেণীর চরিত্র কেমন ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যে সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে!—

প্রথম রাইয়ত। কুঁদির মুখি বাঁক থাকবে না, শ্যামচাঁদের ঠ্যালা বড় ঠ্যালা। মোদের চকি কি আর চামড়া নেই, না মোরা বড় বাবুর নুন খাইনি;—করবো কি, সাক্ষী না দিলি যে আস্ত রাখে না। উট সাহেব মোর বুকি দাঁড়িয়ে উটেলো, তাখ্‌দিনি অ্যাকন তবাদি জক্ক ঝোক্কানি দিয়ে পড়্‌চে; গোড়ার পা ঝ্যান বল্‌দে গোরুর খুর।

দ্বিতীয়। প্যারেকর খোঁচা;—সাহেবেরা যে প্যারেকমারা জুতো পরে, জানিস নে?

তোরাপ। (দন্ত কিড়মিড় করিয়া) জুতোর প্যারেকের মার প্যাট করে, লৌ দেখে গাড়া মোর ঝাঁকি মেরে ওট্‌চে। উঃ! কি বল্‌বো, গুমিন্দিরি অ্যাকবার ভাতারমারির মাঠে পাই, এম্‌নি থাপ্পোড় ঝাঁকি, গুমিন্দির চাবালিডে আসমানে উড়িয়ে দেই, ওর গ্যাড্‌ ম্যাড্‌ করা হের ভেতর দে বার করি।

—নীলদর্পণ, দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক।

তোরাপের প্রকৃতি প্রথম রাইয়তের ঠিক উল্টা; যে মূক পশুবৎ সহিষ্ণুতাই এ অবস্থায় বুদ্ধির নিদর্শন প্রথম রাইয়তের [illegible]ছে; সে বুদ্ধিমান,—ইতরভদ্রনির্ব্বিশেষে এ চরিত্র আমাদের দেশে অতিশয় সুলভ। [illegible] দেহের উপর এতখানি অত্যাচারের কথা সে কেমন স্থির নির্ব্বিকার ভাবে উল্লেখ করিল! কেবল এইটুকুমাত্র গালি দিয়াই নিরস্ত হইল যে—গোড়ার (গুওটার) পা ঝ্যান বল্‌দে গরুর খুর। এই গালির মধ্যেও যে unconscious humour আছে তাহাই যেন এতখানি ব্যথার উপরে প্রলেপের কাজ করিতেছে। যাহারা মনে শিশুর মত দুর্ব্বল ও অসহায়, তাহাদের দেহের এই অপরিমিত শক্তি হইতেই তাহারা কতখানি ধৈর্য্য সংগ্রহ করে, এইটুকুর মধ্যে তাহার আভাস আছে।

তোরাপের কথাগুলিতে যে চরিত্র পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহা সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালের কবি-কল্পনাকে আকৃষ্ট করিয়াছে। তাহার বিশাল পেশীপুষ্ট দেহ—একটা বন্য পৌরুষের ছবি—একথাগুলিতে যেমন সুস্পষ্ট হইয়া উঠে, তেমনই এই ভাষার ভঙ্গিতেই তার অন্তরের বালকমূর্ত্তি এবং অকপট কুটিলতাহীন ক্রোধ যে রসের সৃষ্টি করে, তাহাতে একাধারে হাসি ও শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। 'লৌ দেখে গাড়া মোর ঝাঁকি মেরে ওট্‌চে'—এই একটি কথায় সে কোন্ জাতের মানুষ তাহা আমরা নিমেষে বুঝিয়া লই; চরিত্র-চিত্রণে এমন অব্যর্থ নাটকীয় কল্পনাই সেক্‌স্‌পীয়ারেরও গৌরব। কিন্তু তোরাপের চরিত্রে এই যে এখানে আদিম পশুটার মূর্ত্তি উঁকি মারিতেছে—তাহার ক্রোধপ্রকাশের ভঙ্গিতে সেই পশুরই শিশুরূপ দেখিয়া আমরা কৌতুক অনুভব করি; সেই পশুই একটি অকপট মনুষ্যত্বের মাধুর্য্যে মনোহর হইয়া উঠিয়াছে। তোরাপের ভাষাও লক্ষ্য করিবার বস্তু—এখানে ভাষার অসংযমই প্রাণের প্রাবল্য সূচনা করিতেছে। এ ভাষায় যে অশ্লীলতা আছে তাহা 'আর্টের' অশ্লীলতা নয়, চরিত্রগত দুর্নীতি নয়, এ অশ্লীলতায় ন্যায্য অধিকার কেবল এই চরিত্রেরই আছে; সে অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিতে চাহিবে, এত বড় রুচিবাগীশ ভগবানও নহেন—তোরাপ তাহাই

প্রমাণ করিয়াছে। এ ভাষার জন্ম হইয়াছে—আত্মাভিমানহীন নাটকীয় কল্পনার অব্যর্থ প্রেরণায়; তোরাপকে কবি কাঁচিছাঁটা করিয়া নিজের রুচি অনুসারে গড়েন নাই, কারণ, তিনি নাটক লিখিতেছেন, কাব্য করিতেছেন না।

কিন্তু দ্বিতীয় রাইয়তের ওই অতি-সংক্ষিপ্ত মন্তব্যটির দ্বারা আমরা এই নিরতিশয় সরল বোকা মানুষটিকে চিনিয়া লই; উহার মধ্যে যে অতিসূক্ষ্ম হাস্যরস রহিয়াছে তাহাও অল্প উপভোগ্য নহে। মুখটা বিজ্ঞের মত গম্ভীর করিয়া সে একটা খুব বড় খবর দিয়া নিজেও খুশী হইতে পারিয়াছে, তাহার সঙ্গীকেও যেন কতকটা আশ্বস্ত করিতে পারিয়াছে। আসলে, সে-ই সকলের চেয়ে হতভম্ব হইয়া আছে; সংসারের এই সকল অনর্থের কূলকিনারা পায় না বলিয়াই সে বেচারী যখন কোন-কিছুর একটা কারণ খুঁজিয়া পায়, তখনই যেন কতকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারে। এই চরিত্রের এই উক্তিটিতে একদিকে যেমন হাসির উত্তেজনা আছে, তেমনই এইরূপ অত্যাচারিত অসহায় কৃষক-জীবনের করুণতম বেদনা এই কথাগুলির মধ্যে স্তম্ভিত হইয়া আছে।

দীনবন্ধুর নাটকীয় প্রতিভার সম্যক আলোচনা এ প্রবন্ধের অভিপ্রায় নয়, এখানে সে আলোচনার স্থানও নাই। অধুনা-উপেক্ষিত, বিস্মৃতপ্রায় এই অসাধারণ শক্তিশালী লেখকের নূতন করিয়া কিছু পরিচয় দিবার স্পর্দ্ধা আমরা করিয়াছি। তথাপি 'নীলদর্পণ' নাটক হইতে আর একটি চিত্র উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না। এই নাটকে দীনবন্ধু একটি চাষার মেয়ে আঁকিয়াছেন; আমার মনে হয়, সমগ্র বাংলাসাহিত্যে এমন স্বভাবাঙ্কন কুত্রাপি নাই। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর মেয়ে আঁকিয়াছেন, তিনি তাহার নারীচরিত্রের মহিমার দিকটিই কবি-উপাসকের মত মুগ্ধদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়াছেন—সে চরিত্রের গভীরতা, তাহার অনির্ব্বচনীয় রহস্যশোভা তিনি পৌরুষ সহকারে উদ্ধার করিয়াছেন। দীনবন্ধুর "ক্ষেত্রমণি' নিতান্তই গ্রাম্য,—গ্রাম্য বলিয়াই, তাহার নারীত্ব-মহিমা নয়—নারী-প্রকৃতির আদি-স্বভাব, মাত্র বাংলাদেশের গ্রাম্য গার্হস্থ্য সংস্কারে মার্জ্জিত হইয়া যে ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার সেই সারল্য, কোমলতা ও দৃঢ়তায় চাষার মেয়েও খাঁটি বাঙ্গালীর মেয়ে হইয়াই দেখা দিয়াছে। যে অবস্থায় ক্ষেত্রমণির এই চরিত্র নাটকীয় কল্পনায় ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে, সে অবস্থায় আজিকার ক্ষেত্রমণিরা কি করে জানি না, তথাপি দীনবন্ধুর এ চিত্রাঙ্কনে কাব্যকল্পনার লেশমাত্র নাই বলিয়াই মনে হয়। সে অবস্থায় সে চরিত্রের যে বিকাশ আমরা লক্ষ্য করি, তাহা একটা বিশিষ্ট সংস্কারের ফল বলিয়াও যেমন বুঝিতে পারি, তেমনই, নারীচরিত্রের একটি অতি স্বাভাবিক—এমন কি, অতিশয় আদিম প্রাকৃতিক লক্ষণ ইহাতে রহিয়াছে বলিয়া প্রতীতি জন্মে। আমি 'নীলদর্পণ' নাটকের একটি অতি দুরূহ ও নিদারুণ দৃশ্যের কথা বলিতেছি —এ দৃশ্যে দীনবন্ধুর নাটকীয় প্রতিভার একটি অগ্নি-পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। নীলকর সাহেব পদী-ময়রাণীর সাহায্যে ক্ষেত্রমণিকে কৌশলে হরণ করিয়া তাহার শয়ন-কক্ষে বন্দী করিয়াছে;

মিষ্ট কথায়, ও পরে ভয় দেখাইয়া, জোর করিয়া তাহার ধর্ম্মনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে। দৃশ্যের সে অংশটি এইরূপ—

ক্ষেত্র। ময়রা-পিসি, যাস্‌নে; ময়রা-পিসি যাস্‌নে।

[পদী ময়রাণীর প্রস্থান]

মোরে কালসাপের গত্তের মধ্যে একা রেখে গেলি? মোর যে ভয় করে, মুই যে কাঁপতে নেগেচি; মোর যে ভয়েতে গা ঘুরতে নেগেছে, মোর মুখ যে তেষ্টায় ধুলো বেটে গেল।

রোগ। ডিয়ার,—(দুইহস্তে ক্ষেত্রমণির দুই হস্ত টানন) আইস, আইস—

ক্ষেত্র। ও সাহেব! তুমি মোর বাবা, ও সাহেব! তুমি মোর বাবা, মোরে ছেড়ে দাও, পদীপিসির সঙ্গে দিয়ে মোরে বাড়ী পেটিয়ে দাও; আঁদার রাত, মুই একা যাতি পারবো না—(হস্ত ধরিয়া টানন) ও সাহেব, তুমি মোর বাবা, হাত ধল্লি জাত যায়, ছেড়ে দাও, তুমি মোর বাবা।

রোগ। তোর ছেলিয়ার বাবা হইতে ইচ্ছা হইয়াছে; আমি কোন কথায় ভুলিতে পারি না; বিছানায় আইস, নচেৎ পদাঘাতে পেট ভাঙ্গিয়া দিব।

ক্ষেত্র। মোর ছেলে মরে যাবে—দই সাহেব,—মোর ছেলে মরে যাবে,—মুই পোয়াতী।

রোগ। তোমাকে উলঙ্গ না করিলে তোমার লজ্জা যাইবেনা। (বস্ত্র ধরিয়া টানন)

ক্ষেত্র। ও সাহেব! মুই তোমার মা, ন্যাংটো করো না; তুমি মোর ছেলে, মোর কাপড় ছেড়ে দাও। (রোগের হস্তে নখ বিদারণ)

রোগ। ইন্‌ফরস্যাল্ বিচ্? (বেত্র গ্রহণ করিয়া) এইবার ছেনালি ভঙ্গ হইবে।

ক্ষেত্র। মোরে অ্যাকবারে মেরে ফ্যাল, মুই কিছু বল্‌বো না; মোর বুকি একটা তেরোনালের খোঁচা মার্, স্বগ্‌গে চলে যাই,—ও গুখেগোর বেটা, আঁটকুড়ীর ছেলে, তোর বাড়ী ঘোড়া মরা মরে না? মোর গায়ে যদি হাত দিবি তোর হাত মুই এঁচ্‌ড়ে কেম্‌ড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করবো। তোর মা বুন নেই, তাদের কাপড় কেড়ে নিগে যা; দেঁড়িয়ে রলি কেন? ও ভাইভাতারীর ভাই; মার্‌না, মোর পরাণ বার করে ফ্যাল্ না, আর যে মুই সইতি পারি নে।

রোগ। চোপরাও হারামজাদী—ক্ষুদ্র মুখে বড় কথা! (পেটে ঘুসি মারিয়া চুল ধরিয়া টানন)

ক্ষেত্র। কোথায় বাবা! কোথায় মা! দেখ গো তোমাদের ক্ষেত্র মলো গো! (কম্পন)

ইহারই নামই ভাষা! এ যেমন সাধুভাষা নয়, কথ্য কাব্যি-ভাষাও নয়—তেমনিই এ কেবল চাষার ভাষাই নয়; এ ভাষার শব্দ-গ্রন্থনে মনুষ্যহৃদয়ের আদিম ভাষাকে বাংলারীতির মধ্যে বাঁধিয়া দিতে হইয়াছে—এ ভাষার উপাদানে, মৃত্তিকার প্রতিমার মত, একটা নাটকীয় অবস্থার চরিত্র গড়িতে হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যের দুর্ভাগ্য যে, এ ভাষার এ প্রয়োজন এখন আর নাই; নাই বলিয়াই বাংলাভাষা এখন কুলত্যাগিনী হইয়া 'রোগ্'-এর ভাষায় পরিণত হইয়াছে।

এই দৃশ্যের এইটুকুর মধ্যেই অসহায়া নারীর যে অবস্থা-সঙ্কট চিত্রিত হইয়াছে তাহার তীব্রতা ও নিদারুণতার কারণ এই যে, নৃশংস হিংস্রজন্তুর আক্রমণে যেন শশকশিশু তাহার সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু তাহার নখ-দন্ত তাহার প্রাণের মতই কোমল, ফুল বজ্র হইয়া উঠিতে পারিল না। জীবনের এত বড় নির্ম্মম কঠোর দিকটা

যে কখনও দেখে নাই—নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের সারল্যে যে আজন্ম লালিত, চাষার ঘরের নির্বোধ মেয়ে যাহার হৃদয়-মন গঠিত, সে যখন সহসা জগতের এই নিষ্করুণ লোলুপতার মূর্ত্তি দেখিল, তখন তাহার আত্মরক্ষার যে প্রয়াস আমরা দেখি, তাহাতে ট্রাজেডির নায়িকা-সুলভ আচরণ বা বাক্য-বিন্যাস নাই; অজগর সর্পের আক্রমণে ক্ষীণপ্রাণা পক্ষীমাতার যে নিতান্ত নিষ্ফল আর্ত্তচীৎকার ও নখরপাত—এখানে তাহাই স্বাভাবিক; প্রাণের প্রবল আকুলতা দুর্ব্বল দেহের বাধা অতিক্রম করিতে পারিতেছে না। এই অতি অশ্লীল দৃশ্যে, গ্রাম্য নারীচরিত্রের গ্রাম্য-ভাষায়, দীনবন্ধু এই একটা জীবনের সত্য—criticism of life—এখানে কাব্যরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। ক্ষেত্রমণি যখন মরিয়া গেল, তখন তাহার মায়ের মুখ দিয়া লেখক যে চরম খেদোক্তি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতেও তাঁহার উৎকৃষ্ট নাটকীয় কল্পনা ও সুগভীর চরিত্রানুভূতির অব্যর্থ পরিচয় রহিয়াছে। ক্ষেত্রমণির শবদেহ-বাহকের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া রেবতী বলিতেছে—

> মুই সোনার নক্ষি ভেসিয়ে দিতে পারবো না। মা রে মুই কনে যাব রে? সাহেবের সঙ্গি থাকা যে মোর ছিল ভাল মা রে।

পাঠককে বোধ করি বলিয়া দিতে হইবে না, ইহার কোন্ কথাটি দীনবন্ধুর স্থান-কাল-পাত্র-কল্পনা ও সহানুভব-শক্তির সাক্ষ্য দিতেছে।

এই সকল চিত্র ও চরিত্রসৃষ্টিতে দীনবন্ধুর নাটকীয় কল্পনার মূলে যে কবিদৃষ্টি রহিয়াছে তাহার বৈশিষ্ট্য বুঝিতে বিলম্ব হয় না। দীনবন্ধুর স্বভাব-প্রেরণা, ট্রাজেডি বা অতি উচ্চ ভাব-কল্পনার বিরোধী, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিনি বাঙ্গালী-জীবন হইতে রসের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন; সে রস অতি গভীর ভাবকল্পনার রস নয় এই জন্য যে, তিনি যাহা দেখিয়াছেন, তাহারই তদ্‌ভাবে মুগ্ধ হইয়াছেন, আর কিছু দ্বারা পূরণ করিয়া লন নাই। করুণরস বাঙ্গালীর জীবন-কাহিনীতে যথেষ্ট আছে; এবং বাঙ্গালী চরিত্রে, তাহার অতিসঙ্কীর্ণ জীবন-পরিধির মধ্যেই, অতি ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখও ভাব-গভীর অন্তর্বিপ্লবের সৃষ্টি করিতে পারে। কিন্তু নাটকের ঘটনা-চিত্রে, জীবনের পরিদৃশ্যমান কর্ম্মরঙ্গভূমিতে সে চরিত্রের এমন মূর্ত্তি প্রকাশ পায় না, যাহাতে নাটকীয় ট্রাজেডি-রচনা সম্ভব হয়। বঙ্কিমচন্দ্র অতীতের কাল্পনিক ইতিহাস আশ্রয় করিয়া যাহা রচনা করিয়াছিলেন তাহা নাটকীয় কল্পনা অপেক্ষা কবি-কল্পনারই উপযোগী, তাই বঙ্কিমের প্রতিভায় নাটকীয় গুণ থাকিলেও তাঁহার কল্পনা গদ্য-রোমান্সেই সার্থক হইয়াছে। এককালে কল্পনার এই কাব্য-প্রবৃত্তি বাঙ্গালী লেখককে অভিভূত করিয়াছিল; বাঙ্গালীর জীবনে যাহা নাই, কল্পনায় তাহা পূরণ করিয়া সাহিত্যে নিছক কাব্যরসসৃষ্টির উদ্যোগ চলিয়াছিল।) একটা দৃষ্টান্ত দিব। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'ফুলজানি' উপন্যাস এককালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল; রবীন্দ্রনাথও এই উপন্যাসের একটি উপাদেয় সমালোচনা

লিখিয়াছিলেন। এই উপন্যাসে সেকালের বাঙ্গালী সমাজ, বাঙ্গালী জীবন ও বাংলার পল্লী-প্রকৃতি লেখকের সহজ সহানুভূতি-কল্পনায় চিত্রিত হইয়াছে। দীনবন্ধুর ক্ষেত্রমণি-চরিত্রের যে অংশ নীলদর্পণ-নাটকের দৃশ্যগুলির অন্তরালে রহিয়া গিয়াছে, তাহাই উচ্চতর সমাজের মার্জ্জিত পরিচ্ছন্নরূপে এই উপন্যাসের ফুলকুমারীর চরিত্র-চিত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইহার শেষের দিকে, ঠিক ক্ষেত্রমণির মতই ফুলের যে অবস্থা-সঙ্কট কল্পিত হইয়াছে এবং সেই অবস্থায় তাহার চরিত্রে যে ট্রাজেডি-সুলভ নায়িকা-বৃত্তি আরোপ করা হইয়াছে, তাহাতে কাহিনীর পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা হয় নাই; ফুলকে আর ফুল বলিয়া চিনিতেই পারা যায় না। ঘটনা অসম্ভব না হইলেও এ উপন্যাসের পক্ষে রসবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়; পাঠকের চিত্ত বিস্ময়-বিহ্বল হয় সত্য, কিন্তু সেখানে ট্রাজেডির যে বেদনা আমরা অনুভব করি, তাহার কারণ—আমাদের এই অতি পরিচিত বাঙ্গালী মেয়েটির সেই অভাবনীয় রূপান্তর। যে জীবনের যে রস-কল্পনায় এই উপন্যাসের উৎপত্তি, এবং কতক পরিমাণে পরিণতিও বটে—শেষাংশের ট্রাজেডি যতই সুকল্পিত হউক—সে জীবনের পক্ষে তাহা যেন নিতান্তই আগন্তুক, আভ্যন্তরীণ নহে।

বাঙ্গালী জীবন ও বাঙ্গালী চরিত্রের এই সংকীর্ণ গণ্ডিকে আশ্রয় করিয়াই দীনবন্ধুর নাটকীয় কল্পনা স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল; এ জীবনে যে উপকরণ সুলভ দীনবন্ধুর প্রতিভা তাহার সম্পূর্ণ উপযোগী। এই লোকায়ত অতি-সাধারণ সুখ-দুঃখকে নাটকাকারে প্রকাশ করিতে হইলে যে রস-প্রেরণা নাটক-রচনার পক্ষে সঙ্গত, দীনবন্ধুর তাহাই ছিল সহজাত শক্তি। এই রস হাস্য-রসই বটে, কিন্তু ইহা সাধারণ ভাঁড়ামী বা রঙ্গরস নহে; ইহা বৃহত্তর অনুভূতি-কল্পনার হাস্য-রস। এক হিসাবে যাবতীয় রসের মধ্যে এই রস শ্রেষ্ঠ। দীনবন্ধুর রচনায় যে অতিরিক্ত কৌতুক-হাস্যের প্রাচুর্য্য আমাদিগকে সহজেই আকৃষ্ট করে, তাহাই যদি তাঁহার একমাত্র কৃতিত্ব হইত, তাহা হইলে তাঁহার প্রহসনগুলির মধ্যে উৎকৃষ্ট নাটকীয় গুণের সমাবেশ আমরা দেখিতে পাইতাম না। সেই প্রবল কৌতুক-হাস্য-প্রিয়তার মধ্যেও দীনবন্ধুর নাটকীয় কল্পনা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই। উৎকৃষ্ট হাস্যরস উৎকৃষ্ট কাব্য-কল্পনার মতই দুর্ল্লভ; কারণ, উভয়ের মধ্যেই জগৎ ও জীবনকে গভীর ভাবে দেখিবার শক্তি আছে। উৎকৃষ্ট হাস্যরসের মূলে যে কল্পনা-দৃষ্টি আছে তাহা অনেকটা এইরূপ। জীবনের যত কিছু দ্বন্দ্ব, দুঃখ, দুর্গতি ও দুর্ব্বুদ্ধি—সকলের মধ্যেই একটা সমান নিরর্থকতার লীলা আছে; উত্তম-অধম, শ্রেষ্ঠ-নীচ, পাপ-পুণ্য, শক্তি-অশক্তি প্রভৃতি যাবতীয় ভেদ-বুদ্ধি ও তর-তম—সংস্কারের মূলে আছে মানুষের বেরসিক-সুলভ আত্মাভিমান। এই জগৎব্যাপী নিরর্থকতাকে সার্থক করিয়া তুলিবার একমাত্র উপায়—সকল ব্যক্তি সকল ঘটনাকে একটা বিরাট হাস্যরসাত্মক অভিনয়ের অঙ্গরূপে উপভোগ করা। তখন দেখিতে পাইবে, যে দুষ্ট তাহারও আত্মাভিমান যেমন বৃথা, যে শিষ্ট তাহারও আত্মপ্রসাদ তেমনই কৌতুককর। এই অভিনয়-রস-বোধ লাভ করিতে হইলে নিজকে দর্শকের স্থানে বসাইতে হয়, আভিনয়িক ব্যাপারের প্রতি ব্যক্তিগত লৌকিক

সংস্কার ত্যাগ করিতে হয়। অতএব উৎকৃষ্ট হাস্যরসের মূলে একটা অতি উচ্চ রস-কল্পনা আছে। এইরূপ রস-কল্পনায় মানুষের প্রতি বা সৃষ্টির প্রতি নির্ম্মম ব্যঙ্গের ভাব নাই; কারণ, অতি ব্যাপক সহানুভূতিই এই হাস্যরসের নিদান। এই ভাব-দৃষ্টির দ্বারা মানুষকে দেখিতে পারিলে তাহার সর্ব্ব অভিমান নিরর্থক বলিয়াই যেমন হাস্যকর হইয়া ওঠে, তেমনই সেই হাসির অন্তরালে একটি সুগভীর সহানুভূতি প্রচ্ছন্ন থাকে—ঐ সহানুভূতি আছে বলিয়াই পরিহাসও 'রস' হইয়া উঠে, হাস্যরস কবিকল্পনার অভিষিক্ত হয়।)

(দীনবন্ধুর কল্পনা যেখানে যে চরিত্রাঙ্কণে সর্ব্বাপেক্ষা সফল হইয়াছে, সেখানেই উৎকৃষ্ট হাস্যরসের সাহায্য লইয়াছে। তাঁহার 'নীল-দর্পণ' নাটকের অতি করুণ ও বীভৎস ঘটনা-সমাবেশের মধ্যেও এই হাস্যরসের যে প্রাচুর্য্য আমরা দেখিতে পাই, তাহা সম্ভব হইত না, যদি জীবনের দুঃখ-দুর্দ্দশা ও পাপ-দম্ভের উপরে তাঁহার উদার রস-কল্পনা জয়ী না হইত; অত্যাচারী ও অত্যাচারিত উভয়ের মধ্যে তিনি যে হাসি প্রসারিত করিয়াছেন তাহা যে কোথাও রসভঙ্গ করে নাই, তার কারণ, তাঁহার সেই ব্যক্তি-নিরপেক্ষ উদার রস-কল্পনা। করুণকেও উজ্জ্বলতর করিবার জন্য তিনি হাস্যরসের অবতারণা করেন; কারণ, এই জাতীয় রসসৃষ্টিতে করুণ ও হাস্য তুল্যমূল্য। এই হাস্যরসই যে দীনবন্ধুর প্রতিভার মূল প্রেরণা, তাঁহার কল্পনা যে আর কোনও পথে রসসৃষ্টি করিতে পারে না, তার দৃষ্টান্তও এই 'নীলদর্পণ' নাটক; এই নাটকেই তিনি পৃথকভাবে করুণরসের সৃষ্টি করিতে গিয়া একেবারে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। প্রশ্ন উঠিতে পারে, তাঁহার হাস্যরস উৎকৃষ্ট হইলেও তাহার পরিসর-ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ, অর্থাৎ তিনি এই হাস্যরসের প্রেরণায় যে চরিত্রগুলি সৃষ্টি করিয়াছেন, সেগুলি চরিত্রহিসাবেও নিতান্তই সাধারণ। ইহার একমাত্র উত্তর—তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে তিনি যাহা ভালো করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাহাই নাটকাকারে গ্রথিত করিয়াছেন। কিন্তু, একথা ভুলিলে চলিবে না, নাটকের বিষয়ীভূত কোনও চরিত্রই সামান্য হইতে পারে না,—যাহা আপাত-দৃষ্টিতে সামান্য তাহাই নাটকের সুলিখিত চিত্রে যে রস-রূপ ধারণ করে, তাহাতেই অসামান্য হইয়া উঠে। নাটকীয় কল্পনায় কোনও চরিত্রই সামান্য থাকে না—সকল চরিত্রই সমান মূল্যবান। তাই, দীনবন্ধুর 'নদেরচাঁদ'ও তাঁহার সৃষ্ট আর কোনও চরিত্র হইতে নিকৃষ্ট নহে; এখানে আদর্শের কথা নাই, রুচির কথা নাই, কাব্য-সৌন্দর্য্যের কথা নাই—আছে কেবল ব্যক্তি-চরিত্রের কথা। এই 'নদেরচাঁদ'ও আমাদিগকে আকৃষ্ট করে কোন্ গুণে? এতবড় একটা দুশ্চরিত্র মূর্খও আমাদের রসবোধ তৃপ্ত করে কেমন করিয়া? সে কি কেবল নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের পাত্র হইয়া? না, লেখকের উদার হাস্যরসে অভিষিক্ত হইয়া সেও তাহার মনুষ্যসুলভ দুর্ব্বলতার প্রতি আমাদের—সজ্ঞানে না হউক অজ্ঞানে—আত্মীয়তা আকর্ষণ করে? ইহাই দীনবন্ধুর হাস্যরসের বৈশিষ্ট্য—বাংলা নাটকে এ বৈশিষ্ট্য আর কাহারও নাই।)

দীনবন্ধু প্রহসন লিখিয়াছেন, সে প্রহসনে ভাষাগত আমোদ-কৌতুকের অন্ত নাই; তথাপি সেই ব্যঙ্গাত্মক বিকৃতি ও অতিশয়োক্তির মধ্যেও দীনবন্ধুর হাস্যে উৎকৃষ্ট কল্পনা-গুণের পরিচয় আছে। দীনবন্ধুর ভাষায়, আমরা কৌতুক-প্রবণতার যে আতিশয্য আছে বলিয়া মনে করি, তার একটা কারণ এই যে, এককালে আমাদের সমাজে যে প্রাণখোলা উচ্চহাস্যের ভাষা অতিশয় সহজ ছিল, তাহা আমরা ভুলিয়াছি; সে প্রাণও যেমন নাই, তেমনই তাহার ভাষাও আজ আমাদের নিকট নিছক প্রহসনের ভাষা বলিয়া মনে হয়। দীনবন্ধুর 'বিয়েপাগ্‌লা বুড়ো' প্রহসন হিসাবে আজিও অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া আছে। কিন্তু প্রহসনের প্রয়োজনে এই গ্রন্থে তিনি যে 'পেঁচোর মা' চরিত্রটি সৃষ্টি করিয়াছেন—মনে হয়, প্রহসনের বাহিরেও তাহার একটা বাস্তব অস্তিত্ব আছে; সে চরিত্রের প্রত্যেক রেখাটি এমনই সযত্নে অঙ্কিত যে, তার কতখানি স্বাভাবিক ও কতখানি আতিশয্যঘটিত, তাহা বলা কঠিন। এই প্রহসন হইতেই দীনবন্ধুর হাস্যরসে উচ্চাঙ্গের নাটকীয় কল্পনার একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিব। বিয়েপাগ্‌লা বুড়ো যখন আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বিবাদ করিয়া, যুবা সাজিয়া, নকল শালী-শালাজের কান-মলা সহ্য করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও শেষে কাঁদিয়া ফেলে, এবং 'মলাম, গিচি, মেরে ফেল্লে,—ও রামমণি!' বলিয়া তাহার বৃদ্ধবয়সের একমাত্র পালয়িত্রী ও রক্ষয়িত্রী বর্ষীয়সী বিধবা কন্যার নাম ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠে, তখন এই কৌতুকাভিনয়ের মধ্যেই মুহূর্ত্তের জন্য মানুষের করুণতম অদৃষ্টই হাসিয়া উঠে। নিজ বার্দ্ধক্য অস্বীকার করিয়া যে-বৃদ্ধ বিগত-যৌবনের অভিনয় করিতেছে, সে যে কিছুতেই জরাকে ফাঁকি দিতে পারিতেছে না, নিমেষের মোহও টিঁকিতেছে না—সে যে সত্যই শিশুর মত অসহায়, এবং একটুতেই আকুল হইয়া মাতৃস্থানীয়া রামমণিকে তাহার স্মরণ করিতে হয়,—নিয়তির সহিত কঠিন সংগ্রামে বিমূঢ় মানবের এই অবস্থা যেমন হাস্যোদ্দীপক, তেমনই শোকাবহ। কিন্তু এই রীতিমত প্রহসনের দৃশ্যেও যে-কল্পনা রাজীবলোচনের মুখে ওই 'ও রামমণি!' বলাইয়াছে, তাহাকে কি নাম দিব? প্রহসনের মধ্যেও এইরূপ হাস্যরসের দৃষ্টান্ত কি আর কোথাও মিলিবে? দীনবন্ধুর প্রতিভার এই অনন্যসাধারণতা যে উপলব্ধি না করিল, বাংলাসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট রসাস্বাদ হইতে সে বঞ্চিত হইয়া আছে।

পৌষ, ১৩৩৮

রবীন্দ্রনাথ

(বর্ত্তমান বাংলাসাহিত্যের মর্ম্ম-মূল হইতে তাহার শাখা প্রশাখার পত্র-পল্লবে যে গূঢ়-সঞ্চারী প্রাণরস প্রবাহিত হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাই যে তাহার প্রধান, অথবা প্রায় একমাত্র উৎস, এ কথা অত্যুক্তি নহে। রবীন্দ্রনাথ যেন ইহার ভিত্তি হইতে শিখর পর্য্যন্ত সমুদয় বদলাইয়া দিয়াছেন; তিনি কেবল এ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন নাই—ইহাকে নূতন করিয়া সংস্থাপিত করিয়াছেন। আর কোনও সাহিত্যে কোনও একজনের সৃষ্টিশক্তি এতখানি প্রভাবশালী হইতে দেখা যায় নাই।)

(ইতিপূর্ব্বে বাংলাসাহিত্যের অধিনায়ক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমের প্রতিভাই বাংলা-ভাষায় সর্ব্বপ্রথম আধুনিক সাহিত্যের পত্তন করিয়াছিল, বাঙ্গালীর রসবোধের উদ্বোধন ও সাহিত্যিক রুচির সংস্কারসাধনে ব্রতী হইয়াছিল। এই আধুনিক সাহিত্যের প্রবর্ত্তনায় মাইকেল যেমন কবি-কল্পনাকে মুক্তির আশ্বাসে সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন, বঙ্কিম তেমনই বাঙ্গালীর রসবোধ জাগ্রত ও পুষ্ট করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন; তাঁহার প্রতিভায় বাংলাসাহিত্যের কৌলিন্য-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। সে হিসাবে বঙ্কিমই বাংলাসাহিত্যকে এক নূতন পথে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।) কিন্তু সে পথে অধিক দূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই বাংলাসাহিত্যের পুনরায় গতি-পরিবর্ত্তন হইল; এই পরিবর্ত্তন যেমন সম্পূর্ণ বিপরীত, তেমনই গভীর ও ব্যাপক। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসাধনায় আমরা যে মন্ত্রের পরিচয় পাই, পরবর্ত্তী যুগে যদি তাহারই প্রসার ঘটিত তবে বাংলাসাহিত্য তাহাতে কোন্‌দিকে কতখানি লাভবান হইত সে আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। আমরা জানি,(সে সাধনার ধারা বাংলার সাহিত্য-ভূমিকে উর্ব্বর করিয়া, পরে প্রায় লুপ্ত হইয়াছে, এবং তাহার স্থানে রবীন্দ্রনাথের সাধন-মন্ত্রই এ যাবৎ জয়ী হইয়া আছে।) আমরা কেবল ইহাই দেখিব যে এ ঘটনা সম্ভব হইল কেমন করিয়া, রবীন্দ্রনাথের সাধন-মন্ত্রের বৈশিষ্ট্য কি,—সে প্রভাবের বিস্তার ও গভীরতা কতখানি। এজন্য প্রথমে রবীন্দ্রনাথের কবি-মানস এবং একালে সেই মানস-ধর্ম্মের সাহিত্যিক প্রয়োজন চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক। ইহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের মুখ্য বিষয়; আশা করি, ইহা হইতেই আর সকল প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারিবে।

(বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার একটা লক্ষণ এই যে, তাহাতে য়ুরোপীয় সাহিত্যের বিশিষ্ট প্রেরণা বাংলাসাহিত্যে সেই প্রথম পূর্ণভাবে সঞ্চারিত হইয়াছিল।) বাঙ্গালীর ভাবানুভূতির ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র যে কাব্যলোক উদ্‌ঘাটিত করিলেন তাহাতে মানুষের মনুষ্যত্ব-পিপাসার সঙ্গে একটি মহিমা-বোধ যুক্ত হইল, সাহিত্যে এই জগৎ ও জীবন এক নূতন ভাব-কল্পনায় মণ্ডিত হইল; ভারতীয় সাহিত্যের সুচির-প্রতিষ্ঠিত রসের আদর্শ বিচলিত হইল; কবিকল্পনা অতি

গভীর হৃদয়-সংবেদনাকে আশ্রয় করিয়া বাস্তবকেই এক নূতন রস-রূপে বৃহৎ ও মহিমময় করিয়া তুলিল। বহিঃপ্রকৃতি ও মানব-হৃদয় এই উভয়ের সাক্ষাৎ ঘনিষ্ঠতর পরিচয়ে অন্তর মথিত হইয়া যে রসের উৎসার হয়—প্রকৃতি ও পুরুষের মিলন-জনিত সেই গভীর অতৃপ্তির রসোল্লাস—সেই একজন বাঙ্গালীর প্রতিভায় খাঁটি য়ুরোপীয় আদর্শে কাব্য-সৃষ্টির শক্তি লাভ করিয়াছিল। রূপ-রস-পিপাসার সঙ্গে উৎকৃষ্ট কল্পনা-শক্তির সমাবেশ ঘটিলে কিরূপ কাব্যসৃষ্টি হয়—এই প্রকৃতি-পারবশ্যই পুরুষের চিত্তে কি রস-প্রেরণার সঞ্চার করে, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে বাঙ্গালী তাহার পরিচয় পাইল। কিন্তু এ রসের চর্চ্চায় তাহার স্থায়ী অধিকার জন্মিল না। অতি দুর্ব্বল ভাবপ্রবণ হৃদয়ে কল্পনার সংযম রক্ষা করা দুরূহ। এ সাহিত্যের রসবোধে যে বিবেক বা রুচির শাসন আবশ্যক, তাহা অতি সবল সুস্থ জীবন-চেতনা ব্যতীত সম্ভব নয়। তাই সাহিত্যে এই নবমন্ত্রের সাধনা বঙ্কিমের দৈবী প্রতিভায় যে সাফল্যলাভ করিয়াছিল, সে যুগের আর সকলের পক্ষে তাহা অনধিকারীর বিড়ম্বনা হইয়া দাঁড়াইল। কারণ, এ শক্তিসাধনার পক্ষে প্রাণ-মনের যে স্বাস্থ্যের প্রয়োজন, যে দৃঢ় ও অসঙ্কোচ অনুভূতি-বলে বস্তু ও ভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সাহিত্যে সেই ধরণের রস-রূপ প্রতিষ্ঠা করা যায়—বাঙ্গালীর জীবনধর্ম্মে তাহার অবকাশ ছিল না। তাই দেখা যায়, হেম-নবীনের কাব্য অধিকাংশ স্থলে ছন্দে-গাঁথা উচ্ছ্বাসময় গদ্য; যে প্রাকৃত ভাব-বস্তুর উপাদানে তাঁহারা কাব্য সৃষ্টি করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন তাহাতে ভাব অথবা বস্তু কোনটারই রস-পরিচয় নাই, তাই তাঁহাদের কাব্যের বাণী-রূপ এত দীন, এত অপরিচ্ছন্ন। কিন্তু তাহাতেই সে যুগের বাঙ্গালীর শব্দাড়ম্বর-প্রিয়তা ও অবোধ ভাবাতিরেক কিয়ৎপরিমাণে তৃপ্ত হইয়াছিল—সাধারণ শিক্ষিত বাঙ্গালীর রসবোধ যে ইহার উপরে উঠিতে পারে নাই, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কারণ নাই। যে, কপালকুণ্ডলা, কৃষ্ণকান্তের উইল, বিষবৃক্ষ পড়িয়া মুগ্ধ হয় তাহার নিকট বৃত্রসংহারও উপাদেয়! তাহার কারণ, বাঙ্গালীর অন্তরের বন্ধন-দশা তখনও ঘোচে নাই,—অন্ধকার গৃহে বসিয়া সে রন্ধ্র-পথে আলোক-শলাকা দেখিয়া মুগ্ধ হয় বটে, কিন্তু আলোক-পিপাসা তাহার জাগে নাই। য়ুরোপীয় কাব্যের আদর্শ তাহার রস-বোধের পক্ষে নিরর্থক—কাব্যের সে রস-রূপ তাহার দৃষ্টিগোচর হইলেও তাহাতে সাড়া দিবার মত চিৎ-শক্তি তাহার নাই। তাই বঙ্কিমের কল্পনা তাঁহার উপন্যাস কয়খানিতেই আবদ্ধ হইয়া রহিল, আর কাহারও প্রতিভায়, আর কোনো সাহিত্যিক রূপ-সৃষ্টিতে, সে কল্পনার প্রসার ঘটিল না।

বঙ্কিমচন্দ্রের নায়কতায় বাংলা সাহিত্যে একটি বারোয়ারী উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল, বাঙ্গালী একটি সার্ব্বজনীন সাহিত্যযজ্ঞের অনুষ্ঠানে বড় উৎসাহ বোধ করিয়াছিল; সাহিত্য-ক্ষেত্রে এই উদ্যম ও পুরুষকারকেই তিনি সর্ব্বাগ্রে চাহিয়াছিলেন। নিজে উৎকৃষ্ট কল্পনাশক্তি ও রসবোধের অধিকারী হইয়াও সাহিত্যবিচারে তিনি ছিলেন পুরামাত্রায় ক্লাসিসিষ্ট (classicist)। সাহিত্যের চিরন্তন আদর্শের মূল্য বিচার করিয়া সকল সংস্কারের আমূল পরিবর্ত্তন তিনি আবশ্যক মনে করেন নাই; খাঁটি সাহিত্য-বোধের উদ্রেক অপেক্ষা তিনি

বাঙ্গালীর জীবনে সর্ব্বাঙ্গীণ সংস্কৃতির প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন। তাই, সমসাময়িক সাহিত্যক্ষেত্র কতকগুলি স্থূল অনাচার হইতে মুক্ত থাকে, এবং বাঙ্গালীর চিন্তাশক্তি ও বিদ্যা-বুদ্ধির যাহাতে অধিকতর উন্মেষ হয়, ইহাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। একটা অতিশয় স্বতন্ত্র, ব্যক্তিগত দূর-বিচ্ছিন্ন ভাব-দৃষ্টি লইয়া, একটা পৃথক মনোভূমিতে দাঁড়াইয়া সর্ব্বসংস্কার-মুক্ত হইয়া, দেশ ও জাতির বর্ত্তমান পরিচয়কে একটা সার্ব্বভৌমিক সত্যের মানদণ্ডে যাচাই করিয়া লইবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার ছিল না। তিনি ছিলেন কিছু মুক্ত কিছু জড়িত। তাই তিনি যেমন একদিকে বঙ্গভারতীর দশভূজা-মূর্ত্তি স্থাপনা করিয়া সাহিত্যের উৎসব জাঁকাইয়া তুলিলেন, তেমনই আর একদিকে, সেই উৎসবের বাদ্য কোলাহলে দেবীর বোধন-মন্ত্র যে ভালো করিয়া শ্রুতি-গোচর হইল না—বাণীপূজায় বাঁশীর সুর অপেক্ষা কাঁসির আওয়াজই যে বাঙ্গালীর কানে অধিকতর উপাদেয় হইবার উপক্রম করিল, জাতি-স্নেহ-মুগ্ধ বঙ্কিম সে আশঙ্কায় বিচলিত হন নাই।

কিন্তু সমস্যা শুধু ইহাই নয়। য়ুরোপীয় সাহিত্যের যে আদর্শ অতিশয় অভিনব, অনভ্যস্ত, এবং জাতির জীবন-সংস্কারের বিরোধী বলিয়া—চমক লাগাইলেও, সত্যকার রসবোধ উদ্রিক্ত করে নাই বলিয়াছি—সাহিত্যের সেই আদর্শ সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া সেখানকার কাব্যেও বিশেষ বিচলিত ও পরিবর্ত্তিত হইতেছিল; এবং যে কারণে তাহা সেখানে অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল সেই যুগান্তরকারী ভাব-চিন্তার প্রভাব আমাদের দেশে এই অপ্রবুদ্ধ জীবন-চেতনার মধ্যেও নিগূঢ়ভাবে সঞ্চারিত হইতেছিল। এজন্য আমাদের দেশেও এই নূতন সাহিত্যিক উৎসাহের মূলে একটা সংশয়-বিমূঢ়তা ঘটিয়াছিল, তাহার ফলে য়ুরোপীয় সাহিত্যের যে ভঙ্গি আমরা অনুকরণ করিতেছিলাম তাহাতে আর তেমন আস্থা বা উৎসাহ রক্ষা করা ক্রমেই দুরূহ হইয়া উঠিল। ইহার মধ্যেও বাঙ্গালীর জাতিগত কাব্য-প্রবৃত্তি তাহার স্বাভাবিক গীতিরসপ্রবণতা, যেন পথ না পাইয়া গুমরিয়া মরিতেছিল। তাই ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী কাব্যের সঙ্গে যতই তাহার পরিচয় বৃদ্ধি পাইল ততই তাহার কল্পনা যেন পুনরায় নূতন করিয়া সঞ্জীবিত হইল। এই কাব্যসাধনার আদর্শে সে যেন একটি অপেক্ষাকৃত সহজ ও আত্মস্বভাব-সুলভ পন্থা খুঁজিয়া পাইল; শুধু তাহাই নয়, ইহা হইতে ভাবের যে স্বাতন্ত্র্য-মন্ত্রে সে দীক্ষালাভ করিল, তাহাতে দেশ কাল ও বহির্জীবনের প্রতিকূল অবস্থা হইতে সে কতক পরিমাণ মুক্তির উপায় করিয়া লইল। অতএব এ যুগে আমাদের সাহিত্যে রবীন্দ্র-প্রতিভার অভ্যুদয় আকস্মিক বোধ হইলেও অপ্রত্যাশিত নয়। এইবার এ সম্বন্ধে আমি কিছু বিস্তারিত আলোচনা করিব।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য যে মুখ্যতঃ গীতিধর্ম্মী—তাহাতে বাঙ্গালীর জাতিগত প্রতিভারই জয় হইয়াছে; কিন্তু তাহার মূলে যে কল্পনা-ভঙ্গি আছে তাহা ভারতীয় কাব্য-পন্থার অনুগত না হইলেও ভারতীয় সাধনার আদর্শেই অনুপ্রাণিত। রবীন্দ্রনাথের মত খাঁটি ভারতীয় মানস-প্রকৃতি বঙ্কিমচন্দ্রেরও নহে, বরং সে হিসাবে কবি-বঙ্কিম য়ুরোপেরই মানস-পুত্র।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যাহা ফুটিয়াছে ভারতীয় তত্ত্বচিন্তায় তাহার প্রেরণা চিরদিন ছিল। ভারতীয় ভাবসাধনার যাহা বৈশিষ্ট্য, সমগ্র জগৎকে একটি রস-চেতনায় আত্মসাৎ করায় সেই অপূর্ব্ব প্রতিভা, চিরদিন ভাবকে লইয়াই তৃপ্ত হইয়াছে—রূপেরও অরূপ-সাধনা করিয়াছে। জীবনের প্রত্যক্ষ পরিচয়ক্ষেত্রে, এই প্রকৃতির রূপ-রেখা-লিপির সুস্পষ্ট সঙ্কেতে, রস-স্বরূপ ব্রহ্ম যে ভাবে মানুষের সহজ ইন্দ্রিয় চেতনার পথেই আত্মসাক্ষাৎকার করাইতেছেন কাব্যই যে সেই অনুভূতির বিশিষ্ট সহায়, এবং রসজ্ঞানী সাধক বা জ্ঞানরসিক ঋষি যাহা পারেন না—রূপের মধ্যেই ভাবকে প্রত্যক্ষ করা ও রূপের ভাষাতেই তাহাকে প্রকাশিত করা—তাহা যে কবিকর্ম্মেরই আয়ত্ত, এই ভাব-সর্ব্বস্ব জাতি তাহা এতদিন ভাবিতেও পারে নাই। মানুষের সার্ব্বজনীন অধিকার সম্বন্ধে সংশয়, এবং রূপকে ত্যাগ করিয়া অরূপে ভাবদৃষ্টি নিবদ্ধ করার প্রবৃত্তি—এই দুই কারণে ইতিপূর্ব্বে আমাদের দেশে ভাবসাধনা কখনও উৎকৃষ্ট কবি-কল্পনার সঙ্গে যুক্ত হইতে পারে নাই।

য়ুরোপীয় কাব্যে যে কবি-প্রতিভা এতদিন রূপের আরাধনা করিতেছিল—প্রকৃতির সহিত দ্বন্দ্বে মানব-প্রাণের বিচিত্র বিক্ষোভকেই একটি অবশ আত্মমুগ্ধ রসপিপাসায় পরিণত করিয়া কল্পনার তৃপ্তি-সাধন করিতেছিল—উনবিংশ শতাব্দীতে সেই প্রতিভায় এক স্বতন্ত্র কবিমানসের উদ্ভব হইল; এযুগের কবিগণ রূপের উপরে ভাবের প্রতিষ্ঠায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তথাপি এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যমূলক সাধনার মূলে প্রকৃতির প্ররোচনাই প্রবল ছিল বলিয়া—এই বহিঃ-সৃষ্টির বহু-বিচিত্র রূপ-বিলাসের অন্তরালে এই সকল সাধকেরা স্ব-স্ব ভাব-কল্পনায় এক অব্যভিচারী চিন্ময় আদর্শের সন্ধান করিয়াছিলেন বলিয়া—এ প্রবৃত্তি কবি-প্রতিভারূপেই প্রকাশ পাইয়াছিল; এবং কাব্যের সঙ্গীতে ও কাব্যের ভাষায় ভাবকে রূপ দিবার এক প্রকৃষ্ট পন্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। রূপের এই অভিনব ভাব-ভঙ্গি, অনির্ব্বচনীয়কে বাক্যের সাহায্যেই হৃদয়-গোচর করার এই বাণী-প্রতিভা, এযুগের ভারতীয় কবি-মানসকে আশ্বস্ত করিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী, ও তথা য়ুরোপীয় কাব্য কেবল এই হিসাবেই রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিপোষক হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ, রবীন্দ্রনাথের ভাব-মন্ত্র সম্পূর্ণ ভারতীয়; য়ুরোপীয় কবির ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও রবীন্দ্রনাথের আত্মসাধনায় যথেষ্ট প্রভেদ আছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ভারতীয় ভাবপন্থা য়ুরোপীয় কাব্যপন্থায় মিলিত হইয়াছে—এই মিলনের গূঢ় তাৎপর্য্য না বুঝিলে রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় মিলিবে না।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, য়ুরোপীয় সাহিত্যের যে আদর্শে বাংলা সাহিত্য প্রথমে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল তাহার সম্যক সাধনার পথে প্রধান অন্তরায় ছিল—নানা সংস্কারে আচ্ছন্ন বাঙ্গালীর জীবন-চেতনা। জীবনের বাস্তব অনুভূতি-ক্ষেত্রে যে বস্তুর পরিচয় নাই, তাহাকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করিবে কেমন করিয়া? অথচ য়ুরোপীয় সাহিত্যের রূপ তাহাকে মুগ্ধ করে, কাজেই বিড়ম্বনার অন্ত নাই। এই অবস্থায় সত্যকার সাহিত্য-সৃষ্টি করিতে

হইলে, এ যুগের বাঙ্গালীর পক্ষে অন্তরের যে মুক্তির প্রয়োজন, বাহিরে বাস্তব জীবন-ব্যাপারে সে মুক্তি বহুবিঘ্নময় বলিয়াই, তাহার একমাত্র পন্থা—স্ব-তন্ত্র ভাব-সাধনা। ইহা এই ভারতের অধ্যাত্ম-সাধনারই অনুপন্থী। চিত্তবৃত্তি নিরোধের দ্বারা জগৎকে আত্ম-চেতনা হইতে বহিষ্কার করিয়া, অথবা, আত্ম-চেতনার প্রত্যয়ানন্দে এই জগতের এক আধ্যাত্মিক রস-রূপ কল্পনা করিয়া পরিত্রাণ-লাভের যে উপায়, তাহা ভারতীয় প্রতিভার নিজস্ব সম্পদ। কিন্তু একালে মুক্তিসাধনার এই mystic-পন্থা তেমন প্রশস্ত নহে, এবং কাব্যে তাহা কোন কালেই চলে না। কারণ, কাব্যে শুধু ভাব নয়, অরূপ-রসের অর্দ্ধব্যক্ত উল্লাসও নয়,—এই জগৎ ও জীবনের প্রত্যক্ষ-অনুভূতিকে রস-রূপে পূর্ণ প্রকাশিত করাই কাব্যের সার্থকতা। উনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় কবিকল্পনায় যে মুক্তি-প্রয়াসের কথা বলিয়াছি, তাহাতেও এই বহিঃ-প্রকৃতির প্ররোচনাই প্রবল, তাহাতে প্রকৃতিপ্রভাবজনিত জীবন-চেতনাই নিগূঢ়ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। এ ধরণের প্রকৃতি-প্রভাব আমাদের জীবনে কোনও কালেই প্রবল হইতে পারে নাই। এই ভাব-সঙ্কটে রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনা এক অভিনব মুক্তির সন্ধান পাইল; এবং সে কল্পনার মূলে যে সেই ভারতীয় ভাব-সাধনার মন্ত্রই শক্তি সঞ্চার করিয়াছে, ইহাই বিস্ময়কর। যে প্রেরণা এতকাল কাব্যকে দূরে রাখিয়া ভাবসাধনার অন্যতম মার্গে ধাবিত হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথ তাহাকেই ভাব হইতে রূপে-নূতন পন্থায় প্রবর্ত্তিত করিলেন। ঋষির মন্ত্র-দৃষ্টিকে, সাধকের ইষ্ট-স্বপ্নকে, mystic বা অপরোক্ষদর্শী রস-জ্ঞানীর প্রত্যয়ানন্দকে তিনি অন্তর হইতে বাহিরে—এই বিচিত্ররূপা প্রকৃতির হাব-ভাবের মধ্যেই উদ্ভাসিত হইতে দেখিয়াছেন; তাঁহার কল্পনায় সেই মোহিনী অসতীই সতী-মূর্ত্তির কল্যাণ-শ্রীতে মণ্ডিত হইয়াছে। আমাদের দেশে কবির কাজ ছিল স্বতন্ত্র; কাব্যামৃত রসাস্বাদকে সংসার-বিষ-বৃক্ষের অমৃত-ফল বলিয়া উল্লেখ করিলেও, সংসারটা বিষবৃক্ষই ছিল। সেই বিষবৃক্ষ হইতে অমৃতফল আহরণ করিতে হইলে নিছক কল্পনা বা বাস্তব-বিস্মৃতির যে কৌশল—তাহারই নাম কবি-কর্ম্ম। কাব্যশাস্ত্রবিনোদ একটা চিত্তরঞ্জন বা মন ভুলানো ব্যাপার, অতএব বাস্তব-জীবন-চেতনার কোন উৎপাত রস-সৃষ্টির পক্ষে নিতান্তই অবান্তর। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে রস একটি mystic অনুভূতির অবস্থা মাত্র; এজন্য কাব্য-বিচারে কবি ও কাব্য অতি সহজেই অব্যাহতি পাইয়াছে—কাব্য-বস্তু বা কবিমানসের কোন বিশেষ পরিচয় বা মূল্য-নিরূপণের প্রয়োজন তাহাতে নাই। এজন্য একদিকে কবি-কল্পনা ও তাহার বিষয়ীভূত বস্তু জগৎ যেমন অতিশয় সঙ্কীর্ণ, তেমনই কাব্যবিশেষের রস-নির্ণয়ে একটি অতি স্থূল পদ্ধতির প্রয়োগই যথেষ্ট। কতকগুলি সাধারণ লক্ষণেই যাহার প্রমাণ, যাহাতে কোনও বিশেষ বস্তু-পরিচয় বা মানস-পরিচয়ের অবকাশ নাই, তাহাতে কবি-কল্পনার প্রসার কোথায়? রসের এই ধারণা হইতেই বুঝা যায়, এদেশে জগৎ ও আত্ম-চেতনার মিলন-ক্ষেত্ররূপে, কাব্যের সীমা-বিস্তার কেন হয় নাই। রসের আদর্শকে মহিমান্বিত করিলেও, আলঙ্কারিকেরা কাব্যকে জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাকে অতি সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন।

আলঙ্কারিক-শিষ্য ইহার উত্তরে কি বলিবেন জানি; কিন্তু মুস্কিল হইয়াছে, আধুনিক মানুষ এমনই বেরসিক যে তাহা বুঝিতে চাহিবে না। (আধুনিক মানুষের রস-পিপাসায় কোনও চিন্তালেশহীন, মানসিকতাবর্জ্জিত তুরীয়-অবস্থার আস্বাদন-কামনা নাই। কাব্যের মধ্যেও সে একটা জগৎকেই চায়, সে এমন জগৎ যেখানে এক উচ্চতর মানস-বৃত্তি পূর্ণ-লীলার অবকাশ পায়—এই জগতের সকল অসম্পূর্ণ অভিজ্ঞতাকে একটি অখণ্ড রস-চেতনায় সুসমঞ্জস করিয়াই তাহার চিত্ত নিবৃত্তি লাভ করে।) এই মানস-বৃত্তির আমরা বাংলা নাম দিয়াছি 'কল্পনা'; ইহার সংজ্ঞা-নির্দ্দেশে এখনও গোল আছে। দেশীয় কাব্যশাস্ত্রে এই বৃত্তির সম্যক সন্ধান নাই; তার কারণ, কাব্যসৃষ্টিতে কবির যে ভাব-দৃষ্টি, সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়জ্ঞানমূলক সুন্দর-বোধের সাহায্যে এই জগৎ ও জীবনের রস-রূপ আবিষ্কার করে, রস-বাদী তাহাকে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে এই বৈরাগ্য ভারতীয় রসবাদের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত,—এই রস ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর, তাহার আস্বাদনে যে মুক্তি ঘটে তাহা বাস্তব-মুক্তিও বটে। কিন্তু য়ুরোপীয় কাব্যে কবি-কর্ম্মের যে বিশিষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে বাস্তবকে স্বীকার করিয়াই তাহার উপরে আধিপত্য-চেতনায় একরূপ রস-মুক্তির পরিচয় আছে—সেখানে বাস্তবকেই কাব্যলোকে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রবৃত্তি আছে,—সে কাব্যের রস শেষ পর্য্যন্ত বস্তু-চেতনার উপরেই নির্ভর করে।

এক্ষণে দেখা যাইবে, (যে সাধনা আমাদের কাব্যে কখনও প্রশ্রয় পায় নাই, অথচ যাহা ভারতীয় মানস-প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুগত, রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভায় তাহা কেমন কাব্যসৃষ্টির অনুকূল হইয়াছে। যুগ-প্রভাব ও যুগ-প্রয়োজনের বশে এ সাধনা প্রথম প্রকাশ পাইয়াছিল কবি বিহারীলালের কাব্য-ভঙ্গিতে। তথাপি বিহারীলাল শেষ-পর্য্যন্ত mystic, তিনি রূপ হইতে ভাবে আরোহণ করিয়া সেইখানেই পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন; রবীন্দ্রনাথ 'ভাব হ'তে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা'র রহস্যে মুগ্ধ হইয়া জগতের এক নূতন রস-রূপ সৃষ্টি করিয়াছেন। বিহারীলালের সারদা—'স্বপনে বিচিত্ররূপা দেবী যোগেশ্বরী'। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যলক্ষ্মীকে বন্দনা করিয়া বলিতেছেন—'জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে, তুমি বিচিত্ররূপিণী'। বিহারীলাল তাঁহার ভাব-দেবতাকে এই যে 'দেবী যোগেশ্বরী' বা 'যোগানন্দময়ী তনু, যোগীন্দ্রের ধ্যান-ধন' বলিয়াছেন, ইহা নিরর্থক নহে,—অন্তর, ও বহির্জগতের এই যোগাত্মিকা রস-সাধনাই ভারতীয় ভাবুকতার আদর্শ। বিহারীলাল এই ভারতীয় আদর্শকেই সর্ব্বপ্রথম কাব্যে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, কিন্তু কাব্যসৃষ্টিতে সে কল্পনা সিদ্ধি লাভ করে নাই। রবীন্দ্রনাথ এই অন্তর-গহনের দীপ-শিখাকেই বস্তু-পরিচয়ের মানস-রঙ্গভূমিতে প্রতিফলিত করিয়া কাব্যরস-ধারাকে এক নূতন উৎস হইতে প্রবাহিত করিলেন। তাঁহার কল্পনায় ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ এক অভিনব ভোগবাদের সমর্থন করিতে বাধ্য হইয়াছে; বৈরাগ্য-সাধনার মুক্তি অপেক্ষা অন্যতর মুক্তির পন্থা—এই বহির্জীবনের নাট-মন্দিরে কবিকরধৃত বাণী-দীপের আরতি-আলোকে—সুপ্রকাশিত হইয়াছে।) বহুকালাগত সংস্কারকে এমন করিয়া উল্টাইয়া ধরা কবির পক্ষেও

কম দুঃসাহস নয় ; তাহার ফলে আমাদের দেশের সাধারণ পাঠকের নিকট উহা এক মনোহর হেঁয়ালী হইয়া আছে। যাহারা পুরাতন কাব্যরসে অভ্যস্ত তাহারা এ রস-আস্বাদনে সঙ্কুচিত ; যাহাদের রসবোধ অপেক্ষাকৃত উদার তাহারা সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের কাব্য-মন্ত্র দ্বারা এ রস শোধন করিয়া তবে আস্বাদন করিয়া থাকে ; যাহারা কোনো রসেরই রসিক নয়, এ কাব্যের বিরুদ্ধে তাহাদের প্রাকৃত সংস্কার বিদ্রোহী হইয়া উঠে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাধনায় উচ্চতর ভাবসিদ্ধির কথা ছাড়িয়া দিলেও আমার মনে হয়, রবীন্দ্র-সাহিত্যে মনুষ্য-জীবনের যে নবতন মহিমা-বোধ আমাদিগকে আশ্বস্ত করে,—মানুষের অতি ক্ষুদ্র সাধারণ সুখ-দুঃখের উপরে, অতি-পরিচিত সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতার উপরেও তাঁহার সর্ব্বাশ্রয়ী রস কুতূহলী কল্পনা যে দিব্য আলোক প্রতিফলিত করিয়াছে—সর্ব্ববস্তুতে আব্রহ্মস্তম্বব্যাপী বিরাট সত্তার যে রস-রূপ আবিষ্কার করিয়াছে, তাহাতেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি এমন ভিন্নমুখী হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কবি-কল্পনার এই অতি মৌলিক ভঙ্গি সেকালে আমাদের মত ব্যক্তিকেও কিরূপ মুগ্ধ ও সচকিত করিয়াছিল তাহাই বলিব। তখন আমার বয়স ১৫।১৬, তাহারও পূর্ব্বে নিতান্ত বালক-বয়সেই একপ্রকার কাব্য-প্রীতি জন্মিয়াছিল। মাইকেলের 'মেঘনাদবধ', বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা', নবীন সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' তখন আমার সেই ক্ষুদ্র হৃদয় জয় করিয়াছে—বাংলা সাহিত্যের নব-উৎসব-প্রাঙ্গণে সেকালের তরুণ আমরা এই সব লইয়াই মাতিয়া উঠিয়াছিলাম। কিন্তু সে সময়েও, অর্থাৎ ১৯০০ হইতে ১৯০৪ সাল পর্য্যন্ত, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে নাই ; অতি সামান্য যাহা ঘটিয়াছিল তাহাতে সে ভাষা, সে সুর কেমন অদ্ভুত মনে হইত। রবীন্দ্র-সাহিত্য তখনও সুপ্রচারিত হয় নাই ; তা'ছাড়া, রবীন্দ্রনাথের মধ্যাহ্ন-প্রতিভাকেও তখনকার দিনের প্রচলিত সাহিত্য-সংস্কার যেন একটা মেঘাবরণে অন্তরাল করিয়াছিল। কিন্তু যেমনই স্কুল ছাড়িয়া কলেজের পাঠ-পদ্ধতির তাড়নায় ইংরেজী কাব্যসাহিত্যের সঙ্গে বৃহত্তর ও ঘনিষ্ঠতর পরিচয়ের সূত্রপাত হইল, সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথের একখণ্ড 'গল্পগুচ্ছ' হাতে পড়িল ; তারপর কি হইল তাহা তখন ঠিক বুঝি নাই, কারণ মুগ্ধ অবস্থায় আত্ম-পরীক্ষা সম্ভব নয়, তাহার প্রয়োজনও থাকে না। সেই কয়টি গল্প পড়িয়া যে নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলাম, আমার সমস্ত মানস-শরীরে যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, আজ তাহা বুঝিতে পারি। মনে হয়, এতদিন যেন পৃথিবী হইতে চন্দ্রলোকের স্বপ্ন দেখিতেছিলাম ; কিন্তু ইহার পর যেন চন্দ্রলোক হইতে পৃথিবীকে দেখিতে লাগিলাম—যেন এমন একস্থান হইতে এমন ভাবে এই নিত্যকার জগৎকে দেখিবার সুযোগ পাইলাম যাহাতে অতি-পরিচিতের মধ্যেই অপরিচিততম সৌন্দর্য্যের অফুরন্ত আয়োজন হৃদয়-গোচর হয়। বাস্তবে ও স্বপ্নে যেন ভেদ নাই ; সমগ্র ভাব-দৃষ্টির কেন্দ্রই এখন অকস্মাৎ এমন একদিকে সংস্থাপিত হইল যে, বস্তুসকল এক নূতন ছায়া-সুষমার এক নবমূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইল। এই 'গল্পগুচ্ছ'ই ছিল আমার রবীন্দ্রকাব্য-প্রবেশিকা। এখন বুঝি, রবীন্দ্রনাথের কল্পনা-শক্তির মূলে আছে—অন্তর ও বাহির, ভাব ও বস্তু, চিন্তা ও

অনুভূতির সঙ্গতিমূলক এক অপূর্ব্ব গীতি-প্রবণতা ; ইহাতেই তাঁহার মনের মুক্তি ; সেই মুক্তির আনন্দে তাঁহার কল্পনা সকল সংস্কার সকল বিরোধ উত্তীর্ণ হইয়া এমন এক রস-ভূমিতে অধিষ্ঠান করে যেখানে জীবনের সকল অসামঞ্জস্য, বাস্তবের সকল বৈষম্য কবির প্রাণে একটি ভাবৈক-পরিণাম রাগিণীতে সমাহিত হয়। গদ্যে হোক পদ্যে হোক—তিনি যখন যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার অন্তর্গত এই সঙ্গীত পাঠককে আবিষ্ট করে, তাহার সমগ্র চেতনাকে সেই সর্ব্বসমঞ্জসকারী গীতিরাগে বিগলিত করিয়া যে ভাব-দৃষ্টির অধিকারী করে, তাহাতে জগতের কোনকিছুতেই উচ্চ-নীচ, ক্ষুদ্র-বৃহৎ, সত্য-মিথ্যার অভিমান থাকে না—একটি সুগভীর সর্ব্বাত্মীয়তার প্রীতি-কল্পনায় ধূলিও পরম বস্তু হইয়া উঠে। 'গল্পগুচ্ছে'র কথা-অংশে বস্তুগত রোমাঞ্চ-বিস্ময়ের আয়োজন নাই, তথাপি তাহা যে বিস্ময়-রসে হৃদয় আপ্লুত করে তাহার কারণ, তুচ্ছতম বস্তুর উপাদানে লেখক মহত্তমের প্রকাশ দেখিয়াছেন ; আকাশের গ্রহতারকা হইতে ধূলিতলের তৃণপুঞ্জ পর্য্যন্ত যে একটি মহিমা অব্যাহত রহিয়াছে, প্রাণ তাহারই ভাব-সঙ্গীতে পূর্ণ হইয়া ওঠে ; তখন আর বাস্তবে ও কল্পনায় কোনও বিরোধ-বুদ্ধির অবকাশ থাকে না ; কে বলিবে, 'গল্পগুচ্ছে'র কতটুকু বাস্তব, আর কতটুকু কল্পনা ? 'গল্পগুচ্ছে' এই ভাব যে রূপ পাইয়াছে তাহা সহজেই হৃদয়-মনের গোচর হয়, এবং যে একবার এই ভাবমণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিয়াছে রবীন্দ্র-সাহিত্যের মর্ম্ম-সঙ্গীত তাহার কানে ও প্রাণে, কোথাও আর বাধা পায় না। 'গল্পগুচ্ছে'র মধ্য দিয়াই আমার এই দীক্ষালাভ একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার হইলেও আমার মনে হয়, আমার মত সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে রবীন্দ্র-প্রতিভার সহিত অতি সহজ পরিচয়ের উহাই উৎকৃষ্ট সোপান। এবং ইহাও আমার বিশ্বাস যে, 'গল্পগুচ্ছের' মধ্যে কবি-দৃষ্টির যে অতি স্বতন্ত্র ও নিগূঢ় ভঙ্গি, এবং রস-সৃষ্টির যে কৌশল আছে, তাহা এখনও আমাদের দেশের সকল রসিক-চিত্ত আকৃষ্ট করিতে পারে নাই ; পারিলে, অন্ততঃ একদিক দিয়া রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রকৃত মর্য্যাদা বুঝিবার পক্ষে এত প্রতিবন্ধক ঘটিত না।

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব প্রমাণ করিবার আবশ্যকতা আর নাই। কিন্তু, আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় যে পরিমাণ মুগ্ধ হইয়াছি ততখানি সঞ্জীবিত হই নাই, ইহা অস্বীকার করিয়া লাভ কি ? রবীন্দ্রনাথ বঙ্গবাণীকে ভাষায় ও ছন্দে যে নব কলেবর ধারণ করাইয়াছেন তাহাতেই একালের বাংলাসাহিত্য তাঁহার নিকট অশেষ ঋণে ঋণী। কিন্তু ওই বাণী-রূপের অন্তরালে যে ভাবের আত্মা আছে তাহা বাঙ্গালীর রসবোধে সম্যক ধরা দেয় নাই—একটা স্ব-তন্ত্র ভাবমুক্তির পরিবর্ত্তে অন্ধ ভাবের ঘোর সৃষ্টি করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যকল্পনা আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে, তাহার সঙ্গীত কানে স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে ; কিন্তু সেই কাব্য-কল্পনার মূল প্রেরণা অন্তরে প্রবেশ করিয়া আমাদের কল্পনাকে স্বতন্ত্র মুক্তির সন্ধান দেয় নাই। এযুগে যে-কেহ বাংলা লিখিয়াছেন বা লিখিতেছেন তাঁহার ভাষা ও রচনা-ভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথের এই বাহ্য প্রভাব অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। বস্তু-জগতের বৈচিত্র্যকেই ভাব-সঙ্গীতের সুষমায় মণ্ডিত করিয়া প্রকাশ করিবার প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথের

কবি-প্রতিভা বাংলাভাষাকে যে রূপ দান করিয়াছে, সে রূপের প্রভাব অজেয়; বাংলাভাষা সেই সঙ্গীত-রসে বিগলিত হইয়া এমন একটি সৌষ্ঠব ও নমনীয়তা লাভ করিয়াছে, যে অতঃপর সর্ব্ববিধ সাহিত্য-গঠন-কর্ম্মে ভাষার এই রূপ শিল্পীমাত্রেরই বরণীয় হইতে বাধ্য।) এখন যাহা সাধারণ বাংলালেখকের অতি সুসাধ্য অনুকরণ-কর্ম্মের সহায় হইয়াছে, তাহাই যে একদিন নানা উৎকৃষ্ট প্রতিভার ভাব-প্রকাশ-পন্থাকে বহুপরিমাণে সুগম করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই হিসাবে বাংলাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সর্ব্বব্যাপী হইলেও, যাঁহারা সাহিত্যে রবীন্দ্র-পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কচিৎ দুই একজন সত্যকার কবি-শক্তি বা মৌলিক সৃষ্টি-প্রতিভা দাবী করিতে পারেন; যাঁহারা সে প্রভাব স্বীকার করেন নাই তাঁহাদের রচনা প্রায়ই সাহিত্য-পদবাচ্য নহে। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক যে দুই চারিজন লেখক গদ্যে পদ্যে মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন, স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও তাঁহাদের কল্পনা রবীন্দ্র-বিরোধী নয়; এজন্য রবীন্দ্র-সাহিত্যের বৃহত্তর মণ্ডলের মধ্যেই তাঁহারা নির্ব্বিরোধে অবস্থান করিতেছেন। অতএব বাংলাসাহিত্য বলিতে আমরা আজকাল যাহা বুঝি তাহা হইতে রবীন্দ্রনাথকে পৃথক করিয়া ধরিলে সে সাহিত্যের বিশেষ কিছু অবশিষ্ট থাকে না; এ সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য অংশে রবীন্দ্রনাথের রচনাই এত অধিক, যে ইহাতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অপেক্ষা তাঁহার নিজের কীর্ত্তিই সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান হইয়া আছে।

বর্ত্তমান বাংলাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব খুব ব্যাপক হইলেও তাহা যে তেমন গভীর হইতে পারে নাই ইহার কারণ আপাততঃ এই বলিয়া মনে হয় যে, রবীন্দ্রনাথকে আমরা বুঝি নাই। বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা বুঝিয়াছিলাম, কিন্তু সে সাধনার শক্তি আমাদের ছিল না—অতিশয় সঙ্কীর্ণ জীবন-যাত্রার ক্ষেত্রে, এই নিতান্ত নিম্নভূমিতলে দাঁড়াইয়া আমরা সেই গগনবিহারী গরুড়ের পক্ষ ও বক্ষবল আয়ত্ত করিতে পারি নাই। রবীন্দ্রনাথ, এই ভূমিতলে দণ্ডায়মান অবস্থাতেই আমাদের মানস-নেত্রের দৃষ্টি পরিবর্ত্তন করাইয়া ভিতর হইতেই যে মুক্তির উপায় করিয়া দিলেন, তাহাতে এককালে মনে হইয়াছিল, এ সাধনায় আমরা অচিরে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিব। কিন্তু তাহা হয় নাই। অতিশয় বর্ত্তমান কালে সাহিত্য-প্রেরণা মন্দীভূত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে; কোনও জাতির জীবন-সঙ্কট কালে তাহার যাবতীয় শক্তি অন্য প্রয়োজনে নিয়োজিত হয়, তখন রস-কল্পনার তেমন স্ফূর্ত্তি আর আশা করা যায় না। তথাপি এ সাহিত্যে পূর্ব্ব হইতেই শক্তি ও সজীবতার অভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে। রবীন্দ্র-প্রতিভার ছায়া-তলে সাহিত্য-রচনার কৌশল, ভাষা ও ছন্দের কারিগরী, যতটা সহজ-সাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহার অনুপাতে নব-সৃষ্টির প্রেরণা ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাতে মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা বাঙ্গালীর মনে সাড়া জাগাইলেও তাহার অনুকরণ যেমন দুরূহ ছিল, রবীন্দ্রনাথের সাধন-মন্ত্র হৃদয়ঙ্গম না হইলেও তাহার বাণীলীলার মোহময় ভঙ্গি তেমনিই সহজ অনুকরণের বস্তু হইয়াছে। এমন হইল কেন? একদিকে রবীন্দ্রনাথের নিত্যনবোন্মেষশালিনী সৃষ্টি-প্রতিভা ও অপর দিকে সমসাময়িক সাহিত্যে তাহার

প্রভাব ও প্রতি-প্রভাব লক্ষ্য করিয়া এ সম্বন্ধে আমার যে ধারণা হইয়াছে এক্ষণে তাহাই লিপিবদ্ধ করিব।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের অভিনব কবিকল্পনা আমাদের রস-পিপাসাকে আশ্বস্ত করিয়া বিশুদ্ধ সাহিত্য-প্রীতির উদ্রেক করিয়াছিল। সাহিত্য-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে ধরণের সাহিত্য-সমালোচনা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহাতেও একটি সুস্থ রস-বোধ জাগিয়াছিল। হেম-নবীনের কাব্যে যে রসসৃষ্টির অভিপ্রায় আছে তাহার ব্যর্থতা আমরা অনুভব করিলাম; ইংরেজ কবি পোপ, এমন কি বায়রণও, আর তেমন করিয়া মুগ্ধ করিল না; স্কট অপেক্ষা জর্জ্জ এলিয়টের উপন্যাস আমাদিগকে অধিকতর আকৃষ্ট করিল। এজন্য আধুনিক বাংলাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্ব হইতেই যে রূপ-সৃষ্টির প্রেরণা দেখা দিয়াছিল, তাহাই যেন আরও পরিশুদ্ধ হইয়া একটা পূর্ণতর বাণী-সাধনার আশায় আমাদিগকে উন্মুখ করিয়াছিল। কিন্তু রবীন্দ্র-প্রতিভার এই প্রেরণা কবির নিজস্ব আত্ম-সাধনার প্রয়োজনে ভিন্ন পথে প্রয়াণ করিল—রূপ হইতে পুনরায় অরূপের পানে ভাবের 'খেয়া'য় পাড়ি জমাইল—কবির কাব্যসাধনায় আত্মভাব-সাধনা প্রবল হইয়া উঠিল। তারপর হইতে আজ পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথ কাব্যকে প্রধানতঃ সঙ্গীতের অধীন করিয়া তাহার বস্তুভার হরণ করিয়াছেন, রূপের স্বরূপ-কল্পনার পরিবর্ত্তে তাহার অরূপ-রসে আকৃষ্ট হইয়াছেন। এই রবীন্দ্রনাথের পরিচয় য়ুরোপ পাইয়াছে; কিন্তু আমাদের সাহিত্যে 'গীতাঞ্জলি'ই যদি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ দান হইত তবে বাংলা সাহিত্যের কি কোনও ভরসা থাকিত?

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় ভারতীয় মানস-প্রকৃতির যে প্রভাব সম্বন্ধে পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি, তাহাই যেন সে-প্রতিভার যৌবন-শেষে তাঁহার কাব্য-প্রেরণাকে অভিভূত করিয়া তাহার স্বধর্ম্ম ঘোষণা করিয়াছে। এ ঘটনা প্রাচীন ভারতের পক্ষে গৌরবজনক হইলেও, আধুনিক ভারতের ইহা সৌভাগ্য নয়। রবীন্দ্রনাথ যে এককালে সেই ভারতীয় ভাবসাধনার mysticism-কেই প্রতীচ্যের রূপ-সাধনার সঙ্গে যুক্ত করিয়া আমাদের সাহিত্যে কাব্য ও জীবনের অপরূপ সমন্বয়সাধনে সক্ষম হইয়াছিলেন, ইহাই ভারতের সৌভাগ্য ও রবীন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ গৌরব। রবীন্দ্রনাথের নিজেরই সাধনার এই যে পন্থা-পরিবর্ত্তন, তাঁহার প্রতিভা ও সাহিত্য-কীর্ত্তির সম্যক পরিচয়ের পক্ষে ইহাই বোধ হয় সর্ব্বপ্রধান বাধা। শুধুই কল্পনা বা কাব্যের ভঙ্গি-বৈচিত্র্য নয়, ভাষা ও রচনার নিত্য-নব রীতি-পরিবর্ত্তনে অনধিকারীর চিত্তে একটা মোহময় প্রহেলিকার সৃষ্টি হয়; ইহার ফলে কোনও একদিক দিয়া রবীন্দ্র-প্রতিভার একটা স্পষ্ট ধারণা হওয়া দুরূহ। এইজন্যই এই দীর্ঘকালেও রবীন্দ্র-কাব্যের একটি সুসঙ্গত আলোচনা কাহারও পক্ষে সম্ভব হইল না; এপর্য্যন্ত যাহা কিছু হইয়াছে, তাহাতে কোনও সাহিত্যিক আদর্শের সন্ধান নাই; তাহা ব্যক্তিগত ভাবোচ্ছ্বাস—সমালোচনা নয়, সুখালোচনা মাত্র। এক্ষণে এমন দাঁড়াইয়াছে যে, বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ দান যে ভাবের রূপ-সৃষ্টি—কোনও প্রকার mysticism নয়—তাহা আমরা বুঝিতে সম্মত নই। তাঁহার কাব্যে সনাতনী

ভাবধারা বা বিশ্ববাণী যে ভাবেই উৎসারিত হউক, তাহার মূলপ্রেরণা যে অতিমাত্রায় আধুনিক, এবং তাঁহার কবি-মানস যে আদৌ mysticism-এর অনুকূল নয়, ইহা বুঝিয়া লইবার প্রয়োজন আছে। আধুনিক মনের রসপিপাসা-নিবৃত্তির যে একটি পন্থা তাঁহার কাব্য-সাধনায় প্রকাশ পাইয়াছে তাহাই তাঁহার প্রতিভার বিশিষ্ট গৌরব। রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রকৃতির যে একটি লক্ষণ সম্বন্ধে কাহারও ভুল হইতে পারে না তাহা এই যে, এমন সদাজাগ্রত মনোবৃত্তি, এমন সুনিপুণ ভাবগ্রাহিতা, এমন সর্ব্বতোমুখী বোধশক্তি এত বড় কবিপ্রতিভার সহিত মিলিত হইতে সচরাচর দেখা যায় না। ইহার ফলে তাঁহার কাব্যসৃষ্টি যেমন বিচিত্র, তেমনই তাঁহার কল্পনায় কুত্রাপি অতি-সচেতন মানস-ক্রিয়ার অভাব লক্ষিত হয় না। রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনা যে রীতিই অবলম্বন করুক, তাঁহার কবি-চিত্ত ভাব ও বস্তুর যখন যেটাকে আশ্রয় করিয়া যত বিচিত্র-রসের সৃষ্টি করুক,—তাহাতে idealism থাকিলেও mysticism নাই। ভাব ও বস্তু—Ideal ও Real—এই উভয়ের দ্বন্দ্বে রবীন্দ্রনাথের কল্পনা ভারতীয় ভাব-সাধনা ও য়ুরোপীয় রূপ-সাধনার যে সমন্বয় সাধন করিয়াছে, তাহার উল্লেখ পূর্ব্বে করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আমার একটি প্রধান বক্তব্য তাহাই, এজন্য সেই কথাটাই আর একবার ভালো করিয়া বলিয়া লইয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিব। আমার বিশ্বাস, রবীন্দ্র-প্রতিভার যে দিকটি আধুনিক জীবন ও আধুনিক কাব্যের সঙ্গতিসাধনে অসামান্য শক্তির পরিচয় দিয়াছে সেই দিকটিই আমাদের লক্ষ্য-বহির্ভূত হইয়াছে; অথবা, যাহা এককালে ক্রমশঃ লক্ষ্যগোচর হইতেছিল তাহা পরে আমাদের দৃষ্টি-বহির্ভূত হইয়াছে—রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবন একটি সুস্পষ্ট ভেদ-রেখায় দ্বিধা বিভক্ত হইয়াই আমাদের মনে এই দ্বিধার সৃষ্টি করিয়াছে। 'সোনার তরী' ও 'বলাকা' পাশাপাশি রাখিয়া পড়িলে এই ভেদ-রেখা কাহারও আগোচর থাকে না।

আমি বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় আধুনিক মনের রস-পিপাসা-নিবৃত্তির একটি প্রকৃষ্ট কাব্যপন্থা মিলিয়াছে, অথচ এই প্রতিভার উদ্বোধন করিয়াছে প্রাচীন ভারতের সেই ভাব-মন্ত্র। যে ভাব-মন্ত্রের সাধনায় রূপ কখনও প্রাধান্য লাভ করে নাই, যাহা প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ানুভূতির ক্ষেত্রে অন্তর ও বাহিরের যোগ-সাধনায় তৎপর হয় নাই, যে মন্ত্রের সাধনায় কখনও কোন কবি-সাধক বস্তুজগতের রূপে তন্ময় হইয়া এই জীবনের সমস্যাকেই রসোজ্জ্বল করিয়া তোলে নাই, রবীন্দ্র-প্রতিভার যৌবন-কালে সেই মন্ত্রই কাব্যসাধনার অনুকূল হইয়াছিল; যাহা এতকাল তত্ত্ব ছিল তাহাই রসরূপে ধরা দিয়াছিল। আধুনিক মানুষের রস-পিপাসায় জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে যে প্রশ্ন-কাতরতা আছে তাহার নিবৃত্তি এইরূপ কাব্যসাধনাতেই সম্ভব। যে আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসা পশ্চিমের কাব্যকে আক্রমণ করিয়াছে রবীন্দ্রনাথ তাহারই সম্মুখে তাঁহার কাব্যের ভিত্তি অকুতোভয়ে স্থাপনা করিয়াছিলেন। তাঁহার কাব্যে তখনও বস্তু বা ভাবের কোনটাই নিরতিশয় প্রাধান্য লাভ করে নাই—বাস্তব হইতে পলায়ন করিয়া ভাবের দুর্গম দুর্গে আশ্রয় লইবার প্রয়োজন তখনও ঘটে নাই। রূপের জগতেই ভাবের সাম্য রক্ষা করিয়া, এক সঙ্গে রস-পিপাসা ও বস্তু-জিজ্ঞাসা চরিতার্থ করাই আধুনিক

কবির শ্রেষ্ঠ সাধনা। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় সেই সাধনাই জয়যুক্ত হইয়াছিল। আধুনিক য়ুরোপীয় কাব্যে এই প্রশ্ন-কাতরতা নিবারণের যত উপায় দেখা দিয়াছে তাহার কোনটিতেই কবি-কল্পনা সম্পূর্ণ জয়যুক্ত হইতে পারে নাই; এমন কি, ক্ষেত্রবিশেষে কাব্য স্ব-ধর্ম্ম ছাড়িয়া বিধর্ম্মের সাধনা করিয়াছে—কবি-কল্পনা রূপ হইতে অরূপে ফিরিবার প্রয়াসও করিয়াছে। এককালে য়ুরোপীয় কাব্যে আধুনিক মন যে ভাব-মন্ত্রের সাধনা করিয়াছিল, পরবর্ত্তী যুগের জ্ঞানবিষ-জর্জ্জরিত ইংরেজ কবি তাহাতে সংশয়-মুক্ত হইতে পারেন নাই, তাই শেক্স্পীয়ারের কবি-প্রতিভার উদ্দেশে তিনি হতাশ ভাবে বলিয়াছিলেন—

> "Others abide our question—Thou art free!
> We ask and ask—Thou smilest and art still,
> Out-topping knowledge:"

শেক্স্পীয়ারের কল্পনা যে ভূমিতে আরোহণ করিয়াছে, সেখানে সকল জিজ্ঞাসা স্তম্ভিত, সে প্রজ্ঞা জ্ঞানকেও অতিক্রম করে। তাই ম্যাথ্যু আর্ণল্ড্ শেক্স্পীয়ারের সেই উত্তুঙ্গ কবি-সিংহাসনের পানে চাহিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করিয়াছিলেন। কিন্তু শেক্স্পীয়ারের এই সিদ্ধিলাভ ত' অরূপ-সাধনায় ঘটে নাই—এত বড় রূপ-স্রষ্টা কবি আর কে জন্মিয়াছে! আর কে এমন করিয়া নিজে নির্ব্বাক থাকিয়া জগৎ-রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যগুলি কেবলমাত্র উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইয়াছে! শেক্স্পীয়ারের মত নির্লিপ্ত নির্ব্বিকার বাস্তবজয়ী বস্তু কল্পনা এযুগে সম্ভব নয়; তথাপি শেক্স্পীয়ারের কাব্যসিদ্ধির দৃষ্টান্তে আমরা কাব্য-সাধনার স্বরূপ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইয়াছি। এই বহির্জগৎ—এই সৃষ্টির মধ্যেই যে কল্পনা আপনাকে মুক্তি দিয়া যেন এক প্রকার বিশ্ব-চেতনার সঙ্গে আত্ম-চেতনা মিলাইয়া, সর্ব্ব-বিরোধ ও সর্ব্ব-বৈচিত্র্যের তীব্র তীক্ষ্ণ অনুভূতিকেই দ্বন্দ্বাতীত করিয়া তোলে, তাহাই উৎকৃষ্ট কবি-কল্পনা। আধুনিক কাব্যের কবিকর্ম্ম আরও দুরূহ; এখনকার কালে কাব্যরসের আস্বাদনে এইরূপ আত্ম-বিলোপ অতিশয় দুঃসাধ্য, কারণ, তীব্রতর জগৎ-চেতনার ফলে এখন আত্ম-চেতনাও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছে। তথাপি কবিকে কাব্যসৃষ্টি করিতে হইলে সেই চিরন্তন দ্বন্দ্বকেই অন্য উপায়ে উত্তীর্ণ হইতে হইবে; ভাবকে রূপের অধীন করিতে না পারিয়া কেবল রূপকে ভাবের অধীন করিলেই চলিবে না; য়ুরোপীয় কাব্যে সে পরীক্ষাও হইয়া গিয়াছে। এখন একমাত্র পন্থা—এই সজ্ঞান দ্বৈতের মধ্যেই অদ্বৈতের প্রতিষ্ঠা। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এককালে কবি-কল্পনার এই লীলাই আমরা দেখিয়াছি—সেখানে ভাব ও রূপের সাযুজ্য-সাধনে এক অপূর্ব্ব রসের অভিব্যক্তি হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসাধনার এই বৈশিষ্ট্য কেবল কাব্যসৃষ্টিতেই প্রকাশ পায় নাই—তিনি তাঁহার এই কাব্য-মন্ত্রের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ, তাঁহার এই কবিধর্ম্মের আনন্দ-উল্লাস, বহুবার বহুবিধ ভাবে জ্ঞাপন করিয়াছেন; আমরা তাহা বুঝিতে চাহি নাই।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনের এই পূর্ব্বার্দ্ধভাগের, বা পূর্ণযৌবনের সাধনা তাঁহার উত্তরজীবনের সাধনার দ্বারা আপাততঃ আচ্ছন্ন হইয়া আছে। যাঁহারা আদি হইতে আজ

পর্য্যন্ত, রবীন্দ্রনাথের এই দীর্ঘ কাব্য-সাধনায় তাঁহার কল্পনার নিত্যনব ভঙ্গিকে একই কবি-ব্যক্তির মানস-পরিণতির বিভিন্ন স্তর-বিকাশ মনে করিয়া আশ্বস্ত হন, তাঁহাদের সঙ্গে এই হিসাবে আমার মত-বিরোধ নাই যে, সে ক্ষেত্রে কাব্যই মুখ্য নয়, কবি-মানসই মুখ্য—সে বিচারের ক্ষেত্রই স্বতন্ত্র। কিন্তু যেখানে কাব্য-বিচারই মুখ্য উদ্দেশ্য সেখানে কাব্যের উপরে কবিকে স্থান দেওয়া কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। আধুনিক কালের কাব্য-সমালোচনায় গীতিকাব্যের আদর্শই অতিরিক্ত প্রাধান্য লাভ করায়, কাব্যরস অপেক্ষা কবি-মানসই আলোচনার মুখ্য বিষয় বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহাও আর একদিকে অতিচার। সংস্কৃত আলঙ্কারিকের কাব্য-বিচারে যেমন কবি-মানসের কোন স্থান ছিল না—তেমনিই আধুনিক কাব্যবিচারে যদি কবি-মানসই সকল স্থান জুড়িয়া বসে, তবে কাব্য যে বস্তুকে ছাড়িয়া একেবারে ভাবের তুরীয়-লোকে রঙ্গীন ছায়া-রচনা হইয়া দাঁড়াইতে পারে, তাহা বোধ হয় কোনও সত্যকার কাব্য-রসিক অস্বীকার করিবেন না। রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার কৃতিত্ব-আলোচনায় আমি তাঁহার কাব্যে ভাব ও রূপের যে অভিনব সমন্বয়ের কথা বলিয়াছি তাহা আপনারা স্মরণ করিবেন; অথবা, আধুনিক যুগের কাব্য-সাধনায় যে সমস্যার উল্লেখ করিয়াছি, তাহাও স্মরণ করিতে বলি। এ প্রবন্ধে কাব্যের আদর্শ সম্বন্ধে পৃথক আলোচনার অবকাশ নাই, তথাপি প্রসঙ্গক্রমে আমি এ সম্বন্ধে যে ধারণা ব্যক্ত করিয়াছি, আশা করি সুধীজন তাহা অগ্রাহ্য করিবেন না। কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম। রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে আমাদের কাব্যবুদ্ধি স্তম্ভিত হইয়া গেছে, এই হত-চেতনার একটি প্রমাণ—রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বতন কবি-কীর্ত্তির পরিচয় আজকাল বড় কেহ রাখে না। বর্ত্তমানে রবীন্দ্রনাথ যে ধরণের ভাব-সাধনায় নিমগ্ন আছেন, ভাষা ও ছন্দের ভিতর দিয়া তাহার যে সুর আমাদের কানে বাজিতে থাকে—বুঝি বা না বুঝি, চক্ষু মুদিয়া আমরা তাহারই রসাস্বাদনের ভান করি। এ সাধনার সঙ্গে আধুনিক জীবন-চেতনার সহজ সম্পর্ক নাই, এবং উহার অন্তর্গত প্রেরণা খাঁটি কবি-কল্পনার অনুকূল নয়। তথাপি এই সঙ্গীতের মোহিনী শক্তি অগ্রাহ্য করিবার নয়; তাই আধুনিকতম বাংলা সাহিত্যে এক দিকে অস্পষ্ট ভাবের ঘোর এবং অপরদিকে তাহারই বিরুদ্ধে বিকৃত মানস-বিলাস প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্য-সাধনার গতি-প্রকৃতি যদি আমরা বুঝিতে পারিতাম, তাঁহার কবি-জীবনের আদি, মধ্য ও অন্তকে—সাহিত্যের আদর্শ, ও তাঁহার ব্যক্তিগত সাধনার আদর্শ, এই উভয় আদর্শে—সম্পূর্ণভাবে বুঝিয়া লইবার সামর্থ্য যদি আমাদের থাকিত, তবে আমাদের সাহিত্যবোধ আরও সজাগ ও সজীব হইয়া উঠিত। কিন্তু তাঁহাকে কোন দিক্ দিয়াই আমরা বুঝি নাই। আধুনিক কালে সাহিত্যের যে আদর্শ, রসসৃষ্টির যে রহস্য, কাব্য-বিচারে যে নূতন সমস্যার সমাধান দাবী করিতেছে, রবীন্দ্রনাথের কবি-কীর্ত্তির মধ্যে সেই সমস্যা পুরামাত্রায় বিদ্যমান; তাহার বিচারেও সেই রহস্যের সন্ধান, সেই আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। কিন্তু আমরা এই সাহিত্য-ধর্ম্মকে এখনও স্বীকার করি না, তাই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকেও যথার্থ ভাবে বরণ করিয়া লইতে পারি নাই। এতকাল

পরে এযুগেও কেহ কেহ যেভাবে কাব্য-জিজ্ঞাসা আরম্ভ করিয়াছেন তাহাকে, কাব্য-পরিমিতি কেন, কাব্য-জ্যামিতি বলাও চলে; সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের সূত্র অনুসারে তাঁহারা যেভাবে রবীন্দ্র-কাব্যের রস-প্রমাণে যত্নবান হইয়াছেন তাহাতে বুঝা যায়—শুধুই রবীন্দ্র-সাহিত্য নয়, সকল আধুনিক সাহিত্যের রসাস্বাদে তাঁহারা এখনও পরাঙ্মুখ।

রবীন্দ্রনাথের এমন দিব্য-প্রতিভাও যে এ যুগে বাঙ্গালীর সাহিত্যিক জীবনে আশানুরূপ শক্তি সঞ্চার করিতে পারিল না, ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে শুধুই রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনার ধারা বা তাঁহার কবি-মানসের পরিচয় করিলেই হইবে না, সেই সঙ্গে, বাঙ্গালীর জীবন, তাহার শিক্ষাদীক্ষা ও সাধারণ সংস্কৃতির কথা ভাবিয়া দেখিতে হয়। তাহা হইলে দেখা যাইবে, এই দুর্ভাগ্যের জন্য রবীন্দ্র-প্রতিভার গৌরবহানি হয় না। বাংলাসাহিত্যে তিনি যাহা দিয়াছেন—তাঁহার স্বতন্ত্র-সাধনা সত্ত্বেও, তিনি বাঙ্গালী ও বাংলাভাষার জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহার মূল্য বুঝিবার শক্তি যে তাহার নাই—ইহাও তাহার কম দুর্ভাগ্য নয়। আর একদিক দিয়া দেখিলে রবীন্দ্র-প্রতিভার গৌরবে বাঙ্গালীর গৌরবান্বিত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। রবীন্দ্রনাথের কল্পনা, শুধু বাংলাদেশের কেন—বর্ত্তমান জগতের যুগ-প্রয়োজনে বাধ্য না হইয়া, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান-বিসর্পী এক সার্ব্বভৌমিক রস প্রতিষ্ঠার সাধনা করিয়াছে—সে সাধনায় ভারতীয় অধ্যাত্ম-দৃষ্টি তাঁহার সহায় হইয়াছে। তথাপি এ সাধনায় যেমন একটি সুমহান্ আধ্যাত্মিক আদর্শ পরিস্ফুট হইয়াছে, ইহার প্রভাবে যেমন কূপ-মণ্ডুক মহাসাগর-দর্শনের অধিকারী হয়, ইহা যেমন বাঙ্গালীর মানস-মুক্তির একটি চিরস্থায়ী উপায় হইয়া থাকিবে, তেমনই,—দুঃখের বিষয় যে, ইহা তাহার বর্ত্তমান দেহ-দশায় তাহার দুর্ব্বল প্রাণ-ধর্ম্মের পক্ষে উপযুক্ত পথ্য নয়; ইহাকে পরিপাক করিবার শক্তি তাহার নাই। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাধনায় যে নূতন রস-দৃষ্টির পরিচয় আছে তাহার স্বরূপ-নির্ণয় আমার মত ব্যক্তির সাধ্যায়ত্ত নয়; বাঙ্গালী যদি বাঁচিয়া থাকে, যদি তাহার দেহ-মন-প্রাণ নব জীবনে সঞ্জীবিত হইয়া সত্য-সুন্দরের সাধনায় পূর্ণশক্তি লাভ করে, তবে একদিন আমার প্রাণের এই ক্ষীণ প্রতিধ্বনির পরিবর্ত্তে এ যুগের এই মহাকবির শ্রদ্ধা-তর্পণে বহুকণ্ঠের বিশুদ্ধতর মন্ত্রোচ্চারণ শোনা যাইবে। বিশ্বসাহিত্যের উদার প্রাঙ্গণে ভবিষ্য-কালের বিচারেও রবীন্দ্র-প্রতিভার মূল্য নির্দ্ধারিত হইবে। আমার এমনও মনে হয়, যে, এতকাল কবি-প্রেরণা যে পথে রসসৃষ্টি করিতেছিল তাহার মূলমন্ত্র যেমন শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকীয় কল্পনাতেই চূড়ান্ত সিদ্ধি লাভ করিয়াছে; তেমনই কাব্য-সাধনার যে আর এক পন্থা য়ুরোপীয় সাহিত্যেই সূচিত হইয়াছে, যাহা ডাহিনে বামে নানা ভঙ্গিতে নানা দিকে আজও অগ্রসর হইয়া চলিতেছে—কাব্যসাধনার সেই পন্থায় যে চূড়ান্ত-সিদ্ধির সম্ভাবনা আছে, রবীন্দ্রনাথের ভারতীয় ভাবকল্পনা হয় ত তাহাতেও শক্তি সঞ্চার করিবে; প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সেই পূর্ণমিলন-মন্ত্রের উদ্গাতারূপেই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সার্থক হইবে। সাহিত্যের সে রূপ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই—রবীন্দ্রনাথও সে সাহিত্যের মন্ত্রদ্রষ্টা মাত্র, রূপস্রষ্টা নহেন। য়ুরোপের রূপ-বাদ ও ভারতের

ভাব-বাদ রবীন্দ্র-সাহিত্যে যেটুকু সমন্বয়ের অবকাশ পাইয়াছে, তাহাতেও মোটের উপর এ পর্য্যন্ত ভাবের প্রাধান্যই অধিক; তথাপি, কাব্যরস-পিপাসার সঙ্গে জগৎ-জিজ্ঞাসার যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আধুনিক কালে উত্তরোত্তর প্রবল হওয়াই স্বাভাবিক, সেই অতিশয় আত্ম-সচেতন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-মূলক কল্পনাই এ পর্য্যন্ত আর কোথাও এমন বিশ্বাত্মীয়তার রসে পৌঁছিতে পারে নাই। এদিক দিয়া চিন্তা করিলে য়ুরোপই এ মার্গের নিকটতর অধিকারী—দেশের তুলনায় বিদেশে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত আদর যে অধিক, তাহা ক্ষোভের বিষয় হইলেও আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। রবীন্দ্র-সাহিত্যের রস-ভূমিতে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালীকে এখনও অন্যতর মন্ত্রের সাধনা করিতে হইবে। রূপ-সাধনা না করিয়া ভাব-সাধনার গহন পন্থায় প্রবেশ করিবার আকাঙ্ক্ষা আজিকার অবস্থায় বাঙ্গালীর পক্ষে সত্যও নহে, স্বাভাবিকও নহে। রবীন্দ্র-প্রতিভার মূলমর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া তাহার অনুকরণ করিলে, অথবা তাহার প্রতি আক্রোশ করিয়া সাহিত্যের চিরন্তন আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিলে, বাংলা সাহিত্যের অপমৃত্যু ঘটিবে। এ সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ-লাভের একমাত্র উপায়—রবীন্দ্র-সাহিত্যের সহিত বাঙ্গালীর ঘনিষ্ঠতর পরিচয়-সাধনের চেষ্টা; এবং য়ুরোপীয় সাহিত্যের আধুনিকতম রূপটিকেই চরম আদর্শ মনে না করিয়া, সকল কালের সাহিত্য হইতে সাহিত্যের স্বরূপ ও স্বধর্ম্মকে উদ্ধার করিয়া উদার রসবোধের প্রতিষ্ঠা করা। তবেই বাংলা সাহিত্যে বাঙ্গালীর প্রকৃত মানস-মুক্তি ঘটিবে, তখন রবীন্দ্র-সাহিত্যের দুর্লভ সম্পদকে আমরা আত্মসাৎ করিতে পারিব—সে প্রতিভার গৌরবে আমরা যথার্থ গৌরবান্বিত হইতে পারিব।

পৌষ, ১৩৩৮

দেবেন্দ্রনাথ সেন

দেবেন্দ্রনাথ যে যুগের কবি সে যুগ এখনও সম্পূর্ণ গত হয় নাই, কিন্তু নব্য সাহিত্যিক-মণ্ডলীর মধ্যে এমন কেহ নাই যিনি তাঁহার কবি-প্রতিভার সম্যক্ বা কথঞ্চিৎ পরিচয় রাখেন,—ইহা নিজ অভিজ্ঞতা হইতে জানি। ইহার প্রধান কারণ, তাঁহার কাব্যগুলি তেমন সুপ্রচারিত হয় নাই। পুরাতন 'ভারতী' ও 'সাহিত্য'-পত্রিকার পৃষ্ঠাগুলির মধ্যেই সে স্মৃতি ধূলিলিপ্ত হইয়া আছে; এবং শেষ বয়সে তাঁহার যে সকল কবিতা সমসাময়িক মাসিক-পত্রে মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হইত, সেগুলিতে তাঁহার প্রতিভার মধ্যাহ্ন-দীপ্তির পরিচয় ছিল না। অতএব আধুনিক পাঠক সমাজে যাঁহারা প্রকৃত কাব্যরস-পিপাসু তাঁহাদের সঙ্গে একজন বিস্মৃতপ্রায় কবির নূতন করিয়া পরিচয়-সাধন করাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। এজন্য এই প্রসঙ্গে কবির পরিচয়-হিসাবে অনেক কবিতা উদ্ধৃত করা আবশ্যক হইবে—আশা করি, সেই নিদর্শনগুলির সাহায্যেই পাঠক স্বাধীনভাবে কবির পরিচয় গ্রহণ করিবেন, আমার মন্তব্যগুলি এই রত্নমাল্যের গ্রন্থিমাত্র মনে করিলেই আমি কৃতার্থ হইব।

কবিবর বিহারীলালের কাব্য হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক বাংলাকাব্যে যে নূতন ভঙ্গি লক্ষ্য করা যায় তাহাতে সমগ্র ইংরেজী যুগের কাব্য সাহিত্য দুইটি ধারায় বিভক্ত হইয়াছে—একটির গতি-প্রকৃতি বহির্মুখী ও মহাকাব্যের অনুকূল; অপরটির কল্পনা মুখ্যতঃ অন্তর্মুখী, আত্মনিষ্ঠ ও গীতাত্মক। বাঙ্গালীর কাব্য চিরদিন গীতি-প্রাণ—কিন্তু ইংরেজী ও তথা য়ুরোপীয় আদর্শের অনুপ্রাণনায়, এবং অভিনব শিক্ষা ও সাধনার সংস্পর্শে, অতি অল্পকালের মধ্যেই বাঙ্গালীর ভাব-সাধনায় যে বিপ্লব বাধিল, এবং তাহার প্রভাবে জীবন ও জগৎকে নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবার যে প্রেরণা বাঙ্গালী কবিকে চঞ্চল করিয়া তুলিল, তাহারই ফলে বাংলা কাব্যে এক নূতন সাধনার সূত্রপাত হইয়াছিল। এই সাধন-চক্রের প্রবর্ত্তক বিহারীলাল এবং সিদ্ধ সাধক রবীন্দ্রনাথ। আর যে দুইজন কবি রবীন্দ্রনাথের সমকালবর্ত্তী ও সতীর্থ তাঁহাদের একজন দেবেন্দ্রনাথ এবং অপর জন কবি অক্ষয়কুমার বড়াল। এ যুগের গীতিকাব্যে আমরা যে ভাববিপ্লব ও সজ্ঞান ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সাধনার পরিচয় পাই, দেবেন্দ্রনাথের কবিতাগুলিতে তাহার স্পষ্ট প্রতিধ্বনি নাই। তাঁহার প্রতিভা আত্ম-মুগ্ধ; তিনি আপন হৃদয়ের স্বতঃউৎসারিত ভাব-নির্ঝরিণীর মধ্যে আপনাকে মুক্তি দিবার চেষ্টা করিয়াছেন; আপনার অন্তরে যে স্পর্শ-মণি পাইয়াছেন তাহার স্পর্শে জগৎ ও জীবনকে সোনায় সোনা করিতে চাহিয়াছেন; তিনি পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চ-প্রদীপ জ্বালিয়া অনাবিল প্রীতির মন্ত্রে সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর আরাধনা করিয়াছেন—কোনপ্রকার চিন্তা বা বিচারকে তিনি সে পূজাগৃহে পদক্ষেপ করিতে দেন নাই। বিহারীলালের ধ্যান ছিল, দেবেন্দ্রনাথের কেবল

আরতি। *এই সৌন্দর্য্যমুগ্ধ কবির সৌন্দর্য্যসাধনায় একটি নূতন দিক ফুটিয়া* উঠিয়াছে—নয়ন ও হৃদয়, এই দুইএর পরিচর্য্যায় সর্ব্বেন্দ্রিয়ের উল্লাসব্যঞ্জক এক নূতন কাব্যকলার উদ্ভব হইয়াছে। সে কথার বিস্তারিত আলোচনার পূর্ব্বে আমি কাব্য-পরিচয়ে ব্যাপৃত হইলাম।

কবি-মানসের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে কাব্যকলারও পরিণতি হইয়া থাকে, এই সূত্র ধরিয়া দেবেন্দ্রনাথের অসংবিন্যস্ত কবিতারাশির মধ্য দিয়া তাঁহার কবিশক্তির বিকাশ একটু স্থূলভাবে অনুসরণ করাই সম্ভব। তার আর একটি কারণ এই যে, রচনার এমন অসমতা আর কোনও কবির কাব্য-সাধনায় লক্ষিত হয় না; চিন্তা ও বিচার-বিশ্লেষহীন কবি-প্রতিভা উচ্চ-নীচ ও সমতল ক্ষেত্রে কল্পনাকে যেন অবন্ধন অবস্থায় ছাড়িয়া দিয়াছে। অথচ, এই দুরন্ত অসংযত কল্পনার লীলা স্থানে স্থানে এমন ফসল ফলাইয়াছে যে তাহা চিরদিন বঙ্গ-সাহিত্যে সোনার দরে বিকাইবে। মনে হয়, তাঁহার কবিতাগুলি যেন আপনারাই আপনাদিগকে লিখিয়াছে! ভাবানুভূতির সারল্য, অতি সহজ সৌন্দর্য্য-বোধ, বায়ুর স্পর্শমাত্র জলের হিল্লোল-কম্পনে প্রস্ফুটিত পদ্মের মত কবি-হৃদয়ের বিক্ষেপ—তাঁহার রচনায় যেমন লক্ষ্য করা যায়, এমন আর কোথাও নয়। ইহার দোষ এবং গুণ, উভয়ই তাঁহার কাব্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। এজন্য তাঁহার কবিজীবনের কালক্রম বা কবিশক্তির ক্রমবিকাশ তাঁহার কাব্য-গুলির মধ্যেই চিহ্নিত হইয়া আছে এবং চেষ্টা করিলে এ বিষয়ে একটা ক্রম-সূত্র পাওয়া যাইবে, এরূপ ধারণা অসঙ্গত নহে; এতদ্ভিন্ন, প্রথম বয়সের রচনা, মধ্য বয়সের রচনা, ও শেষ বয়সের রচনা—এরূপ স্তরবিভাগে বিশেষ কোনও বাধা নাই।

প্রথমেই, কবি তাঁহার কবিধর্ম্ম সম্বন্ধে নিজেই বহুবার যে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন তাহার একটি এখানে উদ্ধৃত করিলাম—

চিরদিন চিরদিন রূপের পূজারী আমি—
রূপের পূজারী!
সারাসন্ধ্যা সারানিশি রূপ-বৃন্দাবনে বসি'
হিন্দোলায় দোলে নারী, আনন্দে নেহারি।

অধরে রঙ্গের হাস বিদ্যুতের পরকাশ,
কেশের তরঙ্গে নাচে নাগের কুমারী;

বাসন্তী ওড়োনা-সাজে প্রকৃতি-রাধিকা নাচে,
চরণে ঘুঙ্গুর বাজে আনন্দে ঝঙ্কারি'।

নগনা দোলনা কোলে মগনা রাধিকা দোলে
কবিচিত্তে কল্পনার অলকা উঘারি'—

আমি সে অমৃত-বিষ পান করি অহর্নিশ,
সংসারের ব্রজবনে বিপিনবিহারী।

কবি এক স্থানে তাঁহার 'কল্পনা'র প্রতি যে উক্তি করিয়াছেন তাহাও এখানে উদ্ধৃত করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

অপরের চিত্তগৃহে মন্থর গমনে যাও
মৃদুল কৌমুদী-রূপ ধরি',
ধরিয়া বিদ্যুৎ-রূপ কেন এসো মোর চিত্তে—
চমকি' প্রাণের রাজ্য কাঁপে থরথরি'!

অপরের চিত্তবনে ধীরে ফোটে ফুল,
ছিল যাহা পরাগের রেণু—
রবিকর পিয়ে পিয়ে হয় সে মুকুল,
সুধীরে প্রকাশে ফুলতনু;

হায়, কিন্তু মোর চিত্তে হিমাদ্রি-শিখরে যেন
অকস্মাৎ বসন্ত-সঞ্চার—
পল্লবে মুকুলে ফুলে নুয়ে পড়ে তরু-লতা,
মুহূর্ত্তে একি গো রঙ্গ, মর্ম্ম বোঝা ভার।

অপরের পার্শ্বে যাও—যেন শিশু-মণি
সাঁওতাল-প্রসূতির কোরে;
প্রসব-যন্ত্রণা ব্যথা জানে না রমণী,
ভাগ্যবতী পুত্রমুখ হেরে।

এস কিন্তু মোর পাশে, কেন এ ভয়াল বেশে
আত্মা মোর তোলপাড় করি'?—
যেন ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া, 'ওম্' শব্দে নিঃসরিয়া
উরিলা ব্রহ্মার কন্যা দেবী বাগীশ্বরী!

অর্থাৎ—তাঁহার সৌন্দর্য্যপিপাসা শান্ত ধ্যানপ্রবণ নহে, তাঁহার সৌন্দর্য্য-কল্পনায় আত্মকর্ত্তৃত্ব থাকে না। এ উক্তির প্রমাণ নিম্নোদ্ধৃত কবিতায় আছে।

দাও দাও বিদায়-চুম্বন!
জীবনের রত্নাগার একেবারে করে' খালি
অভাগারে ফাঁকি দিয়ে মরণে দিতেছ ডালি,
দাও দাও বিদায়-চুম্বন!

লয়ে ও হীরার কুচি চক্ষের সলিল মুছি'
দরিদ্র করিবে সখি জীবন যাপন,
দাও দাও বিদায়-চুম্বন!

এ হেমন্তে দাও সখি ফুল্ল মালতীর মালা,
পৌষের দুরন্ত শীতে রৌদ্ররাশি দাও বালা,
দাও দাও বিদায়-চুম্বন!
ঘনঘোর বর্ষারাতে কোথা পাব জ্যোৎস্নারাশি।
এ জলদে ছাড়ি দাও বিকট বিদ্যুৎ-হাসি।
দাও দাও বিদায়-চুম্বন!

পুলিনে দাঁড়ায়ে হায় শীতে থর থর কায়—
সলিলে নামিব আমি মুদিয়া নয়ন,
দাও দাও বিদায়-চুম্বন!

সূর্য্যকান্ত-মণিসম অধর-প্রবালে মম
ভরি' লব একরাশি কাঞ্চন-কিরণ!
দাও, চিত্ত-মণিবন্ধে রাখিব বন্ধন বাঁধি'
চিরবিরহের দিনে বিরহের চির-সাথী—
দাও দাও বিদায়-চুম্বন!

নবমেঘ যতক্ষণ বর্ষণ সম্বরণ করে, ততক্ষণই তাহাকে সুন্দর দেখায়,—কবি নাকি কাব্য-বিষয় হইতে কতক-পরিমাণে আপনাকে নির্লিপ্ত না রাখিলে রচনার পারিপাট্যের হানি হয়। উপরি-উদ্ধৃত কবিতায় এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কবি আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিয়া, অরুদ্ধ আবেগের বশে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতেই ভাব-সংহতি ও প্রকাশ-কৌশল পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে। এ চাতুরী কতখানি অযত্নসিদ্ধ ও কতখানি সাধনালব্ধ, ভাবিতে বিস্ময় জন্মে। এমন স্বতঃউৎসারিত-প্রায় কবিতার মধ্যে এত অধিক গাঢ়তা সামান্য শক্তির পরিচয় নহে। এইরূপ উপমার ঘটা, ভাষার ছটা ও অনুভূতির ঐকান্তিকতা দেবেন্দ্রনাথের সকল পরিপক্ক রচনায় আছে—কিন্তু এই পরিপক্কতা সর্ব্বত্র কালক্রমিক নহে; তথাপি ভাব, ভাষা ও কলা-কৌশলের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার কবি-প্রতিভার ক্রমবিকাশ-সূত্রটি কেমন করিয়া ধরা যায় তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব। কাব্যক্ষেত্রে সৌন্দর্য্যই প্রথম হইতে তাঁহার হৃদয়ে আধিপত্য করিয়াছে; সৌন্দর্য্যসাধনার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের বিস্তার হইয়াছে, সৌন্দর্য্য-দৃষ্টি আরও ব্যাপক হইয়াছে; তখন প্রীতি আসিয়া কল্পনার হাত ধরিয়াছে—ক্রমে এই প্রীতির আধিপত্যে কল্পনার আংশিক পরাজয় ঘটিয়াছে এবং পরিশেষে ভক্তি-সাগর সঙ্গমে কল্পনা স্রোতস্বিনীর আকুল কলনাদ স্তব্ধ হইয়াছে। প্রধানতঃ এই চারিটি স্তরে তাঁহার কবিতাগুলিকে বিভক্ত করা যাইতে পারে। সর্ব্বপ্রথম স্তরের বিশেষ পরিচয়ে প্রয়োজন নাই—পাঠকমাত্রেই সেগুলি বাছিয়া লইতে পারিবেন। এগুলিতে সৌন্দর্য্য-বোধ এখনও ভালো ফুটে নাই, কিন্তু

কবি-হৃদয়ের অকৃত্রিম আকুলতা ও সরল পবিত্র উল্লাস ভবিষ্যৎ শক্তির সূচনা করিতেছে। ইহার পর কবি এইরূপ আত্মপরিচয় দিতেছেন—

এক যে বিধবা আছে এ-দেশের মাঝে,
তাহারি মুরতি মোর হৃদয়েতে রাজে—
পাটল অধরে তার,
চঞ্চল ধূসর কেশে
ডুবায়ে তুলিকা ঘন, আঁকি আমি ছবি—
আমি খুদ্র বাঙ্গালার কবি।

এক যে সধবা আছে, কোলে পিঠে যার
শিশু-স্মর রেখে গেছে ফুল-ছবি তার—
সীমন্ত-সিন্দুরে তার,
চরণ-অলক্ত-রাগে
ফলাইয়া নবরাগ, আঁকি আমি ছবি—
চিরদুঃখী বাঙ্গালার কবি।

গ্রামের এ কূলে কূলে, প্রাণের অশ্বথ-মূলে
যতদিন বহিবে জাহ্নবী—
খোকারে লইয়া বুকে,
প্রিয়ারে আলিঙ্গি সুখে,
বুক পুরি' রঞ্জিব এ ছবি—
ক্ষুদ্র আমি বাঙ্গালার কবি।

এই প্রীতি-সিঞ্চিত সৌন্দর্য্যের পরিবেষণ—বাংলার সারস্বত-আয়তনের একটি চত্বরে তাঁহাকে উৎসব-নায়করূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এই সময়ের অসংখ্য কবিতার বিস্তৃত পরিচয় সম্ভব নহে, আমি কয়েকটি মাত্র উদ্ধৃত করিব। এই শ্রেণীর কবিতাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ কবিকীর্ত্তি ;. তাঁহার প্রথম প্রকাশিত, একমাত্র পরিচিত কাব্য-সংগ্রহ 'অশোকগুচ্ছে' ইহারই কয়েকটি গ্রথিত হইয়াছিল।

'দাও দাও একটি চুম্বন'-শীর্ষক কবিতা এই দ্বিতীয় স্তরের উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করিলে ক্ষতি নাই। পিপাসার জ্বালা এখন আর জ্বালা নয়—অসহ্য হরষ। হৃদয়ের মধ্যে সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে—অন্তর ভরিয়া গিয়াছে; কবি আপনাকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়াছেন, কোনোখানে যুক্তি-তর্কের 'যদি' 'কিন্তু' নাই।

দাও দাও একটি চুম্বন—
মিলনের উপকূলে সাগর-সঙ্গমে
দুর্জ্জয় বানের মুখে ভাসাইয়া দিব সুখে
দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবন !

আর এক একটি—চুম্বন !
তোমার ও ওষ্ঠদুটি বাসন্তী যামিনী জাগি'
পাতিয়াছে ফুলশয্যা বল গো কাহার লাগি ?
দাও দাও একটি চুম্বন।
নববধূ আত্মা মোর লাজুক লাজুক ঘোর—
চক্ষু বুজি' মাথা গুজি' করিবে শয়ন।

পুষ্পময় স্বপ্নময় তোমার ও ভালবাসা,
কবিতা-রহস্যময় নীরব তাহার ভাষা।
কপোত কপোতী সনে
মগ্ন মৃদু কুহরণে
থাকে যথা, সেইরূপ পরামর্শ করি'
তব ওষ্ঠ মম ওষ্ঠ উঠুক শিহরি।

'গান-শোনা' শীর্ষক কবিতায় কবির এই কবি-ধর্ম্মের আরও সজ্ঞান পরিচয় আছে।—

গেয়ে যাও, থেম' নাক', গেয়ে যাও গান,
সাজে না তোমারে সখি মিছা অভিমান।
পিয়ে ও সঙ্গীত-মধু আমার মানসী বধূ
আহ্লাদে উন্মুখ আজি উর্দ্ধ করি কান।
বধিরতা সারিয়াছে, আত্মা মোর বুঝিয়াছে—
রূপ, রস, স্পর্শ, গন্ধ—একই উপাদান।
পুষ্প, জ্যোৎস্না, প্রেম, গান,—এক সেতারের তান।
গেয়ে যাও, থেম' নাক', গেয়ে যাও গান,
সাজে না তোমারে সখি মিছা অভিমান।

যত তব প্রাণমাঝে হাসি অশ্রু লেগে আছে—
উছলি' উছলি' আজি আনিছে ও গান।
সুখ মৃদু কেঁদে উঠে দুখ মৃদু হেসে উঠে,
গেয়ে যাও, থেম' নাক', গেয়ে যাও গান,
সাজে না তোমারে সখি মিছা অভিমান।

কবে কোন শেফালির সৌরভে হয়ে অস্থির
দুহুঁ দোঁহে করেছিনু প্রেম-সুধা দান,
কবে কোন যামিনীতে বসি বাতায়ন-পথে
করেছিলে তুমি সখি অভিমান-ভান
কোন সে মাধবী-রাতে ফুলশয্যা ফুলপাতে
একটি চুম্বনে হ'ল নিশি অবসান!—
নয়নে ত্রিদিব-নেশা, পুলক-বিহ্বল-বেশা
বলে' যাও সে কাহিনী, গেয়ে যাও গান,
সাজে না তোমারে সখি মিছা অভিমান।

এই সকল কবিতায় দেবেন্দ্রনাথের স্বভাবসিদ্ধ sensuousness যে আকারে প্রকটিত হইয়াছে, তাহার বিশিষ্ট লক্ষণ এই যে, তাঁহার লালসাও পদ্মের মত বিশদ, ধূপের ন্যায় সুরভি। Sensation ও emotion—ইন্দ্রিয় ও হৃদয়, এই দুইয়ের মিলনে তাঁহার রচনায় যে কাব্য-শিল্পের বিকাশ দেখিতে পাই তাহাতে morbid কল্পনার অবকাশ একরূপ অসম্ভব।

প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা এইখানে বলিয়া রাখিতে চাই। আধ-আলোছায়াময়ী রহস্যরূপিণী জ্যোৎস্নানিশীথিনী যেমন বড়াল-কবির কল্পনার অনুকূল, রবীন্দ্রনাথের কল্পনা যেমন বর্ষান্ধকারে নিরুদ্দেশ অভিসারে যাত্রা করে, দেবেন্দ্রনাথের কল্পনা তেমনি চৈত্র-বৈশাখের রৌদ্র-মদিরা পানে বিভোর—অশোকের রঙে, চম্পকের সৌরভে মাতিয়া উঠে। 'বর্ষ-শেষ' ও 'নববর্ষ' বিষয়ক অসংখ্য কবিতার মধ্য হইতে আমি কেবল একটি মাত্র এখানে উদ্ধৃত করিলাম—পাঠকগণ ইহাতে কবির অপূর্ব্ব কল্পনা-বিলাস লক্ষ্য করিবেন।

কপালে কঙ্কণ হানি' মুক্ত করি' চুল
বাসন্তী যামিনী আহা কাঁদিয়া আকুল!
স্বামী তার চৈত্রমাস অনঙ্গের মত,
দক্ষিণে ঈষৎ হেলি' জানু করি নত,
কার তপ ভাঙ্গিবারে করিছে প্রয়াস?
রুদ্রের মূরতি ও যে!—এ কি সর্ব্বনাশ!

ললাটে অনল হের ধক্ ধক্ জ্বলে!
সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি-ভস্ম মাখি কুতূহলে
তপে মগ্ন—চিনিলে না বৈশাখ-দেবেরে?
হে চৈত্র! এ নিশি-শেষে, নিয়তির ফেরে,
হারাইলে প্রাণ আহা!—নাশিতে জীবন
রোষান্ধ বৈশাখ ওই মেলিল নয়ন!

দিগঙ্গনা হাঁকি' ডাকে—"কি কর, কি কর !"
নব-উষা বলে "ক্রোধ সম্বর সম্বর !"
কোকিল ডাকিল মুহু করিয়া মিনতি,
সম্ভ্রমে অশোক-পুষ্প করিল প্রণতি !
বৃথা ! বৃথা ! বৈশাখের চু'চক্ষু হইতে
নিঃসরিল অগ্নিকণা, বেগে আচম্বিতে !

ভস্ম হ'ল চৈত্রমাস ! হয়ে অনাথিনী
মুছিল সিন্দুরবিন্দু বাসন্তী যামিনী !
শাল্মলীর পুষ্পরাশি পড়িল খসিয়া,
পাপিয়া বসন্ত-রাজ্যে গেল পলাইয়া।
প্রজাপতি লুকাইল করবীর শিরে,
ভিজিল শিরীষ পুষ্প নয়নের নীরে !

আম্রের বাহুনীদের সুহরিত দেহ
ভরি' গেল রক্তপীতে, খসি' গেল কেহ !
কঠিন উপলে বসি' সারস সারসী ?
বিহগ-ভাষায় বলে 'কোথায় সরসী ?'
গহন অরণ্যে ছায়া পলাল তরাসে,
ক্লান্ত পান্থ শ্রান্ত হ'য়ে আতপে সন্তাষে।

লতিকা পড়িল লুটি' তরুর চরণে ;
বনস্থলী পতিহীনা নবীন যৌবনে !
দিন বলে, 'এবে আমি খেটে হ'ব সারা,'
রাত্রি বলে, 'হায়, আমি এবে আয়ুহারা !'
দম্পতি যুকতি করি' বিরহে ডাকিল,
কল্পনা কবির বধূ বিদায় মাগিল !

'অশোক ফুল' শীর্ষক কবিতায় কবি-নয়নের বর্ণ-বিলাস উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে-

কোথায় সিন্দুর গাঢ়—সধবার ধন ?
আবীর কুঙ্কুম কোথা গোপিনী-বাঞ্ছিত ?
কোথায় মুরীর কণ্ঠ আরক্ত-বরণ ?
কোথায় সন্ধ্যার মেঘ লোহিতে রঞ্জিত ?
কোথায় বা ভাঙে-রাঙা রুদ্রের লোচন ?
কোথা গিরিরাজ-পদ অলক্তে মণ্ডিত ?
মদন-বধূর কোথা অধরের কোণ—
ব্রীড়ার বিক্ষেপে হায় সতত লোহিত ?

সকলেরই কিছু কিছু চারুতা আহরি'
ধরি' রাগ অপরূপ গাঢ় ও তরল,
গুচ্ছে গুচ্ছে তরুবরে করিয়া উজ্জ্বল
রাজিছে অশোকফুল, মরি কি মাধুরী!
চৈত্র আর বৈশাখের অনিন্দ্য গরিমা—
হে অশোক, ও রূপের আছে কি রে সীমা?

অন্যত্র কবি নিজেই ফুল হইতে চাহিতেছেন—তাঁহার প্রেম ও সৌন্দর্য্য-পিপাসা এক হইয়া গিয়াছে—

ফেলিয়া দিয়াছি বাসি মালতীর মালা—
চম্পক-অঙ্গুলিগুলি ঘুরায়ে ঘুরায়ে
গাঁথিছ বকুল-হার বিনায়ে বিনায়ে?
শেষ না হইতে মালা ওই দেখ বালা,
তোমার অলকগুচ্ছ হয়েছে উতলা!
মালা-গাঁথা শেষ হ'লে পাইবে সম্পদ,
তাই বুঝি উরসের যুগ্ম কোকনদ
সরসে নলিনীসম হয়েছে চঞ্চলা?
আমিও কুসুম সখি, সারাটি যামিনী
সঞ্চিয়াছি তব লাগি' রূপ ও সৌরভ,
লভিতে এ পুষ্পজন্মে বিভব গৌরব,—
হ্লাদে দেখ, কি উতলা হয়েছি সজনি!
চিকণিয়া গাঁথিতেছে বকুলের মালা—
আমারেও ওই সাথে গেঁথে ফেল বালা!

কালিদাস প্রেয়সীকে 'প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ' বলিয়াছেন, আমাদের কবি বলেন, প্রেয়সী কাব্যশিক্ষার গুরু—

যাদুকরি, তুই এলি—
অমনি দিলাম ফেলি'
টীকাভাষ্য,—তোর ওই চক্ষু-দীপিকায়
বিদ্যাপতি, মেঘদূত, সব বোঝা যায়!
শব্দ হয় অর্থবান,
ভাব হয় মূর্ত্তিমান,
রস উথলিয়া পড়ে প্রতি উপমায়!
যাদুকরি, এত যাদু শিখিলি কোথায়?

'লাজ-ভাঙানো' শীর্ষক কবিতায় কবির অপূর্ব্ব 'কোর্টশিপ'-প্রথার পরিচয় পাই। কিশোরী-পরিণয়ের পক্ষপাতী যুবকগণ বিরুদ্ধবাদীদিগের যুক্তিতর্কে পরাজিত হইয়াও কবির প্ররোচনায় দ্বিগুণ প্রলুব্ধ হইবেন সন্দেহ নাই।—

ঘোমটা খুলিবে নাক'? থাক তবে বসি',
আমি করি কাব্যপাঠ যামিনী জাগিয়া।
একি! একি! চাঁপাগুলি গেছে বুঝি খসি'?—
খোঁপা চাছে ফুলগুলি কাঁদিয়া কাঁদিয়া!
আমি দিব?—কাজ নাই, পরশে আমার
(আমি গো চঞ্চল বড়!) খুলিবে কবরী!
কুন্তলের ফুলদানি, আহা মরি, মরি!—
চাঁপাগুলি ফিরে পেয়ে হাসিছে আবার!
এমন সুন্দর পান কে গো সেজেছিল?
হাসিছ?—তোমার কীর্ত্তি! এ বড় অন্যায়!
তব ওষ্ঠ এত লাল!—পানের বাটায়
আমা লাগি' ভিন্ন পান কে বল আনিল?
"যাও, যাও!"—সেকি কথা? ধরি দুটি কর,
আমিও রাঙ্গায়ে লই আপন অধর।

'লক্ষ্ণৌর আতা' শীর্ষক কবিতায় কবি বলিতেছেন:—

চা'হি না 'আনার'—যেন অভিমানে ক্রুর
আরক্তিম গণ্ড ওষ্ঠ ব্রজ-সুন্দরীর;
চাহি নাক' 'সেউ'—যেন বিরহ-বিধুর
জানকীর চিরপাণ্ডু বদন রুচির
একটুকু রসে ভরা চা'হ না আঙ্গুর—
সলজ্জ চুম্বন যেন নববধূটির!
চাহি না 'গন্না'র * স্বাদ—কঠিনে মধুর
প্রগাঢ় আলাপ যেন প্রৌঢ় দম্পতীর।
দাও মোরে সেই জাতি সুবৃহৎ আতা
থাকিত যা, নবাবের উদ্যানে ঝুলিয়া—
চঞ্চলা বেগম কোন্ হ'য়ে উল্লাসিতা
ভাঙ্গিত,—সে স্পর্শে হর্ষে যাইত ফাটিয়া!
অহো কি বিচিত্র মৃত্যু!—আনন্দে গুমরি'
যেত মরি' রসিকার রসনা-উপরি।

* 'গন্না' অর্থে ইক্ষু।

আমার মনে হয়, বাংলা কবিতায় এমন সহজ, গভীর ও প্রবল ইন্দ্রিয়ানুভূতির উদ্রেক আর কোথাও নাই। এই অনুভূতির তীব্রতা প্রকাশ করিবার ভঙ্গিও স্থানে স্থানে কি সুন্দর! একটি কবিতার একটু অংশ মাত্র এখানে উদ্ধৃত করিলাম, পাঠক ইহার কাব্য-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইবেন—।

আগে একটি চুম্বন পেলে
শিথিল হইত তনু—
খোঁপাটি খসিত, চাঁপাটি ঝরিত,
কটির কিঙ্কিণী বাজিয়া উঠিত,
সরমে ভরমে নূপুর কাঁদিত
পদতলে রুণুঝুনু!

'অদ্ভুত অভিসার' শীর্ষক কবিতায় কবি ভাবকে প্রকৃতই রূপ দিয়াছেন, কবিতাটি কবির একটি উৎকৃষ্ট রচনা—

মাধবের মন্ত্রসিদ্ধ মোহন মুরলী
ধ্বনিল রাধার চিত্ত নিকুঞ্জ মোহনে,—
অমনি রাধার আত্মা দ্রুত গেল চলি'
শ্যামতীর্থে, শ্যামাঙ্গিনী যমুনা-সদনে!
গেল রাধা; তবে ঐ মন্থর গমনে
মঞ্জুল বকুল-কুঞ্জে কে যায় গো চলি?
অ কুল দুকূল, ম্লান কুন্তল কাঁচলি,—
ঘুম যেন লেগে আছে নিঝুম লোচনে!
নাহি জ্ঞান, নাহি সাড়া! টানে তরুদল
লুণ্ঠিত অঞ্চল ধরি'! মুখপদ্ম 'পরি
উড়িয়া বসিছে অলি গুঞ্জরি' গুঞ্জরি',
বিহ্বলা মেখলা চুম্বে চরণের তল!
আগে আত্মা, পিছে দেহ যাইছে তুহার—
রাধিকা রে!— বলিহারি তোর অভিসার!

অতঃপর কবি নিজে কেমন করিয়া কাব্যরস আস্বাদন করেন, তাহার পরিচয় দিয়া এই স্তরের কাব্য-প্রসঙ্গ শেষ করিব। কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের সনেটগুলির (কড়ি ও কোমল?) উদ্দেশে লেখা।—

হে রবীন্দ্র, তোমার ও সুন্দর সনেট
কি সরস! নারিঙ্গীর সুরভি সমীরে
মুক্ত বাতায়নে বসি' ক্ষুদ্র জুলিয়েট
ফেলিছে বিরহ-শ্বাস যেন গো সুধীরে!

আধেক-নগন তনু বাকল-ভূষণে
মালিনীর তীরে যেন বালিকা সুন্দরী !—
সলিলে কাঁপিছে শশী, চঞ্চল নয়নে
কাঁপে তারা, কাঁপে উরু গুরু গুরু করি' !
নববলয়িতা লতা বালিকা-যৌবন
শিহরিয়া উঠে যথা সমীর-পরশে—
লাজে বাধ'-বাধ' বাণী, রূপের আলসে
ঢলঢল তোমার ও কবিত্ব মোহন !
পাঠ করি', সাধ যায়, আলিঙ্গিয়া সুখে
প্রিয়ারে, বাসন্তী নিশি জাগি সকৌতুকে !

সৌন্দর্য্য-সাধনার সোপানবিশেষে কবি যখন হইতে সৌন্দর্য্যের মধ্যে আর একটি বস্তু অনুভব করিলেন, তখন হইতে তাঁহার কাব্যে প্রীতি-কল্পনার লীলা আরম্ভ হইয়াছে, কেবল রূপপিপাসার emotion নয়, রূপাতিরিক্ত একটি সূক্ষ্ম অনুভাব তাঁহার কল্পনার সহিত জড়াইয়া গেল, সৌন্দর্য্যের মধ্যে মঙ্গলের উপলব্ধি স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

এই প্রীতির পরিচয় প্রথম পাওয়া যায় তাঁহার নারীবিষয়ক কবিতাগুলিতে। নারী-সৌন্দর্য্যের মধ্যে কবি যে বিচিত্র রস উপভোগ করিয়াছেন তাহাকে ঠিক প্রেম বলা চলে না; এজন্য আমি এগুলিকে প্রেম-কবিতা বলিলাম না। নারী তাঁহার সৌন্দর্য্য-সাধনার সাকার বিগ্রহ, সুমধুর দাম্পত্য-প্রীতি সৌন্দর্য্য-কল্পনায় মণ্ডিত হইয়া এই কবিতাগুলিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে—তাঁহার কাব্যলক্ষ্মীই এই চিরপরিচিতা সুখদুঃখভাগিনীর মূর্ত্তিতে তাঁহার হৃদয়ের আরতি লাভ করিয়াছে। নারীর হৃদয়-রহস্যের উদ্ভেদ বা 'হৃদি দিয়ে হৃদি অনুভব' এ কবিতাগুলির মধ্যে নাই। সৌন্দর্য্যবোধের ব্যাপকতার পরিচয়—realise নয়, idealise করিবার শক্তিই—এগুলির বিশিষ্ট লক্ষণ। পিপাসার পরিবর্ত্তে তৃপ্তি, অভাবের পরিবর্ত্তে ভোগ, বিরহের পরিবর্ত্তে মিলন, ব্যথার পরিবর্ত্তে সুখই—ইহাদের একমাত্র রস। 'লক্ষ্মণের প্রতি ঊর্ম্মিলা'র পত্রেও কবি অতীত-মিলনের স্মৃতি ও ভবিষ্যৎ মিলনের স্বপ্ন সুন্দররূপে চিত্রিত করিয়াছেন। কিন্তু নারী-সৌন্দর্য্যের মধ্যে তিনি নিজেরই হৃদয়ের সরলতার যে প্রতিবিম্ব দেখিয়াছেন, যে পবিত্রতা ও মঙ্গলের উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সৌন্দর্য্য-পূজার মন্ত্র কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; এই জন্য এই শ্রেণীর কবিতাগুলিকে আমি তাঁহার কাব্যের দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের অন্তর্ব্বর্ত্তী একটি মধ্যন্তররূপে গণ্য করিতে চাই। এই কবিতাগুলির মধ্যেই আবার যেগুলি নিছক সৌন্দর্য্য-মোহের কবিতা সেগুলিকে দ্বিতীয় স্তরের লক্ষণাক্রান্ত বলিতে আপত্তি নাই। বস্তুতঃ এই মধ্যন্তরে উভয় স্তরের লক্ষণই বর্ত্তমান, এইজন্য এগুলিকে আমি তাঁহার হৃদয়ের বিকাশপথে একটি transition-সূচনা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছি।

পশু, পক্ষী, লতা, ফুল বা শিশুকে কবি যে সৌন্দর্য্যমুগ্ধ সহজ প্রীতি ঢালিয়া দিয়াছেন, সেই প্রীতি নারী-বিষয়ে তাঁহার হৃদয়ে নূতন চেতনার সঞ্চার করিয়াছে সত্য—কারণ সে ত

শুধুই ফুল নহে, তাহার স্বতন্ত্র চেতনা, আশা-পিপাসা আছে—তথাপি কবির কল্পনাকাশে এই নূতন গ্রহ যেটুকু বিপ্লব বাধাইতে পারিত, কবি তাহা হইতে দেন নাই। তাঁহার নিজেরই এক উপমা দিয়া বলা যায়, তাঁহার কল্পনার 'সুধাংশু-মণ্ডলে নারী-রোহিণী' ডুবিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই নারী-বিগ্রহকেই কেন্দ্র করিয়া তাঁহার সৌন্দর্য্য-কল্পনার পরিধি বিস্তৃত হইয়াছে, এবং প্রেম-প্রীতির রূপে বাঙ্গালীর বাস্তব সংসারের, তাহার নিত্যকার গৃহস্থালীর অন্তরঙ্গ পরিচয়টিকে প্রাণের রসে রসিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার কাব্যের এই দিকটি এককালে সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল, তাঁহার কল্পনার 'চন্দ্রালোকে দুর্ব্বাঘাসও কাঞ্চন' হইয়া উঠিয়াছিল। বাস্তবের সঙ্গে তাঁহার ভাবমুগ্ধ হৃদয়ের সংস্পর্শই তাঁহার নারীবিষয়ক কবিতাগুলিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে—এইখানেই তাঁহার কবিদৃষ্টি বাস্তবকে স্বীকার করিয়া তাহার উপর জয়ী হইয়াছে। কবিতার সঙ্গে বনিতার এই যে আপোষ—বস্তুর সঙ্গে ভাবের এই যে মিলন—ইহাতেই তাঁহার প্রীতি-কল্পনার প্রথম উন্মেষ। শুধু কল্পনা নহে, সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়বৃত্তি এইরূপে বিকশিত হইয়া সৌন্দর্য্যের মধ্যে মঙ্গলকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছে।

এই মধ্যন্তরের কবিতার পরিচয় হিসাবে আমি 'দীপহস্তে যুবতী' শীর্ষক কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"ছাড় ছাড়, হাত ছাড়—"
ছাড়িলাম হাত,
হে সুন্দরী রোষ কেন? তুমি যে আমার
পরিচিত, মনে নাই সে নিশি আঁধার?
তোমাতে আমাতে হ'ল প্রথম সাক্ষাৎ!
তরুটি ভরিয়া গেছে অশোকে অশোকে,
বসেছে জোনাকি-পাঁতি কুসুমে কুসুমে;
কবিচিত্ত ভরি' গেল মাধুরী-আলোকে,
তুমি সখি তরু হ'তে নেমে এলে ভূমে!
কি অশোক-বার্ত্তা আনি' মরমে মরমে
ঢাল' দিলে কবি-কর্ণে অশোক-সুন্দরী!
দিবসের পাপ-চিন্তা কলুষ সরমে
হেরি ও সাঁজের দীপ গিয়াছে বিস্মরি'?
হাসিয়া ছাড়ায়ে হাত গেল বধূ ছুটি'—
প্রাণের তুলসী-মূলে জ্বালিয়া দেউটি।

'প্রথম চুম্বন' কবিতাটিও এই পর্য্যায়ভুক্ত সম্পূর্ণ তুলিয়া দিলাম।

না জানি কি নিধি দিয়া গড়িল চতুর বিধি
প্রথম চুম্বন!
কুহরিয়া উঠে পিক,
শিহরিয়া উঠে দিক,

ভরে যার ফলে ফুলে শ্যামল যৌবন ;
বন-তুলসীর গন্ধে বায়ু হয় মাতোয়ারা
বিটপীর গায়ে গায়ে চাঁদের কিরণ !

অজানা সুরভি-ঘ্রাণে
কি জানি কি জাগে প্রাণে,
কোকিল ঝঙ্কার ছাড়ে মাতায়ে ভুবন
কি জানি কি মেঘ হেরি'
চঞ্চলা ময়ূরী নাচে—
আবেশে পেখম তুলি' অঙ্গের দোলন !

অজানা সুরভি-ঘ্রাণে
কি জানি কি জাগে প্রাণে—
আগ্রহে দম্পতী করে প্রথম চুম্বন !
কে আনিল আলোরাশি হৃদয় আঁধারে ?
অধরের ফাঁক দিয়া
জ্যোৎস্না পড়ে উছলিয়া
দম্পতীর শয্যার আগারে !
রঙ্গীন বার্ণিশ পেয়ে খাটপালা হেসে উঠে !-
কে রে এ চতুর কারিগর ?
দেওয়ালের চিত্রগুলি আবার নূতন হ'ল !-
কে রে সুনিপুণ চিত্রকর ?
কনক-পারদ লেগে মলিন দর্পণখানি
ধরিল কি অপরূপ শোভা মনোহর !

নব বক্ষে নব সুখ,
নবধর্ম্ম নবযুগ !
নবশশী হেসে সারা, প্লাবিয়া ভুবন !—
জ্যোৎস্নার আবছায়ে যৌবন-নেশার ঝোঁকে
মধুর মধুর এই প্রথম চুম্বন !

এইবার আমি পূর্ণ প্রীতি-কল্পনার উদাহরণ দিব। চিন্তার পথে কবি কখনও যান নাই—সে তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ, এইজন্যই বোধ হয় আজিকার দিনের চিন্তাশীল (?) রসিক তাঁহার কাব্যে আকৃষ্ট হইবেন না! কিন্তু এই স্তরের কবিতাগুলিতে তাঁহার কবিহৃদয়ের সহানুভূতি উৎকৃষ্ট কাব্যের প্রয়োজন সাধন করিয়াছে। এই প্রীতি-কল্পনার কাব্যকুসুমরাশি

হইতে প্রথমেই 'অদ্ভুত আলাপী' শীর্ষক কবিতাটির একটি অংশ উদ্ধৃত করিলাম।—

হে প্রকৃতি! একি লীলা, বুঝিবারে নারি!—
যে দিকে তাকায়ে দেখি সেইদিকে সখা সখী—
তরুরাজ্যে, জীবরাজ্যে যত নরনারী।
প্রজাপতি উড়ে ঘুরে বসে আসি মোর শিরে,
মুচকিয়া হাসে যত কুসুম-কুমারী।
প্রতিবাসী ব্রাহ্মণের শিখীটি পেয়েছে টের
আমি গো স্বজন তার—রঙ্গ দেখ তার—
সম্মুখে আসিয়া দেয় নৃত্য-উপহার।
শ্যামলীর বৎসপাশে কাছে গিয়ে মহাত্রাসে
সকলে পলায়ে আসে, আমি কাছে গেলে
সহর্ষ সুরভি-সুতা কিছুই না বলে!

ইহার পর, 'পরশমণি'-শীর্ষক কবিতায়, কবিবর হেমচন্দ্রের কবিতার উত্তরে বলিতেছেন—

না গো না, এ চক্ষু নয় সে অতুল মণি!
প্রেমই পরশমণি, যাদুকর-স্পর্শে যার
হয়েছে অমরাবতী মাটির ধরণী!
ইহারি পরশবলে অতুল রূপসী-সাজে
দাঁড়ায় যুবার পার্শ্বে শ্যামাঙ্গী রমণী!
ইঁহারি পরশবলে কৃষ্ণ ভৃঙ্গে ক্রোড়ে লয়ে
মদন-লাঞ্ছন মুখ নেহারে জননী!
ইহারি পরশ পেয়ে ত্রিভঙ্গের শ্যাম অঙ্গে
হেরে ত্রৈলোক্যের রূপ ব্রজবিহারিণী!
হে কবি, ইঁহারি বলে হেরিয়াছ বঙ্গ-ঘরে
ডেসি-লেসি-ড্যাফোডিল্-কুসুম-লাঞ্ছন
বঙ্গনারী-পুষ্পরাজি বিশ্বে অতুলন!

কবির 'নারীমঙ্গল'-শীর্ষক অপূর্ব্ব কবিতাটি এই সঙ্গে পাঠ করিতে বলি। 'আঁখির মিলন'-শীর্ষক কবিতায় দম্পতীর গোপন আলাপের মাধুরী কবিচিত্তকে স্পর্শ করিয়াছে—

আঁখির মিলন ও যে—আঁখির মিলন।
লোকে না বুঝিল কিছু লোকে না জানিল কিছু
দম্পতীর হ'ল তবু শত আলাপন!
হ'ল মন-জানাজানি হ'ল মন-টানাটানি—
আশার চিকন হাসি, মানের রোদন;
বিজয়ার কোলাকুলি— আঁধারে শ্যামার বুলি,
প্রেমের বিরহ-ক্ষতে চন্দন-লেপন—
ওই আঁখির মিলন!

প্রীতি-বিস্ফারিত হৃদয়ে কবির কল্পনা কত নূতন সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করিয়াছে—নিম্নে তাহার কয়েকটি নমুনা দিয়া তৃতীয় স্তরের কাব্যপরিচয় শেষ করিব।

'বিধবার আরসি' বলিতেছে—

গিয়াছে সোহাগ জানা, বোঝা গেছে ভালোবাসা,
এ ধরায় কেহ কারো নয়;
ছ'মাস চলিয়ে গেল একবার নাহি এল—
দেহ মোর কালিঝুলময়।
ভুল! ভুল!—সখী নয়, সে মোর সতীন হয়,
সব কথা বুঝিয়াছি আমি,
যামিনী হয়েছে ভোর ভেঙ্গেছে স্বপন-ঘোর
—একদিনে দু'সতীনে হারায়েছি স্বামী!

'লক্ষ্মীপূজা'য় কমলাকে আবাহন করিয়া বলিতেছেন—

দূর দেশান্তরে বধূ আনিবারে
যায় যবে বর,
দুইদিন উদাসীন থাকে
স্বজননিকর;
দুই দিন ফাঁক ফাঁক লাগে
আঙিনা ও ঘর।
তার পর যবে বর
বধূটিরে লয়ে
ফিরে আসে আপন আলয়ে—
খুলে যায় প্রাণের মোহানা;
আসে সুখ তোলপাড় করি,
চারিধারে হয় হুড়াহুড়ি,
চারিদিকে উলুধ্বনি হয়!
হর্ষ করে গণ্ডগোল
হয়ে মহা উতরোল,
বেজে উঠে কঙ্কণ বলয়!
লইয়ে বরণ-ডালা
যতেক সধবা বালা
কোলে করি বধূরে নামায়!
কৌতুকে ঘোমটা হ'তে
মুচকিয়া মৃদু হাসি,
নববধূ চারিদিকে চায়!

তেমতি বধূর রূপ ধরি
আসিয়াছ ? এস মা কমলা !—

'মলিন হাসি'র উপমা ও দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছেন—

বিশ্বের ঝঞ্ঝাট ক্লেশ যন্ত্রণার একশেষ
উপমায় হারে তোর কাছে !
হায় রে মলিন হাসি তোর চক্ষে অশ্রুরাশি
যত আছে, জগতে কি আছে ?
আছে কি রে কুঞ্জগেহে নিদাঘে লতার দেহে
কীটদষ্ট পুষ্পের বদনে ?
আছে কি তমালশিরে উদাসী কালিন্দীতীরে
অস্তগামী মুমূর্ষু কিরণে ?
প্রাঙ্গণের প্রান্তদেশে আছে কি রে নিশি-শেষে
পাণ্ডু-চন্দ্র-চন্দ্রিকা-বরণে ?

সুখের বাসর ঘরে সবে হুড়াহুড়ি করে
সধবা ও কুমারীর দল,
চুপে চুপে ধীরে আসি, তুই রে মলিন হাসি
—আধা হাসি, আধা অশ্রুজল—
বিধবার পাণ্ডু মুখে তিলমাত্র বসি সুখে
আবার করিস্ পলায়ন !
হায় রে সে হাসি নয়, হাসির সে অভিনয়
সিক্ত করে কবির নয়ন !

অন্যত্র 'নীরব বিদায়ে'র যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা যেমন সত্য তেমনি মর্ম্মস্পর্শী—

যুবতী হারালে পতি যুবা হারাইলে সতী,
বিরহী কি মৃতের শয্যায়
আলিঙ্গি' পাষাণ বুক চুম্বিয়া অসান মুখ
দেয় তারে নীরব বিদায় ?
না গো, ডুকরিয়া হায় ভাঙ্গিয়া চিত্ত কান্নায়
অশ্রুজলে মেদিনী ভাসায় !
সে ত' নহে নীরব বিদায় !

দেখিবে ? দেখিতে চাও নীরব বিদায় ?—
ওই মৃত বৃদ্ধার শয্যায়
পড়ে আছে নীরব বিদায় !
বুড়ার নাহিক সুখ, বুড়ার নাহিক দুখ,
বুড়াদের নীরব বিদায় !

তোমাদের সুখ আছে, তোমাদের সুখ আছে,
বুড়ার সর্ব্বস্ব চলি' যায়।
ও যে হায় আশাহারা কোনমতে ছিল খাড়া
প্রান্তরের বজ্রদগ্ধ রসালের প্রায়—
ভূমিকম্পে শুষ্কতরু ভূমিতে লুটায়।
চক্ষেতে চাহনি নাই, অধরে কাঁপুনি নাই—
বিন্ধ্যাচলে বৌদ্ধ মূর্ত্তি প্রায়।
হায় ও যে নীরব বিদায়।

আর একটি কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া এই ধরণের কবিতার পরিচয় সাঙ্গ করিব। কবিতাটির নাম 'অদ্ভুত রোদন'। এইরূপ কবিতায় কবিহৃদয়ের যে রূপ ফুটিয়া উঠে, তাহাতে বাংলার জলমাটির নিগূঢ় প্রভাব আছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, 'ভারতসঙ্গীত', 'পলাশীর যুদ্ধে'র যুগে জন্মিয়াও তিনি একটিও পোলিটিকাল স্বদেশ-প্রেমের কবিতা লেখেন নাই, অথচ তাঁহার মত খাঁটি বাঙ্গালী দেশ-প্রেমিক কবি এ যুগে আর কাহাকেও দেখি না। এ যে দেশের মাটিতে, তাহারই রসে পুষ্ট হইয়া, তাহারই অঙ্গে ফুলের মত সহজভাবে ফুটিয়া ওঠা! স্বদেশ বলিয়া বাহিরে একটা কিছু আছে, এমন সজ্ঞান ধারণার অবকাশ তাঁহার ঘটে নাই—অন্তরে যাহা ছিল তাহার পরিচয় তাঁহার ভাবে ভাষায় কল্পনা-ভঙ্গিতে অজস্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই 'অদ্ভুত রোদন' শীর্ষক কবিতায় তাঁহার খাঁটি বাঙালী-প্রাণের নিখুঁত পরিচয় আছে।

"এতদিনে মহাব্রত সাঙ্গ হ'ল মোর—
রাখ্ বোন ফুল, তেল, গুঁজিকাটি তোর;
সময় বহিয়া যায়, কি হবে সাজ-সজ্জায়?
রুক্ষবেশে, রুক্ষকেশে ভেটিব তাঁহায়।
পরেছি সিন্দুর আমি গৃহে এসেছেন স্বামী
মঙ্গলের বাকি তবে কি রহিল হায়?
চল্ বোন্ রান্নাঘরে, আজি পরিপাটি করে'
রাঁধি দুইজনে মিলি পায়স ব্যঞ্জন;
বিদেশ বিভুঁয়ে হায়, অনাহারে অনিদ্রায়
কত কষ্ট পাইয়াছে গরীব ব্রাহ্মণ!"—
বাড়ী ফিরে এল পতি, চিরবিরহিণী সতী
হাসিছে মধুরে কিবা গালভরা হাসি।
গেল গেল মোর নেত্র অশ্রুজলে ভাসি'।

পড়ে গেল হুলস্থুল পাড়ার ভিতরে।
করিয়ে শ্বশুর-ঘর বহু বহুদিন পর
এসেছে, এসেছে কন্যা নিজ পিতৃঘরে।

বহুক্ষণ মার কাছে খানিক পিতার কাছে,
খোকারে পিঠেতে তুলি খানিক বাগানে ;
খুকির ধরিয়া কর দেখে তার খেলাঘর,
দুটি কথা খানিক সইর কানে কানে ;
ঝি-মারে বসায়ে দূরে সলিতা পাকায় ধীরে,
কভু কাটে ফলমূল মার কাছে বসে' ;
ছোট বৌর হাত হ'তে কা'ড়ি' লয়ে আচম্বিতে
নিজে কভু সাজে পান মনের হরষে।
বহু বহুদিন পরে কন্যা আসি পিতৃ-ঘরে
মূর্ত্তিমান হাসি যেন ছুটিয়া বেড়ায়—
হায় রে আমার চক্ষু জলে ভেসে যায়!

দেবেন্দ্রনাথের কাব্যস্রোতস্বিনীর পূর্ণজলরেখা এই পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, তারপর ভাঁটার টানে নামিতে আরম্ভ করিয়াছে। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া দেখিলে তাঁহার কবি-মানসের ইতিহাস এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। যে-তরণী পাল তুলিয়া বহিয়া যায় তাহাকে বায়ু ও জলস্রোতের অধীন হইয়া চলিতে হইবে, স্রোত রুদ্ধ বা বায়ু বন্ধ হইলে তাহার আর গতি নাই। হৃদয়ের আবেগই যাহার একমাত্র সম্বল, স্বভাবদত্ত যৌবন-মহিমাই যাহার একমাত্র শক্তি, সৌন্দর্য্যমোহ ও প্রীতির অসংশয় সারল্যই যাহার একমাত্র সম্বল, তাহার পক্ষে প্রতিভা যাহা করিতে পারে দেবেন্দ্রনাথের কাব্যে তাহা পুরাপুরি করিয়াছে—তজ্জন্য আক্ষেপের কারণ নাই। দেবেন্দ্রনাথ স্বভাব-কবি—তিনি যে আর্ট জানিতেন না তাহা নহে—দেশী ও বিদেশী উৎকৃষ্ট সাহিত্যরসে তিনি প্রবীণ ছিলেন—এজন্য তাঁহাকে বাংলার পল্লীকবিদের মত স্বভাব-কবি বলিলে ভুল হইবে। দেবেন্দ্রনাথের প্রতিভার মৌলিকতা ও বৈশিষ্ট্যই এই যে, তিনি স্বাভাবিক ভাবাবেগে আর্টের সংযম অভ্যাস করেন নাই—তাঁহার প্রকৃতিই আর্ট-বিরোধী, অথচ এই প্রকৃতির পূর্ণ শক্তিবলে তিনি এমন সকল শ্লোক রচনা করিয়াছেন যাহা আর্ট হিসাবেও নিখুঁত। তাঁহার কাব্য ও জীবন এক ছিল, একথা তাঁহার কাব্যপ্রকৃতি হইতে সহজে বুঝা যায়—কবি ও মানুষ এই দুই তাঁহার মধ্যে ভিন্ন হইয়া ছিল না—তার ফলে যাহা হয়, তাঁহার জীবনে তাহা হইয়াছিল। তথ্যের সত্যকে তিনি কখনও গ্রাহ্য করেন নাই—ভাবোন্মত্ত অবস্থায় স্বরচিত দুঃখ ও বিপদজালে জড়াইয়া যখন আপনাকে আপনিই অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিলেন, তখন ভাগ্য ও বুদ্ধিবিপর্য্যয়ে অবসন্ন হইয়াও তাঁহার হৃদয়াবেগ রুদ্ধ হইল না বটে, কিন্তু কল্পনার শক্তি ও স্বাস্থ্যহানি হইল। এই অবস্থায় তাঁহার শীর্ণ কল্পনা ভক্তিকে আশ্রয় করিল। এই ভক্তিও তাঁহার স্বভাবের সম্পূর্ণ অনুকূল, তাঁহার সৌন্দর্য্য-কল্পনা প্রথম হইতেই ইহার দ্বারা অনুরঞ্জিত। কিন্তু যে-শক্তি তাঁহাকে এতকাল উৎকৃষ্ট কল্পনার অধীন করিয়া কাব্যকলার পুষ্টিসাধন করিয়াছিল, এখন সে শক্তি ক্ষীণ হওয়ায়, ভক্তি

কাব্যে উপজীব্য না হইয়া কবির উপজীব্য হইয়া উঠিল। প্রাণ এখন আনন্দ চায় না, সান্ত্বনা চায়। এই সময়ের কবিতাগুলি লইয়াই তাঁহার কাব্যের চতুর্থ ও শেষ স্তর। এই স্তরের আরম্ভ সূচিত হইয়াছে তাঁহার 'অপূর্ব্ব ব্রজাঙ্গনা'র কবিতাগুলিতে। এই কাব্যখানিই তাঁহার কবি-প্রতিভার শেষ কীর্ত্তি। এই কাব্যের আকার প্রকার অনুকরণমূলক হইলেও, এবং কল্পনা অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ হইলেও, ভাবে ও ভাষায় ও ঝঙ্কারে, স্থানে স্থানে মূল 'ব্রজাঙ্গনা'র উপরে উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইহার পরবর্ত্তী কবিতারাশির মধ্যে কয়েকটি সুন্দর কবিতা আছে, কিন্তু ক্রমে ভক্তি তাঁহার কল্পনাকে জয় করিয়াছে, কাব্যে কোনও নূতন সৌন্দর্য্য দান করে নাই; বরং এই সকল কবিতায় কাব্যাংশের প্রসাধন জন্য, তাঁহার পূর্ব্ব কবিতার পুরাতন শব্দসম্পদ ও উপমা বরাবর ব্যবহৃত হইয়াছে; কবি অনেক স্থলে যেন আপনাকে parody করিয়াছেন। আধুনিক পাঠক দেবেন্দ্রনাথের এইকালের কবিতাগুলির সহিতই কিছু কিছু পরিচিত, তাই তাঁহারা দেবেন্দ্রনাথের সত্যকার কবি-পরিচয় পান নাই। এইকালে দেবেন্দ্রনাথের কাব্যলক্ষ্মী সত্যই নিরাভরণা। প্রীতির সহজ আত্মসন্তোষ যেদিন হইতে বিঘ্নিত হইয়াছে, সেই দিন হইতেই তিনি যেন আপন ধর্ম্মে সংশয়ান্বিত হইয়া তাঁহার সৌন্দর্য্য-পিপাসাকে ভক্তিবিশ্বাসের দ্বারা বাঁচাইয়া রাখিতে ও পরিতৃপ্ত করিতে চাহিয়াছেন। ইহার ফলে, তিনি নববৃন্দাবনে নূতন রাধাকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠা করিয়া, নিজে গোপিনী সাজিয়া, ভক্তির ধূপ-গুগ্‌গুল-সৌরভে আবিষ্ট হইয়া আছেন। সে-বৃন্দাবনে যূথেশ্বরী রাধা গোবিন্দের প্রেম-ভিখারিণী, বিরহ-পরিম্লানা, কচিৎ শ্যামসঙ্গতা। কবির হৃদয়-রাধিকা শ্যামকে পাইয়াও নিজের দীনতাবোধ ত্যাগ করিতে পারে নাই। এই সকল কবিতায় যে একটি সুর সর্ব্বত্র ধ্বনিত হইয়াছে, তাহা 'চির-যৌবনা' শীর্ষক কবিতাটি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।—

আমার প্রতিভা আজি কাঙ্গালিনী, হে শ্যামসুন্দর!
কবিতা-মালঞ্চ তার ভরপুর সৌরভে ও রূপে
নহে আর; মাধবী-মণ্ডপ তার মধুপে মধুপে
নহে আর ঝঙ্কৃত ও অলঙ্কৃত। শুষ্ক সরোবর,—
ফোটে না ফোটে না তথা একটিও পদ্ম মনোহর
উপমার; ঝরি' গেছে লতা-পাতা; ওই দীনস্তূপে
ক্রোটনের পাতা কাঁপে, (হায় তারে কে করে আদর?)
কম্বল-সম্বল-হারা দরবেশ কাঁপে যথা চুপে!
হে বঁধু, হে প্রাণেশ্বর! নাহি খেদ নাহি তাহে লাজ;
তুমি যবে আসিয়াছ, কিবা কাজ গোলাপী ভূষণে?
যুগান্তে পতিরে পেয়ে, বিরহিণী ভুলি তুচ্ছ সাজ,
আলুথালু কেশ-পাশ—পড়ে নাকি রাতুল চরণে?
জানি আমি, হে স্বামিন্, তুমি মোরে করিবে না ঘৃণা,—
পতিচক্ষে, প্রাণনাথ! প্রবীণা যে সুচির-নবীনা।

এই স্তরের অজস্র কবিতার বিস্তৃত পরিচয় দিলাম না। তাঁহার লেখনীর বিরাম ছিল না—দেহে যতক্ষণ প্রাণস্পন্দন ছিল ততক্ষণ কবিতার নিবৃত্তি ছিল না, কবিতাই তাঁহার জীবন ছিল। তিনি শেষ বয়সে বহুসংখ্যক ইংরেজী কবিতাও লিখিয়াছিলেন—দক্ষিণ ভারতে উদ্দাম তীর্থ-পথিকের মত পর্য্যটনকালে, তিনি\অ-বাঙালী পাঠকের জন্য এইগুলির অধিকাংশ লিখিয়াছিলেন—কারণ কোনো অবস্থাতেই কবিতা না লিখিয়া তাঁহার বাঁচিবার যো ছিল না।

এইবার দেবেন্দ্রনাথের রচনারীতি বা কাব্যকলা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। কবি Keats বলিতেন—"Poetry must surprise by a fine excess"। এই 'excess' তাঁহার কাব্য-রচনায় আছে, এবং সর্ব্বত্র না হইলেও উৎকৃষ্ট কবিতাগুলিতে 'fine excess' আছে। দেবেন্দ্রনাথের কবিতাগুলিতে সচরাচর একটি অতি সরল ও অখণ্ড ভাবের একাগ্র উচ্ছ্বাস দেখা যায়—ইহাই গীতিকবিতার সাধারণ প্রকৃতি। কিন্তু এই ভাব প্রকাশ করিবার জন্য তিনি উপমার পর উপমা গাঁথিয়া যান—এই উপমাগুলিই তাঁহার বাণীর বৈশিষ্ট্য। ইহা কালিদাসের বা রবীন্দ্রনাথের উপমা নয়—অতি নিপুণ ও নিখুঁত সাদৃশ্য-যোজনা, উপমান ও উপমেয়ের সর্ব্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্য, এগুলিতে পাওয়া যাইবে না। স্থানে স্থানে রীতিমত উপমা-সৌন্দর্য্য ও বাগ-বৈদগ্ধ্য চমৎকৃত করে বটে, যথা—

"চাহি না 'গন্না'র * স্বাদ, কঠিনে মধুর
প্রগাঢ় আলাপ যেন প্রৌঢ় দম্পতীর।"

"ও যে হায় আশাহারা কোন মতে ছিল খাড়া
প্রান্তরের বজ্রদগ্ধ রসালের প্রায়।"

"কম্বল-সম্বল-হারা দরবেশ কাঁপে যথা চুপে।"

—তথাপি উদ্ধৃত কবিতাগুলির অধিকাংশ উপমা হইতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, দেবেন্দ্রনাথের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য তাঁহার উপমাগুলিতে কেমন ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার কল্পনা বস্তুগত নয়, ভাবগত—যে বিভিন্ন বস্তুরাজি এই ভাবমণ্ডলে আকৃষ্ট হয় তাহাদের ভাবগত সাদৃশ্যই এই সকল উপমার প্রাণ। 'নয়নে নয়নে কথা ভাল নাহি লাগে'—সে কেমন?

"আধ-গ্রাস জল যেন নিদাঘের কালে।

'ডায়মন্‌ কাটা মলের' আওয়াজ শুনিয়া কবির মনে হয়—

"ঝিল্লি সাথে নিশিবায় ঝাঁপতালে গীত গায়
নিশিমুখে ফুটে উঠে গোলাপের দল!

অথবা—

"জল পড়ে ঝর ঝর, শীতে তনু থর থর,
ভাঙ্গা-গলা কোকিলার সঙ্গীত তরল!
শুনে শ্যাম নাহি এল, কঙ্কণ খসিয়া গেল,
ছল ছল আঁখি—রাধা চাহে ধরাতল!"

---

* গন্না—ইক্ষু

'মলিন হাসি'র উপমা—

"আছে কি তমালশিরে উদাসী কালিন্দীতীরে
অস্তগামী মুমূর্ষু কিরণে ?"

বালবিধবার—

"ফুরায়নি সব আশা— এক ছাদ রোদ আছে,
কত মালা আছে গাঁথিবার।"

কাব্যসৌন্দর্য্যরূপিণীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"তুমি কি নিজের আঁখে পরীদের ক্ষুদ্র কাঁখে
হেরিয়াছ কুঞ্জবনে জোনাকী-গাগরী ?"

সধবার কোলে-পিঠে—

"শিশু-স্মর রেখে গেছে ফুলছবি তার।"

শেষ বিদায়ের মর্ম্মান্ত আগ্রহে—

"সূর্য্যকান্ত মণিসম অধর প্রবালে মম
ভরি লব একরাশি কাঞ্চন-কিরণ।
—দাও দাও বিদায়-চুম্বন।"

রবীন্দ্রনাথের সনেট কেমন ?—

"নারিঙ্গীর সুরভি সমীরে
মুক্ত বাতায়নে বসি' ক্ষুদ্র জুলিয়েট
ফেলিছে বিরহ-শ্বাস যেন গো সুধীরে।"

এইরূপ উপমাই তাঁহার প্রাণের তীব্র ভাবানুভূতি-প্রকাশের একমাত্র রীতি,—ইহাই তাঁহার কবি-ভাষা, তাঁহার বাণী। তাঁহার লক্ষ্য বাহিরের দিকে নয়; ভাবের রহস্যময় অনুভূতিকে মূর্ত্তি দিবার যে প্রয়াস, তাহাতেই তাঁহার উপমার জন্ম—ভাবসঙ্গতিই তাহার সার্থকতা ; ভাবের সঙ্গে অর্থের এই যে মিলন, এ যেন তাঁহারই ভাষায়—'বিজয়ার কোলাকুলি, আঁধারে শ্যামার বুলি'—এ যেন কবির সঙ্গে কাব্যলক্ষ্মীর 'আঁখির মিলন'! তারপর, তাঁহার কাব্যে একটি অপূর্ব্ব ধ্বনি-ঝঙ্কার (phrasal music) আছে। তাঁহার সকল কবিতাই অক্ষরবৃত্ত পয়ার-ছন্দে লিখিত। যে ভাষা ও ছন্দ বাংলা কাব্যের বনিয়াদী রীতি (অধুনা আবিষ্কৃত বাংলা ভাষার নহে), তাহাকেই আশ্রয় করিয়া তিনি একটি নিজস্ব শব্দঝঙ্কার লাভ করিয়াছিলেন ; এই ঝঙ্কার গভীর হৃদয়াবেগের স্বতঃউৎসারিত ধ্বনি মাধুর্য্যে ওতপ্রোত, ইহা মাত্রাবৃত্ত বা স্বরবৃত্তের পদবিন্যাস-চাতুরী হইতে উদ্ভূত নয়। বাংলা পয়ারের মধ্যে যে উদার ও বৃহত্তর সঙ্গীত সুপ্ত ছিল, যাহার আকস্মিক ও অদ্ভুত উদ্বোধনে মেঘনাদবধ-কাব্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, বঙ্গভারতীর সেই সপ্তস্বরা হইতে দেবেন্দ্রনাথ ইহাকে লাভ করিয়াছিলেন।

এখানে তিনি বিশেষভাবে মাইকেলের দ্বারা প্রভাবান্বিত। মাইকেলের অনুপ্রাসের ভঙ্গিও তাঁহার কাব্যে প্রচুর আছে ('নতজানু সানুশিরে অতনু কুহকী')। তাঁহার মুখেই 'মেঘনাদ-বধ-আবৃত্তি শুনিয়া আমি বাংলা অমিত্রাক্ষরের মাধুরী প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলাম। দেবেন্দ্র-নাথের কণ্ঠস্বরে একটি অপূর্ব্ব দরদ ছিল, সেই অপূর্ব্ব স্বরভঙ্গিতে শ্রোতার শ্রুতিমূলে কাব্য জীবন্ত হইয়া উঠিত। Poetry must be heard as well as read—তাঁহার কবিতাগুলি যদি তাঁহার মত করিয়া আবৃত্তি করিতে পারিতাম, তবে বোধ হয় রসিকসমাজে আর কোনও আলোচনার প্রয়োজন হইত না। তাঁহার কাব্য-সাধনায়, মাইকেল ও হেমচন্দ্র, এই দুই কবির প্রভাব স্পষ্ট লক্ষিত হয়। 'অপূর্ব্ব বীরাঙ্গনা' ও 'অপূর্ব্ব ব্রজাঙ্গনা' এই দুইখানি কাব্য মাইকেলের আদর্শে লিখিত, তথাপি তাহাদের কল্পনায় দেবেন্দ্রনাথের নিজস্ব ভঙ্গি আছে। 'অপূর্ব্ব বীরাঙ্গনা'র উৎসর্গ-কবিতায় তিনি মহাকবি মাইকেলকে ভক্তি-গদগদ ভাবে 'গুরু-নমস্কার' করিয়াছেন। হেমচন্দ্রের কাব্যপ্রকৃতির সঙ্গে তাঁহার কোথায় সগোত্রতা ছিল বলা কঠিন—বোধ হয়, হেমচন্দ্রের ভাষা ও ভাবের সারল্য এবং কাব্যের নিরঙ্কুশ গতি-প্রাবল্য তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। হেমচন্দ্রের মত, কবিতায় ভাল মিলের প্রতি তাঁহার লক্ষ্য ছিল না—কিন্তু ভাষার গুণে ও ঝঙ্কারে এ ত্রুটি অনেকটা চোখে পড়ে না। এই সম্পর্কে দেবেন্দ্র-নাথের কাব্যপ্রকৃতির আর একটা লক্ষণ উল্লেখযোগ্য। শেষ বয়সের রচনায়, যখন তাঁহার ভাব-কল্পনার তেজ মন্দীভূত হইয়া গেছে, তখনই দেখিতে পাই তিনি মিলের বিষয়ে অতিশয় সাবধান হইয়াছেন। যতদিন কল্পনার শক্তি ছিল ততদিন তাঁহার কাব্যলক্ষ্মী ত্রস্ত ব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিতেন; যখন সে মনোহরণ আর নাই, তখন কবিতাসুন্দরী মিলের নূপুর অতি সন্তর্পণে পায়ে পরিয়া ধীর-মন্থর গমনে কবিসন্নিধানে আসিতেন। মাইকেলের ছন্দঃশক্তির প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া তিনি অনেকবার অমিত্রাক্ষর কাব্যরচনার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অসংযত কল্পনা, এই ছন্দ-স্বাধীনতা লাভ করিয়া আরও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে, অধিকাংশ কবিতা গদ্যে পরিণত হইয়াছে; কেবল 'কলঙ্কিনীর আত্মকাহিনী' ও 'উর্ম্মিলা-কাব্যে'র দুইটি কবিতায় তিনি অনেকটা সফল হইয়াছিলেন। কবি বোধ হয় নিজেও এ দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাই সনেটের নাগপাশে স্বেচ্ছাবন্দী হইয়া তিনি বাংলা কাব্যে কতকগুলি উৎকৃষ্ট সনেট রাখিয়া গিয়াছেন।

সর্ব্বশেষে, একবার সমগ্রভাবে দেবেন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতির আলোচনা করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব। বিহারীলাল হইতে যে-নূতনতর ভাবসাধনা বাংলা কাব্যে প্রবর্ত্তিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে বাস্তবের সহিত নূতন করিয়া বোঝাপড়া—একটা বৃহত্তর ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা ও বেদনা এবং তাহার পরিতৃপ্তি বা সান্ত্বনার জন্য একটা নূতন চিন্তাভিত্তির প্রয়োজন সূচিত হইয়াছে। ইহাই বাংলাকাব্যে আধুনিকতার আরম্ভ। ঐ যুগের সাহিত্যে এই প্রবৃত্তি অনিবার্য্য, এবং বিহারীলালের পর তাঁহার কনিষ্ঠগণ বাংলাকাব্যে এই সুর গভীর করিয়া তুলিয়াছেন। যে নূতন ভাব ও ভাবনা এই সময়ে জাতিকে চঞ্চল করিয়াছিল—রাষ্ট্রে, সমাজে

পরিবারে তাহা প্রতিরুদ্ধ হইয়া কবিকল্পনায় এক নূতন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করিল। রবীন্দ্রনাথ এই সাধনায় পরমা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন; আপনার স্বাধীন ও স্বতন্ত্র কল্পনায় তিনি যে মনোজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা নিখিল ও নিশ্ছিদ্র; জীবন ও জগৎসর্ব্বস্বকে তিনি এক অপূর্ব্ব বস্তুভেদী কল্পনায় নির্ব্বিরোধ আনন্দ-সত্তায় পরিণত করিতে পারিয়াছেন। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের এত বড় কীর্ত্তি অন্যত্র দুর্লভ। দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য এ জাতীয় নহে। এ বিষয়ে তাঁহার পক্ষে যুগ-প্রভাব ব্যর্থ হইয়াছে। দেবেন্দ্রনাথের কল্পনা—মানুষের ইতিহাস, সমাজ, অদৃষ্ট ও কর্ম্মবন্ধনকে, কোন দিক দিয়া বুঝিয়া লইতে চায় নাই; বাহিরের সকল আঘাতের উপর তাঁহার কল্পনা দ্বার রুদ্ধ করিয়াছে। ভাবের এই subjectivity বা আত্ম-প্রাধান্য একপ্রকার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বটে, কিন্তু তাহা বস্তুজয়ী নয়,—বস্তুর প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন। তিনি সম্পূর্ণ ভাবতান্ত্রিক; বাহিরকে অন্তরের সুন্দর স্বপ্নে রঞ্জিত করিয়া, তিনি দেশ ও কালের সমস্যার দিকটা বিস্মৃত হইতে পারিয়াছিলেন। মাইকেলের কবিজীবনের আশ্রয় ছিল অতীত মহাকবিগণের কাব্যজগৎ—বিভিন্ন কাব্যরীতির চর্চ্চায় তিনি আর্টিষ্টের মত আনন্দ উপভোগ করিতেন। দেবেন্দ্রনাথের সৌন্দর্য্যপিপাসা ততটা intellectual নয়, অতিমাত্রায় emotional—এ বিষয়ে তাঁহার কবিমানসের সহিত বিহারীলালের সাদৃশ্য আছে। উভয়েই নিজ নিজ ভাব-স্বপ্নে বিভোর, বাহিরের প্রতি উদাসীন—'তপোবনে ধ্যানে থাকি এ নগর-কোলাহলে'।

কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের কল্পনায় ধ্যান ছিল না, নেশার মত্ততা ছিল। 'He ate the laurel and is mad'—একথা তাঁহার সম্বন্ধেই খাটে। ইতিপূর্ব্বে আমি তাঁহার সম্পর্কে কবি কীটস্-এর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছি। উভয়ের কাব্যেই একটা প্রবল sensuousness বা রূপ-তৃষ্ণার লক্ষণ আছে। তথাপি এই উভয় কবির মধ্যে প্রকৃতিগত একটা গভীর বৈষম্য আছে। কীট্‌সের সৌন্দর্য্য-পিপাসা অতি প্রখর বস্তুজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত—প্রাকৃতিক বস্তুসকলের রূপ, রং, রেখা, গতি ও স্থিতির ভঙ্গি, এ সকলই আশ্চর্য্যরূপে ইন্দ্রিয়গোচর করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল, তাঁহার ইন্দ্রিয়-চেতনায় কেবল ভোগবিলাস বা ভাবস্বপ্ন ছিল না, অতি নিপুণ জ্ঞান-ক্রিয়াও ছিল। তাঁহার কল্পনায় যে সুন্দর-মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিত তাহার মূলে সাক্ষাৎ ও নিবিড় ইন্দ্রিয়-পরিচয় ছিল, সে শুধুই প্রাণের অন্ধ আবেগ নয়; তাই তাঁহার কল্পনা সুস্থ, সবল, প্রকৃতিস্থ। তাঁহার বাণী চিত্রবৎ, তিনি রূপকে বাঙ্ময় করিয়াছেন। বহিঃসৃষ্টিকে, চিন্তার পরিবর্ত্তে, সহজ সুস্থ দেহধর্ম্মের দ্বারা আত্মসাৎ করার এই প্রতিভাই কীট্‌সকে শেক্‌স্‌পীয়ারের পার্শ্বে বসাইয়াছে। বস্তুসকলের গোড়ার এই প্রত্যক্ষ-পরিচয় বা ইন্দ্রিয়ানুভূতি—'teased him out of thought'। কিন্তু ইহাই কবির জ্ঞানমার্গ—ইহাই উৎকৃষ্ট প্রজ্ঞা, সৃষ্টিকে নিঃশেষে বুঝিবার আর কোনও সদুপায় নাই। সেই জন্য এই sensuousness অতিশয় স্বাভাবিক ও সজ্ঞান বলিতে হইবে। এই জন্যই কীট্‌স্-এর সম্বন্ধে বলা যায় 'poetry for him was as same as sunlight', কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না। তাঁহার কল্পনায় তীব্র মাদকতা ছিল, সজ্ঞানতা

ছিল না ; তাঁহার ইন্দ্রিয়গ্রাম ভাবাবেগ-বিহ্বল, বস্তুজ্ঞান-বিমুখ ; তাহাতে চেতনা অপেক্ষা মোহই অধিক। বিদ্যাপতির রূপ-মোহ—'জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল'—আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তিতে গভীর হইয়া উঠিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথের অতৃপ্তি নাই, তিনি বিভোর। কীট্‌সেরও এই ভোগ-বিভোরতা আছে, কিন্তু তাহা বাস্তবকে বরণ করিয়া—সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা আত্মসাৎ করিয়া। এজন্য কীট্‌স্-এর কাব্য ও দেবেন্দ্রনাথের কাব্যে অনেক প্রভেদ। দেবেন্দ্রনাথ আপনার ভাবাবেগে আকুল হইয়া ইন্দ্রিয়ানুভূতিকেও স্তম্ভিত করিয়া গাহিয়া উঠেন—

> "দুর্জ্জয় বানের মুখে ভাসাইয়া দিব সুখে
> দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবন।"

—এই 'দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবন' তাঁহার কল্পনালোকে অদ্ভুত হইয়াই রহিল ; ইহার রহস্যই তাঁহার কবিশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া, বাংলাকাব্যে এক অপূর্ব্ব গীতিভঙ্গি রাখিয়া গিয়াছে। তাঁহার কবিতায় আর্টের সংযম নাই, কিন্তু অসংযমের আর্ট আছে—আবেগের তীব্র অনুরণনে ভাবোচ্ছ্বাস ঘনীভূত হইয়া ভাষায় ও ঝঙ্কারে মূর্ত্তিমান হইয়াছে। তাঁহার প্রাণ-পাত্রে সামান্য জলমাত্র ঢালিলেও তাহা মধু-মদিরায় পরিণত হয়! তাঁহার কাব্যে যেন সর্ব্বত্র আনন্দের একটি উচ্চহাসি আছে, এই হাসি সম্বন্ধে তাঁহারই ভাষায় বলা যায়—

> "অধরে গড়ায়ে পড়ে সুধা রাশি রাশি,
> সুরার বুদ্বুদ বুঝি ওই উচ্চহাসি।"

পৌষ, ১৩৩৩
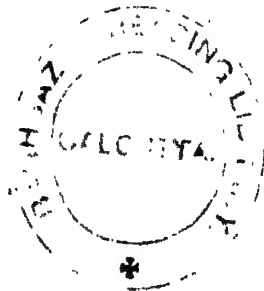
অক্ষয়কুমার বড়াল

নব্য বাংলা গীতিকবিতার ভাব ও ভঙ্গির কথা ইতিপূর্ব্বে বহুবার উল্লেখ ও আলোচনা করিয়াছি। এই নব্য গীতিকবিতার অভ্যুদয় এ যুগের সাহিত্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যে তিনজন কবির প্রসঙ্গে এই নূতন ভাবধারার আলোচনা করিয়াছি তাঁহাদের মধ্যে বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথের আসনই সর্ব্বোচ্চ; দেবেন্দ্রনাথের কাব্যসাধনায় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ভঙ্গি খুব প্রখর ও সুস্পষ্ট না হইলেও—তাঁহার কাব্যে গীতিকবির আত্মভাব-বিভোরতার লক্ষণই প্রবল। তথাপি দেবেন্দ্রনাথেও এই আধুনিকতার আবেগ অল্প নহে; অপরে যাহা সজ্ঞানে করিয়াছেন তিনিও অজ্ঞানে তাহাই করিয়াছেন; তাঁহার কাব্যেও আত্ম-অনুভূতি ভিন্ন বাহিরের কোনও তত্ত্ব বা তথ্য কবি-প্রাণের আশ্রয় হইতে পারে নাই। ইহাই সকল যুগের গীতিকাব্যের সাধারণ লক্ষণ। তথাপি বাংলা কাব্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে—এই সুরও আধুনিক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে; এই আত্মভাববিভোরতার মধ্যেও কবিচিত্তের একটা ব্যক্তিগত অনুভূতির উল্লাস নব্য গীতি-কাব্যের অনুগত বলিয়া বোধ হইবে। আমি অতঃপর এই যুগের অপর একজন শক্তিশালী কবির কাব্যসাধনায় এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-সাধনার সম্বন্ধে আলোচনা করিব। কবিবর অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্যপরিচয় প্রসঙ্গে এই নব্য কবিতার প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি এই দিক দিয়া বিশেষ আলোচনার যোগ্য বলিয়া আমার মনে হইয়াছে। প্রথমে সেই কথাই বলিব।

পূর্ব্ব প্রসঙ্গে আমি একবার মধুসূদনের কবিপ্রকৃতির সম্বন্ধে বলিয়াছি যে মহাকাব্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া যে কবি 'মেঘনাদবধ' রচনা করিয়াছেন তিনিও বাঙ্গালীসুলভ গীতি-প্রবণতা ত্যাগ করিতে পারেন নাই—'মেঘনাদবধে'র বারো-আনাই গীতাত্মক। অতএব দেখা যাইতেছে বাঙ্গালী কবির মজ্জাগত সংস্কার কিছুতেই ঘুচিতে চায় না—মধুসূদনের মত এত বড় প্রতিভা ও এত বড় প্রেরণাও সম্পূর্ণ জয়ী হইতে পারে নাই। কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্যসাধনায় এইরূপ একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। গীতিকাব্য-সাধনাতেও বাঙ্গালী সন্তানের পক্ষে যাহা সহজ ও স্বাভাবিক—গৃহ-সংসারের নানা সরল মধুর প্রীতি ও প্রেমের সম্বন্ধ, পারিবারিক ও সামাজিক নানা অভিজ্ঞতার কাব্য-রস, অথবা ভাবের অতলে আত্ম-বিস্মৃতির আনন্দ—এ সকলকে উপেক্ষা করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ গীতিকবিদিগের দুর্দ্ধর্ষ কেন্দ্রাতিগ কল্পনা, বাস্তববিদ্রোহী অবাস্তব কামনা, আত্মপ্রতিষ্ঠার দুরারোহী আকাঙ্ক্ষা—প্রভৃতি দ্বারা অভিভূত হইয়া এই বাঙ্গালী কবি কাব্যসাধনায় কি পরিমাণ সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন সেই আলোচনা অতিশয় কৌতূহলোদ্দীপক। অক্ষয়কুমারের কবিজীবনে ও কাব্যে যে দ্বন্দ্ব সর্ব্বত্র প্রবল হইয়া আছে, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাহার প্রায় সর্ব্বত্র সেই মর্ম্মান্তিক হাহাকার, আত্মবিশ্লেষণ বা আত্মপ্রতিষ্ঠার ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা তাঁহার কবি-প্রতিভায় শক্তি

সঞ্চার করিয়াছে—তাঁহার মজ্জাগত বাঙ্গালী সংস্কার এবং তদ্‌বিরোধী যুগ-প্রভাব, এই উভয়ের অসামঞ্জস্যই সেই আধ্যাত্মিক দ্বন্দ্বের কারণ। বর্ত্তমান প্রবন্ধে বড়াল-কবির কাব্যপরিচয় প্রসঙ্গে এই তত্ত্বটি আপনিই পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে, কারণ, কবির কাব্যে কবি-জীবন আর কোথাও এমন ভাবে প্রকাশিত হয় নাই ; অর্থাৎ আর কোনও কবি এভাবে কাব্যে আত্মপ্রকাশ করেন নাই।

বর্ত্তমান লেখকের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। কবির সেই ব্যক্তি-পরিচয় তাঁহার কাব্য-পরিচয়ের পক্ষে সুবিধাজনক হইয়াছে কেন তাহাই বলিব। বাহিরের জীবনে অক্ষয়কুমার ছিলেন একজন অতি-সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ভদ্রলোক—গৃহী ও বিষয়ী, অতিপ্রখর সামাজিক-বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত না যে, তিনি 'প্রদীপ' 'কনকাঞ্জলি'র সেই বাস্তব-জীবন-বিড়ম্বিত ভাবস্বপ্নাতুর—অতি সূক্ষ্ম রোমাণ্টিক কল্পনার বিষরস-লুব্ধ—আধুনিক গীতি-কবি। ঘর-সংসারের মমতা, আত্মীয় ও বন্ধু-প্রীতি, সামাজিক রক্ষণশীল মনোবৃত্তি—এসকল তাঁহার চরিত্রে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যাইত। ইহাই যেন তাঁহার জন্মগত সংস্কার। এই জন্মগত সংস্কার অতিমাত্রায় বিচলিত হইয়া তাঁহার কাব্যে অপূর্ব্ব উৎকণ্ঠা ও মানস-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়াছে। অন্য দুই কবির সহিত তুলনা করিলেই তাঁহার কবি-মানস ও ব্যক্তি-স্বভাবের এই দ্বন্দ্ব আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। পাশ্চাত্ত্য কাব্যের যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যমূলক কল্পনা এযুগে বাংলা কাব্যে সংক্রমিত হইয়াছিল—রবীন্দ্রনাথের অত্যুচ্চ প্রতিভাই তাহাকে আত্মসাৎ করিয়া কাব্য-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছে—ভারতীয় ভাবুকতার দুর্দ্ধর্ষ idealism এ বিষয়ে রবীন্দ্র-প্রতিভার সহায়তা করিয়াছে। অক্ষয়কুমার খাঁটি বাঙ্গালী, দেবেন্দ্রনাথও তাই,—ভাবকল্পনার সঙ্গে ভাবুকতার সেই দুর্দ্ধর্ষ শক্তি ইহাদের প্রকৃতি ও তথা প্রতিভার অনুগত নহে। বস্তুর বাস্তবতাকে অক্ষয়কুমার কখনও কল্পনায় গ্রাস করিতে পারেন নাই—দেবেন্দ্রনাথের মত চিন্তালেশহীন ভাবাতিরেকের সাহায্যে বাস্তব-মুক্তির উপায় তাঁহার কবিপ্রকৃতির পক্ষে অসম্ভব। অতএব বড়াল-কবির কবিজীবনে বস্তু ও কল্পনা, হৃদয় ও মনোবৃত্তি, প্রেম ও সংশয় প্রভৃতির দ্বন্দ্ব নিরবচ্ছিন্ন হইয়া আছে। এই দ্বন্দ্বকে কবি ভাবজীবনের মধ্যেই আবদ্ধ রাখিয়া বহির্জীবনে নিজকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখিয়াছিলেন—তাঁহার কবি-জীবন ও ব্যক্তি-জীবনের মধ্যে একটি সুদৃঢ় ব্যবধান ছিল ; জীবনে কাব্যাভিনয় তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল। অথবা এমনও বলা যায়, বিহারীলাল ও দেবেন্দ্রনাথের মত তিনি ভাব-ভোলা কবি ছিলেন না ; রবীন্দ্রনাথের মত অনাসক্ত আর্টিষ্টও তিনি নহেন। সমাজ ও সংসারের পুরা দাবী মিটাইয়া তিনি নিজের জন্য একটি পৃথক ভাবরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেখানে তিনি নিঃসঙ্গ। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের এই বিষরসই যেমন তাঁহার কাব্য-প্রেরণার উৎস, তেমনই বহির্জীবন ও জগৎ-সংসার হইতে প্রায় বিচ্ছিন্ন হওয়ায় তাঁহার কল্পনা মুক্ত ধারায় প্রবাহিত হইতে পারে নাই—কতকটা রুদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ হইয়াই ছিল।

বড়াল-কবির সম্বন্ধে আমি প্রসঙ্গান্তরে বলিয়াছি—"বিহারীলালের কাব্যে আত্মভাব-নিমগ্নতার লক্ষণ থাকিলেও তাহাতে সজ্ঞান আত্ম-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা নাই। কিন্তু সেই

আত্ম-ভাবের মোহই বড়াল-কবির কাব্যে আত্ম-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষারূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাই, বিহারীলালের 'সারদা'র একটি দিক—বিশ্বের অন্তঃপুরে তাহার সেই রহস্যময়ী মূর্ত্তি—শেলীর কাব্যরসে অভিষিক্ত হইয়া বড়াল-কবির অবাস্তব-রস-পিপাসার ইন্ধন যোগাইয়াছে। এই আত্মপরায়ণ কল্পনা—অতিশয় অসামাজিক আত্মরতির কবিতা—বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন। কাব্যকে জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কবি-কল্পনার এই হা-হুতাশ বাংলা কাব্যে এইখান হইতেই আরম্ভ হইয়াছে।" ইহা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যই বটে, কিন্তু ইহাতে কল্পনার একটা সঙ্কীর্ণ অথচ তীব্র গভীর প্রবৃত্তি মাত্র আছে। আধুনিক কবি-মানসের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যই তাহার শক্তির ও অশক্তির কারণ। একদিকে তাহা যেমন একটা অতিশয় বিশিষ্ট কবি-দৃষ্টির সহায়—জগৎ ও জীবনকে একটা আত্ম-কেন্দ্রিক (ego centric) সৃষ্টিরূপে নূতন করিয়া রচনা করে; তেমনই, অতিরিক্ত মন্ময়তার (subjectivity) ফলে কল্পনা আর একদিকে ক্ষুণ্ণ হয়; তন্ময়তা বা objectivityর অভাবে, তাহার মধ্যে একটা অতীন্দ্রিয় অবাস্তবতা অথবা অসুস্থতার আভাস থাকে। বাস্তবকে একেবারে তিরস্কার না করিয়া, মন্ময় কল্পনার দ্বারা তাহাকে আত্মসাৎ করিবার শক্তি যেখানে যত অধিক সেইখানেই একটা অখণ্ড রস-সৃষ্টির পরিচয় তত সুলভ। শেলী, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবিগণের এই শক্তিই তাঁহাদের কাব্যে একটা অখণ্ড ভাব-জগতের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছে। তথাপি, কাব্যরসের উৎকর্ষ কোথায়—শেক্‌স্‌পীরীয় তন্ময়তায় না রবীন্দ্রীয় মন্ময়তায় সে প্রশ্ন এখানে অপ্রাসঙ্গিক। অক্ষয়কুমারের কাব্যে আমরা মন্ময়তাই লক্ষ্য করি, কিন্তু সেই সঙ্গে বাস্তবকে গ্রাস করিবার মত কল্পনাশক্তির অভাবও লক্ষ্য করি। এজন্য তাঁহার বাঁশীর একটি মাত্র ছিদ্রপথে যে গীতধ্বনি উৎসারিত হইয়াছে তাহা কেন্দ্রীভূত গাঢ়তায় ও আত্মসর্ব্বস্ব ঐকান্তিকতায় রসোজ্জ্বল হইলেও একটি অখণ্ড ভাব-জগতের প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। তাঁহার কল্পনার মর্ম্মগত দ্বন্দ্বই ইহার কারণ। তাঁহার কল্পনা নিছক আত্ম-মুখী; subjectivity নয়, egoism—তাঁহার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রধান লক্ষণ; তাঁহার অবাস্তব অভৌম কামনার মধ্যে বস্তু-নিষ্ঠাও যেমন নাই, তেমনই বাস্তব-বিস্মৃতিও নাই।

অক্ষয়কুমারের এই একমুখী কল্পনা তাঁহার কাব্যালোচনার পক্ষে বড়ই সুবিধাজনক হইয়াছে। তাঁহার কাব্যগুলিতে কবি-জীবনের মর্ম্ম-কাহিনী এমনই পারম্পর্য্য-সূত্রে সুগ্রথিত হইয়া আছে যে, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাহা অনুসরণ করা আদৌ দুরূহ নয়। 'ভুল', 'কনকাঞ্জলি', 'প্রদীপ', 'শঙ্খ' ও 'এষা'—এই কয়খানি স্বল্পায়তন কাব্যেই সে কাহিনী সুসম্পূর্ণ হইয়া আছে। তাঁহার কবি-মানসের বিকাশধারাও যেমন সরল, তেমনই তাঁহার কাব্য-মন্ত্র প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অতিশয় সুস্পষ্ট। কবি যেন এক আসন হইতে অন্য আসনে কখনও উঠিয়া বসেন নাই; এমন কি, আসনখানিও কখনও পরিবর্ত্তন করেন নাই। সেই একাসনে বসিয়া, শেষ পর্য্যন্ত সেই একই মন্ত্র জপ করিয়া, তিনি 'ভুল' হইতে 'এষা'য় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। আমি প্রথমে, তাঁহার কাব্যগুলির ভিতর দিয়া, এই মন্ত্র ও তাহার সাধনার কাহিনী উদ্ধার

করিব; পরে, যে দ্বন্দ্বের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি তাহার পরিণামে কাব্যসাধনার যে পরিণতি বা সমাপ্তি ঘটিয়াছে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া কবি-পরিচয় শেষ করিব।

কাব্যপাঠ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ভূমিকাহিসাবে আরও দুই চারি কথা বলিবার প্রয়োজন আছে। আমি বলিয়াছি, বিহারীলালের 'সারদা' শেলীর কাব্যরসে অভিষিক্ত হইয়া বড়াল-কবির কল্পনায় অধিষ্ঠিত হইয়াছে। অক্ষয়কুমার বিহারীলালকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিলেও, এবং প্রাণের ঐকান্তিকতা ও কাব্যসাধনার আধ্যাত্মিকতায় গুরুকে আদর্শ-রূপে গ্রহণ করিলেও, তিনি গুরুর 'সারদা'মন্ত্রের অনুসরণ করেন নাই—বাহির ও অন্তরের যত কিছু দ্বন্দ্ব-সংশয়ের সমন্বয়রূপিণী, সৃষ্টির আদি ও অদ্বৈত প্রেরণাশক্তিরূপা 'যোগেশ্বরী সারদা'র আরাধনা তিনি করেন নাই। আপনারই হৃদ্‌গত কামনার—ও তাহারই চির-অতৃপ্ত পিপাসার—বিগ্রহরূপে এক মানসী-প্রতিমা তাঁহার কবি-স্বপ্ন আচ্ছন্ন করিয়াছে। এই প্রতিমা কবির মানসাকাশে বিসৃষ্ট নিজেরই প্রতিবিম্ব। এইরূপ আত্মরতিমূলক প্রেম-পিপাসা বিহারীলালে নাই। কিন্তু বিহারীলালের কাব্যমন্ত্রে দীক্ষিত সেকালের দুই তরুণ-কবি, রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার, উভয়েরই মানসে—ইংরেজ কবি শেলীর প্রভাব সহজেই সংক্রামিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের বিপুলপ্রসারী কল্পনায় এ আদর্শ কিছুকালমাত্র আধিপত্য করিয়াছিল, পরে তাহা রসসৃষ্টির বলিষ্ঠতর প্রতিভায় রূপান্তরিত হইয়া গেছে; কিন্তু অক্ষয়কুমারের কল্পনা-বীজ ইহারই রসে অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছে। তথাপি শেলীর কল্পনা হইতে ইহা ক্ষুদ্র; সে idealism আরও ব্যাপক, সে প্রত্যয় আরও গভীর। শেলী আপনার ভাববিগ্রহকে —সৃষ্টির মর্ম্মান্তবাসিনী, সর্ব্বসৌন্দর্য্যের মূলাধার রূপাতীত রূপলক্ষ্মীরূপে ভাবনা করিয়াছিলেন। সে সম্বন্ধে তাঁহার কোনও সংশয় ছিল না; তাঁহার যতকিছু উৎকণ্ঠার কারণ—এই অনিত্য পার্থিব আবরণ ভেদ করিয়া, মর্ত্ত্য-মৃত্তিকার অশুচি স্পর্শ বাঁচাইয়া, তাহার সেই দিব্য শুভ্র শাশ্বত সত্তার সহিত মিলনের পক্ষে বাধা। অক্ষয়কুমারের আদর্শ এত বৃহৎ, কল্পনা এত ব্যাপক নয়—এতটা পার্থিবতাবর্জ্জিত নয়; বরং ব্যক্তির ব্যক্তিগত পিপাসায় তাহা রক্তিম ও রঙ্গীন। শেলীর 'Epipsychidion' বা রবীন্দ্রনাথের 'মানসসুন্দরী'তে মানসীকে মানবী বা নারী-রূপে পাইবার কামনা থাকিলেও সে প্রেম শেলীর পক্ষে যতটা আধ্যাত্মিক, এবং রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তাহা যতটা 'improvement of sensuous enjoyment'—এবং উভয়েরই মধ্যে যতটা মানস-শক্তি আছে—অক্ষয়কুমারের কল্পনায় তাহা নাই। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত, তাঁহার সেই অতি ঊর্দ্ধগ ভাবসর্ব্বস্ব কামনাতেও বাস্তবের ক্ষুধা বর্ত্তমান। তিনি নর ও নারীর বাস্তব সম্পর্কের—পুরুষ ও প্রকৃতির দ্বৈততত্ত্বের—ভাবনা কখনও ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাঁহার এই প্রেমকে আত্মরতি বলিবার কারণ এই যে, তিনি এই দ্বৈতের অপরার্দ্ধকে আপনারই মানসলোকে সন্ধান করিয়াছেন—অত্যুগ্র মন্ময়তার ফলে তাঁহার সেই মানসী-প্রণয়িনী তাঁহার নিজেরই প্রতিচ্ছবি—অপরার্দ্ধ নয়, আত্ম-অর্দ্ধেরই প্রতিকৃতি। বাস্তবকে তিনি উপেক্ষা করিতে বা স্বকীয় কল্পনায় গ্রাস করিতে সমর্থ নহেন; বরং নর-নারীর বাস্তব

মিলন-রহস্য তাঁহাকে সমধিক আকুল করে, নারীর সহিত একাত্মীয়তা লাভের জন্যই তিনি একান্ত উৎসুক। কিন্তু তাঁহার কবিপ্রবৃত্তি ভিন্নমুখী—যুগল-মিলনেও আত্ম-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা প্রবল; তাই ব্যর্থ-মিলনের হাহাকার ঘুচে না। এই 'ভুল' হইতে তাঁহার কবিজীবন আবদ্ধ ও অগ্রসর হইয়াছে, এবং 'প্রদীপে'র আলোকপাত পর্য্যন্ত এক বিষম অন্তর্দ্বন্দ্বে তিনি অবসন্ন হইয়াছেন। যে কল্পনা আদিতে একটা অভৌম ভাবকে আশ্রয় করিয়াছিল—যাহা বিহারীলালের সাধনমন্ত্র ও শেলীর কাব্য-প্রভাবে জন্মলাভ করিয়াছিল—তাহাই পরিশেষে 'নারী'র বাস্তব প্রকৃতির অনুধ্যানে স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে, সৃষ্টিরহস্যের অন্তর্গত প্রকৃতি-পুরুষের দ্বৈততত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া কতকটা সান্ত্বনা লাভ করিয়াছে। এইটুকু ভূমিকার পরে আমি অক্ষয়কুমারের কাব্যগুলি হইতে পূর্ব্ব-পর ক্রমানুসারে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার কাব্য-সাধনার গতি ও পরিণতির আভাস দিব।

প্রথমেই 'ভুল' ও 'কনকাঞ্জলি' হইতে কিছু উদ্ধৃত করিলাম, ইহার মধ্যে অক্ষয়কুমারের কবিমানসের প্রথম উন্মেষ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।—

(১) পড়ে আছি নদীকূলে শ্যামদূর্ব্বাদলে—
কি যেন মদিরা-পানে
কি যেন প্রেমের গানে
কি যেন নারীর রূপে ছেয়েছে সকলে!

যেই আশা, যে পিপাসা,
যেই ভুল, ভালবাসা
বুঝেছি ছুঁয়েছি প্রাণে স্বপনে সঙ্গীতে—
বুঝাইতে গেলে যায়,
বুঝিতে পারি না হায়,
চাই চারিভিতে!

(২) অসমাপ্ত এ চুম্বন, অতৃপ্ত পিপাসা!
এই ত প্রেমের বন্ধ,
বাস্তবে স্বপনে দ্বন্দ্ব,
কবিতার চিরানন্দ, সশঙ্ক দুরাশা!

(৩) এ জীবনে পুরিত সকল
সে যদি গো আসিত কেবল!
গানে বাকি সুর দিতে, ফুলে বাকি তুলে নিতে,
স্বপ্ন বাকি হইতে সফল—
সে যদি গো আসিত কেবল!

অযতনে ব্যর্থ হয় সবি।
ধরিয়া তুলিটি শুধু দুটি রেখা টেনে গেলে—
শূন্য হৃদি হয়ে যেত ছবি।

* * * *

জীবনের এই আধখানা,
দরশপরশাতীত আশা—
এ রহস্যে কোন অর্থ নাই ?
এ কি শুধু ভাবহীন ভাষা ?

উপরি-উদ্ধৃত শ্লোকগুলিতে কবি-হৃদয়ের যে উৎকণ্ঠা ব্যক্ত হইয়াছে তাহা 'দরশ-পরশাতীত'; এ আশা এ ভালবাসাকে কবি নিজের প্রাণে স্বপনে ও সঙ্গীতে ছুঁইয়াছেন। ইহাকে বাহিরের কোনও মূর্ত্তিতে স্পষ্ট ধরা যায় না—কেবল মনে হয়, 'কি এক নারীর রূপে ছেয়েছে সকল!' বিহারীলালের 'সারদা'র ছায়া ইহাতে আছে, কিন্তু অক্ষয়কুমারের 'কাব্যলক্ষ্মী' বহিরন্তরবিহারিণী নয়, বাস্তব-অবাস্তবের মিলন-মন্ত্রের সাধন-বিগ্রহ নয়। পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের প্রেম-কবিতার সঙ্গে ইহার তুলনা করিলেই দেখা যাইবে, বৈষ্ণব কবিদিগের আধ্যাত্মিক প্রেম-সাধনা এবং পরবর্ত্তী সমগ্র বাংলা-কাব্যের লৌকিক প্রেমোচ্ছ্বাস, এই উভয়বিধ আদর্শ হইতে ইহা কত ভিন্ন। 'কি এক নারীর রূপে ছেয়েছে সকল'—এ ভাব পরবর্ত্তী কাব্যে পুরাতন হইয়া গেছে বটে, কিন্তু ইহাতে অক্ষয়কুমারের বৈশিষ্ট্য আছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় পড়ি—

মানসীরূপিনী ওগো বাসনাবাসিনী,
আলোকবসনা ওগো নীরবভাষিণী,
—স্বর্গ হ'তে মর্ত্ত্যভূমি
করিছ বিহার, সন্ধ্যার কনক বর্ণে
রাঙিছ অঞ্চল,—

—এ মানসী কবিপ্রাণের অতিসূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য-উপভোগের ('improvement of sensuous enjoyment') বাসনাবাসিনী দেবতা। এখানে বাস্তব-অবাস্তবের দ্বন্দ্ব নাই, আছে কেবল একটি অতি মধুর বিরহ-বিলাস। কবির এ বিশ্বাস আছে—

আছে এক মহা উপকূল
এই সৌন্দর্য্যের তটে, বাসনার তীরে
মোদের দোঁহার গৃহ।

বিহারীলালের 'সারদা'ও জাগর-স্বপ্নের দ্বন্দ্ব হইতে একেবারে মুক্ত নয়, তথাপি কবির ধ্যান-গভীর উপলব্ধিতে এ দ্বন্দ্ব একটি অপূর্ব্ব-রসে গলিয়া যায়। যখন মনে হয়—

তবে কি সকলই ভুল।
নাই কি প্রেমের মূল,—
বিচিত্র গগন-ফুল কল্পনা-লতার ?

তখনই আবার গভীর আশ্বাসে প্রাণ আশ্বস্ত হয়—

এ ভুল প্রাণের ভুল,
মর্ম্মে বিজ্‌ড়িত মূল,
জীবনের সঞ্জীবনী অমৃত-বল্লরী।

কিন্তু অক্ষয়কুমারের প্রেম-কল্পনায় এরূপ বিশ্বাস বা আশ্বাসের স্থান নাই, কারণ—

পরিমলে কুতূহলী,
ফুলে শেষে পায়ে দলি—
তৃপ্তির নরকে জ্বলি অতৃপ্তির খেদে।

—ইহা হইতে বুঝা যায় অক্ষয়কুমারের কল্পনা বাস্তবাতিরিক্ত হইলেও এত উর্দ্ধগ নয় যে বাস্তবকে একেবারে গ্রাস করিয়া লইবে। 'তৃপ্তির নরকে জ্বলি অতৃপ্তির খেদে'—এমন কথা যে বলে তাহার বাস্তব-অনুভূতি অল্প নহে; কারণ, কেবল কবিচিত্তের নহে—মানব-হৃদয়ের একটি চিরন্তন ট্রাজেডির তত্ত্ব এই কথাগুলিতে নিহিত রহিয়াছে। ইহাই অক্ষয়কুমারের কবিপ্রকৃতির একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। শেলী, বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ—যাঁহার সহিত অক্ষয়কুমারের যেটুকু মিল বা অমিল থাকুক, অক্ষয়কুমারের কল্পনা একটা বাস্তব অভাবকে অস্বীকার করিতে পারে নাই, কল্পনা ও বাস্তবের মধ্যে একটা আপোষ করিয়া লইতেও চাহে নাই। এই দ্বন্দ্বকে অস্বীকার করাটাই যেন নিজ ব্যক্তি-মহিমাকেই খর্ব্ব করা। তৃপ্তিই নরক; যে মুহূর্ত্তে পিপাসানিবৃত্তি হয় সেই মুহূর্ত্তেই বুঝি—সে পিপাসার সে নিবৃত্তি কত ক্ষুদ্র; ফুলের পরিমল মধু-পিপাসার উদ্রেক করে, কিন্তু মধুপানশেষে ফুলকে পায়ে দলিয়া ফেলিয়া দিই—অতৃপ্তির খেদে জ্বলিয়া মরি। মানুষের হৃদয়-চেতনা যত তীব্র তাহার অভিশাপও তত ভীষণ।

এই নূতন পিপাসা হয় ত প্রেম নয়, কিন্তু ইহাই আধুনিক মানুষের মনোজীবনের একটা দুরারোগ্য ব্যাধি। ইহা সৌন্দর্য্য-প্রেম নহে, ভাবোন্মাদও নহে—এ বুভুক্ষা অন্তর্জ্জীবনের দিক দিয়াই অতিশয় বাস্তব। অক্ষয়কুমারের কবিজীবন-কাহিনী অনুসরণ করিবার কালে এই কথাটি মনে রাখিলে সে কাহিনীর আদ্যন্ত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। আর একটু অগ্রসর হইলেই আমরা বুঝিতে পারিব, অক্ষয়কুমারের কাব্যলক্ষ্মী—তাঁহার মানস-দ্বন্দ্ব বা মিলন-পিপাসার লক্ষ্য ও উপলক্ষ্য, উভয়ই—নারী। কোনও কবি-ভাবের প্রতীক, বা রূপক-রূপিণী নারী নহে, সৃষ্টিতত্ত্বের অন্তর্নিহিত যে মিথুনতত্ত্ব—অক্ষয়কুমারের 'নারী' তাহারই আধখানা। এই নারীর যে ভাব-বিগ্রহ, তাঁহার কল্পনায় সুদূর-দুর্লভ হইয়া আছে, তাহাকেই তিনি বাস্তবের মধ্যে খুঁজিয়া পান না। বাস্তবে ও আদর্শে এই দ্বন্দ্ব—ইহাই তাঁহার 'কবিতার চিরানন্দ, সশঙ্ক দুরাশা'।

অতঃপর 'প্রদীপ' কাব্য হইতে কিঞ্চিৎ কবি-পরিচয় সংগ্রহ করিব। অক্ষয়কুমারের কল্পনায় 'নারী'র যে আদর্শের কথা বলিয়াছি, প্রথম স্তরের কবিতাগুলিতে কবি সে সম্বন্ধে

অর্দ্ধ-সচেতন মাত্র—সে কল্পনা অস্ফুট ভাবময়। এই দ্বিতীয় স্তরের কবিতাগুলিতে কবি একটা চিন্তাভিত্তির সন্ধান করিতেছেন—এই দ্বন্দ্ব যে অর্থহীন নয়, তাহাই বুঝিয়া কতকটা আশ্বস্ত হইতে চেষ্টা করিতেছেন। 'আবাহন'-শীর্ষক কবিতায় কবি তন্ত্রোক্ত দ্বৈতাদ্বৈতের এক নূতন অর্থ করিয়া, নারী ও পুরুষের পৃথক সত্তার একটি কবিতাসুলভ সম্বন্ধ কল্পনা করিয়াছেন। এই কবিতার দুই অংশে—প্রথমে 'নর' ও পরে 'নারী'-বন্দনায়—যে উদাত্ত-গম্ভীর স্তোত্রগান ধ্বনিত হইয়াছে তাহা এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-যুগেরই আবাহন শঙ্খধ্বনি। প্রথম অংশের কয়েকটি পংক্তি এইরূপ—

ক্ষুদ্র নয়, তুচ্ছ নয় নর।

* * *

এ বিকচ তনু-মন
বিধাতার ধ্যেয় ধন,
দেবাসুর-রণক্ষেত্র, সর্ব্বতীর্থসার—
উপযুক্ত আসন তোমার।

কিন্তু নর ও নারীর দ্বৈত-তত্ত্ব, এবং সৃষ্টির পক্ষে তাহার প্রয়োজন স্বীকৃত হইলেও কবির তাহাতে তৃপ্তি কোথায়? এ পার্থক্য প্রকৃতিগত, অতএব মিলনের পথে জগৎ-চক্রই অন্তরায়। তাই মিলনের আশা একরূপ আত্ম-প্রবঞ্চনা।—

এ যে রে কুস্বপ্ন-ঘোর জন্মান্তর অভিশাপ,
কুহক কাহার!

কোথায় আনন্দ-স্বপ্ন! এ যে অদৃষ্টের ব্যঙ্গ
বিকৃত-কল্পনা,
দুরাশার অভিশাপে সহস্র মরণাধিক
আত্ম-প্রবঞ্চনা।

কবি কিন্তু নিজের ব্যাধি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজ্ঞান; যে আত্মপরায়ণ কল্পনা নারীর বাস্তব রূপকে অগ্রাহ্য করিয়া একটা আত্মগত অবাস্তব আদর্শকে প্রেমের বিষয় করিতে চায় তাহার পরিণাম কবিও জানেন—

প্রণয়ের পরভাগ আপনি গড়িয়া লবে
আপনার কল্পনা-স্বপনে,—

—সে ফাঁকি চলে না, কারণ—

তুচ্ছ প্রেমিকের আশা—
ঘোরে না বিধির চক্র
মূলে নাহি পেলে একজনে।
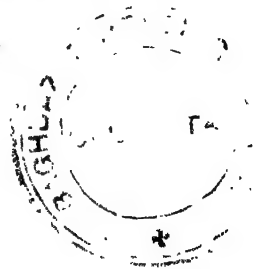
এই 'একজন'কে তাঁহার প্রচণ্ড আত্মাভিমান কিছুতেই বরণ করিয়া লইতে দিবে না, তাই কবি আর্ত্তস্বরে ফুকারিয়া উঠেন—

কোথা তুমি জীবন-জীবন !
আত্মদ্রোহী আত্মঘাতী ভূমে আজ জানু পাতি'—
কর তারে কৃপা-বিতরণ।

ইহার পর, এই কাব্যের শেষভাগেই কবি এই দ্বৈতকে 'অভেদ প্রভেদ' বলিয়া বুঝিতে চাহিয়াছেন—নর ও নারীর সত্তায় প্রকৃতিগত পার্থক্য থাকিলেও সে প্রভেদের মধ্যে একটা অভেদ সম্বন্ধ আছে ; যদি না থাকিত তবে—

"গ্রহ উপগ্রহ লয়ে বিশ্ব যেত চূর্ণ হয়ে,
বিধির সৃজন-কল্প হইত বিফল।"

পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে-প্রেম তাঁহার কাব্যের উপজীব্য তাহা আত্মসমর্পণ-মূলক নয়—আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। আত্ম ও পরের যে দ্বন্দ্ব তাহার সমন্বয়ই প্রেমের সাধনা, দ্বন্দ্ব না থাকিলে মিলনের কোন অর্থ ই হয় না ; তদ্ভাবে ভাবিত হইতে পারা যেমন শ্রেষ্ঠ কবি-শক্তি, তেমনই সেই সহানুভূতিমূলক প্রেমদৃষ্টি প্রেমিকেরও দিব্যশক্তি,—এ কথা অক্ষয়কুমার যেন অস্বীকার করিতে চাহিয়াছিলেন। এই দ্বন্দ্বের বিরুদ্ধে একটা মর্ম্মান্তিক আক্রোশ তাঁহার কবিজীবনের আরম্ভ হইতে অনেকদূর পর্য্যন্ত প্রবল হইয়া আছে। তথাপি এইরূপ একটা তত্ত্বের আশ্বাসে তাঁহার কল্পনা শেষের দিকে কতকটা মুক্তি পাইয়াছে। 'প্রদীপ' ও 'শঙ্খে'র কতকগুলি কবিতায় ভাবুকতা ও কবিদৃষ্টি আরও ব্যাপক হইয়াছে, কল্পনার অধিকতর স্ফূর্ত্তি এবং বাণীরচনায় সংযত-শ্রীর পরিচয় আছে। নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলি তাহারই নিদর্শন।—

তুমি শান্তিস্বস্তিদাত্রী, অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী,
সৃজয়িত্রী পালয়িত্রী ভবদুঃখহরা !
আত্মমধ্যা স্বয়ংস্থিতা, সুন্দরে অপরাজিতা,
মুগ্ধা আশ্লেষ-রূপা বিশ্লেষ-কাতরা।

আমি জগতের ত্রাস, বিশ্বগ্রাসী মহোচ্ছ্বাস,
মাথায় মত্ততা-স্রোত, নেত্রে কালানল ;
শ্মশানে মশানে টান, গরলে অমৃত-জ্ঞান,
বিষকণ্ঠ, শূলপাণি, প্রলয়-পাগল !

তুমি হেসে বসে' বামে, সাজাইয়া ফুলদামে
কুৎসিতে শিখালে, শিবে, হইতে সুন্দর !
তোমারি প্রণয়-স্নেহ বাঁধিল কৈলাস-গেহ,
পাগলে করিল গৃহী, ভূতে মহেশ্বর !

(২) সৌন্দর্য্যের মেরুদণ্ড তুমি,
শৃঙ্খলা দাঁড়ায়ে তোমা 'পরে—
তপনের রশ্মিবলে চলে যথা গ্রহগণ
তালে তালে গেয়ে সমস্বরে।
তোমারি ও লাবণ্য-ধারায়
কালের মঙ্গল পরকাশ ;
অসম্পূর্ণ এ সংসারে তুমি পূর্ণতার দীপ্তি,
মেঘ-ঘোরে স্বর্গের আভাস !
প্রাণান্তক জীবন-সংগ্রামে
তুমি বিধাতার আশীর্ব্বাদ,
নিত্য জয়-পরাজয়ে পাছে পাছে ফিরিতেছ
অঞ্চলে লইয়া সুখ সাধ।

দ্বিতীয় কবিতাটিতে শেলীর কবিতার স্পষ্ট ছাপ আছে—যদিও এই নারী-বন্দনায় কবি বাস্তব জীবন-সঙ্গিনী নারীকেই সম্বোধন করিয়াছেন। শেলীর কয়েকটি পংক্তি এইরূপ—

Sweet Benediction in the eternal Curse!
Veiled glory of this lampless Universe!
Thou moon beyond the clouds! Thou living form
Among the Dead! Thou star above the storm!
Thou Harmony of Nature's art, Thou mirror
In whom, as in the splendour of the sun
All shapes look glorious which thou gazest on!

(৩) শিরে শূন্য পদে ভূমি, মধ্যে আছি আমি তুমি—
কল্প কল্প বিকাশ-বারতা !
আছে দেহ—আছে ক্ষুধা, আছে হৃদি—খুঁজি সুধা,
আছে মৃত্যু—চাহি অমরতা।

এস এ হৃদয়ে মম অস্ফুট চন্দ্রিকা সম,
প্রেমে স্নিগ্ধ শুভ্র করুণায় !—
ঢেকে দাও সব ব্যথা, অসমতা অক্ষমতা,
জড়ায়ে ছড়ায়ে আপনায়।

লয়ে প্রেম সুধারাশি, এস দেবী, এস দাসী,
এস সখী, এস প্রাণ-প্রিয়া।
এস সুখ-দুখ-দূরে, জন্ম-মৃত্যু ভেঙ্গে চুরে,
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ব্যাপিয়া।

(৪) এস প্রিয়া প্রাণাধিকা,
জীবন-হোমাগ্নিশিখা!
দিবসের পাপ তাপ হোক্‌ হতমান।
ওই প্রেমে—প্রেমানন্দে,
ওই স্পর্শে, বাহুবন্ধে,
আবার জাগুক মনে—আমি যে মহান্‌,
একেশ্বর, অদ্বিতীয়, অনন্যপ্রধান!

অক্ষয়কুমারের বিশিষ্ট ভাবসাধনা তাঁহার কাব্যে এই পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে; ইহাই তাহার স্বাভাবিক ও আন্তরিক পরিণতি, এবং ইহা ঘটিয়াছে সেই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-সাধনারই পথে, বাস্তবকে যে ভাবে তিনি বরণ করিয়া লইয়াছেন তাহাতেও আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 'কনকাঞ্জলি'তে তাঁহার যে কামনা ছিল—

দাও শিক্ষা, যোগময়ী, যেখানে থাক না তুমি—
কিসে দেখি সৌন্দর্য্য তোমার,
তোমাতে মগন হ'য়ে সত্তা তব ভুলে গিয়ে
একা হই পূর্ণ অবতার।

এখানেও সেই কামনাই আরও সুপ্রষ্ঠিত হইয়াছে।—

ভাবিয়া বিন্দুরে এক, ব্যাপ্ত হই বিশ্বময়—
শিখারে, শিখা' সে প্রেমযোগ;
ছিঁড়ে যাক নাভি-শিরা, ঘুচে যাক জীবনের
চিরজন্মগত স্বার্থরোগ।

কবির এই পুরাতন প্রার্থনা তাঁহার নিজ আদর্শে হয় ত পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু—'ভাবিয়া বিন্দুরে এক ব্যাপ্ত হই বিশ্বময়'—এই স্পষ্ট ego-centric সাধনার যে প্রেমযোগ, 'তোমাতে মগন হ'য়ে সত্তা তব ভুলে গিয়ে' যে ধরণের আত্মপ্রতিষ্ঠা সম্ভব,—তাহাতে আত্ম ও পরের দ্বন্দ্ব এক অর্থে মিটিতে পারে; কিন্তু 'জীবনের চিরজন্মগত স্বার্থরোগে'র যে একমাত্র ঔষধ—প্রেমানন্দ, এ তাহা নয়। ইহার জন্য কবির ভাগ্যবিধাতা অন্যরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

এইবার অক্ষয়কুমারের জীবনে যে একটি ঘটনা, এবং তাহারই প্রচণ্ড আঘাতে তাঁহার কাব্যে যে রূপান্তর ঘটিয়াছিল, তাহার কথা বলিব। কবি-বিধাতা কবির প্রতি নিরতিশয় প্রসন্ন ছিলেন, তাই কবি ও মানুষটির মধ্যে এতকাল যে দ্বন্দ্ব ছিল, তাহা দূর করিয়া, জীবনের সহিত কাব্যের—প্রেয়সীর সহিত মানসীর—এমন কঠিন মিলন ঘটাইয়াছিলেন। উপরে অক্ষয়কুমারের কবিজীবনের যে পরিচয় দিয়াছি—যে সূত্রটি ধরিয়া তাঁহার কবিমানসের বৈশিষ্ট্য ও পরিণতির আভাস দিয়াছি, তাহা হইতে যেন একটা অতিশয় বিলক্ষণ ও স্বতন্ত্র পরিচয় তাঁহার শেষ দুইখানি কাব্যে—বিশেষ করিয়া 'এষা'য়—ফুটিয়া উঠিয়াছে, কবির যেন জন্মান্তর

ঘটিয়াছে। যে অত্যুচ্চ মানস-আদর্শকে তিনি কখনও ত্যাগ করিতে পারেন নাই, জীবনের শেষভাগে তাঁহার সেই অভিমান ধূলিসাৎ হইয়াছে, প্রকৃতির পরিশোধের মতই সেই অবাস্তব বিরহ-বেদনা বাস্তব পত্নীশোকে রূপান্তরিত হইয়াছে। যাহাকে তিনি ভাবের নক্ষত্র-লোক ভিন্ন আর কোথাও চিনিয়া লইতে পারেন নাই—উপরি-উদ্ধৃত শেষ স্তরের কবিতা-গুলিতেও তিনি যাহাকে সাধারণ মর্ত্ত্যসঙ্গিনীরূপে না দেখিয়া ভাব-কল্পনার জ্যোতির্মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তিনীরূপে দেখিতে চাহিয়াছেন, তাহাকেই তিনি সামান্য মানবীর মধ্যে, স্নেহমমতাময়ী গৃহধর্ম্মচারিণী পত্নীরূপে চিনিতে পারিয়া, এবং সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্ব অভিমান ত্যাগ করিয়া, যে সুরে এই অতুলনীয় শোক-গাথা রচনা করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার জীবনে ও তথা কাব্যে সিদ্ধি-লাভ ঘটিয়াছে। প্রেমের পরশপাথর-স্পর্শে কখন যে তাঁহার হৃদয়ের লৌহশৃঙ্খল সোনা হইয়া গিয়াছিল তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই, তাঁহার সেই আত্মসর্ব্বস্ব কল্পনা তাঁহাকে অন্ধ করিয়াছিল। এক্ষণে রবীন্দ্রনাথের কবিতার সেই 'ক্ষ্যাপা'র মতই কবির কি মর্ম্মান্ত অনুশোচনা !—

> কপালে হানিয়া কর বসি' পড়ে ভূমি 'পর,
> নিজেরে ক'রিতে চায় নির্দ্দয় লাঞ্ছনা—
> পাগলের মত চায়, কোথা গেল হায় হায় !
> ধরা দিয়ে পলাইল সফল বাঞ্ছনা !

এ নিয়তি অক্ষয়কুমারের মত কবির পক্ষে অতিশয় স্বাভাবিক। বোধ হয় ইহাই কবিগণের সাধারণ নিয়তি। তথাপি অক্ষয়কুমারের কবি-জীবনের ইহাই পরম সৌভাগ্য ; জীবনের এই কঠিন বাস্তব তাঁহার কবিস্বপ্নের অবাস্তবকে এমন ভাবে আঘাত করিয়াও তাঁহার কাব্যসাধনাকেই সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছে। কারণ আমার মনে হয়, বাংলা কাব্যসাহিত্যে 'এষা' কাব্যখানিই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। 'প্রদীপ' ও 'কনকাঞ্জলি'র কবি যে পেলব সূক্ষ্ম রস-মূর্চ্ছনায় নব্য গীতিকাব্যে একটি নূতন সুর যোজনা করিয়াছিলেন তাহা জাতির নহে, যুগের ; সে কাব্য কল্পনায় বড় নহে—দৃষ্টি-সৃষ্টির যাদুশক্তি তাহাতে নাই। জীবনকে—ভাবনা দ্বারা নয়—সাক্ষাৎ দৃষ্টিদ্বারা এমন করিয়া দেখা যে, গীতিকাব্যে হোক আর মহাকাব্যেই হোক, জীবনেরই একটা রূপ পরম রসবৎ হইয়া উঠে ; বাস্তব অবাস্তবের কথা নয়, একটা গভীরতর রহস্যের সাক্ষাৎ উপলব্ধি ঘটে—ইংরেজ ভাবুক যাহাকে 'burden of the mystery' বলিয়াছেন সেই গুরুভার মন হইতে অপসারিত হয়—সেই দৃষ্টিই কবিদৃষ্টি ; উৎকৃষ্ট কাব্য সেই দৃষ্টিরই সৃষ্টি। এ যাবৎ অক্ষয়কুমারের কল্পনা অতিরিক্ত ভাবপ্রধান হইলেও তাহার মধ্যে যে আন্তরিকতা ও প্রাণময়তার নিঃসংশয় প্রমাণ আমরা পাইয়াছি এই শেষের কবিতাগুলিতে তাহাই একটি সুপরিস্ফুট বাণীমূর্ত্তি লাভ করিয়াছে ; তাহার কারণ, মানুষ ও কবি এখানে এক হইয়া গিয়াছে—জীবনের সত্য কবি-দৃষ্টির রশ্মিপাতে চিরন্তনের সৃষ্টিশোভায় মণ্ডিত হইয়াছে। এখানে ভাব বা idea-ই বড় নয়, যাহা শাশ্বত ও সার্ব্বভৌমিক—'in

widest commonalty spread'—তাহাই একটি ব্যক্তির প্রাণ-বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া সুবিস্তৃত ও সুবলয়িত হইয়া উঠিয়াছে। এই কাব্যখানিতে অতিশয় ব্যক্তিগত বিয়োগ-ব্যথাকে তিনি যে রস রূপ দান করিয়াছেন—কবিত্ব-কল্পনা-বর্জ্জিত, অতিশয় আধিভৌতিক, elemental দুঃখকেই যে ভাষা ছন্দ ও উপমা-অলঙ্কারে ঠিক তাহারই মত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন; অতিশয় অকপট সরল অথচ গাঢ় গভীর অনুভূতিই যে অপরূপ কাব্যশ্রী লাভ করিয়াছে—তাহা অত্যুৎকৃষ্ট কবিশক্তির পরিচায়ক। যে কল্পনা বাস্তবেরই মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিতে পারে, সার্ব্বজনীন মানবহৃদয়ের মত চিরপুরাতন ও চিররহস্যময় বিষয়বস্তু যাহার উপজীব্য, এবং সেই সকলের অতি সরল ও সহজ অনুপ্রেরণা হইতে যে কল্পনা কাব্যের কোনও একটি অমৃত-রূপ সৃষ্টি করিতে পারে তাহাই শ্রেষ্ঠ কবিকল্পনা। প্রতিভার শক্তি অনুসারে এই কল্পনা ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কাব্য সৃষ্টি করে—কবি-শক্তির বিচারে সে একটা বড় কথা; কিন্তু কাব্যগুণের বিচারে ক্ষুদ্র বলিয়াই কোনও কবি-কর্ম্ম নিকৃষ্ট নহে। এই হিসাবেই অক্ষয়কুমারের 'এষা' কাব্যখানিই তাঁহার প্রতিভার পূর্ণ নিদর্শন বলিয়া মনে হয়।

আমি অক্ষয়কুমারের কবি-কীর্ত্তিকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া লইয়াছি। 'ভুল' হইতে 'শঙ্খের' কিয়দংশ—ইহাই প্রথম ও বৃহত্তর ভাগ, এই ভাগেরই বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। কারণ আধুনিক বাংলা গীতিকাব্যের একটি প্রধান প্রবৃত্তির লক্ষণ—ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-সাধনার একটি বিশিষ্ট ভঙ্গি—ইহাতে আছে। 'শঙ্খ' কাব্যখানিকেই এই দুইভাগের সন্ধিস্থল বলা যাইতে পারে, কারণ, ইহার কয়েকটি কবিতা যেমন পুরাতনের পুনঃ সঙ্কলন, তেমনই অপরগুলি 'এষা'র সমকালবর্ত্তী। এইরূপ ভাগ করিয়া লইবার আর এক সুবিধা এই যে, অক্ষয়কুমারের কবিপ্রকৃতির পরিচয়হিসাবে তাঁহার কাব্যসাধনার এই দীর্ঘতর কাল ও কাব্যের এই বৃহত্তর অংশ অধিকতর উপযোগী; এজন্য কাব্য-কীর্ত্তির মূল্য বা রসসৃষ্টির আদর্শবিচারে আমি এগুলিকে না লইয়া তাঁহার কবি-মানসের লক্ষণ-নির্ণয়ে এই অংশের আলোচনা করিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে 'শঙ্খ' ও 'এষা' প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে এগুলির যে মূল্য ছিল, পরে তাহা যে অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, বাংলা কাব্যের আধুনিক প্রবৃত্তির—কাব্যে কবি-মানসের অভ্যুদয়, বাস্তব ও কল্পনার দ্বন্দ্ব, আত্মপরায়ণ রোমান্টিক ভাব-বিদ্রোহের স্পষ্ট নিদর্শন হিসাবে এই কাব্যগুলি যেমন মূল্যবান, তেমনই এক প্রকার সূক্ষ্ম ভাবানুভূতির—ভাবের সহিত ভাবুকতার, মানসের সহিত মনসিজের মিলন-মূলক এক অপূর্ব্ব উৎকণ্ঠার গীতিরস এই কাব্যগুলিতে সঞ্চারিত হইয়াছে। নিতান্ত বালক-বয়সে সেই যে পড়িয়াছিলাম—

> সারা বসন্তটি ধরে' অফুট গোলাপ তুলি,'
> বেছে বেছে ফেলে দিয়ে ছোট ছোট কাঁটাগুলি,
> ছড়ায়ে রেখেছি পথে,—এই পথ দিয়ে যাবে,
> যেতে যেতে একবার সে কি হেসে পাশে চাবে?

—দলে' যাবে ফুলরাশ, হয় ত চাবে না হায়!
কত ফুল বৈশাখে ত মাটিতে শুকায়ে যায়!

-তাহার রেশ এখনও কানে লাগিয়া আছে। আবার—

যা, বায়ু তাহার কাছে—
সে বুঝি ঘুমায়ে আছে,
নিয়ে যা গানটি মোর ধীরে ধীরে তার কাছে;
নিয়ে যাস্ বুকে করে',
দেখিস্ পড়ে না ঝরে',
বড় ভয় হয় মনে—বুঝিতে না পারে পাছে।

যাস্ বায়ু পায় পায়,
শুইয়া পড়িস্ গায়,
হৃদয়-কোরকে তার গানটিরে দিস্ রেখে;
সে যেন মধুর ঘুমে—
গানটির ধীর চুমে
স্বর্গের স্বপন সনে শৈশব-স্বপন দেখে।
যেন রে প্রভাত হ'লে—
ঘুমটুকু গেলে চলে',
স্বপ্নটুকু গান-টুকু না ভুলিয়া যায়।
ঘুমটি ভাঙ্গিয়া গেলে,
কাল যেন কাছে এলে,
বন-হরিণীর মত চমকিয়া না পলায়!

এই বস্তুই 'এষা'য় রূপান্তরিত হইয়াছে—বাস্তব-চেতনার সংঘাতে সেই ভাব-কল্পনাই নূতন পথে প্রবাহিত হইয়াছে। ইহাকে কবি-প্রতিভার স্বাভাবিক পরিণতিও বলা যাইতে পারে; কারণ বাহিরের ঘটনাবর্ত্ত যতই প্রবল হোক, মানুষের সেই একই প্রকৃতি আরও গভীর ভাবে সাড়া দেয় মাত্র। অতএব, 'এষা'র কবি যে 'প্রদীপ', 'কনকাঞ্জলি'র কবি হইতে ভিন্ন নহেন, মনস্তত্ত্বের সিদ্ধান্তমতে তাহা স্বীকার করিতেই হয়। তথাপি মানুষের জীবনে যেমন, তেমনই কবির জীবনেও একটা বড় বিপ্লব এবং তাহার ফলে গতি-পরিবর্ত্তন অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নহে। অক্ষয়কুমারের জীবনে ইহা ঘটিয়াছিল, এবং কাব্যও জীবনকে অনুসরণ করিয়াছে। ইহা প্রতিভার নিবর্ত্তন নয়—বিবর্ত্তন। তাঁহার কল্পনায় আজীবন যে আন্তরিকতা ছিল, জীবনের বাস্তব-চেতনা হইতে মুক্তি কখনও ছিল না, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি—বাস্তব ও কল্পনার দ্বন্দ্ব তাঁহার কবিশক্তিকে চিরদিন উজ্জীবিত করিয়াছে। আজ বাস্তবের সহিত সাক্ষাৎ সংঘর্ষে সেই দ্বন্দ্ব যেন ঘুচিয়াছে; তবে কি সেই সঙ্গে তাঁহার কবিশক্তিও লোপ

পাইয়াছে ? প্রতিভার নিবর্ত্তন ঘটিয়াছে ? আমি ইহাকে নিবর্ত্তন না বলিয়া বিবর্ত্তন বলিব ; কারণ, স্রোত পূর্ব্বাপেক্ষা মন্দীভূত হইলেও, এ কাব্যের গভীরতা ও স্বচ্ছতা—দুইটিই শক্তিমত্তার পরিচায়ক। অক্ষয়কুমারের কবিত্ব যেন এতদিন শৈলশৃঙ্গে অথবা উপল-বিষম পথে, কখনও আবর্ত্ত কখনও প্রপাত সৃষ্টি করিয়া, কখনও সঙ্কীর্ণ গিরি-বর্ত্মে খরপ্রবাহরূপে পরিভ্রমণ করিয়া, এতদিনে গভীর ও সমতল খাতে নিজস্ব ধারাটি অনুসরণ করিয়াছে। মানুষ ও কবির মধ্যে যে দ্বন্দ্বের কথা আমি আরম্ভেই উল্লেখ করিয়াছি এতদিনে যেন তাহার নিবৃত্তি হইয়াছে ; যে পাশ্চাত্ত্য ভাব-বীজ তাঁহার কবিমানসে অঙ্কুরিত হইয়াছিল, যাহার সহিত সংঘর্ষে তাঁহার সহজাত আর এক প্রবৃত্তি—সহজ সরল বাঙালিয়ানার গভীরতর সংস্কার—একরূপ ক্লাসিক্যাল, সুস্থ সবল ও সংযত রস-রসিকতা—পীড়িত হইয়াছিল, এবং তাহার ফলে, এতকাল তাঁহার কাব্যে ভাব-বিষ-জর্জ্জরিত ব্যক্তি-মানসের আক্ষেপই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, 'এষা'র কবি যেন তাহা হইতে মুক্ত হইয়া প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন—উর্দ্ধগ কল্পনাকে সংযত করিয়া তিনি এক্ষণে মাটির সংসারে বিচরণ করিতেছেন। এইবার আমি কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া কবি-জীবনের এই উত্তরার্দ্ধের পরিচয় দিব।

'এষা'র মুখবন্ধে কবি যেন নিজেরই পূর্ব্ব-জীবন স্মরণ করিয়া বলিতেছেন—

নহে কল্পনার লীলা—স্বরগ নরক :
বাস্তব জগত এই, মর্ম্মান্তিক ব্যথা।
নহে ছন্দ, ভাব-বন্ধ, বাক্য রসাত্মক ;
মানবীর তরে কাঁদি, যাচি না দেবতা।

অন্যত্র—

এই কি জীবন ?

*

কত না কামনা করি'
আকাশ-কুসুম গড়ি !
কত গর্ব্ব-অহঙ্কার—কত আস্ফালন !

কবির সেই অহঙ্কার এক্ষণে চূর্ণ হইয়াছে। আকাশ-কুসুম-কামনার উপরে তাঁহার মানবত্ব জয়ী হইয়াছে। 'নরত্বং দুর্লভং লোকে কবিত্বঞ্চ সুদুর্লভং'—কথাটা বিশেষ অর্থে সত্য হইতে পারে ; কিন্তু কবিত্বের মূলে যদি নরত্বের বৃহৎ ও সার্ব্বজনীন হৃদস্পন্দন না থাকে, তবে তাহা যত বড় রসসৃষ্টির যাদুশক্তিই হোক—অতিসূক্ষ্ম মানস-বিলাস বা রূপতৃষ্ণার পরিপোষক হোক—জীবন-রস-রসিকতার অমৃত আস্বাদন করাইতে সক্ষম নহে। 'নহে ছন্দ, ভাব-বন্ধ, বাক্য রসাত্মক'—বলিয়া কবি যে বিনয় প্রকাশ করিয়াছেন তাহার মধ্যে একটি গভীরতর প্রত্যয়ের আশ্বাস আছে। ছন্দ বা ভাব-বন্ধের উপরে তাঁহার আর আস্থা নাই,

রসাত্মক বাক্য-সম্পদের প্রতিও তিনি বীতস্পৃহ ; অর্থাৎ, এ কাব্যে কবিত্বের ভান নাই, হৃদয়ের অনুভূতিকে যথাযথ প্রকাশ করিবার আকাঙ্ক্ষা আছে। এই অনুভূতিকে বাক্যে প্রকাশ করিতে হইলে শব্দার্থ ও ছন্দ-ঝঙ্কারের কত কৌশলই করিতে হয় ; কবির সেই কৌশলকে আমরা কাব্যকলা বলি। কিন্তু সেই কৌশল করিতে হয় প্রাণের দায়ে—'বিলাসকলা-কুতূহল' তাহার মুখ্য অভিপ্রায় নয়। সকল কাব্যই ভাবের রূপ-সৃষ্টি, এবং রূপ অর্থাৎ বাণীর প্রকাশ-সুষমাই রসসঞ্চারের সাক্ষাৎ কারণ। কিন্তু কাব্যরচনার কালে কবির কোন অভিপ্রায়ই থাকে না—আত্ম-ভাব-প্রকাশের অদম্য কামনা ছাড়া। তাই কবি যখন নিজ কাব্যের পরিচয় দেন—'নহে ছন্দ, ভাব-বন্ধ, বাক্য রসাত্মক,' তখন কবির এই ধারণা বিনয়-মূলক নহে, অতিশয় সত্য। 'এষা'-কাব্যে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। যে-বেদনা যত গভীর ও মর্ম্মান্তসঞ্চারী তাহা ততই নির্ব্বাক হইয়া থাকে—কাব্যে তাহা অতিশয় সরল অনলঙ্কৃত ও স্বল্পাক্ষর হইয়া প্রকাশ পায়। ভাব যেখানে শব্দার্থমাত্রে ধরা দেয় না, সেইখানে উপমার প্রয়োজন হয়। উপমা যেখানে অতিশয় সার্থক ও সুন্দর বলিয়া মনে হয়, সেখানে বুঝিতে হইবে রসাত্মক বাক্যরচনার প্রয়োজনেই তাহার জন্ম হয় নাই, প্রাণের প্রকাশ-বেদনায়—যাহা অনির্ব্বচনীয়, তাহাই ঐ চিত্ররূপে ধরা দিয়াছে, ঐ ভাষাই তাহার একমাত্র ভাষা ; রচনার মুখে তাহা যে আসিয়া পড়িয়াছে, ইহাই কবির প্রতিভা। ভাষার স্বল্পাক্ষরতা ও প্রসাদ-গুণ এবং উপমা-অলঙ্কারের বাহুল্য-বর্জ্জন 'এষা'র কবিতাগুলিকে যে অনর্ঘতা দান করিয়াছে তাহা আধুনিক বাংলা কাব্যের একটি বিশিষ্ট গৌরব, এমন আর কোথায়ও নাই। ভাষার কথা পরে বলিব। এক্ষণে 'শঙ্খ' ও 'এষা' হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া অক্ষয়কুমারের কবি-প্রতিভার পরিচয় দিব।—

(১) কত দিন গেছে চলে'—
নাহি আর গৃহতলে
লুণ্ঠিত অঞ্চল-চিহ্ন, চরণের রাগ ;
নাহি আর এ শয্যায়
সে রূপ-আভাস হায়,
সে পবিত্র দেহ-গন্ধ—সে স্বপ্ন সজাগ

বুঝেছি কপাল মোর,
তবু ঘোচে নাই ঘোর—
ভাবিতে ভাবিতে কভু সব ভুলে যাই।
রজনী গভীরা হেন,
তবু সে আসে না কেন—
সহসা চমক ভাঙ্গে, তবু যারে চাই !

আবার মুদিয়া আঁখি
কত কি ভাবিতে থাকি,
মৃতেরা এ ধরাতল দেখিতে কি আসে ?
কোথা হতে সে যদি রে
সহসা আসিয়া ফিরে—
আঁখিযুগ ঢাকে করে, বসে হেসে পাশে !

(২) হে প্রিয়, ভাবিয়াছিলে হয়েছি কাতর
প্রিয়ার মরণে,
তার কথা—ছুটি কথা, কথা অবান্তর
কহিনু দুজনে।

হয় ত একটি শ্বাস—নহে দীর্ঘ স্পষ্ট—
ছিলে তুমি শুনি',
বলেছিনু—"বড় কষ্ট ! কি এমন কষ্ট ?"
কথা শুনি' শুনি'।

নহি শিশু, নহি নারী,—ছুটি দিশি দিশি
করি না ক্রন্দন :
নহি নির্ব্বিকার-চিত্ত, জ্ঞানী, ভক্ত ঋষি—
বিমুক্ত-বন্ধন।

আকাশের ছায়া যথা সমুদ্র-হিয়ার
রহে সদা পড়ি'—
তেমনি তাহার স্মৃতি বিবিধ মায়ায়
মনঃ প্রাণ ভরি'।

এ নয় কল্পনা, তর্ক, কবিত্ব-বিচার,
নিমেষের ভান,
হয়েছি উন্মত্ত কি না—দুঃখ-ধারণার
নহে পরিমাণ।

চক্ষে স্বপ্ন-কুহেলিকা, বক্ষে মরীচিকা
মৃত্যুর তিমিরে—
নিঃশব্দে তাহার প্রীতি—দীপহীন শিখা
ধুমাইছে ধীরে।

(৩) 'যে জীবা অনলদগ্ধা' পড়ে পুরোহিত,
কণ্ঠ শোকাকুল।
তাহারি তৃপ্তির তরে দিতেছি যতন-ভরে
তৈজস, তণ্ডুল, শয্যা, বস্ত্র, ফল, ফুল।

কি অদেয় তারে আজ! তেমনি হাসিয়া
সে কি লবে আর?
সমস্ত জগৎ দিলে যদি তার দেখা মিলে—
সমস্ত জীবন যদি চাহে আরবার!

পিতা নাই, মাতা নাই, পতি পুত্র নাই,
অতি অসহায়—
সকল বন্ধন ছিঁড়ে একাকিনী কোথা ফিরে'—
—অনলে অনিলে শূন্যে, কোথায়—কোথায়!

কোথায় ক্ষরিছে মধু, কোথা বিশ্বদেব,
কোথা প্রেতপুরী!
আমি আজ ধরাতলে, সভক্তি নয়ন-জলে
মাগিতেছি মুক্তি তার, দুই কর জুড়ি'।

(৪) এখনো কাঁপিছে তরু, মনে নাহি পড়ে ঠিক—
এসেছিল বসেছিল ডেকেছিল হেথা পিক!
এখনো কাঁপিছে নদ, ভাবিতেছে বারবার—
চলিয়া কি পড়েছিল মেঘখানি বুকে তার!

এ রুদ্ধ কুটীরে মোর এসেছিল কোন্ জনা?
এখনো আঁধারে যেন ভাসে তার রূপ-কণা।
মুরছিয়া পড়ে দেহ, আকুলিয়া উঠে মন,—
শয়নে তৈজসে বাসে কাঁপে তার পরশন!

এসেছিল কত সাধে, মনে যেন পড়ে-পড়ে,
পূরে নাই সাধ তার, ফিরে গেছে অনাদরে!
কাতর নয়নে চেয়ে—কোথা গেল নাহি জানি-
মরুর উপর দিয়া নব-নীল মেঘখানি!

(৫) শোকাচ্ছন্ন, পুরীপ্রান্তে শান্তির আশায়
ধীরে পাদচারে একা ভ্রমি সিন্ধুতীরে;
বিষণ্ণ সায়াহ্ন—দূর দিগন্তে মিশায়,
ধরণী মলিনমুখী তরল তিমিরে।

নীল—সুগভীর নীল—ফেনিল সাগর
তীরে রাখি ফেনরেখা সরে ধীরে ধীরে।
ভাবিতেছি, ইতি নেতি, জন্ম জন্মান্তর—
ধূসর দিগন্ত ধীরে মিলায় তিমিরে।

আমি কি তোমারি ক্রিয়া, হে অন্ধ প্রকৃতি!
মুহূর্ত্ত-বিকার-মাত্র—ওই উর্ম্মি প্রায়—
ল'য়ে ক্ষণ-সুখ-দুঃখ-ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ভীতি,
ফুটিয়াছি বিশ্বমাঝে অতি অসহায়!

বৃথা এই জন্মমৃত্যু, বৃথা এ জীবন!
অদৃষ্টের ক্রীড়নক, সৃজনের ক্রটি!
বিধাতার কোন ইচ্ছা করি সম্পূরণ
বাসনায় উচ্ছ্বসিয়া, নিরাশায় টুটি!

হে ধর্ম্ম! হে দারুব্রহ্ম! কেন কর্ম্মভূমে
জীবের অবোধগম্য মৃত্যু-পরিণাম?
লোক হ'তে লোকান্তরে কামনার ধূমে
ছুটিছে কি ক্ষুব্ধ আত্মা লুব্ধ অবিশ্রাম?

এ নিত্য অদৃষ্ট-যুদ্ধে—নিত্য পরাজয়ে
গড়িতেছি স্বর্গরাজ্য—ভবিষ্য-কল্পনা;
সে কি, নাথ, দেবশূন্য ভগ্ন দেবালয়ে
মুমূর্ষু প্রদীপ-শিখা—বিফল বেদনা?

উপরে যাহা উদ্ধৃত করিলাম তাহাই যথেষ্ট; 'এষা' কাব্যখানি অপেক্ষাকৃত সুপরিচিত—তথাপি আলোচনার সুবিধার জন্য আমি কয়েকটি স্থল সম্মুখে তুলিয়া রাখিলাম। কাব্য-রসিক মাত্রেই এই শ্লোকগুলির মধ্যে একটি বিশিষ্ট কাব্যগুণের পরিচয় পাইবেন। বাস্তব-অনুভূতি ও ভাবুকতা এই দুয়ের সংমিশ্রণে, এবং উপযুক্ত প্রকাশরীতির গুণে এই কাব্য বাংলা ভাষায় একটি সংযত ও শুচি-শ্রী-সম্পন্ন লিরিক-আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ইহার মূলে একটি উচ্চভাবাভিমানী, আত্মস্থ, সমাজ ও সংসারনিষ্ঠ কবি-চরিত্র বিদ্যমান। এই সকল লক্ষণ বিচার করিয়া এই ধরণের গীতিকাব্যকে যদি ক্লাসিক্যাল ভাবাপন্ন বলিতে হয়, তবে বুঝিতে হইবে, কাব্যের এইরূপ শ্রেণীবিভাগ নিতান্ত ভ্রমাত্মক—অন্ততঃ, তাহা দ্বারা কাব্যের যথার্থ জাতি-নির্ণয় হয় না। অথবা ইহাও বলা সঙ্গত হইবে যে, কাব্যের কোনও জাতিই নাই; রস-সৃষ্টির নানা বিচিত্র ভঙ্গি থাকিতে পারে, কিন্তু যেহেতু সে সকল ভঙ্গিই সার্থক

হইতে হইলে সেই এক রস-প্রমাণই তাহার একমাত্র প্রমাণ, এবং যেহেতু সকল উৎকৃষ্ট কাব্যের ভাবে ও ভঙ্গিতে এই দুই তথাকথিত প্রবৃত্তি এমন ভাবে মিলিয়া থাকে যে, সীমানির্দ্দেশ করা নিতান্তই বুদ্ধিবৃত্তির বাহাদুরী—অতএব, অক্ষয়কুমারের কবিতাকেও সেরূপ কোনও শ্রেণীভুক্ত করা চলিবে না। অতিচারী কল্পনা ও তদনুযায়ী ভাষাকে যদি রোমান্টিক বলা যায়, তথাপি যতক্ষণ তাহা প্রকাশ-সুষমার গাঢ় সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত না হয়, তাহাকে সু-কবিতাই বলা যাইবে না। কবি-কল্পনা বা কবি-মানসের স্বচ্ছন্দ স্বাধীন-গতি ব্যতিরেকে রস-সৃষ্টিই সম্ভব নয়, সকল উৎকৃষ্ট কাব্যেই কবি-মানসের সেই মুক্তির লক্ষণ আছে; কেহ ভাব-স্বাধীনতাকে প্রকাশ-সুষমায় সংযত করেন, কেহ-বা ভাব-সংযমকে—বা জাতি, যুগ ও সমাজ হইতে প্রাপ্ত, সুনিয়ন্ত্রিত ভাবরাজিকেই—রস-কল্পনায় উদার-গভীর করিয়া তোলেন। ইহাই কবিত্ব, ইহা ক্লাসিক্যালও নয়, রোমান্টিকও নয়। অক্ষয়কুমারের কাব্যে ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির যে সংযম, এবং ভাব-বস্তুতে চিরাগত সংস্কার ও প্রাচীন আদর্শের প্রতি যে নিষ্ঠার পরিচয় আছে, তাহার উপরেই উহার কবিত্ব নির্ভর করে না। সংস্কার ও আদর্শ যেমনই হোক, তাহার আশ্রয়ে ভাব-কল্পনা ও অনুভূতি যে দিব্যদীপ্তি অর্জ্জন করিয়াছে —এবং, প্রকাশরীতি যেমন হোক, সেই দীপ্তি-সঞ্চারের জন্য তাহাই যদি অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মনে হয়, তবেই তাহা উৎকৃষ্ট কাব্য হইয়া থাকে। এইরূপ কবিত্ব ছাড়া কাব্যের আর কোনও জাতি নাই। তথাপি, কবির কবিত্ব ও কাব্যের বৈশিষ্ট্য-আলোচনা নিরর্থক নয়, বরং রসিকের পক্ষে তাহা রসাস্বাদন-চাতুরী হিসাবে বড়ই আদরণীয়। রস একটি নির্ব্বিশেষ উপলব্ধি বটে, এবং রচনার কোন্ গুণ যে কবিত্ব তাহা নির্ণয় করা দুরূহ বটে; তথাপি সেই এক রসের নানা বিচিত্র রূপসৃষ্টি হইতেই নির্ব্বিশেষের উপলব্ধি আরও নিঃসংশয় হইয়া উঠে—ইহাই রসের আর এক রহস্য। অক্ষয়কুমারের কবিতাও এমন বস্তু যে, তাহার রসগ্রহণে রসিক-জনের হৃদয়-সংবেদনা ভিন্ন অন্য কোনও টীকাভাষ্যের প্রয়োজন হয় না। তথাপি এই কাব্যের প্রবৃত্তি ও প্রেরণায় এমন একটি লক্ষণ আছে যে, তাহার বিচারে কবি-মানসের বৈশিষ্ট্য-আলোচনার যথেষ্ট অবকাশ আছে। এ প্রবন্ধে আমি প্রধানতঃ তাহাই করিয়াছি—কবির কবিত্ব বুঝাইবার জন্য কেবলমাত্র কয়েকটি কবিতাংশ উদ্ধৃত করিয়াছি। এক্ষণে যে কথাটি সর্ব্বশেষের জন্য রাখিয়াছি তাহাই একটু বিশদভাবে বিবৃত করিয়া এ আলোচনা শেষ করিব।

অক্ষয়কুমারের ভাব ও অক্ষয়কুমারের ভাষা এই দুইএর মধ্যে একটা বিরোধ আছে বলিয়া মনে হয়। কবির ভাষাই কবির নিজস্ব—তাহাই স্বপ্রকৃতির প্রতিবিম্ব; ভাব-বীজ বা ভাবের প্রভাব বাহির হইতেও আসে। অক্ষয়কুমারের কাব্য আমি যে দিক দিয়া আলোচনা করিয়াছি তাঁহার কবিজীবনের পূর্ব্বভাগে যে প্রবৃত্তি প্রবল ছিল, ও পরিশেষে তাহার যে পরিবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনের উল্লেখ করিয়াছি—প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সেই সমগ্র কবি-কাহিনী মনে রাখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, অক্ষয়কুমারের কবি-প্রকৃতি বা ধাতুগত

কাব্য-সংস্কার ছিল খাঁটি বাঙ্গালীর। উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী কাব্যের অত্যুগ্র egoistic কল্পনা তাঁহার সেই বাঙ্গালী-সংস্কার অভিভূত করিয়াছিল, কিন্তু গ্রাস করিতে পারে নাই—পারিলে দ্বন্দ্ব থাকিত না। এই দ্বন্দ্ব তাঁহার ভাষাতেও সুপরিস্ফুট—ভাব বিদ্রোহাত্মক, ভাষা অতিশয় সংযত ও নিয়মনিষ্ঠ; তাঁহার আত্মাভিমান বা স্বাতন্ত্র্যাভিলাষ যতই প্রবল হোক, নৈরাশ্য ও সংশয় যতই তীব্র হোক, তিনি স্বপ্রকৃতির শাসন অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই। তাই একদিকে যেমন ভাব ভাবুকতার পীড়নে গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে, তেমনই ভাষাও স্বৈরাচার সম্বন্ধে অতিশয় সতর্ক ও সজাগ। স্বল্পাক্ষর ও সুসংস্কৃত শব্দযোজনা, এবং হিন্দুর পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য ও দর্শন হইতে ভাব ও ভাষার নানা মণ্ডন-উপকরণ চয়ন করিবার প্রবৃত্তি এই কারণেই ঘটিয়াছে। এই দ্বন্দ্ব তাঁহার কবিজীবনের প্রথম ভাগে—'ভুল' হইতে 'শঙ্খে'র পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার কবিশক্তিকে কথঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ করিয়াছে—অতিরিক্ত সংযমের ফলে ভাষার একপ্রকার রুক্ষতা ঘটিয়াছে, ছন্দের গতি ও কল্পনার রসাবেশ মন্দীভূত হইয়াছে। প্রাণ বাঁধা রহিয়াছে বাঙ্গালী-জীবনের নিবিড়তম অনুভূতির রসাস্বাদন-সুখে, কিন্তু মন ছুটিয়াছে অতি ঊর্দ্ধগ ভাবুকতার বারিহীন মরু-মরীচিকার পশ্চাতে। প্রাণ যাহা চায় মন তাহা চায় না; তৃপ্তিই নরক, অতৃপ্তি অর্থাৎ বাস্তবে ও স্বপনে যে দ্বন্দ্ব, তাহা তাঁহার কবিতার 'চিরানন্দ, সশঙ্ক দুরাশা'। তৃপ্তির মধ্যেও তিনি অতৃপ্তির উপাসক, কিন্তু প্রাণের গভীরতর চেতনায় তৃপ্তিই তাঁহার প্রকৃতি-সুলভ। তিনি শেলীর মত 'অমূরতি কামনার সমূরতি অধিষ্ঠান' কামনা করেন, কিন্তু তাঁহার কামনা আদৌ অমূরতি নহে—সারাজীবন তাহা সশরীরে তাঁহার অতি নিকটে অবস্থান করিয়াছে; তিনি তাহাকে একটি অমূরতি মহিমায় মণ্ডিত করিয়া নিজের ভাবাভিমান তৃপ্ত করিতে চাহিয়াছেন। তাই তাঁহার কবিজীবনের প্রথম ভাগে কাব্যে তাঁহার স্বপ্রকৃতির পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয় নাই; তাঁহার ভাষায় যে প্রকৃতির পরিচয় পাই, ভাব তাহার বিরোধী—ইহারই ফলে, আমার মনে হয়, 'প্রদীপ' ও 'কনকাঞ্জলি'র কবিতাগুলিতে ভাবের রূপসৃষ্টি তেমন সার্থক হয় নাই।

এইবার 'শঙ্খ' ও 'এষা'র কাব্য-জগতে প্রবেশ করিলে অক্ষয়কুমারের কবিপ্রকৃতির মূল মর্ম্ম ধরা পড়িবে; যাহা এতকাল প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা এইবার প্রকট হইয়াছে। আর আত্মদ্রোহ নাই, তাই এমন পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশ—ভাব ও ভাষার এমন প্রৌঢ়-পরিণত রূপ সম্ভব হইয়াছে; সমস্ত মেঘান্ধকার ও কুহেলিকাজাল অপসারিত করিয়া শরৎ-প্রসন্ন আকাশের মত কবির নিজস্ব প্রতিভা দীপ্তি পাইতেছে। কাব্যে আর অভিমান নাই, আছে পরিপূর্ণ আত্ম-নিবেদন। এখানে কবি নিজপ্রাণের সত্যকে—তাঁহার স্বধর্ম্মকে স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার জীবন বাঙ্গালী-জীবনের মতই গণ্ডিবদ্ধ; ক্ষুদ্র ভূমিটুকুর মধ্যেই সহজ প্রেম ও প্রীতি-মুগ্ধ প্রাণ সুগভীর অমৃত-উৎসের সন্ধান পাইয়াছে—বিন্দুতে যেমন সিন্ধুর আভাস আছে তেমনই বাঙ্গালীর এই গার্হস্থ্য-জীবনের মধ্যেই আধ্যাত্মিক রস-পিপাসার অতলস্পর্শ ভাবসাগর তরঙ্গায়িত হইতেছে। এবার কবি দম্পতী-প্রেমের যে দেবী-মূর্ত্তি গড়িয়াছেন, যে-মন্ত্রে

তাহার আবাহন ও বিসর্জ্জন সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালী-কবির কাব্য ভিন্ন অন্যত্র দুর্লভ। এক অর্থে তাহা যেমন বিশ্বজনীন নহে, আর এক অর্থে তাহা বিশ্বসাহিত্যেরই এক বিচিত্র সম্পদ—বিশ্বমানবতার নির্ব্বিশেষ বর্ণহীনতা তাহার লক্ষণ নয় বলিয়াই রসহিসাবে তাহা মহার্ঘ। বাঙ্গালী-প্রাণের—বাঙ্গালী-জীবনের—রস, রং ও রূপের সর্ব্বস্ব নিংড়াইয়া—যাহা কোনও এক জাতি বা সমাজের ভাবানুভূতির বাস্তব উপকরণ তাহাই বিশেষরূপে অবলম্বন করিয়া—এই যে কাব্যসৃষ্টি, বাংলা সাহিত্যে ইহার একটু পৃথক মূল্য আছে। আমার মনে হয়, আধুনিক কাব্যসাহিত্যে খাঁটি বাঙ্গালী-কল্পনার ইহাই শেষ নিদর্শন। একথা সত্য, সে-সমাজ আর নাই, সে সকল আদর্শও আজ লুপ্ত-প্রায়, তথাপি ভাবীযুগের বাঙ্গালী যদি বাঙ্গালীত্ব না হারায়, অর্থাৎ জাতিহিসাবে মরিয়া না যায়, তবে তাহার মর্ম্মের কোনও নিগূঢ় স্থানে বাঙ্গালীজাতিসুলভ বিশিষ্ট চেতনা কি স্পন্দিত হইবে না? অক্ষয়কুমারের 'এষা'র কবিপ্রাণের যে আকুতি, যে আনন্দ ও আশ্বাস, যে ক্ষুধা ও প্রেমের আদর্শ ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা আজিকার জাতি-ভ্রষ্ট বাঙ্গালীকে মুগ্ধ করিতে না পারে, কিন্তু তাহার ভাব-সত্য অক্ষয় ও অমর; সেদিনও যাহা বাস্তব ছিল যুগান্তরে তাহাই অবাস্তব-মনোহর কবিস্বপ্নরূপে রসিক-চিত্ত স্পর্শ করিবে; কারণ, দেহের জগতে যাহা নশ্বর ভাবের জগতে তাহা চিরস্থায়ী।

এই গ্রন্থে এ যুগের বাঙ্গালী কবিগণের সম্বন্ধে একটি কথা আমাকে বার বার উল্লেখ করিতে হইয়াছে তাহা এই,—নব্য বাংলাকাব্যে কবিকল্পনা নারীর নারীত্ব-মহিমায় বিশেষরূপে মুগ্ধ হইয়াছে; মাইকেল, বিহারীলাল, সুরেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ, এমন কি কল্পনা-বিশ্বের অধীশ্বর রবীন্দ্রনাথও নারী-বন্দনায় পঞ্চমুখ। ইহার কারণ কি? অক্ষয়কুমারের কাব্যে এই নারী-স্তুতির যে প্রেরণা লক্ষ্য করা যায় তাহাতে এই প্রশ্নের মীমাংসা আরও সহজ হইয়া যায়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, অক্ষয়কুমার তাঁহার কবিজীবনের পূর্ব্বভাগে, অভৌম কল্পনার অতি ঊর্দ্ধ ভাবলোকে বিচরণ করিতে চাহিলেও—চির-দুর্লভ ও চির-সুদূর মানসী-নারীর বিরহ-ব্যথায় অধীর হইয়া চির-অতৃপ্তির গান গাহিয়া ধন্য হইতে চাহিলেও—তিনি গৃহগত-প্রাণ বাঙ্গালী। সমগ্র 'এষা' কাব্যখানি কবির confession বা আত্মচরিত-উদ্‌ঘাটন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বাঙ্গালী-কবির দাম্পত্য-প্রীতি নারীর একটি মহিমময়ী মূর্ত্তি না গড়িয়া পারে না; মধুসূদন যাহাতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, বিহারীলাল যাহাকে আপন ইষ্টদেবতার আসনে বসাইয়া-ছিলেন, সুরেন্দ্রনাথ যাহাকে সংসারে ও সমাজে তাহার ন্যায়সঙ্গত অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, এবং দেবেন্দ্রনাথ ভাব-ভোলা কবিত্বের আবির-কুঙ্কুমে যাহার অর্চ্চনা করিয়াছেন, অক্ষয়কুমার তাহাকেই বাঙ্গালীর গৃহ-প্রাঙ্গণে—নিত্য-লক্ষ্মীপূজার উৎসবে—বাস্তব সুখ-দুঃখের গন্ধপুষ্প ও সুগভীর স্নেহরসের আলিপনায়, হৃদয়েশ্বরীরূপে বন্দনা করিয়াছেন। এ নারী কোনও কবিপ্রিয়া বা কাব্যের আদর্শরূপা নহে, ধ্যান-কল্পনার ভাব-বিগ্রহও নহে। নারীর যে একটি বিশেষ রূপ, শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয়বিধ সাধনার সাধক, প্রকৃত পৌত্তলিক, দেহবাদী বাঙ্গালীর গৃহধর্ম্ম-সাধনায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল—যে-রূপ একাধারে রাধিকা ও অপর্ণা, আত্মবিগলিত

অথচ আত্মস্থ—গ্রহণে দুর্ব্বল, ত্যাগে রাজরাজেশ্বরী—যে রূপ যুগল-প্রেমের রসাবেশেও দাস্য, সখ্য বাৎসল্যের এক অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে ভাবুকের প্রাণে ভাবের ঘোর সৃষ্টি করে—অক্ষয়-কুমার জীবনে সেই রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া সেই নারী-বিগ্রহের আরতি করিয়াছেন। এ নারী দান্তের 'বিয়াত্রিচে' বা পেত্রার্কার 'লরা' নয়, কারণ, এ নারী—'মায়াবদ্ধা, মায়াময়ী, সংসারবিহ্বলা'—

"তোমারি প্রণয় স্নেহ বাঁধিল কৈলাস-গেহ,
পাগলে করিল গৃহী, ভূতে মহেশ্বর।"

ধর্ম্মে-কর্ম্মে, দৈনন্দিন আচার-অনুষ্ঠানে, বাঙ্গালী হিন্দুর জীবনের যত কিছু সংস্কার—সে সকলের মধ্যে, এই প্রাণগত, দেহগত, প্রীতি শতবন্ধনে আপনাকে দৃঢ় ও পুষ্ট করিয়াছে। প্রিয়ার মৃত্যুতে গৃহাভ্যন্তরের তৈজসপত্রও যেমন—

"শয়নে তৈজসে বাসে কাঁপে তার পরশন"

তেমনই, গৃহ-প্রাঙ্গণের তুলসীমঞ্চও যেন তাহারই চিতাভস্মে প্রোথিত রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। শারদীয়া অষ্টমী-পূজার শুভ সন্ধিক্ষণে দেবীকে সম্বোধন করিয়া কবি বলিতেছেন—

মুহূর্ত্তেক স্তম্ভিত ভুবন
বসি' যেন যোগাসনে, অর্দ্ধনিদ্রা-জাগরণে
হেরিছে তোমার পদার্পণ।
অর্দ্ধশশী অষ্টমীর চিত্রে যেন আছে স্থির
দিক্‌ প্রান্তে ছড়ায়ে কিরণ।
কি সম্ভ্রমে কি আতঙ্কে, নত-জানু ভূমি-অঙ্কে,
শিহরে সঘনে প্রাণ-মন!
সে যেন গভীর শ্বাসে, ছায়াসম বসি' পাশে,
ম্লানমুখ উপবাসে—
গল-বস্ত্রে আমা সনে যাচে শ্রীচরণ!

'এষা'র একটি কবিতায় শোকার্ত্ত কবির মুখে নারী-গেহিনীর যে পরিচয় পাই, তাহা কি কোনও শাস্ত্রসম্মত আদর্শ-সতী-চরিত্রের বর্ণনা—না, পুণ্যবান বাঙ্গালীমাত্রেরই এ এক অতি-পরিচিত মূর্ত্তি? বলিতে সাহস হয় না, এই নারী-প্রগতির দিনে এরূপ সেন্টিমেণ্ট ভদ্রজনোচিত নহে—নারীর দেবীত্ব-মহিমা কীর্ত্তন করাও আজিকার দিনে স্বার্থপর কাপুরুষতা; আমি কাব্যসমালোচনা ব্যপদেশে শাস্ত্রোপদেষ্টা হইতে চাহি না। বাঙ্গালীজীবনেরই সহজ ও আন্তরিক হৃদয়-সংবেদনা এখানে যে রসসৃষ্টি করিয়াছে, অক্ষয়কুমারের কবিতায় যে মর্ম্মান্তিক বাস্তবতা আছে, তাহারই কথা বলিতেছি; এবং ইহাই বলিতেছি যে, এ কাহিনী যে সত্য, ইহাতে যে কোনও আদর্শ-প্রতিষ্ঠার প্রয়াস নাই, এমন কি, রসাত্মক বাক্যরচনাই ইহার মুখ্য অভিপ্রায় নয়—তাহা বিশ্বাস করিতে হইলে পাঠককে খাঁটি বাঙ্গালী হইতে হয়;

সেই সঙ্গে নিজে পুণ্যবান হইলে আরও ভাল হয়। ব্যক্তিগত ভাবে যদি সে সৌভাগ্য কাহারও না-ও ঘটে, তথাপি দূর হইতে দেখিয়া বিশ্বাস করিবার প্রবৃত্তিও অল্প ভাগ্য নহে। ইংরেজ কবি গাহিয়াছেন, 'It is better to have loved and lost than never to have loved at all'—আমি বলি, নিজে না পাইলেও বিশ্বাস করিতে পারাও একরূপ পাওয়া। কাব্যে যাহা পাই তাহাও সেইরূপ পাওয়া ; যাহার 'বাসনা'ও নাই—আলঙ্কারিক তাহাকেই হতভাগ্য বেরসিক বলিয়াছেন। কবি যে পাইয়াছিলেন—নিয়োদ্ধৃত শ্লোকগুলিতে তাহার নিঃসংশয় প্রমাণ রহিয়াছে, না পাইলে কবিতার প্রতি অক্ষর ভাব-অর্থে এমন সরল অথচ এমন গাঢ় হইতে পারিত না।—

জীবনে সে পায় নাই সুখ,
দুখে কভু ভাবে নাই দুখ,
রোগে শোকে হয়নি চঞ্চল ;
সরল অন্তরে হাসিমুখে
সকলি সহিয়াছিল বুকে—
কাঁদিলে যে হবে অমঙ্গল !

* *

সুখে দুখে ছিল চির-সাথী,
জগৎ-জুড়ানো জ্যোৎস্না-রাতি !
জীবনের জীবন্ত স্বপন !
আপনারে হারায়ে হারায়ে
গিয়াছিল আমাতে জড়ায়ে
প্রতিদিন-অভ্যাস মতন !
পড়ে' আছে নয়নে নয়ন—
অসঙ্কোচে করি আলাপন,
দেহে দেহ, নাহিক লালসা ;
হৃদে হৃদি, প্রাণে প্রাণ হেন—
অতি স্বচ্ছ প্রতিবিম্ব যেন !
এক আশা ভাবনা ভরসা !

* *

ঘর-দ্বার জগৎ সংসার,
সকলি—সকলি ছিল তার,
আমি নিত্য অতিথি নূতন
দিলে পাই, নিলে তুষ্ট হই,
গৃহপানে কভু চেয়ে রই—
অনায়াস দিবস কেমন !

—এ চিত্র অতিশয় বাস্তব। তথাপি দাম্পত্যের এই রূপ অন্যত্র এত সুলভ নয়, তাই বাঙ্গালী-কবির নারীপূজা অর্থহীন নহে। নারীকে idealise করা—'অর্দ্ধেক মানবী তুমি, অর্দ্ধেক কল্পনা'—অথবা, আদিরসের নানা গাঢ় ও তরল বর্ণে রঞ্জিত করাও নয়, আমি সত্যকার পূজার কথা বলিতেছি, যেমন পূজা হিন্দুরা করিয়া থাকে—মৃন্ময়ীকে চিন্ময়ীরূপে, অতিশয় অন্তরঙ্গ আত্মীয়তার সম্পর্কেই মানুষকে দেবতা, ও দেবতাকে মানুষরূপে দেখে। আমার মনে হয়, ইহা হিন্দুর হইলেও—বিশেষভাবে বাঙ্গালীরই ধর্ম্ম।

দিয়া তব রূপ-গুণ না হয় মরণে—
বাঁচিলে না কেন আর দু'দিন জীবনে।

—এই বলিয়া কবি যাহার জন্য দুঃখ করিতেছেন তাহাকেই আবার 'সর্ব্বার্থসাধিকে শিবে গৌরী নারায়ণী' বলিয়া আবাহন করিয়াছেন।

'এষা'-কাব্যের এই যে দাম্পত্য-প্রেম ও নারী-পূজা—ইহার সবিস্তার উল্লেখের প্রয়োজন ছিল। অক্ষয়কুমারের কবিত্ব ও তাঁহার কাব্যের আদর্শ আসলে কি—তাঁহার কবিচিত্তের যথার্থ ও পূর্ণতম স্ফুরণ প্রথমে, না শেষে—ইহাই স্পষ্ট করিবার জন্য আমি এই বিস্তৃত আলোচনা করিলাম। আমরা দেখিলাম, বাংলা কাব্যে বাঙ্গালী-প্রাণের একটি সত্যকার আকুতি—বাঙ্গালীর চিত্ত-অন্তঃপুরের তুলসী-মঞ্চটি—অক্ষয়কুমারের কাব্যে যে ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ঠিক সেই ভঙ্গি সেই সুর পূর্ব্বে বা পরে আর কোথায়ও এমন তীব্র ও তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে নাই। ইংরেজী গীতি-কবিগণের কল্পনা তাঁহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছিল, তাঁহার কবিপ্রাণ তাহাতে সাড়া দিয়াছিল—হয় ত তাহাতেই তাহার জাগরণ ঘটিয়াছিল; কিন্তু ভাবুকতার তুঙ্গ শিখরে তিনি যাহার সন্ধান করিয়াছিলেন—সে ছিল পর্ব্বত-পাদদেশে সমতল বাস্তভূমির অতি সন্নিকটে—'The shepherd in Virgil grew at last acquainted with Love, and found him a native of the rocks'; তাহা না হইলে আমরা বাংলাকাব্যের একটি বিশিষ্ট রস হইতে বঞ্চিত হইতাম।

ভাষাহিসাবে যাহাকে ক্লাসিক্যাল বলা যায়, অক্ষয়কুমারের কাব্যের আদ্যন্ত তাহাই; যে ধরণের রসপ্রবণতা ইহার কারণ তাহা কবির জন্মগত, সহজাত। তিনি শেলী বা বিহারীলালের সগোত্র নহেন—ধ্যান-কল্পনার অত্যুচ্চ শিখর অথবা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের নির্জ্জন-বাস তাঁহার পক্ষে স্বাস্থ্যকর নহে। যে সচেতন আত্মদ্রোহ বা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অভিমান আমরা তাঁহার কাব্যসাধনায় লক্ষ্য করি, ভাষায় তাহার চিহ্নমাত্র নাই। বিহারীলালের ভাষাও খাঁটি বাংলা; তথাপি তাহাতে স্বাতন্ত্র্যের ছাপ সুস্পষ্ট—প্রচলিত রীতিকে লঙ্ঘন করার দুঃসাহস তাহাতে আছে। ভাষার বিষয়ে অক্ষয়কুমার অতিশয় রক্ষণশীল—পবিত্র দেব-বিগ্রহের মত তিনি তাহার প্রসাধন পরিমার্জ্জন করিয়াছেন, কিন্তু তাহাকে খেলার সামগ্রী করেন নাই; বরং এমন বলা যাইতে পারে যে, তিনি ভাষার ধাতু অবিকৃত রাখিয়াই তাহাকে পিটাইয়া, যেমন দৃঢ় তেমনই মসৃণ করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার মনের মধ্যে খাঁটি বাংলার

একটি আদর্শ-রূপ ছিল; ভাব-সংহতি ও অর্থগৌরব এই দুয়েরই প্রতি দৃষ্টি থাকায় গীতিকাব্য-রচনাতেও তাঁহার ভাষা অতিশয় লঘু বা তরল হইতে পারে নাই। ভাষায় এই অতিরিক্ত সংযমের মূলে যে নিষ্ঠা আছে তাহা আজিকার দিনে ভাবিয়া দেখিবার যোগ্য। মধুসূদন, হেম, নবীন, সুরেন্দ্রনাথ, বিহারীলাল, দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সে-যুগের কবিগণের ভাষা যে অর্থে খাঁটি বাংলা, অক্ষয়কুমারও সেই খাঁটি বাংলাভাষার সেবক, এবং সেই ভাষাকেই স্বকীয় আদর্শে তিনি একটি গাঢ়-বন্ধ শক্তি-শ্রী দান করিয়াছেন। মধুসূদন হইতে অক্ষয়কুমার পর্য্যন্ত বাংলা কাব্যের ভাষা খাঁটি বাংলা বটে; বাণী-প্রতিভা সকলের সমান নহে, এবং এই সকল কবির রচনায় ভাষা-শিল্পের চরমোৎকর্ষ অবশ্যই ঘটে নাই—বরং তাহার অচির-সম্ভাবনাই সূচিত হইয়াছিল। কিন্তু সহসা ভাষার সেই প্রাণ-সূত্র ছিন্ন হইয়া গেল, বিশ্বভারতীর জন্য বঙ্গভারতীকে পথ ছাড়িতে হইল। কারণ, অনতিকাল মধ্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উৎকট লীলা—প্রবল ও দুর্ব্বল, উভয়বিধ আত্মবিলাসের যথেচ্ছাচার—ভাষাকে জাতিভ্রষ্ট করিয়া তুলিল; তাহার ফলে সাহিত্যে বাঙ্গালীরই প্রাণের রূপ আর কাব্য-শ্রী লাভ করিতে পারিতেছে না। ইংরেজীতে যাহাকে decadence বলে, আমাদের সে যুগও কাটিয়া গিয়াছে, এখন একেবারে পচন-অবস্থা। বাংলাভাষা আর বাংলা নাই, থাকিবার প্রয়োজনও বোধ হয় নাই। ভাষার উপরে, অতিশয় শক্তিমান কবির যে-টুকু ও যে-ধরণের প্রভুত্ব—মাত্র কাব্যকলার পক্ষে—বাঞ্ছনীয় মনে হইতে পারে, তাহাই যদি জাতীয় বা সার্ব্বজনীন সাহিত্যিক ভাষার আদর্শ হইয়া দাঁড়ায় তবে তাহার ফল বিষময় হইবেই। আজ বাংলা সাহিত্যের ভাষা লইয়া সাম্প্রদায়িক বিবাদ বাধিয়াছে, প্রাদেশিকতার অভিমানও প্রকট হইয়া উঠিতেছে—ইহার কারণ কি? ভাষার তন্ত্রী প্রাণের তন্ত্রীর মত—তাহাই ছিঁড়িয়াছে। খাস ইংরেজী বুলি পর্য্যন্ত যদি বাংলা কবিতায় চলিতে পারে, তবে আর্‌বী ফার্‌সী কি দোষ করিয়াছে? অতি-আধুনিক সাহিত্যের ভাষায় যে উচ্ছৃঙ্খলতা উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে তাহার এক কারণ—বাংলাভাষার বাংলা-রীতি বহুপূর্ব্ব হইতেই বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া যে অনন্যসাধারণ প্রতিভায় বাংলা-সাহিত্য আবৃত ও আচ্ছন্ন হইয়া আছে, সেই প্রতিভা যেমন স্বাতন্ত্র্যকামী, তেমনি লীলাময়; সর্ব্ববিধ বন্ধনের মত ভাষার বন্ধনও ইহার পক্ষে পীড়াদায়ক। বস্তুর উপরে ভাব, এবং জীবনের উপরে আর্টের মত—বাক্যের উপরে ছন্দ ও সুরের প্রতিষ্ঠা করিয়া, এই প্রতিভা সর্ব্বত্র জাতির উপরে ব্যক্তির প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে। এদিকে শিক্ষিত বাঙ্গালী-সমাজে জাতীয় সংহতি-বোধ আর নাই, সমাজের উপরে ব্যক্তিমাত্রেরই প্রাধান্য একটা সর্ব্ববাদিসম্মত নীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাহিত্যে এই নীতি পূর্ব্বেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, তাই এক্ষণে সেই ব্যক্তি-প্রাধান্যের অজুহাতে—প্রতিভা থাক্ বা নাই থাক্—একপ্রকার লেখনীলাম্পট্য সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছে। চরিত্রহীনের লেখনী ভাষার শাসনে সংযত হয়—জাতির ধর্ম্ম ব্যক্তির অধর্ম্মকে রোধ করে। কারণ, ভাষার অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তি বহুকালব্যাপী ও বহু-বিচিত্র প্রাণপ্রবাহের তটতরঙ্গরেখার মত; তাহার

পদ্ধতি যেমন সুচিহ্নিত, তেমনই বহু-ভঙ্গিম। সত্যকার স্বাধীনতার যে বন্ধনের প্রয়োজন, তাহাও যেমন ইহাতে আছে, তেমনই, ব্যক্তি-মানসের অসংখ্য নব-নব pattern বা ছাঁচ ইহার মধ্যে নিহিত আছে—প্রতিভাবান পুরুষ সহজেই তাহা আবিষ্কার করিয়া লয়। কিন্তু এ বন্ধন যে মানে না, সে যত বড় আর্টিষ্ট হোক্‌, তাহার সেই 'হীরা-মুক্তা-মাণিকের ঘটা শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা'র মত লুপ্ত হইয়া যায়। যাহা পাথরে খোদাই না করিয়া বেলা-বালুকায় অঙ্কিত করা হয়, তাহা যতই নয়নমনোহর হউক—কখনও 'monumental' হইতে পারে না, ব্যক্তির স্বার্থপর আত্ম-বিলাস জাতির স্মৃতিফলকরূপ সাহিত্যে কখনও দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

অক্ষয়কুমার বা দেবেন্দ্রনাথ কেহই খুব বড় প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না। তথাপি তাঁহাদের ভাষায় বাংলা কাব্যরীতির যেটুকু উৎকর্ষের আভাস আছে—একজনের সংযম ও আর একজনের অসংযম, খাঁটি বাংলার যে বিভিন্ন কাব্য-ভঙ্গি ফুটাইয়াছে—তাহাতে মনে হয়, মাইকেল, হেম, নবীন, বিহারীলাল প্রভৃতির যে ভাষা—যে-ভাষার মধ্যে, ভারতচন্দ্র হইতে ঈশ্বরগুপ্ত পর্য্যন্ত সকল কবির বুলি নূতন করিয়া প্রাণ পাইয়াছে—সেই ভাষাই স্বকীয় পরিণতি-ক্রমে এতদিনে অনবদ্য বাণী-সুষমা লাভ করিতে পারিত, বাঙ্গালীর প্রাণ-মনের বিশিষ্ট সংস্কৃতি এত দ্রুত লোপ পাইত না।

শ্রাবণ, ১৩৪৩

শরৎচন্দ্র

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে একটা কথা আমাদের মধ্যে এখনও অনেকের মনে হয়,—বাংলা কথা-সাহিত্যে তাঁহার আবির্ভাবটা যেন একটু আকস্মিক। এক বিষয়ে যে আকস্মিক তাহাতে সন্দেহ নাই, সে বিষয়ে তিনি অনন্যসাধারণ। একান্ত নিভৃত-নির্জ্জনে তাঁহার সাধনা শেষ করিয়া তিনি একেবারে তাঁহার পূর্ণসিদ্ধির ফলটি আমাদের হাতে তুলিয়া দিলেন। সে যে কত বড় বিস্ময় তাহা, যাঁহারা সেদিনের লোক, তাঁহারা আজও স্মরণ করিবেন। কিন্তু আর একটা বিস্ময়ের কারণ আজও বিদ্যমান। এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, তাঁহার উপন্যাসগুলিতে যে-দিক্‌টি যেমন করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে ভাব ও চিন্তার যে বৈশিষ্ট্য আছে—বাঙ্গালীর পক্ষে যে কঠোর আত্ম-জিজ্ঞাসার তাগিদ আছে, তাহাতে আমাদের হৃদয় যেমন উন্মুখ হইয়া উঠে, মন তেমনি সঙ্কুচিত হয়; আমাদের চিরদিনের সংস্কারে আঘাত লাগে, নিরুদ্বেগ আত্মপ্রসাদের হানি হয়। যাঁহারা রসিক, তাঁহারা ইহাতে বিচলিত হন না, তাঁহারা সেটুকু পরম আগ্রহে, দ্বিধাশূন্যমনে উপভোগ করেন, বাস্তবের দিকটা অনায়াসে অতিক্রম করিয়া যান। কিন্তু যাঁহাদের সংস্কার প্রবল হইয়া রহিয়াছে, সেই সংসার-প্রবীণ জনমণ্ডলী শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলি পড়িয়া যতটা অভিভূত হন, ঠিক ততটাই লেখকের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করেন। বাংলা কথা-সাহিত্যে এতদিন যে-ধরণের ভাব-কল্পনা ও আদর্শের চর্চ্চা হইয়া আসিতেছিল, এ যেন তাহার বিপরীত। এই বিপ্লবের কি প্রয়োজন ছিল? জীবনের বাস্তব দিকটা লইয়া এমন নাড়াচাড়া করিবার—তাহাকে আবার এমন রসোজ্জ্বল করিয়া তুলিবার এই দুর্ম্মতি কেন? শরৎচন্দ্রের প্রতিভার এই মৌলিক প্রবৃত্তি এখনও সন্দেহ ও সংশয়ের হেতু হইয়া রহিয়াছে। আমাদের জীবনের জীর্ণভিত্তির তলদেশে, অন্ধকার গহ্বরে, যে সকল প্রেতমূর্ত্তি পিপাসার্ত্ত হইয়া একবিন্দু জল প্রার্থনা করিতেছিল, শরৎচন্দ্র তাহাদের সেই রুদ্ধ আর্ত্তনাদ আমাদের কর্ণগোচর করিয়া দিয়াছেন; আমরা ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না, তাই একটা বিভীষিকার সৃষ্টি হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পর রবীন্দ্রনাথকে আমরা এখন কতকটা বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত পরেই শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব যেন একটু অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত—আমাদের সাহিত্যের ধারাটি যেন একটা ভিন্নমুখে প্রবাহিত হইতে চলিয়াছে। এই আপাত-বৈষম্যের মূলে কোনও সত্য আছে কি না, আমাদের সাহিত্যের ভাবধারার ক্রমবিকাশে শরৎচন্দ্রের অভ্যুদয় স্বাভাবিক কিনা, তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

বঙ্কিমের আমল হইতে আজ পর্য্যন্ত আমাদের কথা-সাহিত্য ভাবপ্রধান; অর্থাৎ কল্পনা ও ব্যক্তিগত ভাবদৃষ্টির প্রসারই যেন এ সাহিত্যে বেশী। বঙ্কিমচন্দ্র খাঁটি আদর্শবাদী,

তাঁহার উপন্যাসগুলিতে অতি সাধারণ জীবন-যাত্রার উপরেও একটি অবাস্তব-রমণীয় কল্পনার ছায়াপাত হইয়াছে। কতগুলি চরিত্র, ঘটনা ও অবস্থান (situation)-কে সেই কল্পনার উপযোগী করিয়া তার মধ্যে লেখক নিজের মনোমত আদর্শে সাহিত্যিক রসপিপাসা চরিতার্থ করিয়াছেন। এজন্য তাঁহার উপন্যাসের প্লট-রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় আছে। বঙ্কিমের উপন্যাসগুলি ঠিক নভেল নয়—গদ্য রোমান্স, ভাষা, ভাব ও কল্পনার ঐশ্বর্য্যে পাঠককে স্বপ্নাতুর করিয়া তুলে। তাঁহার উপন্যাসগুলি পড়িবার সময়ে মনের রাশ একটু আলগা করিয়া রাখিতে হয়; কেবলমাত্র সেই রস উপভোগ করার জন্যই যদি সেগুলি পড়া যায় তবে তার ভিতরকার সেই গভীর সৌন্দর্য্যদৃষ্টি, Passion ও emotion-এর দ্বন্দ্ব এবং একটি অপ্রাকৃত কল্পনার মোহে মুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না। বঙ্কিমের এই idealism বাঙ্গালীর মনোহরণ করিয়াছিল; শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটক ও স্কটের রোমান্স পড়িয়া এককালে বাঙ্গালীর প্রাণে যে রসের ক্ষুধা জাগিয়াছিল তাহা বঙ্কিম কতকটা তৃপ্ত করিয়াছিলেন। সেকালের কাব্য-গুলিতে এমন খাঁটি সাহিত্য-রস ছিল না—কাব্য, নাটক ও উপন্যাস, এই ত্রিবিধ সাহিত্যের রস ঐ একজনই একপাত্রে পরিবেশন করিয়াছিলেন।

এই ধরণের রুচি ও রস পুরাতন হইয়া না আসিতেই—বরং, যখন পূর্ণ মাত্রায় বঙ্কিমের যুগই চলিয়াছে—সেই সময়ে আসিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁহার রচনায় প্রথম হইতেই ভাবকল্পনার একটা নূতন অভিব্যক্তি দেখা গেল। এখানে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলির উল্লেখ না করিয়া, বাংলা কথাসাহিত্যে যেগুলি তাঁহার প্রতিভার সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও মৌলিক সৃষ্টি, সেই 'গল্পগুচ্ছে'র কথা মনে রাখিলেই হইবে। বঙ্কিমের ভাবুকতা যে বাস্তবকে পাশ কাটাইয়া রসের সন্ধান করিতেছিল, রবীন্দ্রনাথের idealism সেই বাস্তবকেই এক অপূর্ব্ব মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছে। যে-কল্পনা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বা subjective, সে-কল্পনার রঙে, যাহা অতিশয় সাধারণ ও সুপরিচিত, এমন কি তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র—তাহাই অপূর্ব্ব-সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে, বাস্তবের মধ্যেই লোকোত্তর-চমৎকারের বিস্ময়রস সঞ্চারিত হইয়াছে। বাস্তবের সেই অতি-পরিচয়ের আবরণখানি উন্মোচন করিয়া বস্তুর অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করাই তাঁহার কল্পনার মূল প্রবৃত্তি। সে-কল্পনা বস্তুকে একেবারে রূপান্তরিত করে, অথচ মনে হয় সেইটিই যেন তার একমাত্র সত্যকার রূপ। যে-আনন্দে কবি এই অপূর্ব্ব রসসৃষ্টি করিয়াছেন, তার মূলে কোন্ প্রেরণা ছিল তাহা কবি নিজেই বলিয়াছেন—

মাথাটি করিয়া নীচু বসে' বসে' রচি কিছু
বহুযত্নে সারাদিন ধরে',—
ইচ্ছা করে অবিরত আপনার মনোমত
গল্প লিখি একেকটি করে'।

ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখকথা
নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতিরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু'চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা, ঘটনার ঘনঘটা,
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ ;
অন্তরে অতৃপ্তি র'বে সাঙ্গ করি' মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।
জগতের শত শত অসমাপ্ত কথা যত,
অকালের বিচ্ছিন্ন মুকুল,
অজ্ঞাত জীবনগুলা অখ্যাত কীর্ত্তির ধূলা
কত ভাব, কত ভয় ভুল
সংসারের দশদিশি ঝরিতেছে অহর্নিশি
ঝর ঝর বরষার মত—
ক্ষণ-অশ্রু ক্ষণ-হাসি পড়িতেছে রাশি রাশি
শব্দ তার শুনি অবিরত।
সেই সব হেলাফেলা, নিমেষের লীলাখেলা
চারিদিকে করি' স্তূপাকার,
তাই দিয়ে করি সৃষ্টি একটি বিস্মৃতি-বৃষ্টি
জীবনের শ্রাবণ-নিশার।

মানুষের জীবনের যে দিকটি আড়ম্বরের দিক, কেবলমাত্র ঘটনার ঘনঘটায় যে দিকটি বড় হইয়া উঠে—মানব-ইতিহাসের শোভাযাত্রায় যে সব উন্নত উষ্ণীষ ও উদ্ধত ধ্বজা আমাদের মনে একটা অতিরিক্ত সম্ভ্রমের উদ্রেক করে—রবীন্দ্রনাথের কল্পনা সেদিকে আকৃষ্ট হয় নাই। তাঁহার কথা Wordsworth-এর মত—

The moving accident is not my trade,
To freeze the blood I have no ready arts,
'Tis my delight—alone in summer shade
To pipe a simple song for thinking hearts.

রবীন্দ্রনাথও বলেন—

শুধু বাঁশিখানি হাতে দাও তুলি'
বাজাই বসিয়া প্রাণমন খুলি'
পুষ্পের মত সঙ্গীতগুলি
ফুটাই আকাশ-ভালে।

অন্তর হ'তে আহরি' বচন
আনন্দ-লোক করি বিরচন,
গীতরসধারা করি সিঞ্চন
সংসার-ধূলিজালে।

কেবল মানুষহিসাবেই মানুষের যে চিরন্তন মহিমা, উত্তম ও অধম নির্ব্বিশেষে যে কাহিনী তাহার জীবনের সত্যকার ইতিহাস—সেই প্রতিদিনের হাসিকান্না, সুখ-দুঃখই ধরণীকে চিরশ্যামল করিয়া রাখিয়াছে, তাহারই যে গান—তাহাই শাশ্বত, তাহাই অমর। নতুবা—

কুরু-পাণ্ডব মুছে গেছে সব,
সে রণরঙ্গ হয়েছে নীরব,
সে চিতা-বহ্নি অতি-ভৈরব—
ভস্মও নাহি তার;

যে-ভূমি লইয়া এত হানাহানি,
সে আজি কাহার তাহাও না জানি,
কোথা ছিল রাজা, কোথা রাজধানী,
চিহ্ন নাহিক' আর।

তবে আছে কি?

যুগে যুগে লোক গিয়েছে এসেছে,
দুখীরা কেঁদেছে, সুখীরা হেসেছে,
প্রেমিক যে জন ভাল সে বেসেছে
আজি আমাদেরি মত;

তারা গেছে, শুধু তাহাদের গান—
দু'হাতে ছড়ায়ে করে গেছে দান;
দেশে দেশে, তার নাহি পরিমাণ,
ভেসে ভেসে যায় কত।

শ্যামলা বিপুলা এ ধরার পানে
চেয়ে দেখি আমি মুগ্ধ নয়ানে;
সমস্ত প্রাণে কেন যে কে জানে
ভরে' আসে আঁখিজল।

বহুমানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা,
বহুদিবসের সুখে দুখে আঁকা,
লক্ষযুগের সঙ্গীতে মাখা
সুন্দর ধরাতল।

ইহাই হইল রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সৃষ্টির মূল প্রেরণা। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, এই idealism কত বড়, কত দুরূহ! পৃথিবীর ধূলামাটিকে সোনা করিয়া তোলা, মানুষের সাধারণ সুখ-দুঃখ-আশা-আকাঙ্ক্ষাকে, বিশ্বসৃষ্টির যে রহস্য তাহারই অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেখা ত সহজ idealism নয়!

এই কল্পনার সঙ্গে দেশের লোকের এখনও ভাল করিয়া পরিচয় হয় নাই। ইহার প্রভাব আকস্মিক হইতে পারে না—রবীন্দ্রনাথের ভাব-কল্পনা আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করিয়াছে খুব ধীরে। বঙ্কিমের কল্পনা সূর্য্যাস্ত-শেষ বর্ণ-গরিমার মত আমাদের মনের আকাশে যে সৌন্দর্য্য-রাগের আয়োজন করিয়াছিল তাহারি অন্তরালে শুক্ল-সন্ধ্যার অস্ফুট চন্দ্রালোকের মত রবীন্দ্রনাথের কল্পনা অলক্ষিতে আমাদের মনকে অধিকার করিয়াছে। এ আলোক যে কখন কেমন করিয়া গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া উঠিল, কখন যে সে আলোকে পথের উপর আমাদের ছায়া গভীর হইয়া উঠিল—তাহা আমরা জানিতেই পারি নাই। এ রূপের মধ্যে কোন উদ্বেগ নাই, কোন উত্তেজনা নাই,—নিশীথ-রাত্রের দিগন্তপ্লাবী জ্যোৎস্নার সঙ্গে ইহার যেন কোথাও কোন বিরোধ নাই, সকল কর্কশতা ও রূঢ়তা একটি গভীরতর চেতনার আশ্বাসে যেন লুপ্ত হইয়া যায়। [বাস্তবের মধ্যে যেখানে যেটুকু সৌন্দর্য্য রহিয়াছে সেইটুকুই সত্য, অথবা তাহার যতটুকু সত্য ততটুকুই সুন্দর—বাকিটুকু মিথ্যা, মিথ্যা বলিয়াই দুঃখকর। এই ভাবদৃষ্টি, এই আনন্দবাদ, এই সত্য-সন্ধান বাংলাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বাপেক্ষা বড় দান।] কিন্তু ইহা ত সকলের পক্ষে সহজ নয়। যে-কল্পনায়, ছোট-বড় সুন্দর-কুৎসিত সুখ-দুঃখ—সবই একটা নিগূঢ় ঐক্য-বোধের আনন্দে সমান হইয়া দেখা দেয়, তাহাকে আত্মসাৎ করা একটা বিশেষ culture বা সাধনার অপেক্ষা রাখে। তবু এই কল্পনার যাদুশক্তিকে সজ্ঞানে স্বীকার না করিলেও, অনেকের প্রাণে একটা নূতনতর স্বপ্নের আবেশ লাগিয়াছে। মানুষের সম্বন্ধে কোন-কিছুই উপেক্ষার যোগ্য নয়, সত্যকার জগৎকে অস্বীকার করিয়া বৈরাগ্য-সাধন বা কোন অপ্রাকৃত কল্পনার আশ্রয় নেওয়া যে ঠিক নয়—এমনই একটা ভাব মানুষের মনে ক্রমশঃ স্থান পাইতেছে। রবীন্দ্রনাথের দুরারোহিণী কল্পনার ঊর্দ্ধ শাখায় যে ফুল গুচ্ছে গুচ্ছে ফুটিয়া উঠিল তার সবটুকু শোভা সকলের চোখে ধরিল না বটে, কিন্তু সেই ফুলের বীজ নিম্ন-ভূমিতে একটি নূতন রূপে অঙ্কুরিত হইল। শরৎচন্দ্রের সুনিভৃত সাধনার পরিচয় আগে কেহ পায় নাই; তাই হঠাৎ যখন দেখা গেল, একেবারে পথের ধারেই লতাগুল্মের বেড়াগুলি এক নূতন ধরণের ফুলে ভরিয়া উঠিয়াছে, তার বর্ণ ও গন্ধ যেমন চমকপ্রদ তেমনই অতি সহজে প্রাণ-মন অভিভূত করে—তখন আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। এ যেন ভাব-কল্পনার বস্তু নয়, একেবারে প্রত্যক্ষ বাস্তব; এ যেন চিরদিনের দেখা জিনিষ, অথচ এমন করিয়া কখনও দেখি নাই। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যখন সাহিত্য-গগনের শেষ সীমা পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত করিয়াছে, তখনই সেই রবীন্দ্রালোকিত মহাদেশের এক প্রান্তে একটা নূতন আলো বিচ্ছুরিত হইল, নিথর নিবিড় জ্যোৎস্নাকাশের এক কোণে বিদ্যুৎ-শিহরণ আরম্ভ হইল।

ইহার আগে আর একজন মাত্র কথাশিল্পী রবীন্দ্রনাথের পাশে একটি ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্কের মত দীপ্তি পাইতেছিলেন। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্পগুলিতে একটি হাস্যোজ্জ্বল অথচ শিশির স্নিগ্ধ-বাস্তব-কল্পনা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সে কল্পনায় সুপরিচিত দৈনন্দিন জীবনের আলোক-চিত্র সংগ্রহ করা হইতেছিল। তার প্রকাশভঙ্গি যেমন অনবদ্য, তার ভাবদৃষ্টিও তেমনই সহজ ও সরল, সে যেন কোথাও বাধে না। জীবনকে একটা নূতন দিক হইতে দেখিবার প্রয়াস তাহাতে নাই, কোন অন্ধকার গহ্বর বা কুটিল পথ-রেখার আবিষ্কার তাহার মধ্যে নাই; কেবল একটি সহজ সরল আত্মীয়তার আনন্দে ও সহৃদয় কৌতুক-হাস্যে সেগুলি সমুজ্জ্বল। সাধারণের মধ্যে, রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ' হইতেও এগুলির প্রচার যেন একটু বেশী হইয়াছিল। প্রভাতকুমারের জনপ্রিয়তার মূলে ছিল তাঁহার কল্পনার সহজ রসিকতা; আর একটা কারণ, সে চিত্রগুলি সমাজ ও পরিবারের সঙ্কীর্ণ ফ্রেমে বাঁধা। রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানব-জীবনের যে সূক্ষ্ম অন্তরঙ্গতার যোগ আছে—যে বিপুলতর রহস্যের ছায়ায় সকল ক্ষুদ্রতা একটা অসীমতা লাভ করিয়াছে, প্রভাতকুমারের কল্পনায় তাহার কিছুই নাই। তাই, সেগুলি খাঁটি গল্প হিসাবেই মুগ্ধ করে, কাহারও গভীরতর চেতনা স্পর্শ করে না। কথাসাহিত্যের যখন এই অবস্থা, যখন একদিকে রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম কল্পনা মনোহরণ করিতে পারিতেছিল না, অথচ তাহারি প্রভাবে ভিতরে ভিতরে একটা উৎকণ্ঠা জাগিয়াছে—অন্যদিকে প্রভাতকুমারের মত শিল্পী, ক্ষণিকের আনন্দ বিতরণ করিলেও সেই উৎকণ্ঠার তৃপ্তি-সাধনে অক্ষম, তখন এমন একজন শিল্পীর আবির্ভাব হইল যিনি এই নিগূঢ় উৎকণ্ঠাকেই যেন বাঙ্ময়ী করিয়া তুলিলেন। যে সামাজিক ও পারিবারিক বিধি-ব্যবস্থার বশে, বাঙ্গালীর জীবনে আত্ম-ত্যাগের মহিমা ও স্বার্থরক্ষার দৈন্য, এই দুয়েরই বেদনা করুণ হইয়া উঠিয়াছে—যে-ট্রাজেডি কোন অতি-মানুষ নাটকীয় ট্রাজেডি হইতে কিছুমাত্র কম নয়, তাহাকেই তিনি সাহিত্যের আকারে সুপ্রকাশিত করিলেন। তিনি জীবনকে খুব বিস্তৃত করিয়া দেখেন নাই, কিন্তু যেটুকু দেখিয়াছেন গভীর করিয়া দেখিয়াছেন—সে গভীরতা ততটা কল্পনার নয়, যতটা অনুভূতির। এই সহানুভূতি যেখানে যতটুকু পৌঁছিতে পারিয়াছে ততটুকুই তাঁহার কল্পনার প্রসার। সমাজ যে-পাপে জর্জ্জরিত হইয়াও তাহাকে স্বীকার করে না—আত্মঘাতীর সেই ব্যথাকে শরৎচন্দ্র তাঁহার হৃদয়ের রঙে রঞ্জিত করিয়াছেন। তিনি যাহা দেখিয়াছেন বিনা-সঙ্কোচে তাহার সবটুকুই প্রকাশ করিয়াছেন; সবটুকু প্রকাশ না করিলে যে সে ব্যথার পরিমাপ করা যাইবে না। অসহায় শক্তিহীন সমাজের এই ব্যথাকেই তিনি বড় করিয়া দেখিয়াছেন, তাহাদেরই মত অসহায়ভাবে তিনি নিজেও সেই ব্যথা ভোগ করিয়াছেন। এ বিষয়ে তিনি অনেক চিন্তা অনেক ভাবনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু কোথাও বিচার করিতে বসেন নাই। তিনি দুঃখের কোন দার্শনিক মীমাংসা করিতে চাহেন নাই, তার বাস্তব রূপটি ধ্যান করিয়াছেন; চোখে দেখা এবং গভীর করিয়া অনুভব করা—ইহাই হইল তাঁহার কল্পনার উৎস।

রবীন্দ্রনাথ যে-বাস্তবকে অন্তরের আলোকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন, শরৎচন্দ্র সেই

বাস্তবকেই বাহিরের দিক হইতে নিকটতর করিয়া দেখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় যে ক্ষুদ্র সুখ দুঃখের পরিধি সীমাহীন হইয়া আনন্দঘন শান্তরসের উদ্বোধন করে, শরৎচন্দ্রের প্রত্যক্ষ অনুভূতি-মূলক কল্পনায় সুখ-দুঃখের সেই সীমারেখা কোথাও হারাইয়া যায় না— ব্যথার ব্যথাটুকু শেষ পর্য্যন্ত জাগিয়াই থাকে। এই অনুভূতির সঙ্গেই তাঁহার মানসবৃত্তি জাগিয়া উঠে, কিন্তু তাঁহার সেই চিন্তাগুলিকে কোথাও বস্তুনিরপেক্ষ abstract idea-র ভাবনা বলিয়া মনে হয় না। অমাবস্যার রাত্রে নির্জ্জন শ্মশানে বসিয়া শ্রীকান্তের সেই ধ্যান— 'অন্ধকারের একটা রূপ আছে'—পড়িতে পড়িতে মনে হয়, এখানে শরৎচন্দ্র বুঝি নিজেকেও ছাড়াইয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাহার মধ্যে নিছক ভাব-কল্পনা নাই—একটা অত্যন্ত বাস্তব অনুভূতির emotion আছে। রবীন্দ্রনাথের কল্পনা সৃষ্টির মর্ম্মস্থলে একটা অব্যভিচারী রসবস্তুর সন্ধান করিয়াছে—সে কল্পনা সকল বস্তুরই সেই এক রস-পরিণাম উপলব্ধি করিয়াছে। এই ভাব-কল্পনার প্রভাবে শরৎচন্দ্রের অনুভূতি-কল্পনাও যেন একটু জোর পাইয়াছে; তাই 'নীলাম্বরে'র মত নিরক্ষর, গাঁজাখোর পল্লী-সন্তানের মধ্যেও রসের উৎকৃষ্ট উপকরণ সন্ধান করিতে তাঁহার সাহসের অভাব হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তাঁহার ভাষার মধ্যেও রহিয়াছে; তথাপি তাঁহার ষ্টাইল যেমন মৌলিক, তাঁহার কল্পনাও তেমনি নিজস্ব। এই জন্যই তাঁহাদের দুই জনের দুই বিভিন্ন কল্পনা-প্রকৃতি তুলনা করিয়া দেখিবার মত ঠিক একই ধরণের গল্প খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত। তবু আমি যতটা সম্ভব চেষ্টা করিয়া দেখিব। শরৎচন্দ্রের 'অরক্ষণীয়া' গল্পের সেই মেয়েটির অবস্থা রবীন্দ্রনাথের 'পোষ্টমাষ্টার' গল্পের রতনের অবস্থার সঙ্গে যেন একটু মিলে। রতনের দুঃখ যেন সমস্ত আকাশে ব্যাপ্ত হইয়া গেল, তাহার মধ্যে মানবভাগ্যের চিরন্তন ট্রাজেডির ছায়া পড়িয়াছে— সে-দুঃখ যেন ভাবের শাশ্বত লোকে একটি পরম পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে। 'অরক্ষণীয়া'র মধ্যে সে রকমের ভাবুকতা নাই; তাহার মধ্যে যে দুঃখের বর্ণনা আছে, সে ঠিক সেই ব্যক্তি ও সেই অবস্থার মধ্যেই কঠিন ও সুনির্দ্দিষ্ট হইয়া জাগিয়া রহিল, কোনও একটি ভাবলোকে সমাপ্তি লাভ করিল না। এখানে কবিত্বহিসাবে রবীন্দ্রনাথের কল্পনাই উৎকৃষ্ট। কিন্তু শরৎচন্দ্রের এই সহানুভূতিই তাঁহাকে উৎকৃষ্ট সৃষ্টি-শক্তির অধিকারী করিয়াছে। 'চন্দ্রনাথ' উপন্যাসে সেই 'কৈলাস-খুড়া' ও 'বিশু'র কথা বাংলা গল্প-সাহিত্যে অতুলনীয়। ঐ উপন্যাস-খানির শেষের দিকে এই যে চিত্রটি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে মূল কাহিনী ম্লান হইয়া গিয়াছে। একি শুধু বাস্তবের তীব্র অনুভূতি? কত বড় রস-কল্পনার প্রমাণ ঐ চিত্রটি! ইহার সঙ্গে এক দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটির তুলনা করা যায়। 'কাবুলি-ওয়ালা'র ব্যথা বিশ্বজনীন হইয়া এক অপূর্ব্ব রসের সৃষ্টি করিয়াছে বটে, তবু মনে হয় শরৎচন্দ্রের করুণরস যেন আরো গভীর, আরো উজ্জ্বল। রবীন্দ্রনাথের সত্যাশ্রয়ী ভাব-কল্পনা বাঙ্গালীকে রসের ঊর্দ্ধলোকে বিচরণ করিবার অধিকার দিয়াছে। এই সত্যকে তিনি পৃথিবীর ধূলামাটির উপরেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সীমাকে অসীমের সঙ্গে বাঁধিয়া

দিয়াছেন। শরৎচন্দ্র এই ধরণী ও ধরণীর ধূলামাটিকে তেমন করিয়া দেখেন নাই—তিনি বিশ্ব বা প্রকৃতি, কাহাকেও ভক্তি করিবার অবকাশ পান নাই। তাঁহার নিজের সমাজে তিনি যে জীবন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাকেই গভীর বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন, আর কিছুর ভাবনা তিনি করেন নাই। তিনি রবীন্দ্রনাথের মানবতাটুকুই গ্রহণ করিয়াছেন, বিশ্ব-মানবতা বা বিশ্ব-প্রাণতার দিক দিয়াও তিনি যান নাই।

কিন্তু তাই বলিয়া শরৎচন্দ্র বস্তু-তান্ত্রিক বা Realist নহেন। তিনিও একজন বড় দরের Idealist। অতি নিম্নশ্রেণীর জীবনযাত্রা, এমন কি, সমাজ-বহির্ভূত জীবনকে তিনি তাঁহার কল্পনায় স্থান দিয়াছেন, অথবা অনেক বাস্তব দুঃখের চিত্র আঁকিয়াছেন বলিয়াই তিনি Realist নহেন। বরং তাঁহার হৃদয়ের আবেগ এতই বেশী যে, কোন-কিছুকেই তিনি ঠিক তাহার মত করিয়া দেখিতে পারেন নাই—অনেক বড় করিয়া দেখিয়াছেন। মানুষের দুঃখ তিনি যতটুকু দেখিয়াছেন, তদপেক্ষা বেশী উপলব্ধি করিয়াছেন; এই উপলব্ধি করার মধ্যে যে শক্তি আছে, সেইটাই তাঁহার কবিশক্তি। যিনি প্রকৃত Realist, তিনি প্রত্যক্ষ বাস্তবকে ঠিক ঠিক প্রকাশ করেন, এজন্য তাঁহার রচনায় সুন্দরের অপেক্ষা কুৎসিতের দিকটা, ভাব অপেক্ষা অভাবের দিকটা, আত্মা অপেক্ষা অনাত্মার দিকটাই বেশী করিয়া ফুটিয়া উঠে—তাহার মধ্যে লেখকের নিজের কোন অভিপ্রায় বা ভাবের উচ্ছ্বাস থাকে না। এইটি মনে রাখিলেই শরৎচন্দ্রকে কেহ Realist বলিবেন না।

প্রমাণস্বরূপ শরৎচন্দ্রের নারী-চরিত্রগুলিই ধরা যাক। শরৎচন্দ্রের যত-কিছু নিন্দা-প্রশংসা এইগুলিকে লইয়া। এই নারী-চরিত্রই বাংলার বড় বড় ঔপন্যাসিকের একটি শক্তি-পরীক্ষার স্থল। বাংলা উপন্যাসে নারী-চরিত্রগুলিই যা একটু বৈচিত্র্যময়, পুরুষ-চরিত্রগুলা নাকি তেমন কিছু নয়। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলি সম্বন্ধেও টম্‌সন্ সাহেবও এই কথাই বলিয়াছেন। কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। আমাদের দেশে নারীর মধ্যেই একটু শক্তির পরিচয় আছে, তাই গল্পে-উপন্যাসে নারী-চরিত্রের একটু বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। তবু বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ এই উভয়ের মধ্যে, এবিষয়ে বরং বঙ্কিমের কল্পনাই একটু বাস্তব-ঘেঁসা; রবীন্দ্র-নাথের নারী-চরিত্র সর্ব্বত্রই একটা আদর্শ-কল্পনায় অনুরঞ্জিত, তাহাদের সম্বন্ধে তাঁহারই কথায় বলা যাইতে পারে—'অর্দ্ধেক মানবী তুমি, অর্দ্ধেক কল্পনা'। আমাদের সমাজে, নারীর যে শক্তির কথা বলিয়াছি, শরৎচন্দ্র ঠিক সেইটির সন্ধান পাইয়াছেন, তাই তাঁহার কল্পনাও বাস্তবের অনুকূল হইয়াছে। তিনি আমাদের মেয়েদের মধ্যে সেই একটা মহিমা লক্ষ্য করিয়াছেন—দুঃখ সহ করিবার অসাধারণ শক্তি। 'অন্নাদিদি'কে দেখিয়া নারীচরিত্র সম্বন্ধে তিনি যে এক বিষয়ে নিসংশয় হন—সেটা উপন্যাস নয়, খুব সত্য কথা। কিন্তু একথা ত শুধু আমাদের দেশের মেয়েদের সম্বন্ধেই খাটে না, নারীমাত্রেরই প্রকৃতিতে এই passive শক্তি নিহিত রহিয়াছে। নারীবিদ্বেষী Schopenhauer-ও বলিয়াছেন,—'She pays the debt of life not by what she does, but by what she suffers.'। নারী-জীবনের এই নিয়তি শরৎচন্দ্রকে

বিশেষ করিয়া অভিভূত করিয়াছে; তাহার কারণ, আমাদের সমাজে নারীর এই নিয়তি সর্ব্বত্র জাজ্বল্যমান। যে সমাজে পুরুষের পৌরুষ প্রায় নির্ব্বাপিত, ভীরু দুর্ব্বল স্বার্থপর পুরুষের সংখ্যাই বেশী, সেখানে নারীকেই যে পুরুষের সকল অত্যাচার, সকল পাপের বোঝা বহিতে হয়। এই সমাজের অন্ধতম গহ্বরে\ শরৎচন্দ্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন—সেখানে নারীর সেই ক্রুশবিদ্ধ অবস্থা তাঁহার প্রাণে অপরিসীম সহানুভূতির উদ্রেক করিয়াছে, তাই তিনি Son of man-এর পরিবর্ত্তে Daughter of Woman-এর মহিমা এমন করিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। আমার মনে হয়, যে অপূর্ব্ব ভাবুকতা ও lyric sentiment শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে একটি গীতি-মূর্চ্ছনার সৃষ্টি করিয়াছে, নারী-জীবনের এই দুঃখ-কল্পনাতেই তার জন্ম, ইহা হইতেই তাঁহার কল্পনা গভীর ও ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু নারী-চরিত্রের এই একটি দিক তিনি বিশেষ করিয়া দেখিয়াছেন বলিয়া, এবং সেইটিকেই কেন্দ্র করিয়া তাঁহার অধিকাংশ উপন্যাস গঠিত বলিয়া, তাঁহার কল্পনার মণ্ডলটি কিছু সঙ্কীর্ণ। প্রত্যক্ষ বাস্তব-অনুভূতির দ্বারাই তাঁহার কল্পনা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহার দৃষ্টি যেমন গভীর, সৃষ্টি-শক্তি তেমন প্রচুর নহে। বাস্তব-অনুভূতি ও subjective কল্পনা, এই দুয়ের পূর্ণ মিলনেই 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে তাঁহার শক্তির এমন সার্থক বিকাশ দেখিতে পাই। এই উপন্যাসখানির গঠনে ও পরিকল্পনায় অতিশয় স্বাধীন আত্মপ্রকাশের সুযোগ ঘটিয়াছে, বাস্তব-অনুভূতি ও স্বকীয় কল্পনার বিরোধ এখানে নাই; তাই এই উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের Idealism এমন অপূর্ব্ব কাব্যসৃষ্টি করিয়াছে।

এই প্রবন্ধে আমি শরৎচন্দ্রের কবি-প্রতিভা সম্বন্ধে আমার একটা ধারণা প্রকাশ করিয়াছি; বাংলা কথাসাহিত্যে ভাবের যে প্রধান ধারাটি বঙ্কিম হইতে শরৎচন্দ্রে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহার গতি-প্রকৃতির একটু আলোচনা করিয়াছি। সেই আলোচনার ফল এই দাঁড়ায় যে, আমাদের কথাসাহিত্যে এ পর্য্যন্ত Idealism-ই জয়ী হইয়া আসিয়াছে। বঙ্কিমের কল্পনায় ছিল একটা বড় Ideal-এর sentiment; রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় Real ও Ideal-এর সমন্বয়-চেষ্টা আছে; শরৎচন্দ্রের কল্পনায় আছে Real-এর একটা emotional প্রতিরূপ। বঙ্কিমের কল্পনায় Real একটা বাধা হইয়া দাঁড়ায় নাই, সে কল্পনা ছিল সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশ ও নিরাপদ; রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় Real রূপান্তরিত হইয়াছে, তাহার realityই যেন লোপ পাইয়াছে; শরৎচন্দ্রের কল্পনায় এই Real-এর সমস্যা জটিল হইয়া উঠিয়াছে—Real-এর জন্য একটা প্রবল আবেগের সৃষ্টি হইয়াছে। এই ত্রিধারায় আমাদের সাহিত্যের Idealism বোধ হয় নিঃশেষ হইয়া আসিল। অতঃপর যে সাহিত্যের সৃষ্টি হইবে, শাদা চোখে Real-এর সঙ্গে বোঝাপড়া করাই হইবে তাহার একমাত্র প্রেরণা।

আশ্বিন, ১৩৩৫

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

(১)

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা এককালে বাংলার মাসিক-সাহিত্য পাঠকদের বড় প্রিয় ছিল— আজ সেই সাময়িক সাহিত্য হইতে অপসৃত হওয়ায় তাঁহার কবিতার পাঠকসংখ্যাও কমিয়াছে। তাঁহার জনপ্রিয়তার যে দুইটি কারণ ছিল তাহার একটি এই সাময়িকতা,—তিনি সাময়িক সাহিত্যের উপযোগী, অর্থাৎ ইংরেজীতে যাহাকে topical বলে, সেই বিষয়ক কবিতা লিখিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন; সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনা অবলম্বনে উদ্দীপনাময় কবিতা সদ্য সদ্য রচনা করিয়া সংবাদপত্রপাঠক বাঙালীর কাব্যপিপাসা চরিতার্থ করিতেন। অপর যে গুণের জন্য তাঁহার কবিতা পাঠকসাধারণের এত ভাল লাগিত—সে তাঁহার আশ্চর্য্য ছন্দনির্ম্মাণকৌশল। এই দুই গুণে তিনি তাঁহার জীবদ্দশায় রবীন্দ্রোত্তর কবিগণের মধ্যে সমধিক যশস্বী হইয়াছিলেন।

এই দুই গুণের প্রথমটির—অর্থাৎ সাময়িকতার মূল্য স্থায়ী হইতে পারে না, তাই সে গুণের এখন আর তেমন আকর্ষণ নাই। কিন্তু দ্বিতীয় গুণটির—ছন্দচাতুর্য্যের—আকর্ষণ পূর্ব্বে যেমন ছিল এখনও তেমনই থাকিবার কথা, এবং সেই কারণেই সত্যেন্দ্রনাথ আজিও সম্পূর্ণ খ্যাতিভ্রষ্ট হন নাই।

উপরে যাহা বলিলাম তাহাতে মনে হইবে, কবিহিসাবে সত্যেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব খুব বেশী নহে—কাব্যবস্তুর সাময়িকতা বা সাংবাদিকতা, এবং ছন্দগৌরব, ইহার কোনটাই উৎকৃষ্ট কবিশক্তির নিদর্শন নয়; পাঠকসাধারণের পক্ষে উহাই যথেষ্ট হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত কাব্য-রসিকের নিকট উহার মূল্য খুব বেশী নয়। কিন্তু আমাদের দেশে সেইরূপ রসিকের সংখ্যা আধুনিককালে আরও কম; অতএব, এক্ষণে কোন কবির কবিখ্যাতি এইরূপ লক্ষণের উপরেও নির্ভর করিতে পারে। অতি আধুনিককালে তাহারও প্রয়োজন হয় না, কারণ, এক্ষণে ছন্দ একেবারে বিতাড়িত হইয়াছে, এবং বিষয়বস্তুও হাসপাতাল ও বাতুলাশ্রম হইতে আমদানী না করিলে পাঠকের চমক লাগে না। অতএব সত্যেন্দ্রনাথের ওই দুই গুণ ব্যতীত আর কিছু আছে কিনা, এ পর্য্যন্ত সেই বিষয়ে কাহারও মনে কোন সন্দেহই জাগে নাই। সত্যেন্দ্রনাথের কবিত্ব সম্বন্ধে আধুনিক অনেক সাহিত্য-প্রেমিক ব্যক্তিকে নাসা কুঞ্চিত করিতে দেখিয়াছি; এবং তাঁহার কবিতার প্রতি যাঁহাদের এখনও কিছু অনুরাগ আছে—ঐ ছন্দ এবং তাঁহার কাব্যের স্বাজাত্য-প্রেরণাই তাহার কারণ।

একথা অস্বীকার করি না, এবং যে-কেহ তাঁহার কবিতারাশির সহিত সম্যক পরিচিত তিনিও স্বীকার করিবেন যে, এই ছন্দকলাকুতূহল তাঁহার অধিকাংশ কবিতার কাব্যস্ফূর্ত্তির

প্রধান প্রেরণা হইয়াছে। কিন্তু ইহাও সত্য যে ছন্দোবৈচিত্র্য সৃষ্টি করিবার আগ্রহ, যা বাংলা-ভাষার ধ্বনিসম্পদকে নানা ভঙ্গিতে লীলায়িত করিয়া তাহার শক্তি পরীক্ষা করাই—তাঁহার অনেকগুলি কবিতার একমাত্র অভিপ্রায় বলিয়া মনে হইলেও, সত্যেন্দ্রনাথের কবি- কেবল তাহাতেই পর্য্যবসিত হয় নাই। তাঁহার রচনার অজস্রতার মধ্যে ছন্দের সহিত ভাষা, ভাব ও অর্থের সম্মিলন বহু কবিতায় ঘটিয়াছে; অর্থাৎ, ছন্দই তাঁহার প্রকাশভঙ্গির একটি প্রধান অঙ্গ হইলেও, কবিহিসাবে তাঁহার একটি বাণী ছিল—সে বাণীর কল্পনাগৌরব যেমনই হোক, তাহার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। ছন্দের প্রতি তাঁহার এই পক্ষপাত একটি অকবি-সুলভ রচনাবিলাস না হইয়া সত্যকার কবিপ্রকৃতিগত একটা লক্ষণ হইতেও পারে। প্রত্যেক কবিরই কবি-প্রেরণা ভিন্ন হইয়া থাকে—যে সুন্দর-বোধের আতিশয্যে মানুষের মধ্যে কবিত্ব-ব্যাধি দেখা দেয় সেই সৌন্দর্য্যের নানা দিক ও নানা চেতনা আছে; সৃষ্টি-সুষমার মূল যে সুর-সঙ্গতি, তাহা কবিচিত্তে বহুবিধরূপে সঞ্চারিত হয়। বাক্য-অর্থের অতীতরূপে যাহা সঙ্গীত, বাক্য-অর্থ-বর্জ্জিত নিছক রূপ-রং-রেখায় সঙ্গীতিরূপে তাহাই চিত্রাদিকলাশিল্প; এবং সৃষ্টির যাবতীয় রূপের যে বাঙ্ময়ী সুষমা, তাহাই কাব্যকলা। এই শেষোক্ত কবিপ্রেরণা একান্তভাবে বাক্যেরই অনুগত; বাক্যের যে দুই প্রাথমিক উপাদান—ধ্বনি ও অর্থ, কবি সেই দুইয়েরই উপরে তাঁহার সৃজনীশক্তি বা শিল্পকৌশল প্রয়োগ করেন; ছন্দ—ধ্বনির, এবং কল্পনা—অর্থের লাবণ্য বৃদ্ধি করে। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় কবিধর্ম্মের এই মূল প্রবৃত্তি প্রবলভাবে কার্য্যকরী হইয়াছে—ছন্দের আনন্দ ও অর্থের চমৎকারিত্ব এই দুই-ই তাঁহার কাব্যে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান; অতএব তিনি যে একজন সত্যকার কবিশিল্পী তাহাতে সন্দেহ নাই।

এ পর্য্যন্ত যাহা বলিয়াছি তাহাতে আশা করি, কোন তর্কের অবকাশ নাই—সত্যেন্দ্র-নাথের কাব্যের বহির্গত লক্ষণ, এবং সেই লক্ষণে তাঁহার যে কবিশক্তির প্রমাণ আমি গ্রাহ্য করিয়াছি, তাহাতে কোনও গুরুতর সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু বাক্য ও অর্থের এবং ধ্বনি ও ছন্দের যে শিল্পকলা তাহাই বিশিষ্ট কবিকীর্ত্তি বলিয়া গণ্য হইলেও যে ভাব ও ভাবোদ্ভূত রস—বাক্য ও অর্থের বন্ধন স্বীকার করিয়াই তাহার ঊর্দ্ধে বিরাজ করে—তাহার কোন্ রূপ সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় ধরা দিয়াছে? কারণ, একটা কোন রূপ অবশ্যই তাহাতে আছে—তাহা উৎকৃষ্ট রস-রূপ কিনা, সে মীমাংসা পরে করিলেও চলিবে। সত্যেন্দ্রনাথ জগৎকে যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন তাহা উৎকৃষ্ট রসদৃষ্টি কিনা, সে বিচার অপেক্ষা, তিনি তাহাতে যে আনন্দ পাইয়াছিলেন, এবং সেই আনন্দ প্রকাশ করিবার জন্য বাগর্থের এমন সাধনা করিয়াছিলেন—সে আনন্দ যে নিশ্চয়ই একটি সত্যকার আনন্দ, তাহাই স্বীকার করিয়া তাঁহার সেই দৃষ্টির ভঙ্গি ও তাহার বিষয়টিকে যতদূর সম্ভব বুঝিয়া লইতে পারিলেই, তাঁহার কবিতা আমরা আরও যথার্থভাবে উপভোগ করিতে পারিব।

সত্যেন্দ্রনাথের কল্পনা—বস্তু ও তথ্যকে, ইতিহাস ও বিজ্ঞানকে, লোকব্যবহার ও চরিত্রনীতিকে, ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির যুক্তিসঙ্গত কল্যাণকে অতিক্রম করিয়া, কোন অপ্রত্যক্ষ

জগৎ বা দূর-দুর্লভ আদর্শের ভাব-মোহে আবিষ্ট হয় নাই। মানুষের ভাষায় যাহা সুস্পষ্টরূপে ধরা দেয়, পুরাণে ইতিহাসে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে যাহার সুঠাম প্রতিমা ভাবুক ও মনীষীর চক্ষে —জ্ঞানবুদ্ধি ও বিবেকসম্পন্ন পুরুষের চিত্তে—নিত্য উদ্ভাসিত হইয়া থাকে, তাহারই বন্দনায় কবি সত্যেন্দ্রনাথ ভাষা ও ছন্দের, উপমা ও অলঙ্কারের, যুক্তি ও দৃষ্টান্তের সকল উপকরণ পুঞ্জীভূত করিয়াছিলেন; সেই জ্ঞানের আনন্দ, সেই আত্মপ্রত্যয়ের আবেগ শব্দ ও অর্থের মণি-কাঞ্চন-মিলনে বিচ্ছুরিত হইয়াছে।

কবিমানসের এই প্রবৃত্তি, কাব্যের এই আদর্শ নূতন নয়—আমাদের দেশে ত নহেই। জীবন ও জগৎকে একটি সুস্থির ও সুনিয়ন্ত্রিত, বুদ্ধি ও বিবেকসম্মত আদর্শে অনুভাবনা করিয়া কাব্যে তাহাকেই শব্দ ও অর্থের সুস্পষ্ট আকারে, অতিশয় বোধগম্য অথচ চিত্তগ্রাহী রূপে, প্রতিফলিত করাই সকল প্রাচীন কবির অভিপ্রায় ছিল—ইহাকেই কাব্যের ক্লাসিক্যাল আদর্শ বলে। এই আদর্শ যে এককালে উৎকৃষ্ট কাব্যসৃষ্টিতে সার্থক হইয়াছিল, তাহাতেই প্রমাণ হয় যে, ভাবকল্পনার দিক দিয়া ইহা মিথ্যা নহে। পরে যখন সেই ভাবদৃষ্টির মৌলিক প্রেরণা আর রহিল না—প্রাচীন কবিগণের কাব্যপ্রেরণার পরিবর্ত্তে সেই কাব্যের বহির্গত রচনাকৌশলই কবিগণের উপজীব্য হইয়া উঠিল—কাব্যকলা যখন ব্যাকরণের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া পড়িল, তখনই এই আদর্শ কাব্যরসিকের শ্রদ্ধা হারাইল। এই আদর্শের বিরুদ্ধে যে নূতন আদর্শের অভ্যুদয় আধুনিক কালের কাব্য-সাহিত্যে ভাবকল্পনার বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছে—তাহাতে জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেকের শাসন অগ্রাহ্য হইয়াছে, তথ্যের বা বস্তুর বাস্তবরূপের নিঃসংশয় আধিপত্য আর নাই। সামাজিক ন্যায়ধর্ম্ম ও নীতির উপরে ব্যক্তির ব্যক্তিচেতনার মহিমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—সৃষ্টির মধ্যে যে কোনও মানবীয় সংস্কারের মঙ্গল-অভিপ্রায়, অথবা সুনির্দ্দিষ্ট গন্তব্যযুক্ত গতিধারার অনুসরণ আছে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। এক কথায়, অন্তর ও বাহিরের মধ্যে কোনও নীতিধর্ম্ম ও যুক্তিবাদের সৌষম্য নাই; বরং ব্যক্তির স্বাধীন ও স্বতন্ত্র কামনায়, তাহার নিজস্ব আধ্যাত্মিক পিপাসার প্রয়োজনে—দিব্য-আবেশের মাহেন্দ্রক্ষণে—সৃষ্টির যে রহস্য উপলব্ধি হয়, তাহা অপেক্ষা সত্য আর কিছুই নাই; এবং সে সত্যও যুক্তি-বিচারের সত্য নহে। এজন্য আধুনিক সকল শ্রেষ্ঠ কবির জীবন-দর্শন স্বতন্ত্র; তাঁহাদের কাব্যে ছন্দ অপেক্ষা সুর বড়; বাক্য-অর্থের পরিস্ফুটতা অপেক্ষা ভাব-ব্যঞ্জনার অসীমতাই অধিকতর উপাদেয়; ভাষার অতীত যে উপলব্ধি তাহারই গৌরবরক্ষার জন্য ভাষার আদর্শ-রক্ষার প্রয়োজন আর নাই।

সত্যেন্দ্রনাথ এ যুগের কবি হইয়াও এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হন নাই, এই জন্যই আধুনিক রুচি ও রসবোধের দরবারে তাঁহার কবিপ্রতিভা সমুচিত সম্মানে বঞ্চিত হইয়াছে। কিন্তু কাব্য ও কবিকে কেবল যুগের আদর্শে বিচার করিলেই সুবিচার করা হয় না; এবং কবিমানস যেমন যুগ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না, তেমনই, মানুষের ভাবচিন্তার এমন একটা স্তর আছে যাহা কোন যুগেই লুপ্ত হইতে পারে না। কাব্যের যে প্রবৃত্তিকে

ক্লাসিক্যাল বলা হইয়া থাকে, তাহার মূল প্রেরণা মানুষের স্বাভাবিক সমাজধর্ম্মনিষ্ঠার মধ্যেই আছে ; একটা কিছুকে স্থায়ী ও দৃঢ় বলিয়া বিশ্বাস, নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল সত্ত-ধ্বংসী জগতের একাংশে একটা স্থির-সত্তার আশ্বাস—মানুষ চায়। প্রবল স্রোতোমুখে যে বিশৃঙ্খল রূপরাশি অবিন্যস্ত কুসুমদামের মত দৃষ্টিগোচর হইয়া পলকে অদৃশ্য হইতেছে, তাহাকে মনের গ্রন্থিসূত্রে মাল্যরূপে সুবিন্যস্ত করার প্রয়াস যেমন মানুষেরই ধর্ম্ম, তেমনই, অপর দিকে সেই স্রোতোবেগের উন্মাদনা—সেই বিশৃঙ্খলতারই অজুহাতে, সকল বহির্গত বস্তুবিন্যাসের মূল্য অস্বীকার করিয়া যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উল্লাস, তাহাও মানুষের প্রতিভাকে নবসৃষ্টির দুঃসাহসে গৌরবান্বিত করিয়াছে। কাব্যসাহিত্যে মানবচিত্তের এই দ্বিবিধ আকাঙ্ক্ষাই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে; বরং, সাধারণ মানবীয় রসপিপাসা পূর্ব্বোক্ত প্রবৃত্তিরই অনুকূল ; অঘোরপন্থী তান্ত্রিক অপেক্ষা, যোগী সন্ন্যাসী অপেক্ষা—সমাজ ও গৃহধর্ম্মের গুরুকেই মানুষ অধিকতর শ্রদ্ধা করিয়াছে। প্রত্যক্ষ বাস্তবের সঙ্গেই অহরহ সম্পর্ক করিতে হয় বলিয়া, যে কাব্য এই বাস্তবকেই একটি সহজ বুদ্ধি ও সরল কারুকলার দ্বারা মণ্ডিত করিয়া আমাদের স্বাভাবিক নীতিজ্ঞান ও হৃদয়-বৃত্তিকে চরিতার্থ করে, সেই কাব্যই আমরা আরও আগ্রহের সহিত উপভোগ করি ; এবং হিসাব করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, জগতের কাব্যসাহিত্যে কবিকল্পনার এই ভঙ্গিই মানুষের কাব্যপ্রীতির উদ্রেক করিয়াছে। অতএব সত্যেন্দ্রনাথের কবিতাও যদি এই জাতীয় হয়, তবে কবিহিসাবে তাঁহার অগৌরবের কারণ নাই।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, সত্যেন্দ্রনাথের কবিমানসের প্রধান লক্ষণ সৃষ্টির অন্তর্গত নীতি-নিয়মের প্রতি পক্ষপাত। সৃষ্টিকে তিনি বিদ্যা ও বুদ্ধিমার্জ্জিত চিত্তফলকে প্রতিফলিত করিয়া দেখিয়াছেন ; জগতের সকল পূর্ব্ব কবি ও মনীষিগণের সাক্ষ্য, এবং পুরাবৃত্ত ও প্রত্নতত্ত্বের প্রমাণপুঞ্জ তাঁহার ধারণা ও কল্পনাকে একটি বিশিষ্ট ভাবমার্গে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। এইজন্য আধুনিক বিজ্ঞানের সাহস ও সত্যবাদের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা থাকিলেও, এবং সকল কুসংস্কার-প্রসূত দুর্ব্বলতা ও সঙ্কীর্ণতাকে এক মুহূর্ত্ত সহ্য না করিলেও, তিনি অতীত-যুগের মানব ও তাহার কীর্ত্তি—বিশেষ করিয়া ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি—নিরতিশয় আস্থাবান ছিলেন। এজন্য তিনি বর্ত্তমানের মধ্যে যে ভবিষ্যতের আশার আলো দেখিয়া উৎফুল্ল হইতেন, তাহাতে আধুনিক প্রগতিবাদীর নূতন স্বর্গ নূতন পৃথিবীর স্বপ্ন ছিল না। আমাদের দেশে উনবিংশ শতাব্দী যে নবজাগরণ আনিয়াছিল—বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবি ও মনীষী তাহার যে মন্ত্র দর্শন করিয়াছিলেন, তাহারই সাধন-ক্ষেত্রের একপ্রান্তে সত্যেন্দ্রনাথের কবিচিত্ত কর্ষিত হইয়াছিল, তিনিও সেই বাংলার সেই নব্যসংস্কৃতির পতাকা বহন করিয়াছিলেন। ঈশ্বরগুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরে' যাহার প্রথম ক্ষীণরশ্মি দেখা দিয়াছিল, একদিকে 'তত্ত্ববোধিনী' ও 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' এবং অপর দিকে 'আলাল' ও 'হুতোমে' যাহা দ্বন্দ্ব-সংশয় ভেদ করিয়া আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজিতেছিল, কিন্তু বিদ্যা ও কবিত্বের দোটানায় পড়িয়া সুরেন্দ্রনাথ, হেম, নবীন প্রভৃতির কাব্যসাধনায় যাহা ভাব ও কল্পনার সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারে নাই—এবং একমাত্র বঙ্কিম

মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের দৈবী প্রতিভায় যাহা একটি সুসম্পূর্ণ বাণীরূপ লাভ করিয়াছিল—সত্যেন্দ্রনাথ তাহারই মূল প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়াছিলেন। তিনি সেই যুগের ভাবনা কামনা ও সাধনাকে, কল্পনার তুঙ্গ শিখর হইতে সাধারণের সমতল মনোভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সংস্কৃতির মূলে ছিল বর্ত্তমানের সঙ্গে অতীতের যোগসাধনের প্রয়াস—বিদেশী আদর্শকে স্বীকার করিয়া তাহারই কষ্টিপাথরে স্বজাতি ও স্বদেশের অতীতকে খাঁটি সোনার ঔজ্জ্বল্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার আকাঙ্ক্ষা। বর্ত্তমান যাহা অনুভব করিতেছে অতীতের সহিত তাহার বিরোধ নাই; ভারতীয় সাধনার ধারায় মানব-সভ্যতার সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশ অব্যাহত ছিল, সেই ধারা শেষের দিকে শৈবালাচ্ছন্ন হইয়াছে মাত্র—এই যে আশ্বাস ও আত্মপ্রসাদ, সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার কবিতায় তাহাই ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই হিসাবে তিনি একটা যুগের বাস্তব ভাবচিন্তা আশা-আকাঙ্ক্ষার চারণ-কবি। এই কারণে ইংরেজ কবি টেনিসনের সহিত তুলনার কথা মনে আসে। টেনিসনও তাঁহার যুগের ইংরেজ-সমাজের ভাবনা ধারণা আশা-আকাঙ্ক্ষার কবি ছিলেন; তাঁহার কবিতাতেও কল্পনার ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ ছিল, এবং একটা রক্ষণশীল মনোভাবের ক্ষুদ্র আত্মসন্তোষ ছিল। কিন্তু টেনিসন যেমন একদিকে কবিহিসাবে সত্যেন্দ্রনাথের চেয়ে নিপুণতর শিল্পী বা রূপকার ছিলেন, তেমনই, অপরদিকে তাঁহার ভাবদৃষ্টি নিজ যুগের শ্রেষ্ঠতা-বোধে এতই নিঃসংশয় ছিল যে, তিনি মানব-সভ্যতার অতীত ধারায়—দেশ, জাতি ও কালের বিচিত্র বহুমুখী প্রতিভার—মূল্য বুঝিতে অপারগ হইয়াছিলেন। নিজ জাতি ও নিজ যুগের কীর্ত্তিগৌরবে এতই বিশ্বাসী ছিলেন যিনি, তিনি একটা সঙ্কীর্ণ কাল ও সঙ্কীর্ণ সমাজের বিদ্যা, ধর্ম্ম ও নীতির আদর্শকেই বিশ্বের উপযোগী মনে করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই; এইখানেই টেনিসনের কবিশক্তির খর্ব্বতা ঘটিয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথ আরও সংস্কারমুক্ত ছিলেন,—তিনি মানুষের ভাগ্য, শক্তি ও প্রতিভাকে সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে সমান গৌরবের অধিকারী বলিয়া মনে করিতেন। এজন্য তাঁহার জাতীয়তাবোধ যেমন উদারতর ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তেমনই, বর্ত্তমানের প্রতি শ্রদ্ধা ও বৃহত্তর ভবিষ্যতের প্রতি আস্থা ছিল। সত্যেন্দ্রনাথের রচনার যে প্রাচুর্য্য, এবং তাহার মধ্যে যে বলিষ্ঠ ভাবুকতা, ভাষার শুচিতা ও ছন্দের অজস্রধারা, শব্দালঙ্কার ও দৃষ্টান্ত-সমুচ্চয়ের নিপুণ প্রগলভতা, এবং সর্ব্বোপরি—প্রকৃতি বা বহির্জগৎ সম্বন্ধে যে অতি-প্রখর কৌতূহল লক্ষ্য করা যায়, তাহাতে বাংলা কাব্যে তিনি একটি বিশিষ্ট কবিপ্রকৃতির পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। এই প্রবন্ধে আমি সত্যেন্দ্রনাথের কবিকীর্ত্তি ও কবিমানসের প্রধান লক্ষণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তারিত আলোচনা করিব।

(২)

উপরে সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-প্রকৃতি এবং কবিমানস দুইয়েরই কিছু পরিচয় দিয়াছি,

এক্ষণে তাঁহার কবিতার পরিচয় দিব। যাঁহারা কবিতার একটি বিশেষ আদর্শ ধরিয়া কাব্যবিচার করেন তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, যেহেতু কাব্য মানুষেরই মনের সৃষ্টি, এবং সেই মনে রসের অনুভূতি অশেষ প্রকারে হইয়া থাকে, অতএব তাহার প্রকাশের রূপও বহুবিধ হইবার কথা। উৎকৃষ্ট কাব্য বলিতে আমরা কি বুঝি তাহা বলা সহজ নয়, কাব্যের একটা সংজ্ঞা যেমন করিয়াই নির্দ্দেশ করি না কেন—দেখা যাইবে, শেষ পর্য্যন্ত সেই সংজ্ঞার বাহিরে এমন বস্তুও থাকিয়া যায় যাহা আমাদের অন্তরে কোন এক প্রকার রসোদ্রেক করিয়া থাকে। আমি পূর্ব্বে রোমাণ্টিক ও ক্লাসিক্যাল কাব্যের যে দুই প্রকৃতির কথা বলিয়াছি তাহাতেও কাব্যের সকল পরিচয় নিঃশেষ হয় নাই; খুব বড় কল্পনা যে কাব্য সৃষ্টি করে তাহার রসপ্রেরণা রসিকের চিত্তে নিষ্ফল হইবার নয়, অতএব সেখানে কোন প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু কাব্য বলিতে আর একটি বস্তু বুঝায়, তাহার নাম—শব্দার্থের চমকপূর্ণ বাণী। আমি কেবল বাক্‌চাতুরীর কথাই বলিতেছি না—বিশিষ্ট ভাবসম্পদ এবং অর্থ-গৌরবযুক্ত ছন্দোবদ্ধ বাণীর কথাই বলিতেছি। এরূপ কাব্যকে আমরা মনঃপ্রধান বলিতে পারি কিন্তু তবুও তাহা কাব্য; কারণ, সেইরূপ রচনায়—ভাবের জগৎ না হইলেও—একটা বাণীর জগৎ সৃষ্টি হইয়া থাকে; শব্দের মার্জ্জিত মুকুরে বস্তুর বস্তুরূপ, এবং ভাবের অর্থ-শ্রী উজ্জ্বল ও স্ফুটতর হইয়া উঠে। ইহাও প্রতিভাসাপেক্ষ, ইহাও কবিকর্ম্ম। সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যগুলি ধীরভাবে পাঠ করিলে স্বীকার করিতেই হয় যে, তাহাতে যে সাধনা ও শক্তির পরিচয় রহিয়াছে তাহা সামান্য নয়; সেই বাগর্থের নিপুণ যোজনা, ভাষার বৈভব ও ছন্দের বৈচিত্র্য, বাংলাসাহিত্যের যে অভাব পূরণ করিয়াছে তাহা আর কাহারও দ্বারা হইত না।

কিন্তু এরূপ বিচার বিতর্ক অপেক্ষা কবিতার সহিত একেবারে সাক্ষাৎ পরিচয় করাই ভাল, কারণ,—'Example is the best definition'। আমি সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য হইতে কয়েক অঞ্জলি ফুলপল্লব তুলিয়া সকলের সম্মুখে ধরিব—একটু সাজাইয়াও লইব, কারণ, সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার বৈচিত্র্য অল্প নয়। কিন্তু তৎপূর্ব্বে সামান্য একটু ভূমিকার প্রয়োজন হইবে।

সত্যেন্দ্রনাথের মন ছিল চোখ দুইটির একেবারে ঠিক পিছনেই, এবং কানও ছিল অতিশয় প্রখর; অর্থাৎ, সমস্ত মনখানি ছিল বহির্জগতের দিকে উন্মুখ। এজন্য আমরা তাঁহার কবিতায় দুইটি জিনিষ নানা ভঙ্গিতে প্রকাশ হইতে দেখি—দেখার আনন্দ ও শোনার আনন্দ। যাহা কিছু ভিন্ন দেশের ও ভিন্ন কালের—তাহার জন্যও তাঁহার মনের ক্ষুধা অল্প ছিল না, তাই প্রকৃতির চিত্রশালা এবং পণ্ডিতের পুঁথিশালা দুইই ছিল তাঁহার সমান আশ্রয়। এই যে জানিবার ক্ষুধা এবং জানার আনন্দ—প্রধানতঃ এই দুইয়ের তাগিদে তিনি সরস্বতীর আরাধনা করিয়াছিলেন। বিহারীলালের 'সারদা' ও রবীন্দ্রনাথের 'লীলা-সহচরী—জীবনদেবতা' সত্যেন্দ্রনাথের মানসে আর এক মূর্ত্তিতে আর এক রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মানুষের ইতিহাসে, তাহার জ্ঞান প্রেম শক্তি ও পৌরুষের যেমন একটি আদর্শ

যুগ হইতে স্ফুটতর হইয়া উঠিতেছে, তেমনই বহির্জগৎও একই ছন্দে আমাদের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের পরিচর্য্যা করিতেছে,—ইহা কল্পনা নয়, ইহা ভাবাবেশের দুর্জ্জের় উপলব্ধি নয়। সৃষ্টির এই বিকাশধারা ও ছন্দের বহুবিচিত্র রূপ বাণি:ত বাঁধা পড়িয়া যে সর্ব্ব-বিদ্যা-বার্ত্তা বিধির রূপ গ্রহণ করিতেছে, সত্যেন্দ্রনাথ তাহারই আ ষ্ঠাত্রী দেবতাকে 'মহাসরস্বতী' নামে আবাহন করিয়া বলিতেছেন—

উদ্ভাসিছে সত্যলোক নি নমেষ ও তব নয়ন ;
তপোলোক করিছে চয়ন
নক্ষত্র-নূপুর-চ্যুত জ্যোতির্ম্ময় পদরেণু তব ;
জনলোকে তোমারি সে জনম-কল্পনা নবনব
পুরাতনে নবীয়ান ;—নবনব সৃষ্টির উন্মেষ !
মহীয়ান মহলোক লভি তব মানস-উদ্দেশ—
ব্যাপ্ত-পরিবেশ।
স্বর্গলোকে স্বেচ্ছা-সুখে জাগ' তুমি গীতে
দেবতার চিতে।

ভূলোকে ভ্রমর-গর্ভ শুভ্র-নীল পদ্মবিভূষণা ;
হংসারূঢ়া—ময়ূর-আসনা !
তুমি মহাকাব্য-ধাত্রী ! মহাকবিকুলের জননী !
কখনো বাজাও বীণা, কভু দেবী ! কর শঙ্খধ্বনি,—
উচ্চকিয়া উদ্দীপিয়া ; চক্রশূল ধর ধনুর্ব্বাণ ;
হল-বাহী কৃষকের ধরি হল কভু গাহ গান,—
পুলকি' পরাণ।—
সর্ব্ব-বিদ্যা-বার্ত্তা-বিধি দেখিতে দেখিতে
গড়ি' উঠে গীতে !

—'মহাসরস্বতী' : অভ্র-আবীর।

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় জ্ঞানের শুভ্র আলোক—মহাসরস্বতীর সেই জ্যোতি—ভাবে ও রূপে বর্ণময় হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের অতীত সাধনায় মানুষের যে গৌরব—সেই গৌরবের গর্ব্ব, এবং সেই জাতিরই বর্ত্তমান অধঃপতনে তীব্র গ্লানিবোধ—ইহাই তাঁহার কবিতার ভাবের দিক ; কিন্তু জ্ঞানের সেই শুভ্র আলোক যে অনুভূতির আবেগে রঙীন হইয়া উঠে তাহাও জাগ্রত অনুভূতির আবেগ—স্বপ্নকল্পনার রঙ নয়। এই ভাবের সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন—

শুভ্র তোমার অঙ্গ বিভা অগাধ শূন্যে মূর্চ্ছা পায়,
রঙীন সে হয় তবেই যবে অশ্রু আমার কূল ছাপায়।

—এই অশ্রুই বাংলা কবিতায় শব্দের মুক্তামালা হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার কবিতার আরও একদিক আছে, ধরণীর রূপ-রঙ-রেখার দিক—পঞ্চেন্দ্রিয়-সাক্ষী প্রকৃতির বহুবর্ণের ঘাঘরী, এবং তাহার নৃত্যচপল চরণযুগের মঞ্জীরধ্বনি। সত্যেন্দ্রনাথ এই রূপের সন্ধান সর্ব্বত্র করিয়াছিলেন—যেমন শিল্পে, তেমন নিসর্গে; এবং শব্দের 'মণিরতনের সঙ্গে' 'মনোযতন' মিলাইয়া ভাষার যে কলাকৌশলে তাহাকে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাও বাংলা কাব্যের একটি সম্পদ হইয়া আছে। একদিকে যেমন—

'জলের কোলে ঝোপের তলে
কাঁচপোকা-রং আলোক জ্বলে,'

তেমনই, আর এক দিকে 'তাজমহলে'র ভিত্তিগাত্রে—

সিংহলী নীলা, রাঙা আরবী প্রবাল,
তিব্বতী ফিরোজা পাথর,
বুন্দেলী হীরা-রাশি, আরাকানী লাল,
সুলেমানী মণি থরে থর,
ইরাণী গোমেদ, মরকত থাল থাল
পোখ্‌রাজ বুঁদি, গুল্‌নর।

চার্‌-কো পাহাড়-ভাঙা মসী-মর্ম্মর,
চীনা তুঁতী, অমল স্ফটিক,
যশল্‌মীরের শোভা মিশ্র-বদর,
এনেছ ঢুঁড়িয়া সবদিক,
মধুমৎস্থিব্‌ মণি ছুন্নিয়া-পাথর
দেউলে দেওয়ালী মণি-শিখ।

—'তাজ': অভ্র-আবীর

রঙ ও রূপের সন্ধানে যেমন তাঁহার চোখের ক্লান্তি নাই, তেমনই কানেরও কি পিপাসা! এই শেষেরটির সম্বন্ধে আশা করি কোন প্রমাণের প্রয়োজন নাই। এই নেশা ক্রমে এমনই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে শেষে সত্যেন্দ্রনাথের সরস্বতী কবিকে ঘুম পাড়াইয়া কানের সেই উৎকণ্ঠা চিরতরে নিবারণ করিয়াছিলেন। এইবার আমি সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য হইতে পংক্তিরাশি উদ্ধৃত করিব, তাহাতে উপরে যাহা বলিয়াছি, এবং পরে যাহা বলিব, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলিবে। এই উদ্ধৃত পংক্তিগুলির সম্বন্ধে একটি কথা বলিয়া রাখি। সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-পরিচয়ের পক্ষে এইরূপ পংক্তি-সংগ্রহের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী, কারণ, তাঁহার রচনার অজস্রতাও যেমন, বৈচিত্র্যও তেমনই; অতএব, অজস্রতার মধ্য হইতেই সেই বৈচিত্র্য প্রদর্শন করিতে হইলে নির্ব্বাচন-কর্ম্ম বড় দুরূহ হইয়া পড়ে। আমি যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি তাহার পরিমাণ সহসা বেশী বলিয়া মনে হইলেও, আসলে তাহাও অতিশয় পরিমিত; বাহুল্যের ভয়ে আমি অনেক উৎকৃষ্ট নমুনা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

আশা করি, ইহাতে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে—মূল কাব্যগুলি সকলেই আবার পড়িতে উৎসুক হইবেন। উপস্থিত এই উদ্ধৃত পংক্তিগুলিই সত্যেন্দ্রনাথের কবি-পরিচয়ের পক্ষে আমার প্রধান ভরসা ; এজন্য, পাঠকগণকে পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদটি অধিকতর যত্নের সহিত পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

(৩)

(১) প্রথমেই কবির পূজাগৃহের স্তোত্রপাঠ ও আরতির মন্ত্র একটু শুনাইব ; এ সকলের ভাষায় ও ভাবে সত্যেন্দ্রনাথের স্টাইল অতিশয় শুচি, ও সংযত—ইহা তাঁহার রচনার একটি বিশেষ গুণ।

অনাদি অসীম অতল অপার
আলোকে বসতি যার,—
প্রলয়ের শেষে নিখিল-নিলয়
সৃজিল যে বারবার,—
অহঙ্কারের তন্ত্রী পীড়িয়া
বাজায় যে ওঙ্কার,—
অশেষ ছন্দ যার আনন্দ
তাহারে নমস্কার।

ভাবের গঙ্গা শিরে যে ধরেছে,
ভাবনার জটাভার,—
চির-নবীনতা শিশু-শশী-রূপে
অঙ্কিত ভালে যার,—
জগতের গ্লানি-নিন্দা-গরল
যাহার কণ্ঠহার,—
সেই গৃহবাসী উদাসী জনের
চরণে নমস্কার।

—'নমস্কার' : কুহু ও কেকা

বসন্তের এই মৌলি-মণি আমের মউল-পুঞ্জ নে
মৌন আমার মুখর হ'ল মৌমাছিদের গুঞ্জনে !
এই নে আমার আশার স্বপন,
এই নে ব্যক্ত এই নে গোপন,
এই নে আসল, এই নে ফসল, এই ফসলের উঞ্ছ নে।

দুপুরবেলার বৈকালী হায় এই নে আমার আঁখির লোর,
সাঁঝ না হ'তেই সন্ধ্যামণি ফুট্‌ল এবার কুঞ্জে মোর;
পলাশ যখন লাল আলোকে
জম্‌ছে তিমির আমার চোখে,
শাওন-অভ্র নাম্‌ছে—যখন কুঞ্জে আবীর-রঙের ঘোর।

ভাবের কুবের ভাণ্ডারী হায়, নয় এ জনা একবারেই
চিত্ত-সাগর মথন-করা চিন্তা-মণি-মুক্তো নেই;
অকূলে'র কূল আঁকড়ি'
কুড়াই ঝিনুক, শামুক, কড়ি,
লাগিয়ে বুকে ঢেউয়ের ঝাপট পেয়েছি যা' তা' এই গো এই।

এই নে আমার অঞ্জলি গো, এই নে আমার অঞ্জলি,—
বীণায় যে গান ধরেছিলাম হয় তো এ তার শেষ কলি;
"আবির্" "আবির্" মন্ত্র-রাবে
কর্ গো সফল আবির্ভাবে
অশ্রু-গ্লানির অভ্র-আবীর আঁখির আলোয় উজ্জ্বলি'।

—'অঞ্জলি': অভ্র-আবীর

একটি তারার একটু শুভ্র আলো
জাগিয়ে রেখ আমার যাত্রা-পথে,
ঘির্‌বে যেদিন মৃত্যু-আঁধার কালো,
ফির্‌তে যেদিন হবে নীরব রথে;
যম-নিয়মের নিমে যখন সকল তনু তিতা;—
দয়া রেখো পিতা! আমার পিতা!

—'ভিক্ষা: কুহু ও কেকা

(২) সত্যেন্দ্রনাথের ভাব-কল্পনা বা ভাবুকতার সৌন্দর্য্য; ইহাও সত্যেন্দ্রনাথের কবিত্বের একদিক।

বিস্ময়ে বিহ্বল-চিত্ত ভগীরথ ভগ্নমনোরথ
বৃথা বাজাইল শঙ্খ, নিলে বেছে তুমি নিজপথ;
আর্য্যের নৈবেদ্য, বলি, তুচ্ছ করি, হে বিদ্রোহী নদী!
অনাহূত—অনার্য্যের ঘরে গিয়ে আছ সে অবধি!

সেই হ'তে আছ তুমি সমস্যার মত লোকমাঝে
ব্যাপৃত সহস্র ভুজ বিপর্য্যয় প্রলয়ের কাজে।

দম্ভ যবে মূর্ত্তি ধরি' স্তম্ভ ও গুম্বজে দিনরাত
অভ্রভেদী হ'য়ে ওঠে, তুমি না দেখাও পক্ষপাত

তার প্রতি কোনদিন ; সিন্ধু-সখী ! হে সাম্যবাদিনী !
মূর্খে বলে কীর্ত্তিনাশা, হে কোপনা ! কল্লোলনাদিনী !
ধনী দীনে একাসনে বসায়ে রেখেছ তব তীরে,
সতত সতর্ক তারা অনিশ্চিত পাতার কুটিরে ;

না জানে সুপ্তির স্বাদ, জড়তার বারতা না জানে,
ভাঙনের মুখে বসি' গাহে গান প্লাবনের তানে ;
নাহিক বাস্তুর মায়া, মরিতে প্রস্তুত চিরদিনই !
অয়ি স্বাতন্ত্র্যের ধারা ! অয়ি পদ্মা ! অয়ি বিপ্লাবিনী !

—'পদ্মার প্রতি' : কুহু ও কেকা

'গম্' ধাতু তোর দেহের ধাতু 'গঙ্গাহৃদি' নামটি গো,
গতির ভুখে চলিস্ রুখে, বাংলা ! সোনার তুই মৃগ !
গঙ্গা শুধুই গমন-ধারা তাই সে হৃদে আঁকড়েছিস,—
বুকের সকল শিকড় দিয়ে গতির ধারা পাকড়েছিস্ !
সংহিতাতে তোমায় কভু করতে নারে সংযত,
বৌদ্ধ নহিস্, হিন্দু নহিস্, নবীন হওয়া তোর ব্রত ;
চির-যুবন্-মন্ত্র জানিস্ চির-যুগের রঙ্গিনী,
শিরীষফুলে পান-বাটা তোর ফুল্ল কদম-অঙ্গিনী !
হেসে কেঁদে সাধিয়ে সেধে চলিস্, মনে রাখিস্ নে,
মনু তোরে মন্দ বলে,—তা তুই গায়ে মাখিস্ নে।
কীর্ত্তিনাশা স্ফূর্ত্তি তোমার, জানিস্ নে তুই দীর্ঘশোক,
অপ্‌রাজিতা-কুঞ্জে নিতি হাসছে তোমার কাজল-চোখ !

—'গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি' : অভ্র-আবীর

আমি 'স্বর্গদ্বারে' খোলা দেখি আজ
স্বর্গের সব দ্বার,
ওগো হের 'আনন্দ- বাজারে' হেথায়
দেবতা দেছেন 'বার' !
জাতি-পাঁতি-কুল মূল খোয়াল রে,
প্রেমে হ'ল একাকার।

ওই নীল-বিভ্রমে আকাশের আলো
দিকে দিকে 'দশা' পায়,
আর 'ঊর্মি' বায় বায়ু আয়ুহীন সম
মুহু মুহু মুরছায় ;
ব্যাপি' ক্ষিতি অপ্ অপ্সরা সব
সরে যায়, ফিরে চায়।

ওরে, কারা পিয়ে আজো মদের মদিরা ?
কে পিয়ে মোহের ভাঙ্ ?
ওই আদি-মৃদঙ্গ বোলে তরঙ্গ
'ধিক্ তান্' 'ধিগেতান্'।
দেবতার দ্বারে কে দ্বিজ শূদ্র ?
কিবা সোনা ? কিবা রাঙ্ ?
—'স্বর্গদ্বারে' : অভ্র-আবীর

(৩) কল্পনা-বিলাস বা কারু-কল্পনা। সত্যেন্দ্রনাথের সকল ভাবুকতা, তত্ত্ব ও নীতিচিন্তার অপর দিক ; শিল্পী-মনের এই ক্রীড়াশীলতা, সত্যেন্দ্রনাথের কবি-প্রকৃতির প্রধান লক্ষণ। ইহা খাঁটি কল্পনার রসাবেশ নয়—সজ্ঞান বুদ্ধিবৃত্তির কারু-কুশলতা ; এ সম্বন্ধে আমি পরে বলিব।

রৌদ্র বাড়িল, নিদ্রা ছাড়িয়া
উঠিল মেঘের দল,
শিখরে শিখরে চরণ রাখিয়া
চলিয়াছে টলমল ;
দেখিতে দেখিতে বিশ্ব'য়ের এই
পাষাণ-যজ্ঞশালে
শত বরণের সহস্র মেঘ
জুটিল অচির কালে !
চমরী-পুচ্ছ কটিতে কাহারো
ময়ুর-পুচ্ছ শিরে,
ধূমল বসন পড়িয়া কেহ বা
দাঁড়াইল সভা ঘিরে।
সহসা কুহেলি পড়িল টুটিয়া,
অমনি সে গরীয়ান্
উদিল বিপুল হৈম মুকুটে
গিরিরাজ হিমবান্।

আজি দলে দলে গিরিসভাতলে
মেঘ জুটিয়াছে যত,
প্রমথনাথেরে ঘিরিয়া ফিরিছে
প্রমথদলের মত !
নীরবে চলেছে গিরি-প্রধানের
সভার কর্ম্মচয়,
সৃজন, পালন—বহু আয়োজন
ওই সভাতলে হয় ;
কোন্ ক্ষেতে কত বরষণ হবে,—
কোন্ মেঘ যাবে কোথা,—
সকলের আগে হয় প্রচারিত
ওইখানে সে বারতা ;
শিখরে শিখরে তুষার-মুকুরে
ঠিকরে কিরণ-জ্বালা,
মুহূর্ত্তে যায় দেশ দেশান্তে !
গিরির নিদেশমালা !

আমি চেয়ে থাকি অবাক্ নয়নে
বসি' পাথরের স্তূপে,
সৃষ্টিক্রিয়ার মাঝখানে যেন
পশেছি একেলা চুপে !
হাজার নদের বন্যা-স্রোতের
নিরিখ্ যেখানে রয়,—
লক্ষ লোকের দুঃখ সুখের
হয় যেথা নির্ণয়,—
মেঘেরা যেখানে দূর হ'তে শুধু
বৃষ্টি মারে না ছুড়ে,—
পাশাপাশি হাঁটে মানুষের সাথে,-
প'ড়ে থাকে সানু জুড়ে ;
কখনো দাঁড়ায় ভঙ্গি করিয়া
কীর্ত্তনিয়ার মত,—
কেহ মৃদঙ্গে করে মৃদুধ্বনি,
কেহ নর্ত্তনে রত

কখনো আবার মেঘের বাহিনী
ধরে গো যোদ্ধৃবেশ,—
মৃত্যুতে যেন মর্ত্ত্য-প্রেতের
কলহ হয় নি শেষ!
কৌতুকে মিহি চাঁদের সুতায়
ওড়না ওড়ায় কেহ,
তারি ভারে তবু পলে পলে যেন
ভাঙিয়া পড়িছে দেহ!
আমি ব'সে আছি এ সবার মাঝে
এই দূর মেঘলোকে,
নিগূঢ় গোপন বিশ্ব-ব্যাপার
নিরখি চর্ম্ম-চোখে!

—'মেঘলোকে': কুহু ও কেকা

ভাটফুলে তোর আগুন ঝাঁটায়, জল-ছড়া দেয় বকুল তায়,
ভাট-শালিকে বন্দনা গায়, নকীব হেঁকে চাতক ধায়,
নাগ-কেশরে চামর করে, কোয়েল তোষে সঙ্গীতে,
অভিষেকের বারি ঝরে নিত্য চির-পুঞ্জতে।
তোমার চেলী বুনবে ব'লে প্রজাপতি হয় তাঁতী,
বিনি-পশুর পশম তোমায় জোগায় কাপাস দিনরাতি,
পর-গাছা ওই মল্লি-আলী বিনি-সুতার হার গাঁথে,
অশথ-বট আর ছাতিম-পাতার ছায়ার ছাতা তোর মাথে।
তুঁষের ভিতর পীযুষ তোমার জমছে—দানা বাঁধছে গো,
গাছের আগায় জল-রুটি তোর পথিক জনে সাধছে গো!

গলায় তোমার সাতনরী হার মুক্তাঝুরির শতেক ডোর;
ব্রহ্মপুত্র বুকের নাড়ী, প্রাণের নাড়ী গঙ্গা তোর।
কিরীট তোমার বিরাট হীরা হিমালয়ের জিম্মাতে,—
তোর কোহিনূর কাড়বে কে বল? নাগাল না পায় কেউ হাতে।
তিস্তা তোমার ঝাপ্টা সিঁথি—যে দেখেছে সেই জানে,
ডান কানে তোর বাঁকার ঝিলিক্, কর্ণফুলী বাম কানে।

—'গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি': অভ্র-আবীর

কতই কথা লিখছে সাগর, লিখছে বারো মাস,
উতলা ঢেউ লিখছে সাগর-মথন-ইতিহাস;

দেখছি আমি মুহুর্মুহু জাগছে দিকে দিকে
সাপের রশ্মি সাপের ফণা চিহ্নিত স্বস্তিকে ;
উঠছে সুধা, ফুটছে গরল ; যাচ্ছে যেন চেনা
আঢ়ক-হাতে লক্ষ্মী !—সাথে লক্ষ্মী-কড়ি ফেনা ।
ছন্দে ওঠে মন্দ ভালো ; চলছে অভিনয়—
দেবাসুরের দ্বন্দ্ব-লীলা দুরন্ত দুর্জ্জয় ।

ঝড়ের বেগে ঝাণ্ডা নিশান ওঠে এবং পড়ে,
নীল-জাঙিয়া নীল আঙিয়া অসুরগুলো লড়ে ।
হঠাৎ হ'ল দৃশ্য বদল উল্‌টে গেল পট—
ঘাঘরা ঘোরায় কোন্ মোহিনী মাথায় সোনার ঘট ।
তারে ঘিরে অপ্সরীরা তরফা নেচে যায়,
ফেনার চারু চিকণ কারু দুল্‌ছে পায়ে পায় ।

—'পুরীর চিঠি' : অভ্র-আবীর

বাহুপাশে বাঁধা বাহু গৌরী ও কৃষ্ণা !
কোলাকুলি করে একি তৃপ্তি ও তৃষ্ণা !
কালোচুলে পিঙ্গলে একি বেণীবন্ধ !
ঘুচে গেল কালো-গায় গোরা-গায় দ্বন্দ্ব !
সখী-সুখে মুখে মুখে দুহুঁ নিঃসঙ্গা !
জয়তু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

দেহ প্রাণ একতান গাহে গান বিশ্ব !
অমা চুমে পূর্ণিমা ! অপরূপ দৃশ্য !
চুয়া মিলে চন্দনে ! বর্ণ ও গন্ধ !
চির চুপে চাপে বুকে শতরূপা-ছন্দ !
অঞ্জন-ধারা সাথে চলে অকলঙ্কা !
জয়তু যমুনা জয়, জয় জয় গঙ্গা !

অপরূপ ! অপরূপ ! আনন্দ-মল্লী !
অপরাজিতার হারে পারিজাত-বল্লী !
দ্রবময় দর্পণে হরিহর-মূরতি !
অপরূপ ! দ্রব-ধূপ দ্রব-দীপে আরতি !
মন হরে ! জয় করে সঙ্কোচ শঙ্কা !
জয়তু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

—'যুক্তবেণী' : বেলাশেষের গান

(৪) ভাব ও ভাষার আলঙ্কারিকতা (Rhetoric)। সত্যেন্দ্রনাথের রচনায় নিছক শব্দার্থের কারুকলা প্রায় সর্ব্বত্র দেখা যাইবে, এবং তাহাতে প্রাচীন কাব্যরীতির সেই রসসৃষ্টি অনেক স্থলেই জয়যুক্ত হইয়াছে। এখানে আমি, কেবল শব্দার্থঘটিত নয়—আলঙ্কারিক রস-প্রেরণার যে নিদর্শন উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা সকল কবি-মনের একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি।

ওগো বিধাতা আমায় এমন করেছে,—
দুষ্কর ব্রতে করেছে ব্রতী,
তাই পুষ্কর মেঘে মজে আছে মন,
নাই সে পুষ্করিণীর প্রতি।
—'চাতকের কথা': কুহু ও কেকা

অগ্নিহোত্রী মিলেছে হেথায় ব্রহ্মবিদের সাথে,
বেদের জ্যোৎস্না-নিশি মিশে গেছে উপনিষদের প্রাতে;
—'বারাণসী': কুহু ও কেকা

রবির অর্ঘ্য পাঠিয়েছে আজ ধ্রুবতারার প্রতিবাসী,
—'রবীন্দ্রনাথের নোবেল-প্রাইজ': অভ্র-আবীর

একটি চিতায় পুড়ছে আজি আচার্য্য আর পুড়ছে লামা,
প্রোফেসার আর পুড়ছে ফুডি, পুড়ছে শমস্-উল্-উলামা,
পুড়ছে ভট্ট, সঙ্গে তারি মৌলবী সে যাচ্ছে পুড়ে;
ত্রিশটি ভাষার বাসাটি হায় ভস্ম হ'য়ে যাচ্ছে উড়ে।

একত্রে আজ পুড়ছে যেন কোকিল, 'কুকু', বুলবুলেতে,—
দাবানলের একটি আঁচে নীড়ের পিঠে পক্ষ পেতে;
পড়ছে ভেঙে চোখের উপর বর্ত্তমানের বাবিল্-চূড়া,
দানেশ-মন্দী তাজ সে দেশের অকালে আজ হচ্ছে গুঁড়া।
—'শ্মশান-শয্যায় আচার্য্য হরিনাথ': কুহু ও কেকা

ঘরের ছেলের চক্ষে দেখছি বিশ্বভূপের ছায়া,
বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।
—'আমরা': কুহু ও কেকা

চৌদ্দ প্রদীপে চৌদ্দ ভুবন উজল করি,
বিস্মৃত শত অমা-যামিনীর কাজল হরি;

কল্পনা দিয়ে করি গো সৃজন কল্প-লতা,—
অভ্র-হিমানী-জড়িত আকাশে অতীত-কথা।

*　　*　　*

চৌদ্দ প্রদীপে সপ্তঋষিরে স্মরণ করি;
ত্রিশঙ্কু আর বিশ্বামিত্রে বরণ করি;
বাল্মীকি আর কালিদাস কবি জাগিছে মনে,
দোলাইয়া শিখা নমিছে প্রদীপ দ্বৈপায়নে।

*　　*　　*

ভীষ্মের স্মৃতি উজলিছে দীপ হৃদয়-লোকে,—
সারা ভারতের পিতামহ সেই অপুত্রকে।
জাগে বিক্রম অভিনব নবরত্নে ধনী,
যবনী রাণীর বক্ষে জাগিছে মৌর্য্যমণি।
লুপ্তদিনের বিস্মৃতি-লেপ ঘুচেছে কালো,
চৌদ্দ প্রদীপে আজকে চৌদ্দ ভুবন আলো।

কোলাকুলি আজ তিমিরে দোলায়ে আলোর দোলা
চৌদ্দ যুগের চৌদ্দ হাজার ঝরোখা খোলা!
এপারে প্রদীপ—উল্কা ওপারে উলসি' ওঠে,
পিতৃযানের মাঝখানে আজ বার্ত্তা ছোটে;
আনাগোনা আজ জানা যেন যায় আকাশ 'পরে,
পিতৃগণের পদ-রেণু আজ আঁধারে ঝরে!
আঁধার-পাথারে আকুল হৃদয় পেয়েছে ছাড়া,
চৌদ্দ প্রদীপে চৌদ্দ ভুবনে জেগেছে সাড়া।

—'চৌদ্দ প্রদীপ': কুহু ও কেকা

জিত মরণের বুকে গাড়িয়া নিশান,
　　জয়ী প্রেম তোলে হের শির,
ধবল বিপুল বাহু মেলি চারিপান
　　ঘোষে জয় মৌন গভীর,
চিরসুন্দর 'তাজ' প্রেমে নিরমাণ
　　শিরোমণি মরণ-ফণীর।

—'তাজ': অভ্র-আবীর

(৫) বাক্-চাতুরী ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্য (Epigram, Wit, Satire)—সত্যেন্দ্রনাথের রচনা সম্বন্ধে ইহারও একটু পৃথক উল্লেখ আবশ্যক। পূর্ব্বে তাঁহার কবিপ্রকৃতির যে লক্ষণ-

গুলি দেখাইয়াছি—এই লক্ষণটি মূলে সেই একই প্রবৃত্তির পরিচায়ক হইলেও এ বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথের শক্তি যেন তাঁহার, কবি-স্বভাব অপেক্ষা জাতি-স্বভাবের মূলগত বলিয়া মনে হয়। এখানে তিনি ঈশ্বরগুপ্তপ্রমুখ কবি, ও কবিওয়ালাগণের বংশধর;—অথবা, আরও প্রাচীন কাল হইতেই রাঢ়দেশের বাঙালী সমাজে যে এক প্রকার চটুল ও মুখর রসিকতা ভাষার সাহায্যে বড় উপভোগ্য হইয়া আসিতেছে, সত্যেন্দ্রনাথ সেই সমাজ ও সেই ভাষার কবিহিসাবে, সেই রসিকতাই যেন সহজাত শক্তির মত লাভ করিয়াছিলেন।

বল্‌ব ভাবি—'প্রিয়া' 'প্রাণেশ্বরী'
ছেড়ে দিয়ে 'শুনছ ?' 'ওগো !' 'হাঁ গো' ;
বল্‌তে গিয়ে লজ্জাতে হায় মরি,
ও সম্বোধন ওদের মানায় নাকো।...
ওসব যেন নেহাৎ থিয়েটারী,
যাত্রা-দলের গন্ধ ওতে ভারি,
'ডিয়ার'টাও একটু ইয়ার-ঘেঁষা,
'পিয়ারা' সে করবে ওদের খাটো,—
এর তুলনায় 'ওগো' আমার খাসা,—
যদিও,—মানি—একটু ঈষৎ মাঠো।

ঈষৎ মাঠো এবং ঈষৎ মিঠে
এই আমাদের অনেক দিনের 'ওগো',
চাষের ভাতে সদ্য ঘিয়ের ছিটে—
মন কাড়িবার মস্ত বড় Rogueও!
ফুল-শেযে সেই মুখে-মুখের 'ওগো !'
রোগের শোকের দুঃখ-সুখের 'ওগো !'
সব বয়সের সকল রসে ঘেরা,—
নয় সে মোটেই এক-পেশে একচোখো ;
বাংলা ভাষা সকল ভাষার সেরা,
স্নিগ্ধ মধুর ডাকের সেরা 'ওগো'।
—'ওগো' : কুহু ও কেকা

বর্ষার মশা বেজায় বেড়েছে,
খালি শোন 'শন্ শন্'—
ক্ষুদে ক্ষুদেগুলো ভায় বা থামিয়ে
ভ্রমরের গুঞ্জন!

* * *

বিশ্রাম নাই, 'পঙ্' 'পিঙ্' 'পাই'—
রব করে ফিরে ঘুরে,
"মোরাও ভোমরা" ভণিতা করিয়া
ভণে যেন নাকী সুরে।

হেসে বাণী কন্—"কেন
কমল-লোচন, ওরে!
ঘোলাটে রাতের অপচার ওরা—
প্রভাতেই যাবে স'রে।
হবে অদৃশ্য ; তাড়াতে হবে না
কিটিঙের গুঁড়া দিয়া,
হবে না তা ছাড়া, মশার কামড়ে
ভোমরার ম্যালেরিয়া।"
—'বর্ষার মশা' : বিদায়-আরতি

ত্যাথ, বর্ণধর্ম্মে করি' অবহেলা
দেবতারও নাহি অব্যাহতি,
হেঁ হেঁ, ক্যাল্‌ক্যালাইয়া কি দেখিছ বাপু?
বোসো, ঐখানে শুনিবে যদি।
ঐ খুটিঙের চূণ চেয়ে সাতগুণ
রং ছিল মহেশের সাদা রে!
তিনি করিলেন বিয়ে হলুদ-বরণা
উমারে,—গ্রহের ফের দাদা রে!
তাহে কি যে অঘটন ঘটিল, শ্রবণ
কর যদি থাকে কর্ণ, আহা!
হ'ল পার্ব্বতীসুত লম্বোদরের
চূণে হলুদিয়া বর্ণ ডাহা!
—'পাতিল-প্রমাদ' : বিদায়-আরতি

কন্যা ঘরের আবর্জ্জনা!—পয়সা দিয়ে ফেল্‌তে হয়,
"পালনীয়া শিক্ষণীয়া"—রক্ষণীয়া মোটেই সে নয়!
ভদ্র ধাঙড় আছেন দেশে করেন যাঁরা সদ্‌গতি,
কামড় তাদের অর্দ্ধরাজ্য,—পরের ধনে লাখ-পতি।

হায় অভাগ্য ! বাংলা দেশের সমাজ-বিধির তুল্য নাই,
কুলটাদের মূল্য আছে, কুলবালার মূল্য নাই।

—'মৃত্যু-স্বয়ম্বর' : অভ্র-আবীর

(৬) চিত্রাঙ্কণ ; শব্দচিত্র—রূপ, রং ও রেখা।

তীরে তীরে ঘন সারি দিয়ে
দেবদারু গড়েছে প্রাচীর,
বনস্থলী-মধুচক্র ভরি'
রশ্মি-মধু ঝরিছে মদির।

অকস্মাৎ চাহিল চার্ব্বাক
পশ্চিমে পড়েছে হেলে রবি,
রশ্মি-রসে ডুবু ডুবু বন,
আবির্ভূতা বনে বনদেবী !

মঞ্জুভাষা রূপে বনদেবী
শিরে ধরি' পাষাণ কলস,
আসে ধীরে আশ্রম-বাহিরে
গতি ধীর, মন্থর, অলস।

পর্ণরাশি-মর্ম্মর-মঞ্জীর
পদতলে মরিছে গুঞ্জরি' ;
অযতনে কুন্তলে বল্কলে
লগ্ন তার নীবার-মঞ্জরী।

—'চার্ব্বাক ও মঞ্জুভাষা' : কুহু ও কেকা

কার বহুড়ি
বাসন মাজে ?
পুকুর ঘাটে
ব্যস্ত কাজে ;—
এঁটো হাতেই
হাতের পোঁছায়
গায়ের মাথার
কাপড় গোছায় !

গ্রামের শেষে
অশথ-তলে
বুনোর ডেরায়
চুল্লী জ্বলে ;
টাটকা কাঁচা
শাল-পাতাতে
উড়ছে ধোঁয়া
ফ্যান্‌সা ভাতে।

—'পাল্কীর গান' : কুহু ও কেকা

বজ্রহাতের হাততালি সে বাজিয়ে হেসে চায়,
বুকের ভিতর রক্তধারা নাচিয়ে দিয়ে যায় ;
ভয় দেখিয়ে হাসে আবার ফিকফিকিয়ে সে,
আকাশ জুড়ে চিক্‌মিকিয়ে চিক্‌মিকিয়ে রে।

* * *

বাদল্‌-হাওয়ায় আজ্‌কে আমার পাগ্‌লি মেতেছে ;
ছিন্নকাঁথা সূর্য্যশশীর সভায় পেতেছে !

—'বর্ষা' : কুহু ও কেকা

ফিরোজা-রং আকাশ হেথা মেঘের কুচি তায়,
গরুড় যেন স্বর্গপথে পাখ্‌না ঝেড়ে যায় !

—'দার্জ্জিলিঙের চিঠি' : কুহু ও কেকা

মেঘের সীমায় রোদ জেগেছে,
আল্‌তা-পাটি শিম্‌।

—'ইল্‌শে গুঁড়ি' : অভ্র-আবীর

হাওয়ার তালে বৃষ্টিধারা সাঁওতালী নাচ নাচতে নামে,
আবছায়াতে মূর্ত্তি ধরে, হাওয়ায় হেলে ডাইনে বামে ;
শূন্যে তারা নৃত্য করে, শূন্যে মেঘের মৃদং বাজে,
শাল-ফুলেরি মতন ফোঁটা ছড়িয়ে পড়ে পাগল নাচে।

তাল-বাকলের রেখায় রেখায় গড়িয়ে পড়ে জলের ধারা,
সুর-বাহারের পর্দ্দা দিয়ে গড়ায় তরল সুরের পারা !
দীঘির জলে কোন্ পোটো আজ আঁশ ফেলে কী নক্সা দেখে,
শোল-পোনাদের তরুণ পিঠে আলপনা সে যাচ্ছে এঁকে।

* * *

কালো মেঘের কোলটি জুড়ে আলো আবার চোখ চেয়েছে।
মিশির জমি জমিয়ে ঠোঁটে শরৎ-রাণী পান খেয়েছে।

—'চিত্র-শরৎ' : অভ্র-আবীর

গাছের গোড়া গোলটি ক'রে লিকিয়ে ছায়া তায় নিভৃতে,
সেই চাতালে রাখাল আসে একটুকু গা গড়িয়ে নিতে।
জলের তালে দুলছে মাঝি বাঁধা নায়ের ছই-তলাতে,
টুনটুনি খায় একলা কেবল করমচা-ডাল টলমলাতে।

পালান ছোঁয়া শাঁওলা ঘাসে বাছুর গরু চরছে পালে,
নাড়িয়ে দু'কান তাড়িয়ে মাছি লোটন-ল্যাজের ছেপ্‌কা-তালে ;
দীঘির জলে রূপোর ঝিলিক দেখ্‌ছে ব'সে মাছরাঙা সে,
ঢল্-নামা জল থিতায় গাঙের,—যার ত্যাখা তার পাড় ভাঙা যে।

* * *

চরের পরে ঝিমায় কাছিম, চোখের পাতে মোতির দানা,

—'আলোর পাথার' : বিদায়-আরতি

উষার আভাস জাগল কিরে ?—দিনমণির খুলল মণি-কোঠা ?
শুকতারাটির শিউলি-ফুলে লাগল কিরে অরুণ-রঙের বোঁটা ?
পূব-তোরণে চিড়্ খেল কি দিগ্‌বারণের নিবিড় দন্তাঘাতে ?
ধুৎরো-ফুলের ডালি মাথায় তুষার-গিরি জাগছে প্রতীক্ষাতে !
মুক্তা-ফলের লাবণ্য কি আমেজ দিল মুক্ত নীলাম্বরে ?
দিগ্‌বধূরা চামর করে আকাশ-আলোর বিরাট্ হরিহরে ?

* * *

হোরার কালো চুলের রাশে কোথায় থেকে ধূপের ধোঁয়া লাগে,
বন্-কপোতের গ্রীবার নীলে জাফ্‌রাণী-নীল মিলায় অনুরাগে।

* * *

পারিজাতের দল ছিঁড়ে কে ছোট্ট মুঠায় ছড়ায় গগন হ'তে
দেও-ডাঙাতে টিপরাঙাতে আনন্দে দুধ-গঙ্গাজলের স্রোতে,
কোন্ ব্রত আজ গৌরী করেন রজতগিরির ভালে সিঁদুর দিয়ে,
হেম হ'ল গা শঙ্করের ওই হৈমবতীর পরশ-পুলক পিয়ে।

—'সিকলে সূর্য্যোদয়' : বিদায়-আরতি

(৭) ইতিহাস-রস-

এই বারাণসী কোশল দেবীর বিবাহের যৌতুক,—
দেখিতেছি যেন বিম্বিসারের বিস্মিত স্মিতমুখ।
নৃপতি অশোকে দেখিতেছি চোখে বিহারের পইঠায়,
শ্রমণগণের আশীর্ব্বচনে প্রাণ-মন উথলায়।

সমুখে হাজার স্থপতি মিলিয়া গড়িছে বিরাট স্তূপ,
শত ভাস্কর রচে বুদ্ধের শত জনমের রূপ।
চিক্কণ চারু শিলার ললাটে লিখিছে শিল্পজীবী
ধর্ম্মাশোকের মৈত্রীকরুণ অনুশাসনের লিপি।
মহাচীন হ'তে ভক্ত এসেছে মৃগদাব-সারনাথে,—
স্তূপের গাত্র চিত্র করিছে সূক্ষ্ম সোনার পাতে।
জয়! জয়! জয় কাশী!
তুমি এসিয়ার হৃদয়-কেন্দ্র,—মূর্ত্ত ভকতিরাশি!

—'বারাণসী' : কুহু ও কেকা

কত বীর, হায়, পুজিল তোমায়,
ভজিল তোমায়, মজিল রূপে,
অন্তিমে শেষ বিছাল ও-বুকে
দেশী ও বিদেশী কত না ভূপে।
নব-গ্রহের নয়-মঞ্জিল্
কোনো সুলতান্ স্থাপল হেথা,—
ভাঙি' তেত্রিশ ঠাকুর-দুয়ারা
একের দেউল—কোনো বিজেতা।
কেহ রাজপুত বীরের মূরৎ
দ্বারপাল করি রাখিল দ্বারে,
হিন্দুরে কেহ বন্ধু মানিয়া
আধা-রাজকাজ সঁপিল তারে।
দিবালোকে তুমি "আরব-রজনী"—
খেয়ালীর চিরধাত্রী তুমি,
কত মিঞা আবুহোসেনে ক্ষেপালে
কৌতুকময়ী স্বপন-ভূমি।

*   *   *

কোথা কাশ্মীরী বেগম? কোথায়—
ইস্তাম্বুলী? কান্দাহারী?
কোথা যোধপুরী? কোথা মরিয়ম?
কোথা উদিপুরী? রাকিয়া নারী?
কোথা নূরজাহাঁ? কোথা মমতাজ?
দিল্‌রাস্‌বানু আজ কোথায়?
কোথায় দারার প্রেয়সী নাদিরা?
হামিদা, মাহম কোথায়? হায়।

কোথা জাহানারা ? শষ্প-শয়ান !
কোথা রোশিনারা ? রৌদ্রে দহে !
কিশোরী নূরিয়া, কোথায় জিনৎ ?
কেবা জানে হায়, কে তাহা কহে ?
যমুনা দেখিতে উচ্চ মীনারে
চড়িত যাহারা কই গো তারা ?
কই দিল্লীর আদিম রাণীরা ?
তোর ধূলিতলে হয়েছে হারা !
—'দিল্লী-নামা' : বেলাশেষের গান

(৮) ভাষা-বৈচিত্র্য ও শব্দযোজনার কারিগরি ; ইহার অন্ত নাই, সামান্য একটু তুলিয়া দেখাইতেছি।—

হায় কুম্ভীরকের পিঙ্গল তালু—
আকাশ পিঙ্গ ছবি,
তার জিহ্বার মত প্রান্তর চালু
রৌদ্রে শুষিছে রবি ;
হায় খাকী-রঙে খাক হ'ল দুই আঁখি
দুনিয়াটা গেল খ'রে,
তাই ঘন-বরষণ-লালসে ধরণী
বজ্র কামনা করে।

* * *

ওগো ছিল্‌মিল্ কবে বহিবে সলিল
ফেনমুখ ফণা তুলি' ?
আর ঝিল্‌মিল্ কবে দুলিবে সমীরে
তাজা অঙ্কুরগুলি ?
ওগো খালি কোল কবে ভরিবে আবার—
আর কতদিন পরে ?
হায় সফলতা লাগি' মৌনে ধরণী
বজ্র কামনা করে।
—'বজ্র-কামনা' : কুহু ও কেকা

বৃহৎ সুখে বৃংহিতে কি দিগ্‌গজেরা গর্জ্জে ?
মিলাবে কি ও অমরা ধরা আকাশ ভাঙি' বজ্রে ?

ধরণী আছে প্রতীক্ষাতে
অর্ঘ্য ধরি' স্নিগ্ধ হাতে,
সূচিত স্বরভঙ্গ তার কেকার রবে বড়্‌জে।

—'প্রাবৃটের গান' : কুহু ও কেকা

ঘুরে ঘুরে ঘুম্‌তী চলে, ঠুম্‌রী তালে ঢেউ তোলে।
বেল্‌-চামেলীর চুম্‌কি চুলে, ফুলেল হাওয়ায় চোখ ঢোলে।
কুড়ুক পাখীর উলুর রবে ঘুম ভাঙে তার, দিন কাটে,
ঝীঁঝিঁ-দোয়েল-শালিক-শ্যামা-বুলবুলিদের কন্‌সার্টে।
শণের ফুলে ছিটিয়ে সোনা শরৎ তারে সাজিয়ে যায়,
ঝিঙি-ফুলের কনক-জবা তার নিকষে যাচিয়ে যায়।
হেমন্ত ভেট দ্বার তাহারে আনন্দে দুই হাত ভরি'
মুক্তো-কাটা গাজর-ফুলের চিকণ চারু ফুল্‌করী ?

*　　*　　*

কাজরী যখন গায় মেয়েরা, বাদল-মেঘে থির কাজল,
অঢেল্‌ কেয়ার পরাগ মেখে তুই হ'য়ে যাস্‌ কেওড়া-জল।
খোস্‌বায়ে তোর খুসীর হাওয়া সোতের পিছন সঞ্চরে,
ফুলগুলো ধায় ফড়িং হ'য়ে উড়ন-ফুলের রূপ ধরে।
ঘুরে ঘুরে ঘুম্‌তী চলিস্‌ ঝুম্‌কো-ফুলের বন দিয়ে,
ঢেউ-ঝিলিকে মাণিক জ্বেলে চাঁদের নয়ন নন্দিয়ে।

—'ঘুম্‌তীনদী' : বিদায়-আরতি

(৯) ভাব, কল্পনা ও ভাষায় খাঁটি সত্যেন্দ্র-রীতি—

রসের ভিয়ান্‌ চড়িয়েছে রে নতুন বা'নেতে ;
তাতারসির মাতানো বাস উঠেছে মেতে।
মাটির খুরি, পাথর-বাটি
কি নারকেলের আধ্‌-মালাটি,
বাঁশের চুঙি পাতার ঠুঙি আন্‌রে—ধর্‌ পেতে।
রসের ভিয়ান্‌ আজকে সুরু নতুন বা'নেতে।

জিরেন্‌ কাটে যে রসখানি জিরিয়ে কেটেছে,
টাট্‌কা রসের সঙ্গে সে ভাই কেমন খেটেছে।
শুক্‌নো পাতার জ্বাল জ্বলেছে,
কাঁচা-সোনার রং ফলেছে,
বোল্‌ বলেছে—ফুটন্ত রস গন্ধ বেঁটেছে।
জিরেন্‌ কাটে রসের ধারা জিরিয়ে কেটেছে।

রসের ভিয়ান্ যার করেছি আমরা বাঙালী,
রস তাতিয়ে তাতারসি, বলেন্ পাটালি।
রসের ভিয়ান্ হেথায় সুরু,
মধুর রসের আমরা গুরু,
(আজ) তাতারসির জন্মদিনে ভাবছি তাই খালি—
আমরা আদিম সভ্য জাতি আমরা বাঙ্গালী।

—'তাতারসির গান' : অভ্র-আবীর

এই মাটি গো এই পৃথিবী—এই যে তৃণ-গুল্মময়,—
তারার হাটে মাটির ভাঁটা,—তাই ব'লে এ তুচ্ছ নয়।

মাটিই আবার মরণ-কাঠি, মাটির কোলে উদয় লয়,
যে মাটিতে ভাঁড় গড়ে রে তাতেই মানুষ মানুষ হয়।
মাটির মাঝে যা' আছে গো সূর্য্যেও তার অধিক নেই,
তড়িৎ-সুতার লাটাই মাটি, জীবন-ধারার আধার সেই।

—'মাটি' : কুহু ও কেকা

কালো ব্যাসের কৃপায় আজো বেঁচে আছে বেদের বাণী,
দ্বৈপায়ন—সেই কৃষ্ণ কবি—শ্রেষ্ঠ কবি তাঁরেই মানি ;
কালো বামুন চাণক্যেরে
আঁটবে কে কূট-নীতির ফেরে ?
কাল-অশোক জগৎ-প্রিয়,—রাজার সেরা তাঁরে জানি ;
হাব্‌সী কালো লোক্‌মানেরে মানে আরব আর ইরাণী।

—'কালোর আলো' : কুহু ও কেকা

(৪)

সত্যেন্দ্রনাথের রচনায় যে পরিচয় দিলাম তাহাতে দেখা যাইবে যে তাহার ভাববস্তু—খাঁটি কল্পনাত নহেই, অনেক স্থলে বুদ্ধি, বিদ্যা, ভাবনা ও সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির ফল। বস্তু এবং চিন্তা উভয়ের সম্পর্কেই তাঁহার একপ্রকার ভাবগ্রাহিতা ছিল—ভাববিলাসও ছিল, তাহাকেই তিনি শব্দার্থের কৌশলে যেমন অর্থবান, তেমনই সুন্দর করিয়া প্রকাশ করিতে

পারিতেন ; অনেক স্থলে ছন্দ বাদ দিলেও কেবল শব্দ ও ভাষার কারিগরিতে তাহা এক ধরণের রস-রচনা বলিয়া গণ্য হইতে পারে। সত্যেন্দ্রনাথের কবিমানসের যে পরিচয় দিয়াছি, তাহাতে তাঁহার কবিতা এইরূপ গদ্যধর্ম্মী হওয়া বিচিত্র নয় ; কিন্তু ইহাও সত্য যে ছন্দ তাঁহার রচনার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, কবি যে ছন্দের সাহায্য বিনা লিখিতেই পারিতেন না, ইহা নিশ্চিত। ইহার কারণ কি? ছন্দ তাঁহার ভাষার নিত্যসঙ্গী, এমন কি, সেই ভাষাকে শক্তি ও মূর্ত্তি দিয়াছে ঐ ছন্দ ; তাঁহার সকল চিন্তা ও ভাববস্তুর মূলে নিশ্চয় এমন একটা কিছু আছে, যাহাকে প্রকাশ করিতে হইলে বাক্যকে ছন্দের পক্ষযুক্ত করিতে হয়। এই বস্তুটি কি? কেবল জানা বা কেবল দেখা নয়—কেবল জিজ্ঞাসার যথোচিত জবাব পাওয়াই নয়, সেই সঙ্গে যে তৃপ্তি ও যে আশ্বাস—প্রাণে যে স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয়, তাহাতেই বাণী এমন ছন্দোময় হইয়া উঠে, ভাষায় বিদ্যুৎ-সঞ্চার হয়। সত্যেন্দ্রনাথ জ্ঞান-বুদ্ধির যে সাধনা করিয়াছিলেন তাহার মূলেও একটা প্রবল আবেগ ছিল, সেই আবেগের বশেই মনের দীপ্তিকে তিনি ভাষায় প্রতিফলিত করিয়াছেন। এইজন্য সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় ছন্দের একটা বিশেষ মূল্য আছে।

উপরি-উদ্ধৃত পংক্তিরাশির অনেক স্থলে সত্যেন্দ্রনাথের কবিত্বের একটি প্রধান লক্ষণ বারবার দেখা দিয়াছে। ইংরেজীতে কবিমানসের একটি বৃত্তিকে Fancy বলে—ইহা ঠিক Imagination নয়। Imagination-কে আমরা বাংলায় যেমন 'সৃজনী-কল্পনা' বলিতে পারি, তেমনই, এই Fancy-কে কবি-মনের একরূপ লীলাবিলাস বা 'খেয়ালী-কল্পনা' বলা যাইতে পারে। সত্যেন্দ্রনাথের এইরূপ কল্পনা খুব বেশী মাত্রায় ছিল। তাঁহার উপমাগুলিতে এই 'খেয়ালে'র উৎকৃষ্ট পরিচয় আছে ; এমনও বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার মনে যেন সর্ব্বদাই এই 'খেয়ালে'র ক্রিয়া চলিত—কোন বস্তুকে চিত্রিত করিবার সময়ে, এমন কি কোন ভাব বা চিন্তাকেও ব্যক্ত করিবার ছলে, তাঁহার মনের এই যে বিলাস তাহাই বিচিত্র উপমা-চিত্রে চিত্রিত হইতে চাহিত; অনেক সময়ে ইহা মুদ্রাদোষেও পরিণত হইয়াছে দেখা যায়। নিরন্তর নানা তথ্য সংগ্রহ—ইতিহাস ও বিজ্ঞানের নানা সংবাদ—তাঁহার মনে যে ভীড় করিয়া দাঁড়াইত, তাহাদিগকে এক-একটি সূত্রে এক-একটি প্রসঙ্গে গাঁথিয়া যেমন একটি বিশেষ ভাব বা অর্থের আবিষ্কার করিতে তিনি ভালবাসিতেন, তেমনই, প্রকৃতির গ্রন্থে যাহা-কিছু পাইতেন—তাহা যত বিভিন্ন ও বিচিত্র হউক—পাশাপাশি ধরিয়া তাহাদিগের মধ্যে রূপ-রেখার সাদৃশ্য আবিষ্কার করার নেশাও তাঁহার অল্প ছিল না ; এই শেষের খেয়ালটি তাঁহার কবিতায় সমধিক সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দনির্ম্মাণ-লীলার পরিচয় দিতে হইলে একটি পৃথক প্রবন্ধের প্রয়োজন, এখানে সে অবকাশ নাই। তথাপি, এ সম্বন্ধেও এখানে দু-একটি কথা বলা আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছন্দকে যে ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করিয়াছেন তাহা শুধু ছন্দের ঐশ্বর্য্য নয়—কাব্যেরও অঙ্গীভূত ; সত্যেন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার ধ্বনিকে আর এক যন্ত্রে ধুনিয়া তাহার নিছক উচ্চারণ-(accent)-সৌন্দর্য্যের চূড়ান্ত পরীক্ষা করিয়াছেন। বাংলা শব্দরাশির অর্থসামর্থ্য

যেমন তিনি বহুরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তেমনই, সেই শব্দের অক্ষরগুলিকেও অশেষরূপে বাজাইয়া তিনি নিজেরই আর এক পিপাসা মিটাইয়াছেন। শব্দের সঙ্গে যেমন অর্থ, তেমনই ঐ দুইয়ের সঙ্গে ছন্দ যুক্ত করার কারণ পূর্ব্বে বলিয়াছি ; কিন্তু তাহাই সব নয়। সত্যেন্দ্রনাথের অতিজাগ্রত মানসবুদ্ধির অন্তরালে আর একটি দেশ ছিল, সেইখানে তিনি প্রত্যক্ষ-বাস্তবের যতকিছু প্রেরণা ও প্ররোচনা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া কেবল সুরের স্রোতে আবগাহন করিতেন ; এই একটি মোহ তাঁহার ছিল। আমার মনে হয়, তাঁহার চিত্তে বিশুদ্ধ রসাবেশের একমাত্র প্রম্যাণ ঐ সুর-প্রধান কবিতাগুলিতেই আছে। আমরা যখন এই নিছক ছন্দঝঙ্কারময় কবিতাগুলি পড়ি এবং কবির প্রতি একটু কৃপাপরবশ হইয়া বুদ্ধিমানের মত মন্তব্য করি—"ছন্দ ভিন্ন ইহাতে আর কি আছে"?—তখন, প্রকৃত রসগ্রাহিতার পরিচয় দিই না। গীতিকবিতার ভাবই আসল বস্তু বটে, কিন্তু, কবিতা যখন এমন প্রবল ছন্দের সুরে বাজিয়া উঠে, তখন তাহাকে—কবিতা না বলিয়া একরূপ ছন্দ-গীতিহিসাবে উপভোগ করাই উচিত। কারণ, ঐ ছন্দও ভাবের একটা রূপ—উহাও একটা সৃষ্টি ; উহার মূলে কবি-প্রাণের আর এক জাতীয় সুন্দর-সংবেদনা আছে। এইরূপ কবিতা পড়িবার কালে কানের ভিতর দিয়াই প্রাণে একপ্রকার রসসঞ্চার হয়—যেমন সঙ্গীতের দ্বারা হইয়া থাকে। আমি এমন কথা বলিতেছি না যে, সর্ব্বত্র ছন্দের কেরামতিকে এইরূপ মূল্য দেওয়া যাইতে পারে ; কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের কবিকর্ম্ম ও কবিপ্রকৃতি ভাল করিয়া অনুধাবন করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, এই সকল কবিতায়, কবির প্রাণের রস-পিপাসা হইতেই, বাক্যার্থের অতীত এক অনির্ব্বচনীয় মাধুরীর সৃষ্টি হইয়াছে। এই ধরণের একটি কবিতার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

পারব না একলাটি আজ ঘরে পারব না রইতে!
চাঁদ ডাকে পাপিয়াকে ছুটো কথা কইতে!
নিরালার কোল-ভরা, ফুল জাগে আলো-করা
যেচে কার খুন্‌সুড়ি সইতে।
অথই পাথার-পারা জোছনায় মাতোয়ারা
দিশেহারা হ'ল চাঁদ হাওয়া চৈতে।

জাগ্‌ল রে নিদ্‌-ঘরে পাখী, আজ নারে নিদ্ সইতে!
আঁখি হ'ল অনিমেষ আলো-থইথইতে!
শোন্ সখী, শোন্ মুহু— কুহু কুহু কুহু কুহু,
বুকভরা সুখ নারে বইতে!
সে সুরের মনোহরে জোছনার সরোবরে—
শত তারা এলো জল-সইতে!

নিশি নিশি জাগো চাঁদ! নিরালায় নিতি নিরখি!
হারানো ছবির মালা জপ কর কি?
কত আঁখি কত যুগে কত দুখে কত সুখে
আঁখি তব গেছে পুলকি',
ছাই হ'য়ে গেছে যারা তারা অতীতের তারা,
একাকী তাদের স্মর কি?

* * *

চৈতী এ জ্যোছনায় একি হায় কুয়াশার কান্না!
কান্নার হাহা-হাওয়া, গান না রে, গান না!
আকাশের পরকোলা কাদের নিশাসে ঘোলা?
তারালোকে খোলা যত জালনা!
ভরা-নয়নের কোলে মুকুতার মুখ দোলে,
ঠোঁটে চুনি, চুলে তার পান্না!

* * *

ঝঙ্কারে রিম্‌ঝিম্ ঝিঁঝি গায় আজ নারে আজ না!
তনু ভরি' মরি মরি নূপুরেরি বাজ্‌না!
আজ নয়, আজ নয়, আজ কোনো কাজ নয়,—
অপরূপ! ভোর না, এ সাঁঝ না!
যে দূরে, যে আছে কাছে সবারি হৃদয় যাচে,
জ্যোছনায় অলখেরি সাজনা!

—'কয়েকটি গান': বেলাশেষের গান

ইহারই সঙ্গে আর একটি এইরূপ ছন্দ-গীতির কয়েকটি কলি তুলিয়া দিলাম, তাহাতে কবির শুধুই কণ্ঠের গুনগুন নয়—হাতের তুড়ি-দেওয়ার শব্দও শুনা যাইবে।

আহা ঠুক্‌রিয়ে মধু-কুলকুলি
পালিয়ে গিয়েছে বুল্‌বুলি;—
টুল্‌টুলে তাজা ফলের নিটোলে
টাট্‌কা ফুটিয়ে ঘুল্‌ঘুলি!

* * *

হের, কুল্ কুল্ কুল্ বাস-ভরা
সুরু হ'য়ে গেছে রস্‌ঝরা,
ভোমরার ভিড়ে ভীমরুলগুলো
মউ খুঁজে ফেরে বিল্‌কুলই।

ওই নিঝুম নিথর রোদ খাঁ খাঁ
শিরীষ-ফুলের ফাগ-মাখা,
ঢুলঢুলে কার চোখ দুটি কালো
রাঙা দুটি হাতে লাল কলি!

* * *

ওগো, কে চলেছে ঢেলা-বন ঠেলে
বুলবুলি-খোঁজা চোখ মেলে,
জামরুলী-মিঠে ঠোঁট দুটি কাঁপে
তাপে কাঁপে তনু জুঁইফুলী!

টী-মধু' : বিদায়-আরতি

কিন্তু বাংলাসাহিত্যে সত্যেন্দ্রনাথের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান—ভাষার বাক্‌পদ্ধতির নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠা, ও তাহার সমৃদ্ধি-সাধন। সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যগুলিতে বাংলাভাষার যেন একটি সম্পূর্ণ রূপ প্রকাশ পাইয়াছে; এ ভাষার যত স্তর আছে, অতিশয় প্রাচীন কাল হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত ভাষার ভাণ্ডারে যত শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়াছে, যে সকল শব্দ অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল—কিংবা প্রচলিত থাকা সত্বেও সাহিত্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই, এবং 'rare word-jewels of ancient authors',—তিনি এই সকলকেই এমন অর্থ-গৌরব ও ধ্বনিসৌষ্ঠব সহকারে তাঁহার রচনা-রাশিতে ব্যবহার করিয়াছেন, এবং ভাষার প্রকৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এমন সব নূতন শব্দও সৃষ্টি করিয়াছেন যে, সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যগুলি যেন বাংলা-বুলির এক রত্নাকর। ভাষার রীতি বা idiom-কেও তিনি যে ভাবে উদ্ধার করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে জাতির একটি মহা উপকার হইয়াছে—সে উপকার আজিকার এই জাতি-জন্ম-ভাষা-নাশের দারুণ দুর্দ্দিনে কেহ বুঝিবে না, তথাপি আমার বিশ্বাস, সত্যেন্দ্রনাথ এদিক দিয়া যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহাতে বাংলাভাষার জাতি, কুল ও কৌলীন্যের পরিচয়টি অতঃপর আর সহজে লুপ্ত হইতে পারিবে না।

সত্যেন্দ্রনাথের কবিপরিচয় ও তাঁহার কবি-কীর্ত্তির মূল্য-বিচার শেষ করিবার পূর্ব্বে, আর একবার সংক্ষেপে কিছু বলিব।

সত্যেন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিকের মত জীবনের সর্ব্বত্র তথ্যের সত্য খুঁজিয়াছিলেন; তাঁহার পিতামহের জ্ঞানপিপাসা তিনিও পাইয়াছিলেন,—কাব্যসাধনাতেও তাহাই ছিল তাঁহার প্রধান প্রেরণা। কবি নিজেও সে কথা স্বীকার করিয়াছেন, তিনি সেই স্বর্গত পিতামহের উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন—

"হে আদর্শ জ্ঞানযোগী! হে জিজ্ঞাসু, তব জিজ্ঞাসায়
উদ্বোধিত চিত্ত মোর; - গরুড় সে জ্ঞান-পিপাসায়।"

সত্যেন্দ্রনাথের কল্পনা অন্ধকারে পক্ষবিস্তার করিত না—অপ্রকাশ বা অপ্রত্যক্ষের আরাধনা তিনি পছন্দ করিতেন না। তিনি যেন কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের মতই 'কল্পনা'র উদ্দেশে বলিতে পারিতেন—

"বিধাতার এ সংসারে, যারে না তুষিতে পারে,
যে কবির মহতী কামনা,
সে কবি করিবে, দেবি! তব উপাসনা।
তোমার মুকুর 'পরে,
সে হেরে হরষভরে
ছায়া তার,—কায়া নাই যার;
তত লোকাতীত নয় বাসনা আমার,
লক্ষ্য মম সামান্য এ সত্যের সংসার।"

যাহাকে যুক্তির নিক্তিতে ওজন করা যায়—যাহা পায়ের তলায় কুশাঙ্কুরের মত বিঁধিয়া আপন অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে—তাহাতেই তাঁহার বিশ্বাস ছিল, এবং তাহাকেই জয় করিয়া তিনি আনন্দ পাইতেন। সেজন্য, একদিকে যেমন অতীতের অমানিশায় তিনি দীপহস্তে বিচরণ করিতে ভালবাসিতেন, তেমনই, বর্ত্তমানের জগৎব্যাপী জীবনযজ্ঞে হবিঃশেষ-ভোজনের আশায় তিনি জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলের সম্মুখে তাঁহার প্রাণের পিপাসার পাত্রখানি তুলিয়া ধরিয়াছিলেন।

(৫)

সর্ব্বশেষে আর একবার সেই প্রশ্ন তুলিব—সত্যেন্দ্রনাথের মত মনোধর্ম্মী, যুক্তিবাদী, নীতিপরায়ণ, প্রত্যক্ষ-বাস্তবের পূজারীকে সত্যকার কবি-সমাজে কোন্ আসন দেওয়া যাইতে পারে? আমি অতি-আধুনিক প্রগতিবাদীদের আপত্তির কথা বলিতেছি না; কারণ, তাহাদের আপত্তি কাব্যের আদর্শ লইয়া নহে; তাহারা সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য সহ্য করিতে পারে না অন্য কারণে—ভূত যেমন রাম-নাম সহ্য করিতে পারে না। তাহাদের নিকট সত্যেন্দ্রনাথের অপরাধ অনেক—প্রথমতঃ, তিনি খাঁটি বাংলাভাষায় কাব্য রচনা করিয়াছেন; দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার শব্দযোজনা যেমন গভীর ভাষাজ্ঞান, ও ঐকান্তিক সাধনাসাপেক্ষ, তেমনই, তাহা অতিশয় অর্থপূর্ণ; তৃতীয়তঃ, তাঁহার কবিমানসে চারিত্র ও পৌরুষ বড় অধিক প্রকট হইয়া আছে; চতুর্থতঃ, তাঁহার ছন্দ-জ্ঞান ও ছন্দবোধ অতিশয় অসুখকর; এবং সর্ব্বোপরি, তাঁহার রচনায় একপ্রকার সুতীক্ষ্ণ রসবোধের আত্যন্তিক সদ্ভাব রহিয়াছে। অতএব, অধুনা যে একদল সত্যেন্দ্রনাথের নামে নাসিকাকুঞ্চিত করিয়া থাকে, তাহাদের আপত্তি সম্পূর্ণ অবান্তর।

আমি সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য হইতে যে পরিমাণ কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছি, সত্যেন্দ্রনাথ কবি কিনা, এবং কোন্ জাতীয় কবি তাহা বুঝিবার পক্ষে উহাই যথেষ্ট হইবে—যদি পাঠকের একটুও সাহিত্যিক সংস্কার এবং রসবোধ থাকে। সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যপ্রকৃতি কোন্ অর্থে ক্লাসিক্যাল তাহা বলিয়াছি; কেবল ইহাই বলিতে বাকি আছে যে, খাঁটি 'ক্লাসিক'হিসাবেও তাঁহার রচনার মূল্য আছে কিনা। সত্যেন্দ্রনাথের মেধা, তাঁহার জ্ঞানপিপাসা ও সাধনার নিষ্ঠা তাঁহার রচনাবলীর ছত্রে ছত্রে জাজ্বল্যমান হইয়া আছে। তাঁহার চক্ষু ও কর্ণের পিপাসা, দৃষ্টি ও শ্রুতির আনন্দ, কেমন শব্দের দ্বারা চিত্ররচনা, ও ছন্দের দ্বারা সঙ্গীত-রচনা করিয়াছে, তাহাও দেখিয়াছি; তাঁহার ভাবুকতাও কেমন Fancy বা খেয়ালী-কল্পনায় রঙীন হইয়া উঠিত—উপমাগুলিও শুধু অলঙ্কার নয়, সেগুলির মধ্যে খেয়ালী কল্পনার কবিত্ব যে প্রায় সৃষ্টিকল্পনার সমান হইয়া উঠিয়াছে, তাহাও লক্ষণীয়। সকল লক্ষণের দৃষ্টান্ত সহ উল্লেখ ও আলোচনা আমি করিয়াছি, এবং ইহা যে কতবড় বাণী শিল্পীর কাজ, তাহা স্বীকার করিয়াছি। কিন্তু এসকল সত্ত্বেও সত্যেন্দ্রনাথের প্রতিভায় একটা ব্যক্তিগত বা চরিত্রগত বাধা ছিল, যাহার জন্য তিনি 'ক্লাসিক্যাল' হইয়াও 'ক্লাসিক' হইতে পারেন নাই; এত বড় বাণীশিল্পী হইয়াও, মানবচিত্তের গভীর ও গাঢ়, ব্যাপক ও সুসমাহিত ভাবরাজির রূপকার হইতে পারেন নাই। একজন সুবিখ্যাত পাশ্চাত্ত্য সমালোচক 'ক্লাসিক' (classic), বা সাহিত্যে উচ্চ ও স্থায়ী আসনের অধিকারী যে লেখক, তাহার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া কয়েকটি যথার্থ কথাই বলিয়াছেন—

> An author who has discovered some moral and not equivocal truth; or revealed some eternal passion in that heart where all seemed known and discovered; who has expressed his thought, observation or invention, in no matter what form, only provided it be broad and great, refined and sensible, sane and beautiful in itself, a style which is found to be also of the whole world, a style new without *neologism*, new and old, easily contemporary with all time.

আমি সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যের উৎকর্ষ বিচারে এত বড় মাপকাঠি ব্যবহার করিতে চাহি না; কারণ, সত্যেন্দ্রনাথ যে একজন প্রথম শ্রেণীর কবি, সে দাবী আমি করিতেছি না। কিন্তু রোমান্টিক কাব্যের গুণ-দোষ যেমনই হোক, যাহাকে আমরা ক্লাসিক্যাল হিসাবেই উপভোগ করিয়া থাকি, তাহার সবচেয়ে বড় গুণ এই যে—তাহাতে 'eternal passion'-এর অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি না থাকুক, তাহাতে 'some moral and not equivocal truth' থাকা চাই-ই; অর্থাৎ, সে বাণীর মধ্যে এমন সত্যের প্রকাশ থাকিবে যাহা স্বপ্রতিষ্ঠ, যাহাতে সংশয়ের দ্বিধা নাই; এবং যাহা তেমন 'broad and great' না হইলেও 'refined and sensible' হইবে,—যেমন ইংরেজ কবি Pope-এর রচনা। বোধ হয়, সেইরূপ কবিতার কথা মনে করিয়াই উপরি-উক্ত সমালোচক আরও বলিয়াছেন—

> "It should above all include conditions of uniformity, wisdom, moderation, and

reason which dominate and contain all the others." "It is here evident that the part allotted to classical qualities seems mostly to depend on harmony and nuances of expression, or graceful and temperate style."

এবং শেষে এমনও বলিয়াছেন যে,—

"In this sense, the pre-eminent classics would be writers of a middling order,—exact, sensible, elegant, always clear, yet of noble feeling and airily veiled strength."

—সত্যেন্দ্রনাথের রচনায় ইহার অনেকগুলি বিদ্যমান থাকিলেও, তাঁহার সবচেয়ে বড় দোষ এই যে, তাহা সব সময়ে 'refined' নয়; এবং অধিকাংশ স্থানে 'sane' বা 'sensible' নহে। উপরে যে গুণগুলির উল্লেখ আছে তাহার মধ্যে প্রধান এবং অত্যাবশ্যক যেগুলি—সেই uniformity, wisdom, ও moderation—রচনার সর্ব্বাঙ্গীণ সমতা, ধীরবুদ্ধি, ও সংযম—সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যের বিশিষ্ট গুণ নহে; তাঁহার ভাবাবেগ যেমন প্রায়ই 'sensible' নয়, তেমনই তাঁহার ভাষার বাক্‌সমৃদ্ধি ও শব্দ-নৈপুণ্য অনন্যসুলভ হইলেও, তাঁহার style সর্ব্বত্র temperate নহে। ইহার কারণ সত্যেন্দ্রনাথের ব্যক্তিচরিত্রের মধ্যেই নিহিত ছিল।

সত্যেন্দ্রনাথ এত পড়াশুনা করিয়াছিলেন—শিল্প ও সাহিত্যের এত অনুশীলন করিয়াছিলেন, তাঁহার মেধা এমন তীক্ষ্ণ ছিল, তথাপি তাঁহার চরিত্র ছিল বালকের মত অপরিণত। তিনি বালকের মতই উত্তেজনাপ্রবণ, বালকের মতই কৌতূহলী, এবং বালকের মতই সরল ও অকপট ছিলেন। বিশ্বাসের সাহস, অবিশ্বাসের অসহিষ্ণুতা, এবং পক্ষপাতের উগ্রতা—এই তিন দোষই তাঁহার মানসপ্রকৃতিতে কিছু অধিক পরিমাণে ছিল, এবং তাহার ফলে তিনি কোন ভাব বা চিন্তাকে একটি বিচারসঙ্গত, শান্তশ্রী দান করিতে পারিতেন না। আবার, পরীক্ষা দিবার সময়ে, মেধাবী অধ্যয়নশীল বালক, যেমন তাহার অধীত বিদ্যার পরিচয় একটু বেশি করিয়া দিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারে না—তেমনই, সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার রচনায়, কারণে ও অকারণে, পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে এমনই অধীর হইতেন যে, তাহাতে যেমন তাঁহার অনেক কবিতা নষ্ট হইয়াছে, তেমনই বহু সুকবিতাও ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। বালকের মতই তাঁহার একপ্রকার হুজুগপ্রিয়তা ছিল, সাময়িক ঘটনায় তিনি অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিতেন—তাহা হইতেই তাঁহার অধিকাংশ সাময়িক কবিতার জন্ম হইয়াছে; সে সকল কবিতায় জনমনোভাবের প্রাবল্যই বেশি, এজন্য সেগুলি অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল। অতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি দুরন্ত বালক যেমন প্রতিপক্ষের সহিত বিবাদ ঘটিলে, তাহাকে যেমন করিয়া হোক পরাস্ত করিয়া পরম আত্ম-সন্তোষ লাভ করে, সত্যেন্দ্রনাথও তেমনই, কোন দল বা ব্যক্তির সহিত মতবিরোধ ঘটিলে, তাহার লাঞ্ছনার একশেষ করিয়া ছাড়িতেন; অস্ত্রপ্রয়োগে তীক্ষ্ণতা ছাড়া আর কোনদিকে তাঁহার দৃষ্টি থাকিত না। তাঁহার কৌতূহলও ছিল বালকের মত প্রবল; বস্তুর বা বিষয়ের মূল্য যেমন

হোক,—বিচিত্র অভিনব হইলেই হইল—তাঁহার সারা মনপ্রাণ সেইদিকেই আকৃষ্ট হইত। এই জন্যই তাঁহার বহু কবিতায়, বিষয়গৌরব অপেক্ষা, ঘটনা, বস্তু, বা চরিত্রের অভিনবত্বই কবিপ্রেরণার কারণ হইয়াছে। এই জন্যই, তিনি যে সকল বিদেশী কবিতা অনুবাদ করিয়াছেন—সেগুলির নির্ব্বাচনে সাহিত্যিক রসবোধ অপেক্ষা সাহিত্যিক কৌতুহলই জয়ী হইয়াছে। যে সকল কবিতা সাহিত্যের চিরন্তন সম্পদ সেগুলিকে তেমন আদর না করিয়া, অপরিচিত দেশের, অখ্যাত ভাষার, অখ্যাত কবির কবিতার প্রতি তিনি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছেন; অথবা, সুকবিতার সংখ্যা অপেক্ষা কবিদের নামের সংখ্যা বাড়াইতে চাহিয়াছেন—যাহাতে তাঁহার অধ্যয়নের পরিধি কত বিস্তৃত তাহাই প্রমাণিত হয়। ছন্দের প্রতি তাঁহার আত্যন্তিক আসক্তিও বালকের ক্রীড়াসক্তির মত; এখানেও তাঁহার মূল্যজ্ঞানের অভাব লক্ষিত হয়। এই সকল দোষ এবং তাহার যে কারণ আমি নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহার জন্যই সত্যেন্দ্রনাথ উৎকৃষ্ট কবিকীর্ত্তির অধিকারী হইতে পারেন নাই; তাঁহার বিরুদ্ধে আর যে সকল আপত্তি তাহা মিথ্যা।

তথাপি, আশা করি, আমি সত্যেন্দ্রনাথের কবিকর্ম্ম ও কবিপ্রতিভার যে পরিচয় দিয়াছি তাহাতে বাংলা কাব্যসাহিত্যে তাঁহার যে একটি বিশিষ্ট স্থান আছে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। সর্ব্বশেষে, আবার সেই কথাই বলি,—সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যবিচার কালে, একথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই যে, মানুষের মনে রসের অনুভূতি যেমন অনেক প্রকারে হইয়া থাকে, তেমনই, তাহার প্রকাশের রূপও বহুবিধ হওয়াই স্বাভাবিক, এবং—

"There is more than one chamber in the mansions of my Father"; that should be as true of the kingdom of the beautiful here below, as of the kingdom of Heaven."

শ্রাবণ, ১৩৪৯
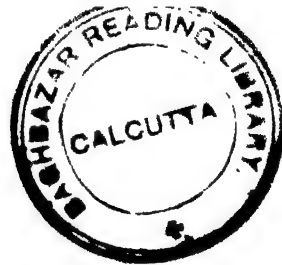
আধুনিক সাহিত্যের ভাষা

প্রায় এক শতাব্দীর কর্ষণ ও অনুশীলনের ফলে বাংলা ভাষার যে রূপ দাঁড়াইয়াছিল, যে-রূপটিকে আশ্রয় করিয়া বাংলার কবি-সাহিত্যিক রসসৃষ্টি করিয়া আসিতেছিলেন, আজ যেন তাহাকে বর্জ্জন করিবার একটা প্রবৃত্তি, বড় হইতে ছোট—সকলের ভিতরেই দেখা যাইতেছে। ইহার কারণ কি?

নবতম সাহিত্যিক আদর্শ বা অতিশয় স্বতন্ত্র ব্যক্তি-প্রতিভা ইহার কারণ হইতে পারে না। কারণ, ভাষার ধাতু-প্রকৃতি—তাহার অন্তর্নিহিত প্রাণ-প্রবৃত্তি—প্রত্যেক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য বিধান করে; এই হিসাবে ভাষা সাহিত্যের অধীন নয়, সাহিত্যই ভাষার অধীন। ভাষার প্রকৃতি জাতির অন্তর-প্রকৃতির সহিত অভিন্ন; সাহিত্যের ভাষা—জাতির ভাষা, জাতির রস-চেতনার উপরেই সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা হয়; ভাষার সহিত সেই রসিকতার নাড়ীর যোগ আছে। ব্যক্তি-প্রতিভা যতই স্বাধীন বা স্বতন্ত্র হউক, একেবারে ভুঁইফোড় হইতে পারে না—অতি বড় কবি-প্রতিভারও একটা বংশক্রম আছে। ভাষার যে পটভূমিকার উপরে প্রতিভা তাহার প্রাণের রং ফলাইয়া থাকে, তাহাতে সে রং ফুটিত না—যদি সেই পটবস্ত্রখানি সমগ্র জাতির বংশপরম্পরাগত ভাব-চেতনার নিত্য-প্রবাহে মার্জ্জিত ও বিশদ হইয়া না উঠিত। কবির চেতনা মূলে এই জাতীয়-ভাব-চেতনার অনুগত—কবি-শক্তি যতই ব্যক্তিগত বলিয়া মনে হউক, তাহাতে সমগ্র জাতির মগ্ন-চৈতন্য স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। সাহিত্যের ভাষা জাতির প্রাণ ও মনঃপ্রকৃতিবশে একটা বিশিষ্ট আকার লাভ করে; তাহা কৃত্রিম নয়, তাহাকে ইচ্ছামত ভাঙিয়া গড়া যায় না—তাহার মূলে জীবনের মতই একটা সত্যকার শক্তি সক্রিয় হইয়া আছে। এই জন্য, কোনও জাতির ভাষায় যে বিশিষ্ট লক্ষণগুলি পরিস্ফুট হইয়া থাকে—বচন-রচনার ভঙ্গি, শব্দ-অর্থের সঙ্গতি-প্রথা, উচ্চারণ-ধ্বনি-মূলক শব্দবিন্যাস, শব্দের ভাবধ্বনি বা ধ্বনিমূলক ভাব-ব্যঞ্জনার বিশিষ্ট রীতি—সেই সকলই তাহার প্রাণের গতিচ্ছন্দের অনুরূপ। এই সকল লক্ষণে ভাষার যে প্রকৃতি সুস্পষ্ট হইয়া থাকে—কোনও ব্যক্তি-বিশেষ বা লেখক-গোষ্ঠীর দ্বারা তাহার পরিবর্ত্তন-চেষ্টা নিতান্তই জবরদস্তি-মূলক অত্যাচার। ইংরেজীতে যাহাকে style বলে তাহা লেখকের নিজস্ব বটে, কিন্তু তাহা যদি ভাষার মূলে আঘাত করে, তবে তাহা style-ও নহে, তাহা লেখকের মুদ্রাদোষ। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ভাষা ব্যক্তির নহে—জাতির; কেবল তাহাই নয়, জাতির সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের মিলন-ভূমি এই ভাষা। জাতির সমষ্টিগত আত্মা এই ভাষাকে আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া থাকে; এই ভাষায় যে-সাহিত্য গড়িয়া উঠে তাহারই সাহায্যে যুগ-যুগান্তর-বাহিত একটি অখণ্ড চৈতন্য, বহু জন্মের জাতিস্মরতার মত অক্ষুণ্ণ থাকে। ভাষাই সাহিত্যের সৃষ্টি ও স্থিতির নিদান।

ভাষার আদর্শ ক্ষুণ্ণ করার প্রয়োজন দুই কারণে হইতে পারে—প্রথম, ভাষার আদর্শ সম্বন্ধে অজ্ঞতা, বিশুদ্ধ বাক্যরচনার অক্ষমতা ; দ্বিতীয়, ভাষাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াও লেখকের নিজ খেয়াল-খুশী চরিতার্থ করিবার আগ্রহ—অতি উগ্র ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবশে জাতীয় রীতি বর্জ্জন করিয়া, একটা নবধর্ম্ম-প্রচারের মত কীর্ত্তি অর্জ্জন করিবার আকাঙ্ক্ষা। ভাষার যে অনাচার প্রবল হইয়াছে তাহার মূলে এই দুই কারণ বিদ্যমান, এবং এই দুই কারণেরও মূলে যে এক গভীরতর কারণ আছে তাহার নাম—জাতির আত্মভ্রষ্টতা।

কিন্তু অজ্ঞতা ও অক্ষমতার প্রমাণ এতই স্পষ্ট যে, দ্বিতীয় কারণটির উল্লেখ বা আলোচনা অনাবশ্যক মনে হইতে পারে। তথাপি একটু ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের সাহিত্য-সাধনা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় যে বিশেষ পরিণতি লাভ করিয়াছিল—সেই সাধনার সেই পরিণতির মধ্যেই ভাবাগত আদর্শের বিনাশ-বীজও নিহিত ছিল, এবং আজও তাহা সক্রিয় রহিয়াছে—অজ্ঞতা ও অক্ষমতাকে প্রশ্রয় দিতেছে। অতএব এই দুই কারণকেই এক সঙ্গে ধরিতে হয়। যাঁহারা বাংলা ভাষার বর্ত্তমান রূপান্তর লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং নবীন লেখকদিগকেই এজন্য দায়ী করিয়া থাকেন, তাঁহারা এ ব্যাধির নিদান আলোচনা করেন নাই।

সকলেই জানেন, গত-যুগের শেষ ভাগে, অর্থাৎ এই অতি-আধুনিক অনাচার প্রকট হইবার অনতিপূর্ব্বে, বাংলা গদ্যরীতি লইয়া একটা আন্দোলন উপস্থিত হয়। এই আন্দোলনের ঘোষণা-মন্ত্র ছিল এই যে, বাঙ্গালীর মুখের ভাষাই আসল বাংলা ভাষা, সাহিত্য গড়িতে হইবে সেই ভাষায় ; অপর যে-ভাষা সাহিত্যে এতকাল চলিয়া আসিতেছে তাহা পণ্ডিতী সাধুভাষা, অতএব তাহা কৃত্রিম। অর্থাৎ, সাহিত্যে আজকাল যে বস্তু বা বস্তি-তন্ত্র চলিতেছে, তাহার সূত্রপাত হয় ভাষা লইয়া ; ইহাই ভাষা-ঘটিত বাস্তববাদ। অলঙ্কৃত বা সুসংস্কৃত ভাষা যদি কৃত্রিম হয়, তাহা হইলে উন্নত কবি-কল্পনাও কৃত্রিম। বস্তি-তান্ত্রিক সাহিত্য যে জীবন-সত্যকে আদর্শ করিয়াছে তাহার তুলনায় বঙ্কিম বা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য যেমন মিথ্যা, কথ্য-ভাষার তুলনায় সাহিত্যিক সাধুভাষাও সেইরূপ কৃত্রিম। কিন্তু রহস্যের কথা এই যে, আন্দোলনকারীরা রবীন্দ্রনাথেরই ভক্ত অনুচর,—সাহিত্যের ভাষা-পরিবর্ত্তন যে দেহের বেশ-পরিবর্ত্তন নয়, এই রসিকজনেরা তাহা বিস্মৃত হইয়া, যে-সাহিত্য রবীন্দ্রনাথকেও ধারণ করিয়া আছে, সেই সাহিত্যের মূলেই কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইলেন। গদ্যরীতি সম্বন্ধে সহসা এই যে আন্দোলন, ইহারও পূর্ব্বে বাংলা পদ্যে রবীন্দ্রনাথ চল্‌তি-ভাষার ছন্দ বা বাংলা-ছড়ার ছন্দকে আধুনিক গীতিকাব্যের কাজে লাগাইয়াছিলেন—ছড়ার ছন্দকে কাব্যছন্দে উন্নীত করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই নূতন ধরণের গীতি-কাব্যের ভাষাই চল্‌তি-ভাষায় সাহিত্য-রচনার সঙ্কেত করিয়া থাকিবে। ইতিপূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের চিঠির ভাষা, শান্তিনিকেতনে তাঁহার মৌখিক আলাপ-আলোচনা ও ধর্ম্ম-ব্যাখ্যানের ভাষা, এবং তাহারই লিপিবদ্ধ রূপ, বাংলা গদ্যের জাত্যন্তর ঘটাইতে, ও শিষ্যবিদ্যা গরীয়সী করিয়া তুলিতে যথাসম্ভব সহায়তা করিয়াছিল।

গদ্যে বা পদ্যে, রবীন্দ্রনাথ যে নবত্বের স্পৃহা তাঁহার অধুনাতন রচনায় ব্যক্ত করেন—তাহার প্রেরণাও যেমন স্বতন্ত্র, তাহার অভিব্যক্তিও তেমনই। অতএব, এই নব-আন্দোলনের নায়করূপে, অথবা প্রধান পৃষ্ঠপোষকরূপে রবীন্দ্রনাথকে খাড়া করিয়া যে বল সঞ্চয়ের চেষ্টা হইয়া থাকে তাহা অর্থহীন। খাঁটি সাহিত্যের ভাষা, বা উৎকৃষ্ট কবি-কল্পনার শব্দ-বিগ্রহ, প্রতিভার প্রেরণায় যে নূতনতর দীপ্তি লাভ করিয়া থাকে, তাহা হইতে ভাষার আদর্শ-নিরূপণ বা রীতি-পরিবর্ত্তন হয় না। কিন্তু ভাষাকে যাহারা জড় মৃৎ-পিণ্ডের মত যে কোনও ছাঁচে ফেলিয়া নব-নব ভঙ্গির উদ্ভাবনা করিতে চায়, তাহারা প্রতিভাহীন বলিয়া, ভাষার দিব্যমূর্ত্তির সন্ধান পায় না। গদ্যে যাহারা চল্‌তি-ভাষাকে আদর্শ করিতে চাহিল তাহারা একটি কৃত্রিম ভাষা গড়িয়া তুলিল—সমাজের এক সম্প্রদায়ের বৈঠকখানায়, কৃত্রিম স্বরভঙ্গিতে আধো-আধো টানা-টানা উচ্চারণে যে ধরণের কথাবার্ত্তা হয়, ইহা সেই ভাষা; ইহাতে 'ককৃনি'-উচ্চারণযুক্ত 'ককৃনি'-বুলির মিশ্রণও অল্প নহে। এ ভাষা যেমন পুঁথির ভাষাও নয়, তেমনই ইহা বাঙ্গালী-সন্তানের মুখের বুলিও নহে।

এই ভাষাই খাড়া করা হইল পুঁথির ভাষার বিরুদ্ধে। পুঁথির ভাষার অপরাধ—তাহা পণ্ডিতের ভাষা; অর্থাৎ, পুঁথি লিখিতে হইবে মুখের বুলিতে, কারণ, যাহারা পুঁথি পড়িবে তাহারা পণ্ডিতীর ধার ধারিবে না। সাহিত্যের সাধুভাষাকেও আমরা মাতৃভাষা বলিয়া থাকি; যদি সে ধারণা ভুল হয়—পণ্ডিতী পিতৃভাষা যদি বর্জ্জন করিতেই হয়, তবে, এ ভাষাও কি বাঙ্গালী-মেয়েদের ভাষা? বাংলাসাহিত্য কি বাঙ্গলার ব্রতকথা-জাতীয় বস্তু? যুক্তির দিক দিয়া যেমনই হউক—দেখা গেল, এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য অন্যরূপ। পূর্ব্বে বলিয়াছি, বাঙ্গালীর মুখের ভাষা বা ইডিয়ম ইহার আদর্শ নহে, এ ভাষা সাধুভাষাই বটে, তবে সে সাধু—'পণ্ডিত' নয়—'বাবু'; এ ভাষার বচনভঙ্গি, ইহার কায়দা ও প্যাঁচ পণ্ডিতকেও হার মানায়। যে-ভাষা একদিন পদ্যে, ও পরে গদ্যে, সমস্ত বাংলাদেশের সাহিত্যিক ভাষা ছিল—সর্ব্বপ্রদেশে শিক্ষিত বাঙ্গালীর ভাব-বিনিময়ের ভাষারূপে যে ভাষা বাংলাসাহিত্যকে সম্ভব করিয়াছিল, সেই ভাষা বাংলা নহে; সে ভাষায় যাহা কিছু রচিত হইয়াছে তাহা কৃত্রিমতা-দোষ-দুষ্ট! এতকাল পরে বাংলাসাহিত্যের খাঁটি ভাষা আবিষ্কৃত হইল! রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' নামক উপন্যাসে এই ভাষার প্রৌঢ় রূপ অনেকে দেখিয়াছেন—তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, খাঁটি মাতৃভাষাভাষী বাঙ্গালী—আধুনিক ভাষায় এখনও যাহার দখল তেমন হয় নাই, এবং ইংরেজীতেও যে সুপণ্ডিত নয়—তাহার পক্ষে, বঙ্কিমের কোনও উপন্যাস, না এই 'শেষের কবিতা', কোন্‌খানি অধিকতর সুখপাঠ্য? সাধুভাষা যদি নিতান্তই বি-ভাষা হয়, তবে সে ভাষায় এতদিন এমন সকল রচনা সম্ভব হইল কেমন করিয়া? এখনও সকল উৎকৃষ্ট গল্প ও উপন্যাস সেই ভাষাতেই রচিত হয় কেন? বাঙ্গালীই বা সেই সকল গ্রন্থে তাহার রস-পিপাসা মিটায় কেমন করিয়া? সংস্কৃত, সাধু, পণ্ডিতী—যে নামই তাহাকে দেওয়া হউক, কেবল গালি দিলেই সত্য কখনও মিথ্যা হইয়া যায় না।

বাংলা গদ্য-সরস্বতীর এক চরণ প্রাকৃত-বাংলার কলধ্বনিমুখর রাজহংসটির উপর, এবং অপর চরণ সাধুভাষার সুসংস্কৃত, গাঢ়বন্ধ, শুচি-শ্রী ও সৌরভময় সহস্রদল পদ্মের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। যেদিন হইতে ভাষার এই দুই বিপরীত স্বভাবের সমন্বয় ঘটিয়াছে সেইদিন হইতেই বাংলা গদ্য আপন প্রাণধর্ম্মে সঞ্জীবিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ও শক্তি লাভ করিয়াছে; তাহার সংস্কৃত জাতি ও প্রাকৃত গোত্র, দুইয়ের ধর্ম্মই বজায় রাখিয়া একাধারে সংযম ও স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। সংস্কৃত পদপদ্ধতির কাঠামোখানাই তাহার জাতি-কুল রক্ষা করিয়াছে; পণ্ডিতের ঘরে ভূমিষ্ঠ না হইলে তাহার যে কি দশা হইত, তাহা আজিকার স্বেচ্ছাচারদৃষ্টে অনুমান করা দুরূহ নয়। সেই বাগ্‌-বৈভব ও বাক্‌-পদ্ধতির আশ্রয় পাইয়াই প্রাকৃত বাংলার শ্রীহীন অথচ জীবন্ত বচনরাশি ভাব-অর্থ ও রসের আধার হইয়া উঠিল। বাংলা গদ্যের সেই সাধুরীতিই উত্তরোত্তর কথ্য-বাংলার বচনরাশিকে আত্মসাৎ করিয়া রবীন্দ্রনাথের যুগে এমন সর্ব্বভাবপ্রকাশক্ষম হইয়া উঠিয়াছে। সে গদ্য যে সাধুত্ব বর্জ্জন করে নাই, তার কারণ—সাধুই হোক আর অসাধুই হোক, বাংলা সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে আজও তাহাই সহজ-সুন্দর, তাহাই প্রাণবান ও গতিমান, সংবর্দ্ধনশীল ও সর্ব্বতোমুখী।

খাঁটি-বাংলা ব্যবহার করার কথাই যদি হয়, তবে সে দিক দিয়াও এই নূতন ভাষার নূতনত্ব কিছুই নাই। বরং দেখা যাইতেছে, সাধুরীতির লেখকেরা যে পরিমাণে ও যেরূপ বিশুদ্ধভাবে এইসকল বুলি ব্যবহার করিয়া থাকেন, আধুনিক ভাষার লেখকেরা তাহা করেন না, করিতে পারেন না। বাংলা বুলি না-জানাই তার একটা কারণ বটে; কিন্তু ইহাতে প্রমাণ হয় যে, ভঙ্গিমাযুক্ত হইলেই ভাষা খাঁটি হয় না, এবং ভঙ্গিমাহীন হইলেও, অর্থাৎ পদ্ধতি 'সাধু' হইলেও, সে ভাষা খাঁটি বাংলার ছাপ বহন করিতে পারে। আধুনিক ভঙ্গিবাগীশেরা নিজ নিজ শিক্ষা ও সংস্কার বশে, কেহ বা সংস্কৃত, কেহ বা প্রকট ইংরেজীরীতির পক্ষপাতী; ইহাতে আর যাহাই হউক, কথ্যভাষার বড়াই করা চলে না। রবীন্দ্রনাথের কথা বলিতেছি না, এতবড় ওস্তাদের ওস্তাদীর কথাই স্বতন্ত্র। অপর দুই একজন যাঁহারা সাধুভাষাকেই উচ্চারণ বদলাইয়া 'চল্‌তি' নামে চালাইয়া থাকেন, তাঁহাদের কথাও বলি না—যদিও এই নাটের গুরু তাঁহারাই; অপর যাঁহারা এই নূতন ভঙ্গির অনুকরণ করিয়া থাকেন, খাঁটি বাংলা-বুলি তাঁহাদের জানা নাই, কেবল ক্রিয়াপদগুলিকে ভাঙ্গিয়া দেওয়াই তাঁহাদের একমাত্র বাহাদুরী। এই ক্রিয়াপদের খর্ব্বতা-সাধনই যেমন এ-ভাষার একমাত্র মৌলিক লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তেমনই, এই রন্ধ্রপথেই যত অনাচার প্রবেশ করিতেছে।

ভাষাতত্ত্ববিদ্‌ স্বীকার করিবেন—ভাষামর্ম্মবিদের তো কথাই নাই—যে, ভাষার ধ্বনি-রূপই তাহার আসল রূপ; কেবল শব্দ-অর্থের সঙ্গতি নয়, এই ধ্বনিই ভাষার আত্মা। ভাষার শব্দ-বিন্যাসে, প্রত্যেক বর্ণটির মধ্য দিয়া এক অখণ্ড ধ্বনিস্রোত বহিয়া থাকে; ইহা এমনই অখণ্ড যে, কোনও অংশে যদি এই ধ্বনি-স্বভাব আহত হয় তবে সমগ্র বাক্‌-প্রকৃতি ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে। বাংলা গদ্যের যে বৈশিষ্ট্য, তাহাও ধ্বনি-রূপের বৈশিষ্ট্য—বাক্যযোজনার

কেবল ব্যাকরণ অভিধান ঠিক থাকিলেই চলিবে না, সেই বিশিষ্ট ধ্বনি-রূপ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়। ইহা কাহাকেও শিখাইতে হয় না, ভাষায় যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, এসম্বন্ধে তাহার সংস্কার জন্মিয়া উঠে। বরং এই ধ্বনি-রূপকে অস্বীকার করাইতে হইলে নানা যুক্তিতর্কের প্রয়োজন হয়, তাহাতেও একটা প্রাণহীন কৃত্রিম অভ্যাসের সৃষ্টি হয়। বাংলাভাষার যে ধ্বনি-প্রকৃতির উপর বাংলা-গদ্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছে—বাক্যের কোনও অঙ্গে তাহার ব্যভিচার ঘটিলে সারাদেহ অসুস্থ হয়। সাধু বা সাহিত্যিক বাংলায় সংস্কৃত শব্দ ও বাক্-পদ্ধতির সঙ্গে বাংলা-বুলি যে ভাবে অন্বিত হইয়াছে তাহার ধ্বনি-রূপ প্রাকৃত নয়—সংস্কৃত। বাংলা পয়ার যেমন প্রাকৃত-অপভ্রংশের ধ্বনি-প্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত—তাহা সংস্কৃতও নয়, বাংলা-বুলির ধ্বনিও নয়, বরং দূরসম্পর্কে সংস্কৃতেরই আত্মীয়, তেমনই বাংলা গদ্যের বাক্যচ্ছন্দ কথ্যভাষার ধ্বনি হইতে স্বতন্ত্র। আমরা যে ভাষায় লিখিয়া থাকি—নব্য লেখকেরাও যে ভাষা লিখিয়া থাকেন, তাহার বুলিও প্রধানতঃ সংস্কৃত বা সাধু, তাহার ধ্বনি-প্রকৃতিকে জোর করিয়া কথ্যভাষার ভঙ্গিতে ভাঙ্গাইয়া লওয়া যায় না। লিখিব সাধুভাষায়, ভঙ্গিমা করিব বাংলা বুলির—এবং তাহারই খাতিরে উচ্চারণ বাঁকাইয়া ক্রিয়াপদের স্থানে টক্ টক্ শব্দ করিব, এ অনাচারে ভাষা পীড়িত হয়, তাহার ধ্বনি-ধর্ম্ম নষ্ট হয়। সেই ধ্বনি ক্ষুণ্ণ হয় বলিয়াই রচনার বাগ্‌বন্ধনও শিথিল হয়; তখন শব্দযোজনার রীতি বা শব্দের শয্যা-গুণ সম্বন্ধে লেখকের কোনও সংস্কারই আর থাকে না; যেখানে-সেখানে যে-কোনও শব্দ ব্যবহার করিতে, এবং শব্দ-যোজনাকালে ভাষার রীতি ভঙ্গ করিতে কিছুমাত্র বাধে না; কারণ, ঐ খণ্ডিত ক্রিয়াপদের আঘাতে বাক্যের ধ্বনিগ্রন্থি শিথিল হইয়া যায়। আধুনিক বাংলা গদ্যের যে দুর্গতি লক্ষ্য করা যাইতেছে, ইহাই তাহার মূল কারণ। যাহারা সাধুরীতি ত্যাগ করিয়াছে, অর্থাৎ ক্রিয়াপদগুলি ভাঙ্গিয়া দিয়া, সাধুভাষার ধ্বনি-সঙ্গতি নষ্ট করিয়াছে, অথচ বিশুদ্ধ বাংলা-বুলি যাহাদের আয়ত্ত নহে, তাহারাই সর্ব্ববিধ অনাচারে গা ভাসাইয়াছে।

একদিন রবীন্দ্রনাথ ভাষার একটা রীতি-বৈচিত্র্য সম্পাদনের জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন—'সবুজ পত্র' তাহার বাহন হইয়াছিল; শুধু বাহন নয়, ভাষার সংস্কার-কার্য্যে ব্রতী হইয়া রীতিমত আন্দোলন সুরু করিয়াছিল। ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারে একদিন যেমন নব্য সম্প্রদায় উন্নত ও বিশুদ্ধ আদর্শের ঘোষণা করিয়াছিলেন, বাংলাভাষার সংস্কার-কামনায় ঠিক সেইরূপ এক পৃথক আদর্শের মহিমা ঘোষিত হইল—ইহাও যেন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে নব্যতন্ত্রের আক্রোশ। বাংলাভাষার বিরুদ্ধে 'সংস্কৃত' ও 'পণ্ডিতী' ইত্যাকার গালি বর্ষিত হইতে লাগিল; ইহাদের প্রধান আপত্তিই যেন এই যে, ভাষার ভিতরেও ব্রাহ্মণের আধিপত্য থাকিবে কেন? সাধুভাষার মধ্যে যে শ্রী ও শক্তি রহিয়াছে, তাহা বিবেচনার যোগ্য নয়; সে-রীতি রসসৃষ্টির পক্ষে যতই অনুকূল হউক—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের রবীন্দ্রত্ব, চৌদ্দ-আনা অংশে, সেই রীতির উপরেই নির্ভর করিলেও—পৌত্তলিক বঙ্কিম যাহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, কুসংস্কার-মুক্ত অভিজাত-সম্প্রদায়, সেই ধূপধুনাগন্ধী সংস্কৃতমন্ত্রানুকারী ভাষা সহ্য করিবেন না। কথাটা যে

এমন করিয়াই বলিতে হইল তজ্জন্য আমিও দুঃখিত, কিন্তু সাধুভাষার বিরুদ্ধে এই আন্দোলন নিতান্তই আক্রোশ-মূলক বলিয়া মনে হয়, ব্যক্তি বা সম্প্রদায়বিশেষের একটা অকারণ বিরাগ ছাড়া ইহার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

এতদিন ইহার জন্য রবীন্দ্রনাথকে দায়ী করি নাই; কারণ রবীন্দ্র-প্রতিভার মূল-প্রেরণা বুঝি। সকলের উপরে তিনি আর্টিষ্ট—এই কথাটি না বুঝিলে রবীন্দ্রনাথকে কেহই বুঝিতে পারিবে না। এ বিষয়ে একটা দৃষ্টান্ত দিব। সকলেই জানেন, রবীন্দ্রনাথ মিষ্টিক নহেন, কিন্তু মিষ্টিক-কবিতা লিখিয়াছেন; অথচ mysticism—জীবনের উপলব্ধি, কায়মনঃপ্রাণে উহার সাধনা করিতে হয়; যাহারা মিষ্টিক তাহারা ঠিক কবিও নহে, তাহাদের মনঃপ্রকৃতি চিত্তের ধাতুই—স্বতন্ত্র। কিন্তু যিনি এতবড় আর্টিষ্ট, আর্টের উপাদান হিসাবে সকলই তাঁহার বশীভূত, কিছুই তাঁহার আর্ট-সাধনার বহির্ভূত নহে। এই একটি মাত্র দৃষ্টান্ত আমি এখানে দিলাম, এ প্রসঙ্গে ইহাই যথেষ্ট। এতবড় সাহিত্যিক প্রতিভা সত্ত্বেও, সঙ্গীতই রবীন্দ্র-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ প্রেরণা। কেবল সঙ্গীতবিদ্ বলিয়া নয়,—এ-হেন সঙ্গীত-প্রাণ ব্যক্তির কোনও স্থির মত বা বদ্ধ-সংস্কার থাকিতে পারে না—অবন্ধনই তাঁহার স্বভাব, সঙ্গীতাত্মক সুষমা প্রীতিই তাঁহার প্রাণের একমাত্র বন্ধন; আর কোন ধর্ম্মই তাঁহার নাই। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় যে সূক্ষ্ম বিতর্ক বা বিশ্লেষণ-শক্তি ও প্রবল ভাবুকতার পরিচয় আছে তাহার পশ্চাতে কোনও মতবাদী ব্যক্তির দৃঢ় প্রত্যয় নাই। রবীন্দ্রনাথের মনোজগতে যদি কোনও শৃঙ্খলা থাকে, তবে তাহা বিশৃঙ্খলার শৃঙ্খলা, পরস্পরের মধ্যে যেখানে যত অসঙ্গতি সেইখানেই তাঁহার মন একটা শৃঙ্খলা-স্থাপনের জন্য ব্যাকুল; এইজন্য, বাহ্যিক ঐক্য বা সঙ্গতিরক্ষার জন্য তাঁহার কোনও উদ্বেগ নাই; বিরোধ ও বৈচিত্র্যই তাঁহার আনন্দ-বিধান করে। এইজন্যই বলিয়াছি, ইংরাজীতে যাহাকে বলে artist par excellence, রবীন্দ্রনাথ তাহাই; তাঁহার প্রতিভা মূলে সঙ্গীতপ্রধান। এ হেন ব্যক্তির কোনও বিধি বা আদর্শ-প্রচারের প্রবৃত্তি অথবা যোগ্যতা থাকিতে পারে না; বঙ্কিমচন্দ্র যে কার্য্যের উপযুক্ত রবীন্দ্রনাথ সে কার্য্যের উপযুক্ত নহেন; এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাংলাসাহিত্যের একজন প্রধান স্রষ্টা হইলেও, তিনি এ-সাহিত্যের নায়ক নহেন। আর্টিষ্ট রবীন্দ্রনাথ ইদানীং বাংলাভাষার উপরে যে নূতন নূতন নক্সা কাটিতেছেন—পুরাতন রীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ, এবং নূতন ভঙ্গিমার প্রতি আসক্ত হইয়াছেন, তাহা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে নূতনও নহে, অস্বাভাবিকও নহে। কিন্তু সহসা ভাষার আদর্শ সম্বন্ধে তিনি এমন সুস্পষ্ট মতবাদ প্রচার করিতেছেন যে তাহাতে মনে হয়, তিনি বাংলা সাহিত্যকে ভাষান্তরিত করিবার পক্ষপাতী। তাঁহার এই মত যথার্থ হইলে বিগত শতাব্দীর সাহিত্য এবং সেই সঙ্গে তাঁহার স্বরচিত গদ্য-পদ্যের প্রায় সমগ্র উৎকৃষ্ট অংশ বাতিল হইয়া যায়। টলষ্টয় শেষ বয়সে আর্টের নূতন আদর্শ স্থাপনার্থে যাহা করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথও বৃদ্ধবয়সে ভাষার নবাবিষ্কৃত ভঙ্গির খাতিরে সাহিত্যের সেইরূপ প্রাণদণ্ড করিতে চান। আর্টিষ্টের পক্ষপাত বুঝি—রবীন্দ্রনাথের

বৈচিত্র্যলোভী মন ভাষারও নানা ভঙ্গি সন্ধান করিবে, ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই; কিন্তু এতদিন পরে মনে হইতেছে, রবীন্দ্রনাথ যেন এই ভাষার বিষয়ে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতেই মনস্থ করিয়াছেন—তাঁহার সদ্য-প্রকাশিত ছন্দ-বিষয়ক প্রবন্ধে এইরূপ ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের মত স্রষ্টা ও শিল্পী যদি অবশেষে বাংলা ভাষার এই গতিই নির্দ্ধারণ করেন তবে ভাষা-বিভ্রাটের আর বাকি কি?

পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই নূতন ভঙ্গি রবীন্দ্রনাথ বহুপূর্ব্বে কবিতায় আমদানী করিয়াছিলেন—'ক্ষণিকা'র ভাষা ও ছন্দ বাংলা গীতিকাব্যে এক নূতন সম্পদ ও সম্ভাবনারূপে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে। বাংলা গদ্যেও নূতন রীতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের মন বহুপূর্ব্বেই আকৃষ্ট হইয়া থাকিবে, এবং ভাষার ভঙ্গি-বৈচিত্র্যহিসাবে রবীন্দ্রনাথের মত সাহিত্যশিল্পীর সেদিকে আকৃষ্ট হওয়া কিছুমাত্র অসঙ্গত নহে, বরং সঙ্গত ও স্বাভাবিক। উপলক্ষ্য বা বিষয়-বিশেষে, এই মৌখিক বাক্-ভঙ্গিই অধিকতর উপযোগী বলিয়া মনে হইতে পারে; তা ছাড়া, আটপৌরে পোষাকের মত ভাষারও যদি আর একটা ছাঁদ থাকে, মন্দ কি? কিন্তু গদ্যের এই রীতিও এমন প্রশস্ত নহে যে তাহাকেই সাহিত্যের রীতি করিতে হইবে—যে রীতি সাহিত্যের রীতি হইয়া আছে, তাহার তুল্য ক্ষমতা ইহার নাই, রবীন্দ্রনাথের মত লেখকের প্রাণপণ চেষ্টাতেও প্রমাণ হয় নাই যে এই রীতিই শ্রেষ্ঠ, ইহার জন্য পুরাতন রীতি পরিত্যাগ করিবার কোনও প্রয়োজন আছে। কিন্তু সে কথা পরে, যাহা বলিতেছিলাম। 'সবুজ পত্র' একটা coterie-র মুখপত্ররূপে দেখা দিল, এই coterie বাংলা ভাষার রীতি পরিবর্ত্তন করিতে চাহিল। এই coterie-র সহিত রবীন্দ্রনাথ যুক্ত ছিলেন—যথেষ্ট উৎসাহও দিয়া থাকিবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যধর্ম্ম-বোধ তখনও অটুট, তাঁহার সাহিত্যিক instinct তাঁহাকে বাড়াবাড়ি করিতে দিল না। 'সবুজ পত্রে' প্রকাশিত সেকালের গল্পগুলির ভাষাই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। 'ক্ষণিকা'-রচনা কালে ভাষা ও ছন্দের নূতন রীতি রবীন্দ্রনাথকে নিশ্চয়ই মুগ্ধ করিয়াছিল—গীতিকাব্যের প্রেরণা-বিশেষে এই ভঙ্গির যে একটি খাঁটি সাহিত্যিক উপযোগিতা আছে তাহা রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু তাই বলিয়া তখনও তিনি এই ভঙ্গিকে সর্ব্বেশ্বরী করিতে চাহেন নাই। তাই 'সবুজ পত্রে'র যুগে, রবীন্দ্রনাথের ভাব-কল্পনায়, আকালিক বসন্ত-সমাগমের মত, কবিত্বের যে অতি প্রবল ও আকস্মিক জোয়ার আসিয়াছিল, তাহার ফলে আমরা যে কবিতাগুলি পাইয়াছি—যাহা 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত ও 'বলাকা'য় সংগৃহীত হইয়াছিল—তন্মধ্যে যেগুলি ভাবৈশ্বর্য্যে ও গীতি-গৌরবে শ্রেষ্ঠ, সেগুলি সাধুভাষার সঙ্গীতে ও ভঙ্গিতে প্রকাশ পাইয়াছে। সেদিন যদি এই মতবাদ তাঁহাকে পাইয়া বসিত, তাহা হইলে 'বলাকা'র সেই কবিতাগুলি জন্মলাভ করিত না। সেই coterie-র সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়াও, ভাষার সেই নব-আদর্শ ঘোষণার যুগে, বাঙ্গালী-কবি বাংলাভাষার আসল ধ্বনি-রূপকে স্বীকার করিয়াছিলেন।

Coterie-র প্রভাবে কবিতার ভঙ্গি হইল এইরূপ—

শিকল-দেবীর ঐ যে পূজাবেদী
চিরকাল কি রইবে খাড়া ?
পাগলামী তুই আয় রে দুয়ার ভেদি !
ঝড়ের মাতন ! বিজয় কেতন নেড়ে
অট্টহাস্যে আকাশখানা ফেড়ে,
ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে
ভুলগুলো সব আন্ রে বাছা-বাছা !
আয় প্রমত্ত, আয়-রে আমার কাঁচা !

অথবা—

যৌবন রে, বন্দী কি তুই আপন গণ্ডিতে ?
বয়সের এই মায়াজালের বাঁধনখানা তোরে
হবে খণ্ডিতে।

উপরি-উদ্ধৃত কবিতার অংশগুলিতে কেবল বাক্যই আছে—ছন্দও আছে, সুর নাই। আমার মনে হয়, উগ্র মতবাদের প্ররোচনায় যাহা হইয়া থাকে, এখানে তাহাই হইয়াছে—বুলি ও ছন্দের জোরটাই বেশী করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। কথ্যভাষা কাব্যরসসিক্ত হইলে, অর্থাৎ তাহাতে কবির প্রাণের সুর লাগিলে, বাংলা গীতিকবিতার যে-রূপ ফুটিয়া উঠে, বাংলাসাহিত্যে তাহা নূতন নয়। রবীন্দ্রনাথের দ্বারা সেই ভাষা ও ছন্দের যতই উন্নতি হউক, তদ্দারা গোপীযন্ত্র বা একতারার কাজই চলিতে পারে, বঙ্গভারতীর সপ্তস্বরার স্থান সে পূরণ করিতে পারে না। সেই সপ্তস্বরার আওয়াজ যে কিরূপ, 'বলাকা' হইতেই তাহার কিছু উদাহরণ দিব—

হে সম্রাট, তাই তব শঙ্কিত হৃদয়
চেয়েছিল করিবারে সময়ের হৃদয় হরণ
সৌন্দর্য্যে ভুলায়ে।
কণ্ঠে তার কি মালা দুলায়ে
করিলে বরণ
রূপহীন মরণেরে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে ?
* * *
জ্যোৎস্নারাতে নিভৃত মন্দিরে
প্রেয়সীরে
যে নামে ডাকিতে ধীরে ধীরে
সেই কানে-কানে ডাকা রেখে গেলে এইখানে
অনন্তের কানে।

প্রেমের করুণ কোমলতা
ফুটিল তা
সৌন্দর্য্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে।

*　　*

সহসা শুনিনু সেইক্ষণে
সন্ধ্যার গগনে
শব্দের বিদ্যুৎছটা শূন্যের প্রান্তরে
মুহূর্ত্তে ছুটিয়া গেল দূর হ'তে দূরে দূরান্তরে।
হে হংস-বলাকা,
ঝঞ্ঝা-মদরসে মত্ত তোমাদের পাখা
রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে
বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে।
ঐ পক্ষধ্বনি,
শব্দময়ী অপ্সর-রমণী,
গেল চলি' স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি'।
উঠিল শিহরি
গিরিশ্রেণী তিমির-মগন,
শিহরিল দেওদার-বন।

—এ যেন গৃহকোণের বদ্ধ বাতাস হইতে একেবারে সাগরকূলের মুক্ত হাওয়ায় ছাড়া-পাওয়া! এ হংস-বলাকা আর কেহ নয়—বাংলা পয়ারছন্দের সাধুভাষা; সেই ছন্দের সেই সুর কবিকে মাতাল করিয়াছে। সাধুরীতির এ ছন্দ আর কখনও এমন করিয়া কবিকে উতলা করে নাই, এই কবিতাগুলির মধ্যেই বার বার সেই কথা বলিয়াছেন। যথন শুনি—

ওরে কবি, তোরে আজ করেছে উতলা
ঝঙ্কারমুখরা এই ভুবন-মেখলা।

*

ঝঞ্ঝা-মদরসে মত্ত তোমাদেব পাখা
রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে
বিস্ময়ের জাগবণ তরাঙ্গযা চলিল আকাশে।

*

এই তব হৃদয়ের ছবি
এই তব নব মেঘদূত
অপূর্ব্ব অদ্ভুত
উঠিয়াছে অলক্ষ্যের পানে—

—তখন বুঝিতে বিলম্ব হয় না, ভাষা-ছন্দের কোন্ ‘অপূর্ব্ব অদ্ভুত’ সঙ্গীত ‘এই নব মেঘদূত’ রচনা করিয়াছে। কবির জীবনে এমন বহুবার ঘটিয়াছে, কিন্তু ইহাই শেষবার, এমন আর পরে ঘটে নাই।

‘সবুজপত্রে’র যুগে, অর্থাৎ ‘বলাকা’র কবিতাগুলি ও নূতন গল্পগুলি লিখিবার কালে, ভাষার রীতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন যেদিকেই ঝুঁকিয়া থাকুক, তাঁহার কবি-চিত্ত, বা অন্তরের বাণী-প্রেরণা, সাধুভাষাকেই বরণ করিয়াছে, ইহা আমরা দেখিয়াছি। সত্য বটে, তাহার পরে তাঁহার পদ্য, ও বিশেষ করিয়া গদ্যরচনার ভাষা, উত্তরোত্তর নূতনের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে—তাহাতে আমরা কিছুমাত্র বিস্মিত হই নাই; কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শিল্পী রবীন্দ্রনাথের খেয়াল-খুশীর স্বাধীনতা আমরা মানিয়া লওয়াই সঙ্গত মনে করি। মানুষের যেমন, তেমনই কবিরও জীবনে একটা শেষ বা পরিণাম আছে। দেহে যৌবনের মত—মানস-জীবনেও প্রতিভার পূর্ণস্ফূর্ত্তির একটা কাল আছে, তারপর জরার আক্রমণ অনিবার্য্য। সকল কবির জীবনেই প্রতিভার পূর্ণোদয়ের শেষে অস্ত-কাল উপস্থিত হয়, রবীন্দ্র প্রতিভাও সে নিয়মের বহির্ভূত নয়। ‘বলাকা’য় আমরা রবীন্দ্র-প্রতিভার শেষ দীপ্তি দেখিয়াছি, তারপর হইতে তিনি যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহাতে আর্টিষ্টের মনস্বিতার পরিচয় আছে—যিনি আজন্ম বাণীর সাধনা করিয়াছেন, তাঁহার চিরাভ্যস্ত লিপি কুশলতা নানা ভঙ্গিমায় নিজেকে বাঁচাইয়া চলিয়াছে। কিন্তু ভঙ্গিই তাহার প্রাণ, মানস-বিলাসের কারুকলাই তাহার প্রধান উপজীব্য; তাহাতে স্রষ্টার আত্মোৎসর্গ নাই; শিল্পীর আত্মসচেতন বিলাস-লীলা আছে। স্রষ্টা ও কবি, প্রকৃতির নিয়মে জরাগ্রস্ত হইলেও, শিল্পীহিসাবে রবীন্দ্রনাথের মানস-পিপাসা এখনও মরে নাই, এই অবস্থা ক্রমেই আরও প্রকট হইয়া উঠিতেছে। সত্তর বৎসর পার হইয়াও রবীন্দ্রনাথের মানস-শক্তি যে এখনও অটুট আছে, ইহাই বিস্ময়কর; এতকাল ধরিয়া মনের এই সজীবতা একালে আমাদের দেশে অতিশয় বিরল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি-প্রতিভা হারাইয়াছেন (এ বয়সে তাহা কিছুমাত্র অগৌরবের নহে), তিনি বাণীর নিগূঢ় রহস্য, ভাব ও রূপের আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ, দৃষ্টি ও সৃষ্টির অভেদ-তত্ত্ব—কবিচিত্তের সেই পরম উপলব্ধিকে—উপেক্ষা করিয়া, এক্ষণে বাণীকে কেবল কেলি-কলার সহচরীরূপে ধরিয়া রাখিয়াছেন। প্রতিভা যাহাদের নাই, দিব্য প্রেরণার অবস্থায় বাণীর জ্যোতির্ম্ময়ী প্রসন্নমূর্ত্তি যাহাদের সম্মুখে কখনও আবির্ভূত হইবে না, খাঁটি বাংলা-বুলি যাহারা বলিতেও ভুলিয়া গিয়াছে, তাহাদেরই পৃষ্ঠপোষকরূপে অতঃপর রবীন্দ্রনাথ প্রাকৃত-বাংলার নামে একটা ভাষা—যাহা ঐতিহাসিক বা সাহিত্যিক, কোনও হিসাবেই গ্রাহ্য নহে—তাহারই জয় ঘোষণা করিতেছেন।

১৩৩৮ সালে ‘পরিচয়’ নামক পত্রিকার আবির্ভাব হয়। এই পত্রিকাখানিকে ‘সবুজপত্রের’ সাক্ষাৎ বংশধর বলা যাইতে পারে। এই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন—

‘সবুজপত্র’ বাংলাভাষার মোড় ফিরিয়ে দিয়ে গেল। * * এর পূর্ব্বে সাহিত্যে চল্‌তি ভাষার প্রবেশ

একেবারে ছিল না তা নয়, কিন্তু সে ছিল খিড়কির রাস্তায় অন্দরমহলে। * * একবার যেমনি একে আত্মপ্রমাণের অবকাশ দেওয়া গেছে, অমনি আপন সহজ প্রাণশক্তির জোরেই সমস্ত বাঁধা আল ডিঙিয়ে আজ বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সে আপন দখল কেবলি এগিয়ে নিয়ে চলেছে। তার কারণ এটা জবর দখল নয়, এই দখলের দলিল ছিল তার নিজের স্বভাবের মধ্যেই, ফোর্ট উইলিয়মের পণ্ডিতেরা সংস্কৃত বেড়া তুলে দখল ঠেকিয়ে রেখেছিলেন।

এই উক্তির কয়েকটি কথা প্রণিধানযোগ্য; প্রথম দুইটি কথা একত্রে লওয়া যাক। খাঁটি সাহিত্যের প্রয়োজনে চলতি-ভাষার সহজ প্রাণ-শক্তির আবশ্যক হইল বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে। আগে হয় নাই কেন? ইহার দখল ত কেহ ঠেকাইয়া রাখে নাই! যে চলতি-ভাষা লোক-সাহিত্যে এবং গ্রাম্য গীতিকাব্যে অষ্টাদশ শতকের রামপ্রসাদ হইতে ঊনবিংশ শতকে টপ্পা-কবি পর্য্যন্ত—অপ্রতিহতভাবে স্বাধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল, তাহার সহজ প্রাণশক্তি বাঙ্গালী ত অস্বীকার করে নাই! কিন্তু সেই সহজ প্রাণশক্তি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ-পাদে নব্য-বাঙ্গালীকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই—দাশুরায়ের ছড়া সংস্কৃত-ব্যবসায়ী পণ্ডিতেরাই উপভোগ করিতেন, নব্য-সমাজের তাহা রুচিকর হয় নাই। এই সহজ প্রাণশক্তি মৌখিক ভাষামাত্রেরই আছে, কিন্তু সেই ভাষায় রচনা করিবার প্রবৃত্তি কোনও সাহিত্যিক বাঙ্গালীর কখনও হয় নাই; কেবল কৃষ্ণদাস কবিরাজ নয়—মুকুন্দরাম বা ভারতচন্দ্র, এমন কি ঈশ্বরগুপ্তের মত বাঙ্গালীও তাহার উপর নির্ভর করিতে পারেন নাই। এখন কথা হইতেছে, এই 'প্রাণের জোর' কি কেবল পণ্ডিতগণের অত্যাচারেই সাহিত্যে আপনাকে জাহির করিতে পারে নাই? গত যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ—যিনি সাধুভাষাকেই আশ্রয় করিয়া নিজের কবি-প্রতিভাকে সার্থক করিয়াছেন—বাংলা-গদ্যের সেই অন্যতম উৎকর্ষ-বিধাতা রবীন্দ্রনাথ—আজ এতকাল পরে সাধুভাষার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন কেন? বাংলা সাহিত্য ও ভাষার ইতিহাস, বিশেষ করিয়া গত যুগের বাংলাসাহিত্যের সেই পুনরুজ্জীবন-কাহিনী, এবং সেই সঙ্গে নিজের কীর্ত্তিকেও বিস্মৃত হইয়া রবীন্দ্রনাথ আজ এই ভাষাবিভ্রাট ঘটাইতে প্রবৃত্ত হইলেন কেন? সাহিত্যের ইতিহাসে দুই-চারি জন এমন প্রতিভাশালী কবি-লেখকের সন্ধান পাওয়া যায়, যাঁহারা যেন যাদুশক্তির বলে ভাষাকে অস্পষ্ট, অসংলগ্ন, বিকলাঙ্গ অবস্থা হইতে সহসা একটা বড় ধাপে তুলিয়া দিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে ভাষার যে অসংস্কৃত রূপ ছিল, এই সকল লেখক তাহারই অন্তর্নিহিত শক্তিকে—ভাষার নিজস্ব প্রাণ-প্রবৃত্তিকেই, প্রতিভাবলে ভিতর হইতে বাহিরে প্রকাশিত করিয়া দেন। বাংলাভাষাও আদি হইতে আজ পর্য্যন্ত সেইরূপেই ক্রমবিবর্ত্তিত হইয়াছে, সর্ব্বকালের কবি-সাহিত্যিক ভাষার যে রূপটিকে ধরিয়া আছেন তাহা প্রাকৃত বা কথ্যরীতি নহে—ইহার কারণ অতিশয় সুস্পষ্ট। বাঙ্গালীজাতির জীবন চিরদিনই গ্রাম্য; কিন্তু এই জীবনে যেখানেই যতটুকু আর্য্য-সংস্কৃতির স্পর্শ ঘটিয়াছে—শাস্ত্রের উপদেশ বা পুরাণগুলির ভাব-প্রেরণা হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছে, সেইখানেই, সেই সংস্কৃতির প্রভাবে তাহার গ্রাম্যতা যতটুকু মার্জ্জিত হইয়াছে, সাহিত্যের ভাষাও ততটুকু রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। এই প্রভাবের বশে, এই সংস্কৃতির

ফলেই, বাঙ্গালী যখন গল্প বলিতে বা গান করিতে বসিয়াছে, তখনই ভাষার গ্রাম্যতাকে কিয়ৎ পরিমাণে শোধন করিয়া লইয়াছে; কথ্য-ভাষার ভঙ্গিতে তাহার সাহিত্য-প্রেরণা কখনও আরাম পায় নাই। আমাদের ভাষা কোনও একটা প্রাকৃতের অপভ্রংশ বটে, তাহার জাতিগত বৈশিষ্ট্যও ক্রমশঃ স্ফুটতর হইয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু যখনই আমরা সাহিত্যরচনা করিতে সুরু করিলাম, তখনই এই অপভ্রংশকে—তাহার প্রকৃতি যথাসম্ভব বজায় রাখিয়া, একটা সংস্কৃত রূপে বাঁধিয়া লইয়াছি। এই ভাষা বলি—এক ছন্দে বা ভঙ্গিতে, লিখি—আর এক ছন্দে, আর এক ভঙ্গিতে; মনে হয় যেন দুইটা ভাষা। কিন্তু ইহা লইয়া কেহ সমস্যায় বা সঙ্কটে পড়ে নাই, এ পার্থক্য কোন লেখককে পীড়া দেয় নাই; বরং এই বিশিষ্ট সাহিত্যিক ভঙ্গিটুকুই প্রতিভাহীন লেখককেও সাহিত্য-রচনায় উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করিয়াছিল। প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের অধিকাংশই এই ভাষার গুণে সাহিত্যপদ পাইয়াছে। অধিকাংশ রচনার বিষয়বস্তু যেমন ক্ষুদ্র তেমনই বৈচিত্র্যহীন, অথচ তাহাই সাহিত্যের উপকরণরূপে কবিকে আকর্ষণ করিয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ—সেগুলিকে ভাষা ও ছন্দের মর্য্যাদা দান করিবার স্পৃহা। পারিবারিক জীবনের দুই একটি বাঁধা ধরা সুখ-দুঃখের একই কথা, ধর্ম্ম লইয়া সামাজিক বিবাদ, অতি তুচ্ছ দাম্পত্য-কলহ, মাহাত্ম্যহীন দেবদেবীর মাহাত্ম্য-বর্ণন, নারীদের বেশবাস, অলঙ্কার, ও নাক-চোখের মামুলী বর্ণনা, পায়স-পিষ্টক ও নানাবিধ ব্যঞ্জনের তালিকা—এই ধরণের বিষয়-বস্তুই এক যুগ ধরিয়া এতগুলা লেখকের কবি-প্রেরণার উপজীব্য যে কি করিয়া হয়, তাহার আর কোনও কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না। কলিকাতা অঞ্চলের কথ্য-ভাষার মোহ যেমন অনেক অ-সাহিত্যিককে সাহিত্যিক করিয়া তুলিতেছে, এককালে এই কথ্যভাষা বা dialect-এর অমার্জ্জিত ও ধ্বনিসৌষ্ঠবহীন রীতিকে বর্জ্জন করিয়া ভাষার এই ভদ্ররূপের চর্চ্চা-ই বহু লেখকের সাহিত্য-সাধনার অভিপ্রায় ছিল বলিয়া মনে হয়। ভাষার এই সাহিত্যিক ভঙ্গিকে কৃত্রিম বলিয়া অস্বস্তি বোধ করিবার কোনও কারণই থাকিতে পারে না। কারণ, এক অর্থে সাহিত্যের ভাষামাত্রেই কৃত্রিম। কবি যে-ভাষায় লেখেন, অরসিক অ-কবি তাহাকে কৃত্রিম মনে করিবে ই, চিরদিনই করিয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথের রচনাপাঠ-কালে সে রচনা যে-রীতিরই হউক—হাস্যবেগ অনুভব করে, এমন শ্রোতার অভাব কখনই হইবে না; অথচ রবীন্দ্রনাথ-কথিত 'প্রাণের জোর' যে ভাষার প্রধান সম্পদ, ইহারা সকলেই সেই কথ্যভাষাই বলিয়া থাকে। কাজেই, কৃত্রিমতার কথা ছাড়িয়া দিলাম। এই সাধুভাষা বাঙ্গালীর জাতীয় সংস্কৃতির ভাষা, এই ভাষা যদি বাঙ্গালী খুঁজিয়া না পাইত, তবে তাহার আদিম গ্রাম্যতা এখনও অক্ষুণ্ণ থাকিত। যদি এই ভাষা বিজাতীয় হয়, তবে বাঙ্গালী এতকাল ধরিয়া যাহা কিছু রচনা করিয়াছে, তাহা সাহিত্যই নয়। এ ভাষা খাঁটি বাংলা না হইয়া যদি সংস্কৃতানুযায়ী হয়, তবে ইহাই বলিতে হইবে যে, জন্মহিসাবে বাঙ্গালী এক জাতি, কিন্তু ভাব-চিন্তার ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উপনয়ন-সংস্কারের দ্বারা সে দ্বিজত্ব লাভ

করিয়াছে। খাঁটি বাংলাভাষা বলিতে এখন যাহা বুঝায়, তাহাও প্রাকৃত-বাংলা নয়—বারো-আনা সংস্কৃত।

রবীন্দ্রনাথ এযাবৎ-প্রচলিত গদ্যরীতির জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতকে দায়ী করিয়াছেন। এই গদ্যের জন্য উক্ত পণ্ডিতগণকে দায়ী করার অর্থ অবশ্য ইহাই যে, এই পণ্ডিতেরাই যখন এ ভাষার জন্মদাতা তখন এ ভাষা খাঁটি বাংলা হইতেই পারে না—বরং তাঁহাদের পণ্ডিতী শক্রতার ফলে বাংলাগদ্যের স্বভাবহানি হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া কৌতুক অনুভব করিয়াছি। আধুনিক যুগে বাঙ্গালীর যত-কিছু উন্নতি হইয়াছে, তাহার মূলে একজন মাত্র যুগাবতার আছেন, তিনি রামমোহন রায়; বাংলা গদ্যের স্রষ্টাও তিনি। তাহাই না হয় মানিলাম, কিন্তু গদ্যসৃষ্টির যাহা কিছু গৌরব তাহার ভাগী হইবেন রামমোহন, আর ইহার জন্য যত-কিছু অপরাধ তাহার ভার বহিতে হইবে গরীব পণ্ডিতগণের—এ কেমন সুবিচার? হিন্দু পণ্ডিতদের যত দোষ—যত আক্রোশ তাঁহাদের উপরে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, সাধুভাষার প্রতি এক দলের এই যে বিরাগ, ইহার মূলে যেন একটা সাম্প্রদায়িক মনোভাব বা কমপ্লেক্স্ আছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ অর্দ্ধে বাঙ্গালীর সুপ্ত প্রতিভা যখন নূতন করিয়া সাড়া দিল, তখন বাংলাভাষার—কি গদ্যে কি পদ্যে—অপরিসীম দারিদ্র্য তাহাকে নৈরাশ্যে অভিভূত করিয়াছিল। ভারতচন্দ্রের কাব্যে আমরা বাংলা ভাষার যে সুমার্জ্জিত কলাসম্মত রসনিপুণ ভঙ্গি ও বিশুদ্ধ রীতির প্রথম পরিচয় পাই—ভাষার সেই সাহিত্যিক আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার সময় পাইল না, রাষ্ট্রীয় গোলযোগ ও সামাজিক অব্যবস্থার ফলে সকলই বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। ষোড়শ শতাব্দী হইতে যে জাগরণ আরম্ভ হইয়াছিল, যে নূতন সংস্কৃতি এ-জাতির স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার ধারা বিক্ষুব্ধ ও বিচ্ছিন্ন হইয়া অতিশয় অগভীর হইয়া উঠিল—সাহিত্যে স্রোতোধারার পরিবর্ত্তে কূপ-পল্বলের সৃষ্টি হইল। পূর্ব্ব-যুগের সাহিত্য ক্রমশঃ যে আদর্শে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল, ভারতচন্দ্রের ভাষায় যে সরল অথচ সুমার্জ্জিত গাঢ়বন্ধ-শ্রী ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়াছিলাম—যাহার মূলে ছিল শিক্ষিত রসবোধ, বিদ্বানসুলভ বৈদগ্ধ্য, পরবর্ত্তী-কালে ভাষার সে আদর্শ টিকিল না, কারণ সে সংস্কৃতিই লোপ পাইতে বসিল; বাণী আর সাধনার বস্তু রহিল না, কবি-প্রতিভা স্বচ্ছন্দজাত লতাগুল্মের মত মাঠবাট ছাইয়া ফেলিল; বাংলাসাহিত্যের ক্ল্যাসিকাল যুগ স্বল্পকালমাত্র স্থায়ী হইয়া সহসা অন্তর্হিত হইল। বাণী সাধনার সেই আদর্শ যদি আরও কিছুকাল টিকিয়া থাকিতে পারিত, এবং ভারতচন্দ্রের সেই সাধনা যদি অব্যাহত থাকিয়া আরও শক্তিশালী প্রতিভার অভ্যুদয়ে স্বাভাবিক সুপরিণতি লাভ করিত, তাহা হইলে বোধ হয়, ঊনবিংশ শতকের শেষার্দ্ধে আমরা কবিওয়ালার গান ও ঈশ্বরগুপ্তের কবিতার পরিবর্ত্তে এমন কিছু পাইতাম, যাহাতে নবযুগের সাহিত্য-প্রেরণা সুসম্পন্ন ভাষা ও সুমার্জ্জিত রীতির অভাবে এমন দিশাহারা হইত না।

একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, সেকালে বাঙ্গালীর সেই নবজাগ্রত প্রতিভা

সাহিত্যসৃষ্টির জন্ত বাংলাভাষাকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সংস্কৃত করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিল—সংস্কৃতের সাহায্যেই এক মহাসঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিল। 'বিষবৃক্ষ', 'কপালকুণ্ডলা'র যে রস-কল্পনা, তাহার বাহন হইল বঙ্কিমী ভাষা—এ ভাষা সেই কাব্যপ্রেরণার প্রয়োজনেই জন্মলাভ করিয়াছিল। যে-ভাষায় দেব-দেবীর ভবানীতে গ্রাম্য জীবনের কাহিনী রচনা করিতে কিছুমাত্র অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই, সে ভাষায় সেক্সপীয়রীয় ট্রাজেডির মত কাব্যরস সৃষ্টি করা কোনও কালের কবির পক্ষেই সম্ভব নয়। রসের আদর্শই যদি বদলাইয়া যায় তবে কোন কথাই নাই, নতুবা, আজিকার দিনেও সেই ধরণের সাহিত্য খাঁটি কথ্য বাংলার ভঙ্গিতে রচনা করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। এ কথা যিনি বুঝিতে পারিবেন না তাঁহার সঙ্গে ভাষাতত্ত্বের আলোচনা চলিতে পারে, সাহিত্যের আলোচনা নিষ্ফল। মিল্টনের মহাকাব্যের সঙ্গীত বাঙ্গালীর কানের ভিতর দিয়া প্রাণে পৌঁছিয়াছে, সে সঙ্গীতের উদার উদাত্ত ধ্বনি, ঈশ্বরগুপ্ত ও কবিওয়ালার যুগের একজন বাণী বরপুত্রকে আকুল করিয়াছে। কানে যাহা বাজিতেছে ভাষায় তাহাকে ধরিবার উপায় নাই, সে যুগের সে ভাষায় তাহা কল্পনা করাও যায় না। প্রতিভা পথ দেখাইল—দৈবী প্রজ্ঞার বলে অসাধ্য সাধন হইল; এতবড় বিস্ময়কর কীর্ত্তি বোধ হয় কোন সাহিত্যের ইতিহাসে নাই। সংস্কৃতের সাহায্যে ভাষাকে এমন করিয়া বাঁধিয়া লওয়া হইল যে, কাশীদাসী-পয়ারের ছাঁদে অমিত্রাক্ষরের সাগরতরঙ্গ অপূর্ব্ব কলকল্লোলে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সে-সঙ্গীতে বাঙ্গালী যেন অর্দ্ধরাত্রে নিদ্রোত্থিত হইয়া কান পাতিয়া রহিল; বাংলা ছন্দের, তথা বাংলা কাব্যের গতি ফিরিল; আজিও সে সঙ্গীত বাংলা কবিতার শ্রেষ্ঠ সম্পদরূপে বিরাজ করিতেছে। গদ্যে ও পদ্যে এই দুই মহাপ্রতিভার উদয় না হইলে নব্য বাংলাসাহিত্য এত শীঘ্র এমন ভাবে প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হইত না।

এই নব্য-সাহিত্যের ভাষা এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যের ভাষা তুলনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, বাংলা ভাষা যেন একটি সবল সুমার্জ্জিত ভঙ্গি লাভ করিয়াছে। এতদিনে, যে একমাত্র পথে তাহার শক্তি ও শ্রী বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব সেই পথে সুনিশ্চিত পদক্ষেপ করিয়াছে। শব্দ-সম্পদ বৃদ্ধি করিবার জন্য যেমন সংস্কৃতের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল, তেমনই শব্দযোজনারীতি বা ভাষার গাঁথনি দৃঢ় করিবার জন্য অনেক পরিমাণে সংস্কৃত-আদর্শ অনুসরণ করিতে হইয়াছিল। তথাপি ভাষার ভঙ্গি সেই পুরাতন বাংলা ভঙ্গি—সেই ভঙ্গিতে শক্তি ও শ্রী সম্পাদন করিয়াছে সংস্কৃত শব্দসম্পদ ও ধ্বনিমন্ত্র। সেকালের শিক্ষিত সম্প্রদায়, যাঁহারা বাংলা সাহিত্যের চর্চ্চা করিতেন—যাঁহারা ভারতচন্দ্র, দাশুরায় ও ঈশ্বরগুপ্তের ভক্ত ছিলেন, তাঁহারাই 'মেঘনাদবধে'র প্রতি অতিমাত্রায় আসক্ত ছিলেন। এখনকার দিনে, যাঁহারা বাংলা সাহিত্য অপেক্ষা ইংরেজী সাহিত্যের সহিত অধিকতর পরিচিত, তাঁহারাই রবীন্দ্রনাথের কাব্যরস উপভোগ করিয়া থাকেন। ভাষার ভঙ্গিই ইহার একমাত্র কারণ নয় তাহা জানি—কিন্তু সংস্কৃত শব্দের অতিরিক্ত প্রয়োগেই বাংলা-ভাষা পীড়িত হইয়া উঠে,

এবং লঘু ও সরল সুপ্রচলিত শব্দের বহুল প্রয়োগেই ভাষার খাঁটি ভঙ্গি যে অক্ষত থাকে—এ ধারণা ভুল। মধুসূদন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত, আমরা বাংলা কাব্যের যে ভাষা-বৈচিত্র্য দেখিয়াছি তাহাতে ইহাই প্রমাণ হয় যে, মূল-ভঙ্গি অবিকৃত রাখিয়া ভাবকল্পনা ও ধ্বনিব্যঞ্জনার তারতম্য অনুসারে, ভাষা অতিশয় গাঢ় বা অতিশয় তরল হইতে পারে—রবীন্দ্রনাথের কাব্যেই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে। মধুসূদনের শব্দচয়নরীতি রবীন্দ্রনাথেও অক্ষুণ্ণ আছে—ভাবকল্পনা ও ধ্বনি-বিন্যাসের তারতম্য-হেতু তাহার সংস্কৃত-ভঙ্গির পার্থক্য ঘটিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের গীতি-কল্পনার ভাষা যতই সুললিত হউক, তাহার রীতি মধুসূদনের অপেক্ষা খাঁটি নহে, বরং তাহার উপর ইংরেজীর প্রভাব আরও সুস্পষ্ট। এককালে রবীন্দ্রনাথের রচনা বাঙালী পাঠকের মনোহরণ করিতে পারে নাই—এখনও সর্ব্বসাধারণের চিত্ত অধিকার করিতে পারে নাই—তাহার কারণ সবটা না হইলেও, কতকটা ইহাই। মাইকেলের কাব্যের শব্দ-দুরূহতা যতটা না বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের ভাষার অনভ্যস্ত ভঙ্গি তদপেক্ষা অধিক বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এক সমসাময়িক কবি একদা রঙ্গ করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন—"ঠাকুরগোষ্ঠির ভাষা ইংরেজীতে ভাজা। ড্যাফোডিল-পুষ্পে যেন মনসার পূজা॥"—তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা নহে। এত কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, বাংলা ভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব ঘটিয়াছে বলিয়া যাঁহারা সাধুরীতির প্রতি সদয় নহেন, মাইকেল-বঙ্কিমের ভাষাকে যাঁহারা খাঁটি বাংলার বিকৃতি বলিয়া মনে করেন, এবং ভাষার অতি আধুনিক ভঙ্গি দেখিয়া যাঁহারা আশান্বিত ও উল্লসিত হইয়াছেন, তাঁহারা যেন স্মরণ রাখেন যে বাংলার ধাতুপ্রকৃতিতে, খাঁটি বাংলা ইডিয়মের উপরেই সংস্কৃতের প্রভাব যতটা স্বাস্থ্যকর, সংস্কৃত-বর্জ্জিত কথ্যভাষার আদর্শ ততটাই অস্বাস্থ্যকর; তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই সাহিত্যের ইতিহাসে বার বার পাওয়া গিয়াছে—আজ তাহাই আরও নিঃসংশয় হইয়া উঠিয়াছে। কথ্য-ভাষার ইডিয়ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সংস্কৃতের সাহায্য কতখানি লওয়া যাইতে পারে নবযুগের সাহিত্য-সাধনায় তাহার পরীক্ষা চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে—তাহার ফলে আমরা যে ভাষা পাইয়াছি তাহা যদি খাঁটি বাংলা নয় বলিয়া বর্জ্জন করিতে হয়, তবে বাংলাসাহিত্যের অপঘাত-মৃত্যু অনিবার্য্য। এই তথাকথিত পণ্ডিতী-ভাষাই যে খাঁটি বাঙালী-প্রতিভার সৃষ্টি, এবং সেই হেতু তাহা খাঁটি বাংলা—একথা বুঝিতে হইলে আধুনিক সাহিত্যের জন্ম-ইতিহাস বুঝিতে হইবে, সে ইতিহাস এ পর্য্যন্ত কেহ লেখে নাই বলিয়া অতিশয় ভ্রান্ত মতবাদ প্রশ্রয় পাইতেছে। কথ্যভাষা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা হইতে আধুনিক সাহিত্যের জন্ম হয় নাই; ইহা একটা দৈবাধীন ঘটনা নহে। সাহিত্যের আদি স্রষ্টা যাঁহারা, কথ্যভাষার মজ্জাগত দুর্ব্বলতাই তাঁহাদের নৈরাশ্যের কারণ হইয়াছিল; সাহিত্যের যে উৎকৃষ্ট আদর্শে তাঁহারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, তাহার উপযোগী শব্দ-সম্পদ বা ধ্বনি-প্রকৃতি সে ভাষার আয়ত্ত নহে বলিয়াই, তাঁহারা ভাষাকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন—তাহা ভদ্র বা সাধুরীতিই বটে, কিন্তু তাহা বাংলা। সে আদর্শ যে সর্ব্বপ্রকারে কল্যাণকর হইয়াছে তাহাতেও সন্দেহ নাই—সেই সংস্কৃতির ফলে আমরা গ্রাম্য বর্ব্বরতা হইতে উদ্ধার পাইয়াছি।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে যে গদ্যসৃষ্টির প্রয়াস চলিয়াছিল তাহা শুধুই গদ্য-রীতির উদ্ভাবনা নহে,—বাংলাভাষার জন্মান্তর-প্রাপ্তির সাধনা। এই গদ্য যখন পূর্ণাঙ্গ হইয়া ভূমিষ্ঠ হইল তখনই আমরা গীত-সুরবর্জিত ভাষার ছন্দকে লাভ করিলাম; ইহার পূর্ব্বে বাক্যচ্ছন্দকে আশ্রয় করিয়াই কোনও সাহিত্য-সৃষ্টি হয় নাই। এই বাক্যচ্ছন্দের আবিষ্কারই অভূতপূর্ব্বভাবে কাব্যচ্ছন্দকে গানের প্রভাব হইতে মুক্তি দিল। মধুসূদন পয়ারকে যে নূতন যতি ও ছন্দে বাঁধিয়া দিলেন—যাহার ফলে কাব্যছন্দ চিরদিনের মত নূতন চালে চলিতে আরম্ভ করিল—সেই নূতন ছন্দোভঙ্গি বাক্যচ্ছন্দের উপরেই প্রতিষ্ঠিত; সেই ছন্দ হইতেই মধুসূদন তাঁহার অমর ছন্দ গড়িবার ইঙ্গিত পাইয়াছিলেন। মধুসূদনের পরে হেম নবীনের রচনায় এই গদ্যভঙ্গি আরও প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। ছন্দ-সঙ্গীত ও কাব্য-কলার প্রতিভা তেমন পরিপক্ব না হওয়ায়, তাঁহাদের অধিকাংশ রচনাই গদ্যময়—গদ্যের ভাষাই যতিমাত্রায় সজ্জিত ও মিলযুক্ত হইয়া বক্তৃতার সুরে বাজিয়া উঠিয়াছে। আধুনিক বাংলাসাহিত্যে, গদ্য ও পদ্য এখনও এমন ভাবে জড়াইয়া আছে যে, আজও গদ্যরচনায় কাব্যের সুর অতি সহজেই আসিয়া পড়ে; গদ্যে কাব্যের সুর না বাজিলে বাঙালীর কান তৃপ্ত হয় না।

বাংলা ভাষার যে অভিনব রূপের কথা বলিয়াছি তাহার সম্বন্ধে একটা কথা পুনরায় স্মরণ করাইতে চাই। ভাষার এই যে সংস্কৃত-ভঙ্গি, ইহার মূল প্রয়োজন—যাহা পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে—ভাবসংহতিমূলক শব্দযোজনা, এবং ধ্বনি-ব্যঞ্জনার ঐশ্বর্য্যলাভ। উৎকৃষ্ট রসের আধার হইতে হইলে ভাষার এ-গুণ অপরিহার্য্য। বাংলা গদ্য আরও পরিণতি লাভ করিল রবীন্দ্রনাথের যুগে—তখন এই rhythm বা ধ্বনিস্পন্দ বজায় রাখিয়া ভাষা বহুল পরিমাণে কথ্য-জবান বা ইডিয়ম আত্মসাৎ করিবার সামর্থ্য লাভ করিল। বলা বাহুল্য, ভাষার এই গতি ও প্রবৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দেন বঙ্কিমচন্দ্র; বিদ্যাসাগরী ও আলালী উভয় ভঙ্গির পৃথক ও বিশিষ্ট গুণ এক আধারে মিলাইয়া, ভাবকে ভাষার অধীন না করিয়া, ভাষাকেই ভাবের অধীন করিয়া—সাহিত্যের যাহা প্রধান ধর্ম্ম সেই প্রকাশ-শক্তিকেই প্রাধান্য দিয়া, বৈয়াকরণ বা ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতের অতিরিক্ত শুচিবায়ু-রোগ পরিহার করিয়া—বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা-গদ্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহাকে জীবধর্ম্মী করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তারপর প্রাণের আবেগে নিরন্তর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিচালনা করিয়া সেই জীবন্ত বাণী-দেহ রবীন্দ্রনাথের যুগে সুদৃঢ়, সুবলয়িত ও সুনমনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

যে-রীতির উদ্ভাবনায়, গুরুগম্ভীর শব্দযোজনা এবং সহজ সরল বাক্‌পদ্ধতির সমন্বয়ে, একটি অখণ্ড ধ্বনিপ্রবাহ সম্ভব হইয়াছে—যাহার ফলে বাংলা গদ্য ভাব, অর্থ ও ধ্বনি-ব্যঞ্জনার সর্ব্ববিধ প্রয়োজন সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছে—'an instrument of many stops' হইতে পারিয়াছে—সে-রীতি 'সাধু'ও নয় 'কথ্য'ও নয়; তাহার নাম আদর্শ-বাংলা-গদ্যরীতি; এই রীতি বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ এই তিন প্রতিভাশালী

লেখকের প্রতিভার ক্রমপরিণতি লাভ করিয়াছে, তথাপি ইহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

বঙ্কিমী যুগের এই যে গদ্য—যাহাকে 'অসাধু'-অপবাদ দিবার জন্যই এক্ষণে বেশী করিয়া 'সাধু' বলা হয়—এই গদ্যের ভাষা ও ধ্বনিসম্পদ আধুনিক বাংলাসাহিত্যকে সাহিত্য-পদবীতে আরূঢ় করিয়াছে। ভাষার এই গঠন ও তজ্জনিত ধ্বনি-গৌরব যদি বাঙালীর সাধ্যায়ত্ত না হইত, তবে আজ আমরা জগতের সাহিত্য সভায় যেটুকু স্থান দাবী করিতেছি, তাহাও সঙ্গত হইত না। যে রবীন্দ্রনাথকে আজ আমরা বিশ্বের সমক্ষে খাড়া করিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করিয়া থাকি, সেই রবীন্দ্রনাথেরও সাহিত্যসাধনা আরম্ভ হয় এই গদ্যকে আশ্রয় করিয়া, এবং তাঁহার সমগ্র কাব্যকীর্তির মহনীয় অংশ এই রীতি ও এই ধ্বনি-ছন্দের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ অতি অল্প বয়সেই এই গদ্যে তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন—১৫ হইতে ২১।২২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি যে গদ্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতেই নিজ শক্তির পরিচয় পাইয়া সাহিত্যসাধনার প্রবল প্রেরণা অনুভব করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে, এমন কি, তাহার অনেক পরেও, কবিতারচনায় তিনি তাদৃশ সাফল্য লাভ করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক জীবনের এই ঘটনা অর্থহীন নহে। তারপর তিনি বিহারী-লালের আদর্শে যে ভাষা ও সুর লইয়া গীতিকাব্য রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, পরে সেই ভঙ্গি একরূপ পরিত্যাগ করিয়া কেবল বিহারীলালের কাব্যমন্ত্রটুকু মাত্র বজায় রাখিয়া তিনি বাংলাকাব্যে যে যুগান্তর আনয়ন করেন, তাহাতে সাধুভাষা ও তাহার ধ্বনি-বিন্যাস তাঁহার বাণীকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। তাঁহার কাব্যের ভাষাও কালিদাসের বাংলা সংস্করণ, এবং তাহার প্রধান ছন্দ-ভঙ্গি হইল পয়ার কিম্বা মাত্রাবৃত্ত পয়ার। মধুসূদন যেমন পয়ারকেই —অর্থাৎ বাংলা-কাব্যের বনিয়াদী ভদ্র ছন্দটিকেই সর্ব্বকর্ম্মের উপযোগী করিয়া বিচিত্র ধ্বনিসম্পদে মণ্ডিত করিলেন, তাহাতে নাটক ও কাহিনীজাতীয় কাব্যে কবি-কল্পনা মুক্তিলাভ করিল; তেমনই, রবীন্দ্রনাথও সেই পয়ারকেই গীতিকাব্যের উপযোগী সুর-ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত করিবার কৌশলটি আবিষ্কার করিয়া কাব্যের অপর রূপটি উজ্জ্বল করিয়া তুলিলেন। বাংলায় এতদিন কবিতার আকারে গান রচিত হইত, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় আমরা বাংলায় কাব্যের বহু-বিচিত্র গীতি-ছন্দ লাভ করিলাম। মধুসূদন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত যে সাহিত্য, তাহা এমনই করিয়া সাধুভাষা ও সাধু-ভঙ্গির সেবা দ্বারা, পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই পূর্ণাবয়ব হইয়া উঠিয়াছিল।

অতঃপর, ভাষার এই রীতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অতিশয় আধুনিক মত যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহার সম্বন্ধে কিছু বলিব। রবীন্দ্রনাথ সম্প্রতি আবার ছন্দ সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন। এই গবেষণার ফলে তিনি এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, যাহা মানিয়া লইলে আধুনিক বাংলাসাহিত্যের মূলোৎপাটন করিতে হয়। কথ্য ও সাধুভাষার আসল প্রভেদ উভয়ের ধ্বনি-প্রকৃতির মধ্যে; এই ধ্বনিই ভাষার সর্ব্বস্ব, বিশেষতঃ নবযুগের সাহিত্য-

সৃষ্টির মূলে সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল এই ধ্বনির ঐশ্বর্য্যবিধান। ভাবব্যঞ্জনার অতি নিগূঢ় তত্ত্ব ভাষার ধ্বনি-রূপের মধ্যেই নিহিত আছে। ভাবসংহতি এবং রসাত্মক ধ্বনিবিন্যাসের প্রয়োজনে সে-যুগের প্রতিভা ভাষার সংস্কৃত-আদর্শ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, কারণ গ্রাম্য সাহিত্যের কথ্যভাষা বা চল্‌তি-বুলির ধ্বনিপ্রকৃতিই হীন। বস্তুতঃ, ভাষাকে উৎকৃষ্ট সাহিত্যরচনার উপযোগী করিয়া তোলাই সে যুগের সমস্যা ছিল, সেই সমস্যার সমাধানই সে যুগের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি—এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই সাধনালব্ধ ফলের সবটুকু আত্মসাৎ করিয়া তবে বাংলার বাণীমন্দিরে পদক্ষেপ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এতকাল পরে, সাহিত্যিক জীবনের অবসানে, রবীন্দ্রনাথ বাংলা-ছন্দের আলোচনায় যে সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে গতযুগের সমগ্র সাহিত্য অপদস্থ হইয়া পড়ে। এই আলোচনায় তিনি চল্‌তি ভাষার ধ্বনি-বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করিয়া তাহাকে এতখানি গৌরব দান করিতে প্রস্তুত যে, অতঃপর সাহিত্য-রচনায় সাধুভাষার প্রয়োজনই অস্বীকার করিতে হয়। চল্‌তি-ভাষার প্রতি তাঁহার পক্ষপাত ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ পাইয়াছিল, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি সাধুভাষার প্রয়োজন অস্বীকার করেন নাই। ১৩৩৮ সালের 'পরিচয়' পত্রিকায় তিনি বাংলা-ছন্দের আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন—

> সভার রীতি ও ঘরের রীতিতে কিছু ভেদ থাকেই। শকুন্তলার বাকল দেখে দুষ্মন্ত বলেছিলেন, কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্—কিন্তু যখন তাঁকে রাজ-অন্তঃপুরে নিয়েছিলেন তখন তাঁকে নিশ্চয়ই বাকল পরান নি। তখন শকুন্তলার স্বাভাবিক শোভাকে অলঙ্কৃত করেছিলেন, সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির জন্য নয়, মর্য্যাদা রক্ষার জন্য।

১৩৩৮ সালে ইহাই ছিল রবীন্দ্রনাথের মত। প্রাকৃত-বাংলার প্রতি পক্ষপাত থাকিলেও তখন তিনি সংস্কৃত-বাংলার রাজ-মর্য্যাদা স্বীকার করিতেন, এবং বাংলাভাষার এই দুই প্রকার ধ্বনিকেই ক্ষেত্রভেদে সমান প্রয়োজনীয় মনে করিতেন; 'শুদ্ধির গোময়-লেপনে'—অর্থাৎ চল্‌তি-ভাষার রীতিই যে বিশুদ্ধরীতি—এই অজুহাতে, সমস্ত একাকার করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না।

কিন্তু গত বৈশাখের (১৩৪১ সাল) 'উদয়ন' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের যে বক্তৃতাটি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে—"আমরা ভুবি পেলেই খুশী রব, ঘুষি খেলে আর বাঁচব না"—ঈশ্বরগুপ্তের এই ছড়াটি উদ্ধৃত করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

> "কেবল এর হাসিটা নয়, ছন্দের বিচিত্র ভঙ্গিটা লক্ষ্য কোরে দেখবার বিষয়। অথচ এই প্রাকৃত-বাংলাতেই 'মেঘনাদবধ কাব্য' লিখলে যে বাঙালীকে লজ্জা দেওয়া হোত সে কথা স্বীকার করব না। কাব্যটা এমন ভাবে আরম্ভ করা যেত—
>
> যুদ্ধ যখন সাঙ্গ হোল বীরবাহু বীর যবে
> বিপুল বীর্য্য দেখিয়ে শেষে গেলেন মৃত্যুপুরে

> যৌবনকাল পার না হোতেই—কও মা সরস্বতী,
> অমৃতময় বাক্য তোমার, সেনাধ্যক্ষ পদে
> কোন বীরকে বরণ করে পাঠিয়ে দিলেন রণে
> রঘুকুলের শত্রু যিনি, রক্ষকুলের নিধি।
>
> —এতে গাম্ভীর্যের ত্রুটি ঘটেছে একথা মানব না।"

এই উক্তির দ্বারা রবীন্দ্রনাথ গত যুগের সমগ্র সাহিত্যকে অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে, সেকালের লেখকেরা গোড়াতেই ভুল করিয়াছিলেন; মধুসূদনের নূতন ভাষা ও ছন্দের কোনও প্রয়োজন ছিল না, তাহা অপেক্ষা এই ভাষা ও ছন্দের গাম্ভীর্য্য কম নয়।

'গাম্ভীর্য্যের ত্রুটি ঘটেছে একথা মানব না'—এই যুক্তিই কি যথেষ্ট? এই যুক্তির উপরে নির্ভর করিয়া কোনও সাহিত্যিক সন্দীপ যদি 'বলাকা' কবিতাটির রীতি বদলাইয়া দেয়, অথবা ঘটাং ঘটাং করিয়া তাল-ঠোকা ছন্দে 'সাজাহান' কবিতাটি পড়িতে থাকে, তবে তাহার সেই বীরত্বব্যঞ্জনায় 'বলাকা'র কবিতাগুলির সুর কি অক্ষুণ্ণ থাকিবে? রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদ-বধের মাত্র কয়েক ছত্র এই অপূর্ব্ব ছন্দে প্যারাফ্রেজ করিয়াছেন, সমগ্র মেঘনাদ-বধ কাব্যখানি একটানা এই ভেক-প্রলম্ফী ছন্দে রচনা করিলে কেমন হয়, তাঁহাকে লিখিয়া দেখিতে বলি না—কল্পনা করিতে বলি।

এই বক্তৃতাটিতে, গদ্যেও চলতি-ভাষার প্রতাপ প্রতিপন্ন করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ যুক্তি ও দৃষ্টান্তের কোনটাই বাকী রাখেন নাই। সাধুভাষার প্রতি সরোষ কটাক্ষ করিয়া একস্থানে তিনি বলিতেছেন—

> "যে-বাংলা আমাদের মায়ের কণ্ঠগত, জ্যেষ্ঠতাতের লেখনীগত নয়, ইংরেজীর মতো তারও সুর ব্যঞ্জনবর্ণের সংঘাতে। আজ সাধুভাষার ছন্দে জোর দেবার অভিপ্রায়ে অভিধান ঘেঁটে যুক্ত-বর্ণের আয়োজনে লেগেছি, অথচ প্রাকৃত-বাংলার হসন্তের প্রাধান্য আছে বলেই যুক্ত-বর্ণের জোর তার মধ্যে আপনি এসে পড়ে।"

উপরি-উদ্ধৃত উক্তিটি সাধুভাষার বিরুদ্ধে যে একটি আক্রোশমূলক অপবাদ তাহা এতখানি আলোচনার পরে বলা নিষ্প্রয়োজন। এই উক্তিটির মধ্যে কয়েকটি অতিশয় অযথার্থ কথা আছে। 'অভিধান ঘেঁটে যুক্ত-বর্ণের আয়োজন'—ইহা কোন্ যুগের সাধুভাষার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে? যদি তৎসম শব্দ ব্যবহার করিলেই 'অভিধান-ঘাঁটা' হয়, তবে বাংলাভাষা দাঁড়াইবে কিসের উপর? 'অভিধানে'র শব্দগুলা বাদ দিয়া যে খাঁটি গৌড়ী-রীতির উদ্ভব হইবে, তাহাতে রবীন্দ্রনাথের গদ্য ও পদ্য-রচনাগুলি তর্জ্জমা করা সম্ভব?—করিলে রবীন্দ্র-নাথকে আর চেনা যাইবে? এই প্রসঙ্গে তিনি আর একটি যে কথা বলিয়াছেন—"বাংলায় হসন্তের প্রাধান্য আছে বলেই যুক্তবর্ণের জোর তার মধ্যে আপনি এসে পড়ে"—তাহা আদৌ

সত্য নহে। হসন্তের জোর আর যুক্তবর্ণের জোর, এই দুইয়ের প্রকৃতিই স্বতন্ত্র—এইজন্যই একই ভাষা দুইটি বিশিষ্ট রূপ ধারণ করিয়াছে; যদি এক হইত, তবে ভাষার এই দুই রীতি লইয়া কোন সমস্যাই থাকিত না। এ বিষয়ে সবিশেষ আলোচনার স্থান এখানে নাই; তথাপি যাঁহাদের কেবল ছন্দ-জ্ঞান নয়—ছন্দবোধও আছে, তাঁহারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, হসন্তের ও যুক্তবর্ণের বিন্যাস-জনিত ছন্দধ্বনি এক নহে; রবীন্দ্রনাথের মাত্রাবৃত্ত,ও ছড়ার ছন্দে রচিত কবিতার ধ্বনি-প্রকৃতি স্বতন্ত্র। একটি সাধুরীতির পয়ার-জাতীয় ছন্দেরই রূপভেদ, অপরটি চলে চল্‌তি-ভাষার চালে। অতএব রবীন্দ্রনাথের এ উক্তিও যথার্থ নহে।

এইবার সংক্ষেপে দুইচারি কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। প্রাকৃত বা চল্‌তি-বাংলার যে ধুয়া উঠিয়াছে তাহা যে সাহিত্যের প্রয়োজনে নহে, একথা সাহিত্যিকমাত্রেই স্বীকার করিবেন। তথাকথিত প্রাকৃত-রীতিও যে খাঁটি বাংলা নয়, তাহা কাহারও বুঝিতে বিলম্ব হইবে না—খাঁটি বাংলা কেহ লেখে না, এবং সম্ভবতঃ আজিকার দিনে কেহ বলেও না। যে বাংলাকে রবীন্দ্রনাথপ্রমুখ মহারথিগণ চল্‌তি-বাংলা বলিয়া খাড়া করিতেছেন, তাহা অপেক্ষা কৃত্রিম ভাষা কল্পনা করাই যায় না—সাধুভাষা তাহার তুলনায় অতি সহজ ও স্বাভাবিক। বাংলাভাষার যে দুইটা রীতি, কি ছন্দে কি রচনা-ভঙ্গিতে, ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা অস্বীকার না করিলে, এবং একই ভাষার পক্ষে এই দ্বৈত-পদ্ধতি যতই অদ্ভুত বলিয়া মনে হউক, এই দুই রীতির মধ্যে কোন্‌টি প্রশস্ত রীতি—সর্ব্ববিধ ভাবব্যঞ্জনার পক্ষে, এবং পূর্ণশক্তি ও সৌন্দর্য্য-গুণের আধার হিসাবে, কোন্ রীতি সুপরীক্ষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গেছে—সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ মাত্র আর নাই। যাহাকে খাঁটি কথ্যরীতি বলা যাইতে পারে—সে-ভাষা মৌখিক বক্তৃতা, উপদেশ, রূপকথা, বৈঠকী আলোচনার ভাষা হইতে পারে; বিষয়ের গুরুত্ব ও মর্য্যাদা-অনুসারে সাধু বা চল্‌তি ভাষার ব্যবহার লেখকের রুচি অনুযায়ী হইলে ক্ষতি নাই। কিন্তু সাহিত্যরসিকমাত্রেই স্বীকার করিবেন—সাধুভাষায় সকল কাজই চলিতে পারে, চল্‌তি ভাষা একেবারে বর্জ্জন করিলেও ক্ষতি নাই। বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতম উৎকৃষ্ট গল্প ও উপন্যাস ইহার সাক্ষী। কিন্তু চল্‌তি-ভাষার ধ্বনি-প্রকৃতি এমনই যে, তাহাতে ভাব-চিন্তা বা কল্পনার বিশিষ্ট গৌরব রক্ষা করা যায় না। স্থানাভাবে আমি একটি মাত্র দৃষ্টান্ত এখানে দিব, এবং ইচ্ছা করিয়াই একটি কবিতার উল্লেখ করিব। রবীন্দ্রনাথের 'দেবতার গ্রাস' কবিতাটি সকলেই পড়িয়াছেন, এবং সম্ভবতঃ অনেকেই ইহার আবৃত্তিও শুনিয়াছেন। এই কবিতাটি সাধুভাষায় ও সাধুছন্দে রচিত। ইহার কথাবস্তু ও বর্ণনায়, ভাবের মত—ভাষায়ও সকল স্তর সন্নিবিষ্ট আছে; অতি সহজ ও সরল নাটকীয় কথাবার্ত্তা হইতে ভাবকবিত্বময় উচ্চাঙ্গের অলঙ্কৃত বাণী একটি অখণ্ড ধ্বনিপ্রবাহে মিলিত হইয়া এই রচনাটিকে একটি অনবদ্য কাব্য-রূপ দান করিয়াছে। এত সরল, এত জীবন্ত অথচ এমন রস-গভীর কথা-চিত্র অঙ্কিত করিবার পক্ষে সাধুরীতি কিছুমাত্র বাধার সৃষ্টি করে নাই, বরং অন্য রীতিতে তাহার ধ্বনিব্যঞ্জনা ক্ষুণ্ণ হইত, 'টয়েটক্কা'-ছন্দে ও কথ্যভাষার ভঙ্গিতে উহা যে কি হইত, তাহা কল্পনা

করাও যায় না। গদ্যে ও পদ্যে এরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে যাহাতে নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয় যে, ভাষার এই সাধু-রীতিই প্রশস্ত রীতি, তাহা বর্জ্জন করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই—বরং সে রীতি নষ্ট করিলে সাহিত্যসৃষ্টিই বাধা পাইবে। এই সাধুরীতিকে সাধু বা পণ্ডিতী-রীতি বলিয়া নাসা কুঞ্চিত করিবার কোনও কারণ নাই—এই রীতিই বাঙালীর চিত্ত-প্রকর্ষের নিদান, ইহাই তাহার ভাবচিন্তা ও কল্পনাকে মার্জ্জিত, তাহার সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশকে অব্যাহত, এবং তাহার মনের মেরুদণ্ডকে দৃঢ় ও ঋজু করিয়াছে। ভাষার রীতি একটা খেলা বা খেয়ালের বস্তু নয়—ব্যক্তিবিশেষের খুশী বা বিলাস-বাসনা যদি এমন করিয়া কোনও জাতির ভাষাকে গড়িতে বা ভাঙিতে চায়, ও পারে—তবে সে জাতির মৃত্যু অবধারিত। বাঙালী কি সত্যই মরিতে বসিয়াছে?

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১
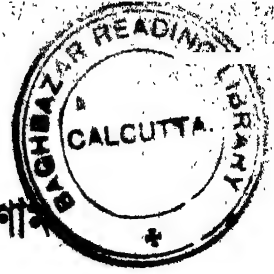
আধুনিক সাহিত্যের পরিণাম

আজকাল যাঁহারা বাংলাসাহিত্য সম্বন্ধে চিন্তা করেন, এবং এই সাহিত্যের আদর্শ-নির্ণয় বা রীতিমত সমালোচনার প্রয়োজন হইয়াছে বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের মনে সর্ব্বদাই একটা প্রশ্ন যেন আড়াল হইতে উঁকি মারিতেছে—সত্যই কি আজিকার দিনেও সাহিত্যের ভাবনা ভাবিয়া কোন ফল আছে? অতিশয় মুষ্টিমেয় জনকয়েক সাহিত্য-প্রেমিক ছাড়া সাধারণ পাঠক বা বাংলাদেশের তথাকথিত বিদ্বজ্জন-সমাজ কি বাংলাসাহিত্য, অথবা কোনও সাহিত্যের জন্য, সময় বা মস্তিষ্কের অপব্যয় করিতে ইচ্ছুক? কাহারো কাহারো কৌতূহল থাকিতে পারে কিন্তু সত্যকার দরদ আছে কয়জনের? সাহিত্যের আদর্শ-বিচার বা সাহিত্যের সমালোচনা কখনও এক-তরফা হইতে পারে না; এখানে শিক্ষাদান বা শিক্ষালাভের প্রয়োজন থাকিলেও, উভয় পক্ষ কতকটা সমপদবীস্থ না হইলে, প্রসঙ্গই উঠিতে পারে না। কারণ সাহিত্য-আলোচনার মধ্যে অন্য সকল শিক্ষার মত, প্রয়োজনের তাগিদ নাই; এখানে চাই প্রাণের তাগিদ, ও সেই সঙ্গে মনের ক্ষুধা। গত ৫০।৬০ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালী সমাজের একটা স্তরে এই তাগিদ যে ছিল তার প্রমাণ, আধুনিক বাংলাসাহিত্য। এই তাগিদ কোথা হইতে, কেমন করিয়া, কি অবস্থায় জাগিল, এবং কেমন করিয়াই বা নিঃশেষ হইয়া গেল—প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই সাহিত্যেরই গতি-প্রকৃতি আলোচনা করিলে, এবং বর্ত্তমান পরিণাম লক্ষ্য করিলে, যে কার্য্যকারণ-তত্ত্ব সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়, তাহার সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিব।

আধুনিক সাহিত্য, অর্থাৎ ইংরাজী-যুগের বাংলাসাহিত্য যে আবহাওয়ার মধ্যে জন্মিয়াছিল, এবং যে রসিকসমাজ তাহাকে বরণ করিয়া লইয়া তাহার পুষ্টির সহায়তা করিয়াছিলেন, সেই দুই-এর কিছুই আর নাই। এই সাহিত্য যাঁহারা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহারা শুধু সাহিত্য সৃষ্টিই করেন নাই—Modern Literature বলিতে আমরা যাহা বুঝি, ইংরাজী সাহিত্যের মারফতে সেই যে বাণীর সহিত তাঁহাদের পরিচয় হইয়াছিল, তাহাকে বহন করিবার মত ভাষা ও ছন্দ তাঁহাদিগকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল। প্রতিভাসম্পন্ন কবিমাত্রেই নিজের ভাষা নিজেই সৃষ্টি করেন, কিন্তু এ সৃষ্টি তারও বেশি। যে জলমাটি যে-ফুলের পক্ষে আদৌ অনুকূল নয়, সেই জলমাটিতে সেই ফুলকেই তাঁহারা স্বভাবে ফুটাইতে চাহিয়াছিলেন; সেই ফুলেরই মালা গাঁথিয়া দেবতা ও প্রিয়জনের প্রসাধন করিতে চাহিয়াছিলেন। এই অসাধ্যসাধন সে যুগের কয়েকটি অসাধারণ প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব হইয়াছিল। বাংলা ভাষার অপরিপুষ্ট ও অপরিণত দেহে একটি পূর্ণ প্রাণশক্তির অবতারণা—সেই ভাষার অতিপ্রাচীন ভাব-সংস্কারের উপরে একটি অভিনব বাণী-রূপের

প্রতিষ্ঠা—এ যে কত বড় কঠিন সাধনা, এ সাহিত্যের সেই নবজন্মের ইতিহাস যাঁহারা জানেন, তাঁহারাই তাহা স্বীকার করিবেন। আধুনিক বাংলা-কাব্যের ধারাটিকে যিনি অতি গভীর তলদেশ হইতে উৎখাত করিয়া এই নববাণীর মুখে উৎসারিত করিয়াছিলেন, সেকালে যে এক লোকোত্তর প্রতিভার উদয় হইয়াছিল—তাঁহার সেই আকস্মিক আবির্ভাব কবির ভাষায় বলিতে হইলে—"পর্ব্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ"। বর্ত্তমান কালে নাম না করিলে অনেকেই তাঁহাকে স্মরণ করিবেন না জানি, এবং করিলেও,

—রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

—বাণীর নিকট তাঁহার এই বর-ভিক্ষা এক্ষণে অনেকে বৃথা দম্ভ বলিয়া মনে করিবেন। কিন্তু বাংলা কবিতায় মধুচক্র রচনা করিবার এই দুরাকাঙ্ক্ষাই আধুনিক সাহিত্যের গতি নির্দ্দেশ করিয়াছিল, সেই দুঃসাহসের ফলেই ঊনবিংশ শতাব্দী শেষ না হইতেই বাংলা কাব্যে নবজীবন-স্রোত দুই কূল ভরিয়া বহিতে আরম্ভ করিল। মধুসূদনের কল্পনালক্ষ্মীর উদ্দেশে আজ এ কথা বলিলে অন্যায় হইবে না যে—

"পান করি' হলাহল নীলকণ্ঠ যথা
বাঁচাইলা বৃন্দারকে, হায় গো, তেমতি
মৃত্যুর উৎসঙ্গে বসি, হে করুণাময়ী,
নীরক্ত অধর-ওষ্ঠ চুম্বিয়া সুধীরে
শুষিলে বিষাক্ত ক্রূর ফেনপুঞ্জরাশি।
দুই ধারে মরণের পঞ্জর হইতে
ঝটপট ইন্দ্রধনু-পালক প্রসারি'
জীবনের যুগ্মপক্ষ দেখা দিল মরি!"

বঙ্গভাষা-বিহঙ্গীকে মধুসূদনের প্রতিভা এমনি করিয়া অবধারিত মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছিল; বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে নূতন করিয়া যে অগ্নিহোত্রের আয়োজন হইল তাহাতে অগ্ন্যাধান করিয়াছিলেন শ্রীমধুসূদন।

কিন্তু সাহিত্যে এই যে নবজীবনের ধারা অতঃপর বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্য্যন্ত অবারিতভাবে বহিয়া আসিল—মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ এই তিন কলাবিদ বঙ্গভারতীর ত্রিতন্ত্রী সেতারে যে পূর্ব্বরাগিণীর উদ্বোধন করিলেন—তাহাতে সাড়া দিয়াছিল কয়জন? এই বাণী ও তাহার অপূর্ব্ব সঙ্গীতে তৎকালীন নিকৃষ্ট রসপিপাসা স্তম্ভিত হইয়াছিল মাত্র; ভারতচন্দ্র, ঈশ্বরগুপ্ত, দাশুরায় প্রভৃতির কাব্য-রসে অভ্যস্ত বাঙালী জাতির মর্ম্মমূলে এই নবসাহিত্যের নূতন রস-চেতনা কি কখনও সম্যক সঞ্চারিত হইয়াছিল? ইংরাজী শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী সাহিত্য-রস-বোধ যেখানে যতটুকু জাগিতে পারিয়াছিল, বাঙালীর প্রাণে এই নব্যসাহিত্যের সাড়া কি ঠিক ততটুকুই জাগে নাই?

পাঠকসাধারণের রুচি কি ঠিক এই আদর্শে গড়িয়া উঠিয়াছিল—এই সাহিত্যের স্বরূপ কি সাধারণ শিক্ষিত বাঙালীর মনে কোথাও সত্যকার রং ধরাইয়াছিল? এই তিন মহাকবি প্রত্যেকেই এক একটি আসর সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মধুসূদনের আসর ছিল সেকালের স্বল্পসংখ্যক বিদ্বন্মণ্ডলী; ইহাদের যে পরিমাণ রসবোধ ছিল, নব্যসাহিত্য-সৃষ্টির উন্মাদনা ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি। হেম, নবীন ও বঙ্কিম—ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় চেতনার উদ্বোধনে—সাধারণ বাঙালীকে রক্ষণশীলতার মন্ত্রে বশ করিয়াছিলেন; বঙ্কিমের খাঁটি সাহিত্য-সৃষ্টি অপেক্ষা, তাঁহার রচনাগুলিতে জাতীয়-সংস্কারের যতটুকু পোষকতার ভাব ছিল, তাহাই তাঁহার জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ। বঙ্কিমের কবি-প্রতিভাকেই যদি বাঙালী পূজা করিত, এই জাতির রস-বোধের উপরেই যদি বঙ্কিমের প্রতিষ্ঠা নির্ভর করিত, তবে আজিকার দিনে, সেই ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে কতকগুলি সংস্কার বিচলিত হইয়াছে বলিয়াই, তাঁহার আসন এতখানি টলিত না। বঙ্কিমের আমলেও তিনি যে আসর পাইয়াছিলেন—সেই শ্রোতৃমণ্ডলী কিরূপ কাব্য-রসের পক্ষপাতী ছিল, তার প্রমাণ, হেম-নবীনের কাব্যগুলির অসাধারণ প্রতিপত্তি। কিন্তু সেজন্য নবীনা কাব্য-সুন্দরী চঞ্চল হন নাই—তাঁহার সেই কমলাসন যাঁহাদের অন্তরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাঁহারা আবিষ্টের মতই নিজেদের রসপিপাসা নিজেরাই মিটাইয়াছিলেন।

কবি বিহারীলালে একটা পরিবর্ত্তন দেখা দিল, ইনি প্রথম হইতেই নিঃসঙ্গ ও অন্তর্মুখ। মধুসূদনের আকাঙ্ক্ষা ছিল—বাঙালী জাতিকে বিশ্ব-সাহিত্যের সাগর-স্নানে উৎসাহিত করা, তাহার কূপমণ্ডুকত্ব ঘুচাইয়া দেওয়া। তিনি একটা বড় রসিকসমাজের অভ্যুদয় আশা করিয়াছিলেন, বাংলা সাহিত্যে একটা বিশাল আসর গড়িয়া লইয়া দরবারী সঙ্গীত আলাপ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেই কোলাহলের সৃষ্টি হইল। 'মধুকরী কল্পনা'র পরিবর্ত্তে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা জাঁকাইয়া উঠিল। একদিকে 'Nineteenth Century'র 'মহাভারত', অন্যদিকে দেশোদ্ধার ও দশমহাবিদ্যার বারোয়ারী যাত্রা-গান জমিয়া উঠিল। সেই প্রাঙ্গনেরই একপ্রান্তে 'মেঘনাদ বধ' বুড়াশিবের নুড়ি বিগ্রহের মত বিরাজ করিতে লাগিল, এবং তাহারই সম্মুখে 'বৃত্রসংহারে'র ভগ্নপটহনিনাদ বড়ই শ্রুতিরোচক বোধ হইল! বিহারীলাল প্রথম হইতেই স্বতন্ত্র ছিলেন। ক্রমে আরও স্বতন্ত্র হইয়া উঠিলেন। অতঃপর কবি-কল্পনা যে পথে ফিরিল তাহার কথা আমরা সকলেই জানি। কাব্যলক্ষ্মীর নূতন ধ্যান-মন্ত্র হইল—

> অন্তর মাঝে তুমি একা একাকী
> তুমি অন্তরব্যাপিনী।
> একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে,
> একটি পদ্ম হৃদয়-বৃন্ত-শয়নে,
> একটি চন্দ্র অসীম-চিত্ত-গগনে,
> চারিদিকে চির-যামিনী।

পরবর্ত্তী কবিগণ যেন এ মন্ত্রের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন; এই মন্ত্রে দীক্ষিত না হইলে খাঁটি কাব্য-সাধনা যেন আর কোন দিক দিয়া সম্ভব হইত না। মধুসূদনের কাব্যলক্ষ্মী যে-রূপে দেখা দিয়াছিলেন বাঙালী তাঁহার সেই রূপটিকে ধরিতে পারিল না; বরং হেম-নবীনের কাব্যের রূপহীন বিষয়-বস্তুই অতিশয় সহজ ও সুলভ ভাবোচ্ছ্বাসে তাহার চিত্ত জয় করিল। মধুসূদন যে অপূর্ব্ব সঙ্গীতে বঙ্গসরস্বতীকে একটি চিরন্তনী মহিমময়ী মূর্ত্তিতে প্রকাশিত করিয়াছিলেন, সেই সঙ্গীতও পরিশেষে বাংলা রঙ্গমঞ্চের 'গৈরিশ' ছন্দে অপরূপ সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

বাহিরের বিস্তৃত আসরে সাহিত্য যে-রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—এমন কি, য়ুনিভার্সিটির পাঠ্যসঙ্কলনেও তাহার যে মূর্ত্তিটি পূজা পাইতেছে, তাহা হইতেই শিক্ষিত বাঙালী-সাধারণের রসবোধ ও সাহিত্য-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বিহারীলালের পর, অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবিগণ এবং যুগনায়ক রবীন্দ্রনাথ কাব্যধারাকে যে পথে ফিরাইয়াছিলেন সেই ধারাটির গতি ও পরিণাম চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে। এই অন্তর্মুখী গীতিকল্পনাই বাংলাসাহিত্যে কিছু সত্যকার ফসল ফলাইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্যই আধুনিক জগৎ-সাহিত্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একটু স্থান করিয়া দিয়াছে। কিন্তু এই কাব্যের ভাব, ভাষা, ছন্দ ও অলঙ্কার পর্য্যন্ত এতই স্বতন্ত্র, ইহার ভাবনা ও আদর্শ এতই অসামাজিক, যে বাঙালীর মনের সঙ্গে ইহার সহজ সম্বন্ধ অল্প বলিয়াই মনে হইবে। একমাত্র দেবেন্দ্রনাথের অলঙ্কার ও কল্পনাভঙ্গী এবং অক্ষয়কুমারের শেষের কবিতাগুলি বিষয়-গুণে এই কাব্য সাধারণ বাঙালীর রুচি ও রসবোধ কতকটা তৃপ্ত করিতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উৎকৃষ্ট কাব্যকলা, এবং তার মধ্যে কবিমানসের যে প্রকৃতি প্রতিফলিত হইয়াছে—যে আত্মবিশ্লেষণ, স্বাতন্ত্র্য-নীতি ও গভীরতর রস-সাধনা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে এ সাহিত্যের রসাস্বাদনে অতিশয় কঠিন অধিকারী-ভেদ থাকিবেই। বাংলাসাহিত্য বলিতে যদি বাঙালীর সাহিত্য বুঝিতে হয়, তবে এখনও এ সাহিত্য বাংলাসাহিত্যের অনেক ঊর্দ্ধেই বিরাজ করিতেছে। অতি অল্প কয়েকজন রবীন্দ্রনাথকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন—অনেকেই রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে কাব্যরচনা করিয়াছেন; কিন্তু এই কাব্যের যাঁহারা যেটুকু সমালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা অন্ধের হস্তী দর্শন করিয়াছেন; এবং যাঁহারা কাব্যরচনায় রবীন্দ্রনাথের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের ছন্দ ও ভাষার অতিশয় হীন পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন, গুরুর অসাধারণ ভাব-দৃষ্টি কেহই লাভ করিতে পারেন নাই। বাকী ভক্তমণ্ডলী 'কালার হাসি' হাসিয়া থাকে, তাহারা জনশ্রুতির দাস। এজন্য, বাংলা কাব্যে রবীন্দ্রযুগের প্রতিষ্ঠা হইলেও তার প্রভাব অনেকটা নিষ্ফল হইয়াছে—সে আদর্শ যে দৃঢ়মূল হয় নাই, অতি আধুনিক সাহিত্যের দিকে দৃষ্টি করিলেই সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিবে না।

অতএব এই নূতন গীতিকাব্য, তথা সুবিশাল রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রেরণাও যে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পক্ষে বন্ধ্যা হইয়াছে এ কথার অনেকটাই সত্য। আমি যে দুইজন অপর কবির নাম করিয়াছি, তাঁহাদের কথা না বলিলেও চলে, কারণ আধুনিক বাংলাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই একচ্ছত্র সম্রাট। এ কালের কাব্যকাননে যে দুই একটি স্বতন্ত্র ফুল একই সঙ্গে ফুটিয়াছিল তাহারা ঝরিয়া না গেলেও উপস্থিত একরূপ লুপ্ত হইয়াই আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভার প্রভাব একেবারে ব্যর্থ হইবার নয়। সেই প্রভাবে বাঙালীর মন কতটুকু লাভবান হইয়াছে তাহাই ভাবিবার বিষয়। বাঙালী-সাধারণের রুচি এক্ষণে কথা-সাহিত্যে pornography, ও কাব্যসাহিত্যে রঙ্গমঞ্চের নাটকগুলিকেই আশ্রয় করিয়াছে। ইহার জন্য অবশ্যই রবীন্দ্র-সাহিত্য দায়ী নয়। বাঙালীর আর্ট-আদর্শ বাংলাদেশের নদীর মতই সমতলপন্থী। মাইকেল, বঙ্কিম অথবা রবীন্দ্রনাথের দুরারোহ কাব্যশিখরে যে ধারার উৎপত্তি হইয়াছে, বাংলার পলিমাটির খাতে তাহাদের সেই বেগ ও সেই নির্ম্মলতা দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না। আবার, রবীন্দ্রনাথের কাব্য ঠিক এই মাটির উপর দিয়াই বহে নাই—নিভৃত শৈলসোপানে জলপ্রপাতের মত দূর হইতে 'ধোঁয়াধার' ও রামধনুর সৃষ্টি করিয়াছে। ভাবধারা অপেক্ষা তাহার সেই রূপ কতক পরিমাণে আকৃষ্ট করিয়াছিল; তাহাও বেশিদিন টিঁকিল না। কোন ভাল জিনিষই এদেশে বেশি দিন ভালো থাকিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ যে অভিনব মুক্তির বাণী প্রচার করিলেন তাহার অর্থ সহজ নয়, কিন্তু তাহার সঙ্গীত নিরতিশয় মোহকর; কাব্যলক্ষ্মীর অধরে যে বাণী সাধারণের কানে অস্ফুট রহিয়া গেল, মধুর হাস্য ও সুনিপুণ কটাক্ষে তাহার অভাব কতকটা পূর্ণ হইল। তথাপি রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব সাধনার ফলে বাংলাকাব্যে রসের একটা উৎকৃষ্ট আদর্শ পাওয়া গেল; একটি ক্ষুদ্র অথচ সুযোগ্য রসিক-সংঘ বাংলাসাহিত্যে রবীন্দ্র-যুগকে চিহ্নিত করিয়া দিলেন। তাঁহাদের কয়েকজনের নাম করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, রবীন্দ্র-প্রতিভাকে বরণ করিবার যোগ্যতা কতখানি শিক্ষা ও সাধনাসাপেক্ষ। রবীন্দ্রনাথের আদি ভক্তগণের মধ্যে মাত্র তিনজনের নাম করিব—স্বর্গীয় অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেন, স্বর্গীয় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। তখন ১৯০৫।৬ সাল; রবীন্দ্রনাথ নবপর্য্যায় 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদক, আমরা তখন কলেজে বিদ্যার্থী। রবীন্দ্রনাথের কাব্য, রবীন্দ্রনাথের বাণী হৃদয়ঙ্গম করা তখনকার তরুণদিগের সাধনার বিষয় ছিল। সারা বাংলা জুড়িয়া সমগ্র শিক্ষাভিমানী তরুণ-সম্প্রদায়ের মনে রবীন্দ্রনাথের আসন তপোবন-বেদিকার অপেক্ষাও উচ্চ ও পবিত্র ছিল। বাংলাসাহিত্য তখনও পণ্যদ্রব্যে পরিণত হয় নাই, সাহিত্য-সেবায় সকলেই একটা সাধনা ও নিষ্ঠার প্রয়োজন বোধ করিত। সেইকালে রবীন্দ্রনাথকে সূর্য্য অপেক্ষা জ্যোতিষ্মান এবং তারকার চেয়ে সুদূর বোধ হইত। মনে হইত, এই কবির অভ্যুদয়ে চিরকালের জন্য বাংলাসাহিত্যের আদর্শ স্থির হইয়া গেল; সাহিত্য-সাধনাই

ধর্ম্মসাধনার স্থান অধিকার করিবে, উৎকৃষ্ট রসবোধের সাহায্যে বাঙালীর মন উদার হইবে,—জাতীয় জয়যাত্রার পথে বাঙালী দীর্ঘকালের পাথেয় সঞ্চয় করিবে। তাই সেদিন সাহিত্য-সাধনাকেই জীবনের পরমতম সাধনা বলিয়া মনে হইয়াছিল।

কিন্তু এই ভাব-সাধনা টিকিল না। মধুসূদনের প্রবর্ত্তনাও যেমন নিষ্ফল হইয়াছিল—বাহিরের দিকে কল্পনাকে প্রসারিত করিয়া বস্তুরস-সাধনায় (objectivity) নিবৃত্তিলাভের পন্থা যেমন অচল হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্ত্তিত আত্মযোগ-সাধনাও তেমনি নিষ্ফল হইয়া গেল। সে নিষ্ফলতা আরও ভীষণ, আরও শোকাবহ। অনধিকারী সাধক শব-সাধনায় ভঙ্গ দিয়া যেমন উন্মাদ হইয়া যায়, তেমনি রবীন্দ্রনাথের ভাবসাধনার মন্ত্র যে নিয়াধিকারীর দল হঠপূর্ব্বক আত্মসাৎ করিতে গিয়াছিল তাহারাও মজিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে আরও নবীন আরও অপরিপক্কদের মজাইয়াছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যে যে 'artistic monasticism' ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের লক্ষণ আছে তাহার তপস্যার দিকটা ঢাকা পড়িয়া গেল; অহঙ্কার ও আত্ম-বিলাসের প্রশ্রয়ে সাধনাহীন যুবক অসংযমকেই মুক্তির পন্থা বলিয়া স্থির করিল। রবীন্দ্র-পূর্ব্ব যুগে সাহিত্যচর্চ্চায় কতক পরিমাণ শিক্ষার প্রয়োজন ছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের কঠোর শাসনে এ বিষয়ে কাহারও অনধিকার-চর্চ্চার উপায় ছিল না। তাহার পরেও কিছুকাল পর্য্যন্ত এ বিষয়ে একটা সমীহ ও সম্ভ্রম-বোধ ছিল। তারপর যেন হঠাৎ কোথা হইতে কি হইল। গত ১৫।২০ বৎসরের কথা ভাবিয়া দেখিলে যে দুইটি প্রধান কারণ চোখে পড়ে তাহাই জানাইব।

প্রথম কারণ, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নবশিক্ষাদান-পদ্ধতি। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় এই শিক্ষা-ব্যাপারটির পরিচয় অত্যাবশ্যক। মধুসূদনের যুগে বাংলা সাহিত্যের যে পুনর্জ্জন্ম হইয়াছিল, তার মূলে যে কাল্‌চার ছিল, তাহা প্রধানতঃ ইংরাজী স্কুল ও কলেজের শিক্ষাপ্রসূত। যে আদর্শ-জ্ঞান ও রসবোধ এই সাহিত্যকে পুষ্ট করিয়াছিল তাহার অনুশীলন হইত বিদ্যালয়ে—সেই intellectual training ও discipline-এর ফলে সাহিত্যসম্বন্ধে যে সম্ভ্রম জন্মিত তাহারই উপর এই সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি নির্ভর করিত। সেকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী শিক্ষিতের সংখ্যা অল্প ছিল, তাহাদের সকলেই রসিক ছিলেন না। কিন্তু এই অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই শিক্ষালাভের সাধনা করিতেন; সেই সাধনার ফলে তাঁহারা সমাজে একটি শ্রদ্ধা ও সংযমের আদর্শ রক্ষা করিয়াছিলেন। মধুসূদন একজন বি-এ উপাধিধারীকে সমালোচকরূপে পাইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছিলেন; সেকালের রবীন্দ্রনাথও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-উপাধিধারী সম্বন্ধে একটা ভয়ের ভাব পোষণ করিতেন। ইহাতে তাঁহাদের প্রতিভার হানি হয় নাই। শিক্ষিত বলিয়া এক সম্প্রদায়ের প্রতি এই যে সম্ভ্রম, ইহার ফল ভালই ছিল। সত্যকার প্রতিভা আপনার শিক্ষা আপনিই সম্পন্ন করিয়া লয়, নিজের ক্ষুধার উপযোগী মানসিক পুষ্টি সংগ্রহ করে। কিন্তু যে রসিক-সমাজের মুখাপেক্ষা তাহাকে করিতেই হয়, তাহার রসবোধ থাকাই যথেষ্ট নয়, রীতিমত সাধনা থাকার প্রয়োজন—এই সাধনার প্রধান অঙ্গ—intellectual training

ও discipline। সেকালে সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিতে পারিত না, কিন্তু শিক্ষিতসমাজে এই শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধার একটা ন্যায়সঙ্গত কারণ ছিল; যাঁহারা সাহিত্য-চর্চ্চা করিতেন তাঁহারা এই শ্রদ্ধার বলে, নিজেদের সাধনায় একটি শুচিতা ও সংযম রক্ষা করিতে পারিতেন।

স্কুল ও কলেজে শিক্ষাদান-পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তনে, এখনকার দিনে যাঁহারা তথাকথিত শিক্ষিত বা উপাধিধারী, তাঁহাদের কোন training বা discipline-এর বালাই নাই, শিক্ষার শৈথিল্যের সঙ্গে সঙ্গে কাল্‌চার লোপ পাইতেছে। সেকালে যাঁহারা শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত ছিলেন তাঁহাদের তুলনায় এখনকার শিক্ষাভিমানীর দল অগণ্য, কিন্তু তখনকার অল্প-শিক্ষিতের সঙ্গে এখনকার বহু উচ্চ-শিক্ষিতের তুলনা হয় না। এই সকল অগণ্য শিক্ষাভিমানী অশিক্ষিতের দল, যাহা কিছু ক্ষুদ্র ও অসুন্দর তাহারই পক্ষে ভোট-সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে—ইহাদের সুলভ প্রশংসাবাদে সাহিত্যের রুচি ও আদর্শ অধঃপতিত হইয়াছে। ইহারই কারণে, যে অল্প কয়জন প্রকৃত রসিক সাহিত্যের শুচিতা রক্ষা করিতে পারিতেন, তাঁহারা হতাশ হইয়া অপসৃত হইতেছেন।

এই অধঃপতনের আর একটি কারণ আছে, সাহিত্যের এই দুরবস্থার জন্য রবীন্দ্রনাথও অনেক পরিমাণে দায়ী! কথাটা শুনিয়া অনেকে চমকিয়া উঠিবেন জানি, কিন্তু অযুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রমাণিত হইলে বর্ত্তমান লেখকও তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবে। তথাপি আমার মনে যাহা হইয়াছে বলিয়া রাখাই ভাল। রবীন্দ্র-সাহিত্যে যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি বর্ত্তমান যুগে তাহার ফল যে বিষময় হইয়াছে তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। সেজন্য রবীন্দ্রনাথের সেই বাণীকে এতটুকু খর্ব্ব করিতে চাই না। কিন্তু সেই বাণীকে যথার্থ আত্মসাৎ করিবার পক্ষে রবীন্দ্রনাথ নিজেই যেন বাধার সৃষ্টি করিয়াছেন। ঠিক কোন্ সময় হইতে বলিতে পারি না—কিন্তু 'সবুজপত্রে'র সময় হইতে রবীন্দ্রনাথের একটা স্পষ্ট পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়—'a change has come over the spirit of his dream'। যে রবীন্দ্রনাথ আজীবন সাহিত্য-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের আদর্শ-রক্ষায় ও সাহিত্যবিচারের মূল সূত্রগুলির ব্যাখ্যায় যত্নবান ছিলেন, সে রবীন্দ্রনাথকে শেষ দেখিয়াছি 'বঙ্গদর্শন'-সম্পাদন কালে। তারপর আর তাঁহাকে সাহিত্য-চিন্তা বা বাংলাসাহিত্যের নায়কতা করিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। ইতিমধ্যে তিনি নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন। তাহার পর হইতেই রবীন্দ্রনাথ একাধারে কবি ও যোদ্ধা। বিশ্বজয়ের যে পতাকা হস্তে তিনি দেশে ফিরিলেন, তাহাতে অতিশয় কঠিন ও নির্ম্মম যুক্তিবাদ, নিরপেক্ষ সত্য-সন্ধান এবং অকুণ্ঠিত ব্যক্তিত্ববাদ লিখিয়া দিলেন। তখন তিনি বিশ্বসাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া বিশ্ব-মনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর যোগ উপলব্ধি করিয়াছেন। তখন আর অন্তরের মুক্তি-সাধনায় lyricism বা subjectivity নয়—বাহিরের জীবন-যাত্রার সর্ব্বসংস্কার-মোচনের উপযোগী একটা colourless universalism প্রচার করিলেন। দেশে তখন

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা-লাভের দুরাশায় একটা ভাবোন্মাদের সৃষ্টি হইয়াছে, যৌবনের দায়িত্বহীন আবেগ অহঙ্কারের ফলে একধরণের সাম্যবাদ ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিতেছে। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য যে তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা বুঝিবার শক্তি বা প্রবৃত্তি কাহারও নাই, কিন্তু তাহার মধ্যে একটি স্বৈরাচারের ইঙ্গিত আবিষ্কার করিবার মত বুদ্ধি সকলেরই ছিল, তাহারই ফলে সেই তথাকথিত শিক্ষিত নবীন সম্প্রদায়ের মনে একটা অতিশয় দুর্নীতিমূলক অহঙ্কার প্রশ্রয় পাইল। সাহিত্যেও আর সাহিত্যিক রসবোধের প্রয়োজন রহিল না। ১৯১৩।১৪ পর্য্যন্ত বাংলাদেশে যে সাহিত্যিক আদর্শের ক্রম-প্রতিষ্ঠার আশা ছিল, সে আর রহিল না। রবীন্দ্রনাথ সংস্কার-মুক্তির বাণী ঘোষণা করিয়া তরুণদের উৎসাহিত করিলেন! ধ্যান জ্ঞান ও মনীষার সর্ব্বোচ্চ শিখরে আসীন হইয়া, বিশ্বব্যাপী আত্ম-প্রতিষ্ঠার বশে তিনি দেশ-কাল বিস্মৃত হইলেন। যে-মন্ত্র একমাত্র তাঁহার মত সিদ্ধ সাধকেরই ইষ্টমন্ত্র, তাহাই তিনি সাধনাসংযমহীন বর্ণজ্ঞানমাত্র-সম্বল পাঠক-সাধারণের মধ্যে প্রচার করিলেন; যে অমৃত-ভাণ্ড হরণ করিতে হইলে তরুণ গরুড়ের মতই বজ্রনখর ও অমিতবল পক্ষপুটের প্রয়োজন, তাহাই তিনি কাক-কুলীরকের দলে বাঁটিয়া দিলেন! সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাহার ফল অচিরেই ফলিতে সুরু করিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নির্ব্বিকার; যত অধম ও অযোগ্যগণ তখন তাঁহার ভক্তমণ্ডলীতে স্থান পাইয়াছে। বাংলা সাহিত্যের দ্রুত অধঃপতন লক্ষ্য করিয়াও তিনি নীরব, সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি তখন laissez faire-নীতির পক্ষপাতী।

আধুনিক সাহিত্যের আদি প্রবর্ত্তনা এমনই করিয়া ব্যর্থ হইয়াছে। যে সাহিত্য একদিন উষার অরুণালোক না মিলাইতেই মধ্যাহ্নের খরজ্যোতির আভাস দিয়াছিল, আজ সে অকাল-সন্ধ্যার তিমির-বিকারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে; যে তিন মহাপুরুষ আপন আপন অমানুষী শক্তি এই সাহিত্যের উন্নতিকল্পে নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র বঙ্কিমেরই যুগপ্রয়োজন সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি ছিল, তিনিই সাহিত্য-সৃষ্টির ব্যপদেশে জাতির মেরুদণ্ড সবল ও উন্নত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। যে-কল্পনা নিঃশ্রেয়সের সাধনা করিয়াও—প্রিয়জনের মুখ চাহিয়া—স্বর্গ কামনা করে না, দেশকালাতীত সত্যের ধ্যানে নিযুক্ত থাকিয়া নিজের আত্মপ্রসাদই জগতকে বিতরণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না—সেই প্রেম বঙ্কিমের সাহিত্য-সাধনায় পুরামাত্রায় ছিল। বঙ্কিমের আদর্শ-প্রীতি বড় কম ছিল না। কিন্তু তিনি কখনও দায়িত্বহীন অখণ্ড সত্যের প্রচারকেই একমাত্র প্রয়োজন বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন নাই; প্রাচীন ঋষিরা যে-সত্যের সাধনা করিয়াছিলেন—দেশ-কাল-পাত্র-নির্ব্বিশেষে মানুষের আত্মার যে স্বরূপ সন্ধান তাঁহারা করিয়াছিলেন, বঙ্কিমের তাহাতে আস্থা ছিল না; তিনি চাহিয়াছিলেন দেশে ও কালে পরিচ্ছিন্ন একটা বিশেষ জাতির বিশেষ অবস্থায় যথাসাধ্য কল্যাণ-সাধন। মধুসূদনের এ ভাবনা ছিল না; তিনি বাংলাসাহিত্যে একটি বাণী-মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠাকরিতে চাহিয়াছিলেন—তাঁহার সাধনা ছিল কাব্যকলা, সাহিত্যের রূপ-সন্ধান। তাঁহার কাব্যে কল্পনা আছে ভাবনা নাই, সঙ্গীত আছে কথা নাই, বেদনা আছে জিজ্ঞাসা নাই। মধুসূদন

ও বঙ্কিম উভয়ের সাধনা পরস্পর-বিরোধী নয়, বরং এক অন্তের অনুগামী। রবীন্দ্রনাথের ভাবনা ভিন্নপন্থী। মধুসূদন যে কাব্য-কলার সাধনা করিয়াছিলেন—ভাষা, ছন্দ ও গঠন-সুষমার যে সূক্ষ্ম রসবিলাস কবি-কর্ম্মের প্রধান গৌরব—সেই কাব্য-কলা রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্যে চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। কিন্তু বঙ্কিম যে সাহিত্য-সাধনাকে জাতির জীবনের সঙ্গে যুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন, তিনি যে-ভাবে যে-কল্যাণ-সাধনের আশা করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাহা করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ আত্মসাধনা করিয়াছেন, সেই সাধনায় যে নির্ব্বিশেষ সত্যের সন্ধান তিনি পাইয়াছেন, তাহাকেই তিনি বর্ত্তমান যুগের বাঙালী জাতির পক্ষেও কল্যাণকর বলিয়া বিশ্বাস করেন, এবং তাঁহার মতে 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়'। এই Egoism আধুনিক সাহিত্যের মূল ধারাকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছে। বঙ্কিম যে খাত কাটিয়াছিলেন তাহাতে জাতির জীবন-স্রোতের সঙ্গেই সাহিত্যের ভাবধারা বহিয়া চলিবার উপায় হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও বিশ্বভারতীর আদর্শ সেই স্রোত রুদ্ধ করিয়া চারিদিকে অস্বাস্থ্যকর পল্বলের সৃষ্টি করিয়াছে। কারণ, কোন আদর্শই কেবল মহান বলিয়াই সত্য নয়, এবং কোন সাহিত্যই কেবল আর্ট বলিয়াই উৎকৃষ্ট নয়; জাতির জীবনের ভিত্তিভূমি হইতে রসের আদান-প্রদানই সাহিত্যের সত্য-সাধনা। তাই, বঙ্কিম যে সাহিত্য-ক্ষেত্রটি প্রস্তুত করিয়া তুলিয়াছিলেন, যাহার উত্তরাধিকার রবীন্দ্রনাথে বর্ত্তিয়াছিল ও তাঁহার সাধনার সহায়তা করিয়াছিল, সেই ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া যাইবার সময় তিনি তাহাকে কি অবস্থায় রাখিয়া গেলেন ভাবিলে বড়ই দুঃখ হয়।

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫

পরিশিষ্ট

রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র ও মধুসূদন

(১)

১৮৫৮ খৃঃ অব্দে ইংরেজী যুগের প্রথম বাংলা কাব্য, রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' প্রকাশিত হয়, এবং পর বৎসরেই কবি ঈশ্বরগুপ্তের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন কাব্যধারার অবসান হইয়াছিল বলা যাইতে পারে। তথাপি রঙ্গলালের কাব্য প্রায় সম্পূর্ণ প্রাচীন পদ্ধতির—ভাষা, অলঙ্কার এবং ভাবনা, সকল বিষয়েই তিনি প্রাচীন কাব্যরীতির অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার কল্পনায় বা বিষয়বস্তু-নির্ব্বাচনে ইংরেজী কাব্যের যেটুকু প্রভাব লক্ষিত হয়—'কর্ম্মদেবী' বা 'পদ্মিনী-কাব্যে' যে সকল বর্ণনা ও চরিত্র-চিত্রণ অথবা দেশপ্রীতি-মূলক ঐতিহাসিক বীররসের নূতনত্ব দেখা যায়—তাহাতে প্রাচীন কাব্যরীতির বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, কেবল রস ও রুচির কিঞ্চিৎ উন্নতি হইয়াছে মাত্র। ভারতচন্দ্র হইতে বাংলাকাব্যে যে রচনারীতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, রঙ্গলাল তাহাকেই খাঁটি ও উৎকৃষ্ট মনে করিয়াছিলেন; এবং সেই রীতি বজায় রাখিয়া যতটুকু পাশ্চাত্য আদর্শ গ্রহণ করা সম্ভব, তাহাই বাংলা কাব্য-সাহিত্যের উন্নতির একমাত্র উপায় বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল।

এই হিসাবেই রঙ্গলালের কাব্যগুলি নবযুগের কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; কারণ মধুসূদনের মধ্য দিয়া যে প্রবল বৈদেশিক ভাব-বন্যা ও কাব্যরীতি অতঃপর বাংলা কাব্যে নবজীবন সঞ্চার করিয়াছিল, রঙ্গলাল যেন দেশী রুচি ও আদর্শের পক্ষ হইতে তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি অতিশয় রক্ষণশীল ছিলেন—ইংরেজী সাহিত্যের সহিত পরিচয়, এবং ইংরেজ কবিগণের কাব্য পাঠ করিয়া মুগ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, ইংরেজী কাব্যরীতি, ইংরেজী কাব্যের আদর্শ তিনি বিজাতীয় বলিয়া মনে করিতেন—বাংলা-কাব্যের পুরাতন আদর্শটিকেই তিনি যেন সভয়ে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। এইজন্য সেকালের ইংরেজী-অনভিজ্ঞ, অথবা অতিশয় রক্ষণশীল পাঠকসমাজে তাঁহার কবিতার পুরাতন রীতি ও ভঙ্গি, এবং তাহারই সঙ্গে কল্পনা ও বিষয়বস্তুর সামান্য ইংরেজিয়ানা—বড়ই উপভোগ্য হইয়াছিল। আগত যুগকে তিনি বরণ করিতে পারেন নাই; যে কাব্যরীতি জীর্ণ ও প্রাচীন হইয়া আসিতেছিল তাহাকেই কিঞ্চিৎ সঞ্জীবিত করিয়া তিনি সেই যুগান্তরের সন্ধিস্থলে ক্ষণিকের জন্য প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু পরবর্ত্তীকালের অভিনব ও বিপুল ভাববন্যার মুখে তিনি একেবারেই ভাসিয়া গিয়াছেন।

কবিহিসাবে রঙ্গলালের কৃতিত্ব খুব অল্প। ভাষা, ছন্দ ও কল্পনার রীতি—কাব্যের এই তিন লক্ষণ বিচার করিলে, তাঁহার মৌলিকতা নাই বলিলেই হয়। পূর্ব্ব কবিগণের অনুসরণ করিয়া তিনি অধিকতর কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই; বরং এবিষয়ে পূর্ব্ব কবিগণ

আরও স্বাভাবিক, সরল ও স্বচ্ছন্দ। ইংরেজী কাব্যের যেটুকু অনুকরণ তিনি করিয়াছিলেন তাহাও কৃত্রিম, অসমঞ্জস ও অকিঞ্চিৎকর। 'পদ্মিনী-কাব্য' আধুনিক কাব্য হিসাবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। কি আখ্যানবস্তু, কি চরিত্র-চিত্রণ, কি গঠন-সৌষ্ঠবে 'পদ্মিনী-কাব্য' প্রাচীন কাব্যেরই মার্জ্জিত সংস্করণ। ভীমসিংহ ও আলাউদ্দিনের চরিত্রে কোনও বিশেষত্ব নাই, দুইজনই ক্রীড়া-পুত্তলী মাত্র—বাক্যে ও কার্য্যে স্বাভাবিক বুদ্ধি বা ব্যক্তিত্বের পরিচয় নাই; চরিত্রদুইটি কোনও একটা আকার লাভ করে নাই। যাত্রার আসরে যেরূপ কাব্যস্রোত বা ভাবের উচ্ছ্বাস দর্শকমণ্ডলীর চিত্তবিনোদন করে 'পদ্মিনী-কাব্যে' তদতিরিক্ত কাব্য-কল্পনা নাই। এইরূপ কাব্য সেকালে কেন এত জনপ্রিয় হইয়াছিল তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে ঐ যুগের শিক্ষা-দীক্ষা, ও রুচি, এবং বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের পূর্ব্বাহ্ণে কাব্যের আদর্শ কি ছিল—কতটুকু নূতনত্ব দেখিলে লোকে কৃতার্থ হইত, তাহাই জানিতে পারা যায়। এ বিষয়ে কবির লিখিত 'পদ্মিনী-কাব্যে'র ভূমিকায় যথেষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে। সুনীতিপূর্ণ ও শিক্ষাপ্রদ কাব্যরচনায় উৎসাহিত হইয়া তিনি 'পদ্মিনী-কাব্য' রচনা করিয়াছিলেন; যাহাতে তৎকাল-প্রচলিত আদিরসপূর্ণ কাব্য পাঠ করিয়া লোকের কুকাব্য-প্রীতি বাড়িয়া না যায়—ইহাই ছিল তাঁহার কাব্যরচনার প্রধান অভিপ্রায়। এ বিষয়ে হয়ত তিনি সেকালের পণ্ডিতগণের আশা পূর্ণ করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু কাব্যরচনা করিতে পারেন নাই। সেই পুরাতন ছন্দ, উপমা ও অলঙ্কার তাঁহার কাব্যে আরও কৃত্রিম হইয়া উঠিয়াছে। কাব্যের মধ্যে কি কি বিষয়ের বর্ণনা থাকা প্রয়োজন; কিরূপ ছন্দ-কৌশল প্রদর্শন করিতে হইবে; নীতিশিক্ষার জন্য কোন্ কোন্ স্থলে কি সুযোগে দীর্ঘ বক্তৃতা করিতে হইবে; পূর্ব্বরাগ, মিলন, বিরহ প্রভৃতির বর্ণনায় কতটুকু আদিরস মিশাইতে হইবে—অথচ অশ্লীল না হয়,—এই সব পূর্ব্ব হইতে ঠিক করিয়া তিনি কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যুদ্ধ-বর্ণনায় তিনি ঈশ্বরগুপ্তের শিষ্য; ছন্দ-রচনায় তিনি ভারতচন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণে তৎপর; অথচ ভাষার নৈপুণ্যে বা রসিকতায় তিনি উভয়েরই বহু নিম্নে। একমাত্র আদিরস বর্জ্জন করার জন্য, অথবা ইংরেজী ধরণে, ঐতিহাসিক আখ্যান-অবলম্বনে, দীর্ঘ ছড়া ফাঁদিয়া কাব্যরচনার জন্য, যদি তাঁহার কোনও কৃতিত্ব থাকে—তাহাও এত সামান্য যে, তাহার জন্য আধুনিক কবিহিসাবে তাঁহাকে একটা স্বতন্ত্র আসন দেওয়া যায় না। ভাষা ও ভাবের দিক দিয়া এমন কিছু নূতনত্বের সৃষ্টিও তিনি করেন নাই—যাহার প্রভাবে পরবর্ত্তী বাংলাকাব্য কোনরূপ উপকৃত হইয়াছে, বলা যায়। 'পদ্মিনী-কাব্য' অপেক্ষা 'কর্ম্মদেবী'তে তাঁহার কথঞ্চিৎ শক্তির পরিচয় আছে—নায়কের চরিত্র, আর কিছু না হোক, সুসঙ্গত হইয়াছে, এবং এই চরিত্রে ইংরেজী আদর্শের ফলও কিছু ফলিয়াছে। এই কাব্যের বর্ণনা-অংশগুলি অতি দীর্ঘ, এবং অনেকাংশে মামুলী হইলেও সুপাঠ্য; ইংরেজ কবি Walter Scott-এর অনুকরণে, কাব্যরচনায় প্রয়াস সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় নাই! ইংরেজীতে যাহাকে বলে—breaking new grounds,' তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহার এই একখানি কাব্যের নাম করা যাইতে পারে।

তথাপি এ কাব্যের গঠন, ভাষা ও ভঙ্গি নূতন নহে। ভাষা অতিশয় কৃত্রিম—অপ্রচলিত দুরূহ শব্দে কণ্টকিত; স্থানে স্থানে সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ বিসদৃশ হইয়াছে। ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার রুচি আদৌ মার্জ্জিত নয়। 'পদ্মিনী-কাব্যে'র উপমাগুলি তাঁহার নিদারুণ অক্ষমতার পরিচায়ক—সে উপমা যেমন অসংখ্য তেমনই অর্থহীন। কেবল একটি বিষয়ে তিনি খুব সতর্ক—তাঁহার মিলগুলি নির্দ্দোষ।

কাব্যের বিষয় বা বর্ণনীয় বস্তু সম্বন্ধে রঙ্গলালের কাব্যে যে নূতন নির্দ্দেশ আছে, তাহা দ্বারা পরবর্ত্তী কবিগণ কতটা উপকৃত হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন আছে। মধুসূদন ঠিক পরবর্ত্তী নহেন—সমকালবর্ত্তী, বরং বয়সে কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী। রঙ্গলাল সম্বন্ধে মধুসূদনের অভিমত অনুধাবনযোগ্য। মধুসূদনের প্রতিভা আপন প্রকৃতি-অনুযায়ী বিষয় নির্ব্বাচন করিয়াছে, এবং সে প্রতিভা এত উচ্চ যে, সেখানে রঙ্গলালের প্রভাব অনুসন্ধান করিতে যাওয়াই বাতুলতা। বরং মধুসূদনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা সত্ত্বেও, রঙ্গলালের কাব্যপ্রেরণা বা কাব্যের আদর্শজ্ঞান যে কিছুমাত্র উন্নত হয় নাই—ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। মৃৎপিণ্ডে কোনও প্রতিবিম্ব পড়ে না। রঙ্গলালের ভাবনা এতই গতানুগতিক যে, Scott, Byron প্রভৃতি কবিদিগের সহিত পরিচয় থাকা সত্ত্বেও, তিনি ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বরগুপ্তকে কার্য্যতঃ কাব্যগুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। ভাষা, ছন্দ ও বর্ণনাভঙ্গির যাহা কিছু বিশেষত্ব তাহার জন্য তিনি ইঁহাদেরই ছায়ানুসারী। তথাপি, বিষয়বস্তু সম্বন্ধে তিনি যদি পরবর্ত্তিগণের পথপ্রদর্শক বলিয়া বিবেচিত হন, তাহাও সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধে'র প্রমীলা-চরিত্রে ও তাহার রণসজ্জার বর্ণনায়, রঙ্গলালের 'পদ্মিনী'র ছায়াপাত হইয়াছে—কেহ কেহ এরূপ অনুমান করেন। বিচার করিয়া দেখিলে ইহাতেও রঙ্গলালের কেবলমাত্র অঙ্গুলি-সঙ্কেত থাকিতে পারে—তার অধিক কিছুই নাই। মধুসূদনের প্রমীলা এমনই নূতন সৃষ্টি, তাহার কল্পনা এতই স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত যে, তাহার জন্য কোন ঋণ স্বীকার করার প্রয়োজন হয় না। রাজপুত-ইতিহাস হইতে বিষয় সংগ্রহ করিয়া বাংলা উপন্যাস-সাহিত্য পুষ্ট হইয়াছে, এ বিষয়ে রঙ্গলালের অঙ্গুলি-সঙ্কেত কিছু উপকার করিয়া থাকিবে। কিন্তু পরবর্ত্তী কাব্যসাহিত্যে, কতক পরিমাণে মধুসূদন ও বহু পরিমাণে ইংরেজী কাব্যই কবিগণের পথপ্রদর্শক বলিতে হইবে। ইহার পর, ঐতিহাসিক ঘটনা-অবলম্বনে একখানি মাত্র কাব্য রচিত হইয়াছিল—সে নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ'। কিন্তু ঐ কাব্যের আকৃতি ও প্রকৃতি 'পদ্মিনী' হইতে স্বতন্ত্র; মধুসূদনের 'মেঘনাদবধে'র পর, ইহাই স্বতন্ত্র আকারে ও নূতন ভঙ্গিতে, সম্পূর্ণ ইংরেজী আদর্শে রচিত দ্বিতীয় বাংলা কাব্য; রঙ্গলালের 'পদ্মিনী' অথবা 'কর্ম্মদেবী'র সঙ্গে ইহার আকৃতি ও প্রকৃতিগত কোনও সাদৃশ্য নাই। হেমচন্দ্র বা আর কোন পরবর্ত্তী কবির রচনায় রঙ্গলালের কিছুমাত্র প্রভাব লক্ষিত হয় না; তাহার কারণ, রঙ্গলালের কাব্যে ইংরেজী কাব্যের অতিক্ষীণ অনুকরণ-সূত্রে কতকগুলি মৃত পুরাতন কাব্য-কঙ্কাল

যোজনা করার চেষ্টা আছে, কুত্রাপি সত্যকার সৃষ্টিশক্তির—নূতন ভাব, চিন্তা বা কাব্যভঙ্গির—কিছুমাত্র নাই।

তাহা হইলে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রঙ্গলালের রচনাগুলির মূল্য কি? এই প্রশ্নের উত্তর সহজ। রঙ্গলাল ছিলেন রক্ষণশীল; আর আর সকলে ইংরেজী কাব্যের রসাস্বাদ করিয়া স্বদেশী কাব্যের প্রতি উদাসীন—এজন্য রঙ্গলাল স্বদেশী কবিতার মানরক্ষার জন্য নির্দ্দোষ বাংলা কাব্যরচনায় উদ্‌গ্রীব হইলেন। তাঁহার আদর্শ সম্পূর্ণ দেশী; কেবল ইংরেজী কাব্যের যে কয়েকটি রচনা-কৌশল প্রবর্ত্তন করিলে বাংলা কাব্য, বাংলা আদর্শই বজায় রাখিয়াই একটু সুমার্জ্জিত হইতে পারে—সে বিষয়ে তাঁহার লক্ষ্য ছিল। ইংরেজী ছাঁচে ঢালাই না করিয়া, অন্য জাতে জাত না দিয়া, বাংলা কবিতার চিরন্তন রূপটি যথাসম্ভব বজায় রাখিয়া উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করা যায়—ইহাই প্রতিপন্ন করিতে তিনি বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন; এবং অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির ন্যায় আপনার কৃতিত্বে সম্পূর্ণ আস্থাবান ছিলেন। সময়ের গতি, কালের প্রভাব, নূতন ভাবের উন্মাদনা—এসব কিছুই তাঁহার চিত্তে কোনও চাঞ্চল্য উপস্থিত করে নাই। তিনি পুরাতন আদর্শের ভক্ত, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তাঁহার কোনও সত্যকার সহানুভূতি ছিল না। মধুসূদনের বিদ্রোহ তিনি সুচক্ষে দেখিতেন না। এজন্য, নবযুগের বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার কাব্যগুলিকে একটি বিষয়ের সাক্ষ্য-স্বরূপ উল্লেখ করা যায়,—প্রাচীন ও নবীনের দ্বন্দ্বে প্রাচীনের শেষ শক্তিটুকু কালোচিত প্রেরণার অভাবে কিরূপ নিষ্ফল হইতে পারে, রঙ্গলালের কাব্যগুলিতে তাহারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। নূতনের পূর্ণ অবতার যেমন মধুসূদন, হেমচন্দ্র যেমন প্রাচীন ও নবীনের সন্ধিস্থল, রঙ্গলালের কাব্য তেমনি নবীনের বিরুদ্ধে প্রাচীনের শেষ নিষ্ফল যুদ্ধোদ্যম। রঙ্গলাল নবীনকে (ইংরেজী কাব্যের আদর্শকে) কিঞ্চিৎ মাত্র প্রশ্রয় দিয়া তাহার সহিত নামমাত্র সন্ধিস্থাপন করিয়া প্রাচীনকে জয়যুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন—কিন্তু যুগদেবতার নিকট সে প্রতারণা ব্যর্থ হইয়াছিল।

(২)

কবিবর হেমচন্দ্রের কাব্যেও দেশী মনোভাব ও বাঙ্গালীর সামাজিক রুচিই বিশেষভাবে প্রকটিত হইয়াছে। ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী-সমাজ—Shakespeare, Pope, Dryden প্রভৃতি ইংরেজ কবির কাব্যরসগ্রাহী বাঙ্গালী পাঠক—আপনার সামাজিক ও সাহিত্যিক রুচি ও রসের আদর্শ বজায় রাখিয়া যে পরিমাণ বিদেশী কাব্যরস আস্বাদন করিতে সমর্থ—সেই ধরণের কাব্যরচনায় হেমচন্দ্র বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। বিলাতী আখ্যান-কাব্য, বিলাতী দেশপ্রীতিমূলক গাথা বা গীতিকবিতা, বিলাতী ভাবুকতাপূর্ণ (reflective) কবিতার নানা ভাব ও কল্পনাকে তিনি যেন বাংলায় তর্জ্জমা করিয়াছিলেন। তিনি ইংরেজী কাব্যের উন্নত আদর্শ কোথাও রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন নাই, তাঁহার রচনাভঙ্গিতে কোনও বিশিষ্ট কাব্য-

কৌশল নাই—সাধারণের উপযোগী বাক্যার্থ-যোজনাই তাঁহার কাব্যের একমাত্র কৌশল। বক্তব্য বিষয়ের সারল্য ও ভাব-স্বাচ্ছন্দ্য, এবং সর্ব্বোপরি—যে রস ও রুচি সমসাময়িক সমাজে উপাদেয় হইয়া উঠিয়াছিল—তাহারই উদ্বোধন ও পরিপুষ্টি, ইহাই হেমচন্দ্রের কাব্যের মুখ্য গৌরব। প্রাচীন কাব্যরীতি তিনি সম্পূর্ণ গ্রহণও করেন নাই, সম্পূর্ণ বর্জ্জনও করেন নাই। ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বরগুপ্তের কাব্যরসে অভ্যস্ত পাঠকমণ্ডলীর রুচি ও রস-বোধকে আঘাত না করিয়া, বর্ণনা, বিষয়বস্তু ও ভাবনার দিকটা তিনি এমন করিয়া ঘুরাইয়া ধরিয়াছিলেন যে, কাব্যকল্পনার আদর্শ বা উৎকর্ষের কথা কাহারও মনে আসে নাই। বক্তব্য বিষয়ের বৈচিত্র্যে এবং অতিশয় সুলভ ভাবুকতার অবারিত স্রোতে তিনি সমসাময়িক বাঙালীর চিত্ত অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহার ছন্দ, ভাষা ও ভাবুকতায় প্রাচীন বা আধুনিক কোনও আদর্শেরই চিহ্ন নাই; তিনি তাঁহারই কালের কবি। তাঁহার ভাষা অতিশয় অপরিপুষ্ট গদ্যের ছন্দোময় রূপমাত্র—তাহা আদৌ কাব্য-ধর্ম্মী নয়; সে ভাষা কেবল অর্থই বহন করিতেছে, এবং সেই অর্থও অতিশয় স্থূল। ভারতচন্দ্রের লঘু তীক্ষ্ণ মার্জ্জিত শব্দ-কৌশল, ভাষা ও ছন্দের সেই অপূর্ব্ব কারিগরি তাঁহার নাই; এমন কি, ভারতচন্দ্রের পরবর্ত্তী কবি-গান প্রভৃতি গীতি-সাহিত্যে অশিক্ষিত-পটুত্বের মধ্যেই, বহুস্থলে ভাব ও ভাষার যে চকিত-চাতুরী, এবং উৎকৃষ্ট লিরিক উচ্ছ্বাস দেখিতে পাই, হেমচন্দ্রের কাব্যে তাহারও নিদর্শন নাই। গুপ্তকবির ভাষা, ছন্দ ও মিল, অনুপ্রাস ও যমকের মধ্যে যে একটি রচনা-কৌশল ও শক্তির পরিচয় আছে, হেমচন্দ্রের ব্যঙ্গ-কবিতাগুলির মধ্যে তাহার স্পষ্ট প্রতিধ্বনি থাকিলেও, রচনার যথেষ্ট শৈথিল্য লক্ষ্য করা যায়।

অতএব, হেমচন্দ্রের কাব্য সম্বন্ধে ইহাই বলা যায় যে, তিনি সমসাময়িক—সামাজিক ও সাহিত্যিক—রুচির অনুবর্ত্তী হইয়া, ইংরেজী কাব্যের বিষয় ও কল্পনাভঙ্গির অনুসরণ ও অনুবাদ করিয়া, অতিশয় সহজ গদ্যভাষায় ও বক্তৃতাত্মক ছন্দে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার বাক্যরীতি ছিল তৎকালীন লেখ্যভাষার রীতি বা idiom—পূর্ব্বতন কবিদের তুলনায়, তিনি একদিকে যেমন এ বিষয়ে আধুনিক ছিলেন, তেমনই,নূতন বাংলা গদ্যে যে পরিমাণ সংস্কৃত শব্দের বহুল প্রয়োগ আরম্ভ হইয়াছিল, তিনি সেইগুলি ব্যবহার করিয়া তাঁহার কাব্যে একটা গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভাষার অতিরিক্ত প্রাঞ্জলতা ও তাহার সঙ্গে এই গাম্ভীর্য্যই, তাঁহার কাব্যগুলিকে বক্তৃতাত্মক করিয়াছে, এবং এইজন্যই সূক্ষ্ম কাব্যরস-বিমুখ পাঠক-সাধারণের পক্ষে তাহা এত উপভোগ্য হইয়াছিল। তাঁহার 'বৃত্রসংহার'—কি কল্পনায়, কি গঠন-কৌশলে, কি ভাষায় ও ছন্দে—আদৌ কাব্যপদবাচ্য না হইলেও, বাংলা কাব্য-সাহিত্যে এখনও পর্য্যন্ত একখানি উৎকৃষ্ট মহাকাব্য বলিয়া পরিচিত হইয়া আছে; এবং সমসাময়িক সাহিত্যে তাহার স্থান অতিশয় উচ্চে ছিল বলিয়া জানা যায়। ইহার একমাত্র কারণ, তিনি তাহার মধ্যে কতকগুলি ঘটনাময়ী যুদ্ধবর্ণনা, অসম্ভব চরিত্রসৃষ্টি এবং সুলভ ভাবোচ্ছ্বাসের উপযোগী পৌরাণিক বৃত্তান্ত (যথা, দধীচির অস্থিদান) সন্নিবিষ্ট করিয়া-

ছিলেন। এই কাব্যের ভাষা ও ছন্দ নিরঙ্কুশ, কথাবস্তু অতিশয় অসংলগ্ন, চরিত্র বলিয়া কোন বালাই নাই—কতকগুলি পুত্তলিকা যন্ত্রসাহায্যে হস্তপদ বিক্ষেপ করিতেছে। ইহার ঘটনাসমষ্টির কার্য্যকারণসূত্র অতিশয় অকিঞ্চিৎকর—ঘটনার জন্যই ঘটনার অবতারণা করা হইয়াছে; বীররস অনেকস্থলে হাস্যকর ও অর্থহীন; প্রেমচিত্র মামুলী আদর্শে রচিত; ক্রোধ, শোক প্রভৃতির রস যাত্রাগানের উপযোগী। ইহার অমিত্রাক্ষর ছন্দও মিলহীন পয়ার মাত্র। অথচ, হেমচন্দ্র এই মহাকাব্যের কবি বলিয়াই বিখ্যাত, এবং এই কাব্য নাকি আধুনিক বাংলা কাব্যের একখানি স্তম্ভস্বরূপ, 'মেঘনাদবধে'র পর্য্যায়ভুক্ত! এ কাব্যের এইরূপ প্রতিষ্ঠার কারণ চিন্তা করিলেই, হেমচন্দ্রের কবি-প্রতিভা এবং সমসাময়িক কালের রুচি ও রসবোধ—উভয়েরই যথার্থ ধারণা করা যাইবে। রঙ্গলাল একটা কাব্যরীতি রক্ষা করিতে গিয়াছিলেন কিন্তু সেই রীতি প্রাচীন বলিয়া আধুনিকতার বন্যায় ভাসিয়া গেল; হেমচন্দ্র মধুসূদনের প্রায় সমসাময়িক, তথাপি মধুসূদন অপেক্ষা তৎকালে তাঁহার প্রতিষ্ঠা অধিক হইয়াছিল—মধুসূদনের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিলেও, সাধারণ পাঠক যেন হেমচন্দ্রেরই পক্ষপাতী ছিল। তাহার কারণ একটু সবিস্তারে বলিব।

এই সময়ে প্রাচীন বাংলাকাব্যের রীতি, কল্পনা ও বিষয়বস্তু অতিশয় জীর্ণ হইয়া আসিয়াছিল; একশত বৎসর পূর্ব্বে যে রাষ্ট্রবিপ্লব হইয়াছিল তাহার ফলে সমাজের উচ্চশ্রেণীর মধ্যে যে অবস্থান্তর ঘটিতেছিল তাহাতে সাহিত্যের আবহাওয়া সুস্থ ছিল না; নিম্নস্তরের মধ্যে, শিক্ষাদীক্ষা ও রুচির যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে পূর্ব্বতন রুচি ও আদর্শ আরও অধঃপতিত হইয়াছিল। ইতিমধ্যে ইংরেজী-শিক্ষাও অগ্রসর হইতেছিল। নব্য-শিক্ষিত সমাজ তৎকালীন কাব্যরসে আমোদ পাইলেও তাহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ছিল না। বাংলাসাহিত্যে খাঁটি কাব্যরস বা কবি-কল্পনার পরিবর্ত্তে যে রসের পরিবেশন চলিতেছিল তাহা প্রধানতঃ সমসাময়িক সমাজ-জীবন ও ঘটনামূলক ব্যঙ্গ-রস; ইহাই প্রাচীন বাংলা-কাব্যের শেষ অবস্থা, ইহাই ঈশ্বরগুপ্তের যুগ। নূতন সভ্যতার সংঘাতে, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নানা পরিবর্ত্তনের আশঙ্কায়, বাঙ্গালীর মন তখন কল্পনা হইতে বাস্তবের দিকে ঝুঁকিয়াছিল—একটা অনিশ্চিত আশঙ্কার বশে নূতনকে উপহাস ও বিদ্রূপ, এবং পুরাতনকে ধরিয়া রাখিবার আকাঙ্ক্ষাই ছিল প্রবল। ইহাই ঈশ্বরগুপ্তের মত কবির আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠার কারণ। কিন্তু ইংরেজী সাহিত্যের আদর্শও ক্রমশঃ বাঙ্গালীকে নূতন করিয়া নিজ সাহিত্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিতেছিল। রঙ্গলালের মনে খাঁটি সাহিত্যসৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল—এই আকাঙ্ক্ষার বশে তিনি ইংরেজীর অনুকরণে—কিন্তু খাঁটি বাংলা রীতি ও ভঙ্গিতে—নূতন ধরণের কাব্য রচনার উদ্যম করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি প্রাচীনকে একটু মাজিয়া ঘষিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন মাত্র, যুগের প্রয়োজন বুঝিতে পারেন নাই। বাংলা কাব্যে উৎকৃষ্ট দেশীয় রুচি ও রস একেবারে লুপ্ত হইয়াছিল—কোন খাঁটি আদর্শের জ্ঞানই ছিল না। যাহাদের সত্যকার সাহিত্যরস-পিপাসা ছিল তাহারা ইংরেজী দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়াই

ঐরূপ পিপাসা বোধ করিয়াছিল। কিন্তু ইংরেজী সাহিত্যের সেই উৎকৃষ্ট কল্পনা ও কলা-কৌশল তৎকালীন বাংলাভাষায় প্রবর্ত্তিত করা একরূপ অসম্ভব ছিল। ইংরেজীতে ইংরেজী কাব্য পরম উপভোগ্য হইলেও, খাঁটি ইংরেজী ভাবের বাংলাকাব্য, দেশীয় রুচি ও সংস্কারের বিরোধী বলিয়া, কিছুতেই উপাদেয় হইতে পারিত না। বাংলাভাষা ও কাব্য-কলাকে এতখানি রূপান্তরিত—মার্জ্জিত ও উন্নত করার প্রয়োজন ছিল, যাহাতে ইংরেজী কাব্য-কলার আদর্শে খাঁটি বাংলাকাব্য রচনা করা সম্ভব হয়। এইখানে একটা কথা ভালো করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। যেহেতু দেশী কাব্য-রীতি ও কাব্যের আদর্শ তখন মৃতপ্রায়, বাঙ্গালীর কাব্য-রস-রসিকতার অবস্থাও সেইরূপ, অতএব, নূতন করিয়া যে কাব্যরস-পিপাসা ধীরে ধীরে জাগিতে আরম্ভ করিল তাহা সম্পূর্ণ ইংরেজী আদর্শের পক্ষপাতী হইবারই কথা; এই রস ও রুচির প্রভাব অতি দ্রুত সঞ্চারিত হইতেছিল। সাহিত্য-রস-পিপাসু বাঙ্গালীর মন এই রসে এমনি ডুবিয়াছিল যে, তৎকালে অনেকেই ইংরেজী কাব্য-রচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন—গদ্যে ও পদ্যে ইংরেজী সাহিত্য তখন বাঙ্গালীকে পাইয়া বসিয়াছিল। এই ইংরেজী সাহিত্য-প্রীতি রোধ করিয়া বাংলা-সাহিত্যের প্রতি শিক্ষিত জন-সাধারণের অন্তর আকৃষ্ট করিবার জন্ম রঙ্গলাল খাঁটি দেশী কাব্য রচনার শেষ চেষ্টা করেন, তাহাতে তাঁহার স্বদেশ-প্রীতি ও মাতৃভাষার প্রতি মমতার প্রমাণ পাওয়া যায়—সাহিত্য-জ্ঞান, বিচার-শক্তি বা ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না। কারণ, তখনকার দিনে সর্ব্বাপেক্ষা বিষম সমস্যা দাঁড়াইয়াছিল—বাংলাভাষাকে, ইংরেজীর মত, স্বাধীন সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি ও উৎকৃষ্ট কাব্য-কলার উপযোগী করিয়া তোলা, ইংরেজী কাব্যের প্রাণকেই বাংলা কাব্যের দেহে সংক্রামিত করা। এত বড় সমস্যা এত আকস্মিকভাবে, এবং এমন সঙ্কট-স্বরূপে, বোধ হয় আর কোন সাহিত্যে কখনও উপস্থিত হয় নাই। যাহারা ইংরেজীভাষায় ব্যুৎপন্ন, তাহারা বাংলা কাব্য পড়িবেই না; যাহারা ইংরেজী জানে না—সেই বৃহত্তর জনমণ্ডলীর রুচি ও রসবোধ শোচনীয়; প্রকৃত কাব্য-রস, বা কবিতার কলা-কৌশল সম্বন্ধে তাহারা সম্পূর্ণ উদাসীন। তাহারা নূতন কিছু চায় বটে, কিন্তু তাহা প্রাচীন সংস্কারের পরিপোষক হওয়া চাই। প্রাচীন সংস্কৃত বা প্রাচীন বাংলা কাব্য-কলার সহিত ইহাদের পরিচয় নাই, নূতন ইংরেজী সাহিত্য-রসও ইহাদের অনধিগম্য। ইহাদের মধ্যে রস-পিপাসা উদ্রেক করিতে হইলে যে শক্তির প্রয়োজন, তাহা হেমচন্দ্রেরই ছিল। তিনি ইংরেজী কাব্যের একটি বাংলা ভঙ্গি আয়ত্ত করিয়াছিলেন; তাহাতে কাব্যের কলাচাতুর্য্যের—অর্থাৎ উৎকৃষ্ট সাহিত্য-রসের প্রয়োজন ছিল না; তিনি অতিশয় সুলভ ভাব ও ভাবনাকে সহজ-পাঠ্য ছন্দে, ও বক্তৃতার ন্যায় ওজস্বিনী ভাষায়, অনর্গল রচিয়া গেলেন—কেবল বক্তব্য বিষয়ের আকর্ষণে তাহা সাধারণের মনোহরণ করিল। হেমচন্দ্রের রচনায় সাহিত্য-সৃষ্টির গুরুতর সাধনা নাই—তৎকালীন রুচি, রস ও আদর্শের অরাজকতার মধ্যে, তিনি ইংরেজী কাব্যের ইঙ্গিত মাত্র অবলম্বন করিয়া এমন একটি কাব্যসাহিত্য সৃষ্টি করিলেন, যাহাতে সেকালের সাধারণ পাঠকের 'আধুনিক'-পিপাসা কতক পরিমাণে চরিতার্থ হইল, অথচ উচ্চতর আদর্শের

'মাথাব্যথা'ও জন্মিল না। এমনই করিয়া তিনি আসল সমস্যা এড়াইবার একটি সহজ পন্থা আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

প্রাচীন কাব্যরীতি যে অচল হইয়াছিল রঙ্গলালের নিষ্ফল প্রচেষ্টাই তাহার প্রমাণ; নূতন কোন কাব্যরীতি বা কোন নূতন আদর্শ যে তখন জনগণের রুচি ও রসজ্ঞানের অনুকূল ছিল না, হেমচন্দ্রের প্রতিষ্ঠাই তাহার প্রমাণ। হেমচন্দ্র, কি প্রাচীন কি নবীন—কোন বিশিষ্ট কাব্যরীতির অনুসরণ করেন নাই; কাব্য-কলা বলিয়া কোনও বস্তুর চেতনা বা সাধনা তাঁহার ছিল না। তিনি পুরাতন কবিগণের ছন্দ মাত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন—অতিশয় সহজ, সুলভ ও অভ্যস্ত বলিয়া। তৎকালে যে নূতন সুসংস্কৃত গদ্যভাষা প্রচলিত হইয়াছিল, তাহাকেই একটি সহজ ছন্দঃস্রোতে গতিমান করিয়া, তিনি কতকগুলি ইংরেজী ধরণের ভাব ও ভাবুকতার উচ্ছ্বাস, বাঙ্গালীর সংস্কার ও সেণ্টিমেণ্টের উপযোগী করিয়া কবিতার আকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সাহিত্যের যে বৃহত্তর সঙ্কটময় সমস্যার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি তাহার সমাধান তাঁহার দ্বারা হয় নাই—ইংরেজী সাহিত্যের সমকক্ষ করিয়া, অথবা, আধুনিক কালের সাহিত্য বলিতে আমরা যাহা বুঝি—তাহার সহযাত্রী করিয়া, বাংলা সাহিত্যকে ভবিষ্যৎ মহাতীর্থের অভিমুখে পথ চিনাইয়া দেওয়ার ভাগবতী প্রেরণা পাইয়াছিলেন—যুগাবতার কবি শ্রীমধুসূদন। মধুসূদনের প্রতিভার পরিচয় এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। আমি, কেবল সেই সমস্যার সমাধানে মধুসূদনের কৃতিত্বের কথা বলিব।

(৩)

পূর্ব্বে সমস্যার কথা বলিয়াছি, আবার বলি। ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজী সাহিত্যের সহিত পরিচয়ের ফলে বাংলার সাহিত্যিক ভাবরাজ্যে একটা বড় ওলট-পালট হইয়া গেল। ধর্ম্ম, সমাজ বা রাষ্ট্রজীবনে যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল তাহা এখনও চলিতেছে, সে বিরোধে দেশীয় আদর্শ বা জাতীয়তা সহজে পরাজিত হইবার নয়; কিন্তু সাহিত্যিক ভাবরাজ্যে এ বিরোধ বেশিদিন টিকিতে পারে না। এখানে যাহা সুন্দরতর তাহা সহজে মনকে জয় করিয়া লয়, এখানে কোন বাস্তবের বাধা নাই—মানুষের সহজ রসিকতা কাব্য-রাজ্যে জাতিবিচার করে না। তাই, স্বদেশী কাব্যের মনোহরণ-শক্তি যখন নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে, কাব্যের খাঁটি আদর্শ যখন লুপ্তপ্রায়, তখন ইংরেজী সাহিত্যের সহিত সেই যে আকস্মিক পরিচয়—তাহার ফলে যে রস-পিপাসা জাগিল, তাহাতে রসিকচিত্ত নিজ ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ভিতরে ভিতরে বীতস্পৃহ হইয়া উঠিল, এবং ইংরেজী কাব্যের উৎকৃষ্ট কলা-শিল্প ও অপূর্ব্ব ভাবুকতার মোহে, অসম্পূর্ণ ও অক্ষম মাতৃভাষার পরিবর্ত্তে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যকে প্রাণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সেকালের মার্জ্জিত-রুচি, শিক্ষিত, রসিক বাঙ্গালীসম্প্রদায় মাতৃভাষার স্থানে ইংরেজী ভাষাকেই

প্রতিষ্ঠিত করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই। দেশীয় সমাজনীতি বা ধর্ম্মবিধির বাহ্যিক শাসন পূর্ব্ববৎ মানিয়া চলিলেও অন্তরের মধ্যে এই যে বিজাতীয় সাহিত্য-রসের সঙ্গে সঙ্গে বিজাতীয় মনোভাবের পরিপুষ্টি—মাতৃভাষার পরিবর্ত্তে ইংরেজী ভাষার সাধনা—ইহার ফল জাতীয় জীবনের পক্ষে কিরূপ বিষময় হইয়া উঠিত, তাহা ভাবিয়া দেখিলেই, এই সাহিত্য-সঙ্কট যে কত বড় সঙ্কট, তাহা আমরা বুঝিতে পারিব। রঙ্গলাল ও হেমচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনা যে ইহার পক্ষে সমান নিষ্ফল হইত, ও হইয়াছে—তাহাও আমরা জানি। ইংরেজী সাহিত্য ও ইংরেজী ভাষার সেই ভাবসম্পদ ও কলা-কৌশল মন হইতে দূর করিবার নয়—তাহার প্রভাব কেবল দেশপ্রীতির উদ্বোধনের দ্বারা নিরাকৃত হইবার নয়, কারণ, তাহা মানুষের সহজ সৌন্দর্য্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত—প্রেমের মতই মানুষকে বিনাবিচারে অবশে জয় করিয়া লয়। ইহার একমাত্র প্রতিবিধান—ওই সৌন্দর্য্য, ওই রূপ ও রসকে অবিকৃত অবস্থায় নিজ ভাষার মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত করা—ঐ রসকল্পনাকে ইংরেজী ভাষার বিজাতীয়তা-মুক্ত করিয়া নিজ ভাষার জাতীয়তা দান করা; অর্থাৎ ঐ ভাব, ছন্দ ও সুরকে—কল্পনার ঐ ভঙ্গিকেই, নিজ ভাষায় ধরিয়া দেওয়া। এই কাজ যে কত বড় প্রতিভাসাপেক্ষ, তাহা বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে মধুসূদন দত্তের অসাধ্য সাধন যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিবেন। য়ুরোপীয় কাব্যের আদর্শ, তাহার কল্পনাভঙ্গি ও রসমাধুর্য্য—এমন কি, তাহার সুরটি পর্য্যন্ত, বাংলা ভাষায় ও ছন্দে তিনি যেমন করিয়া মিলাইয়া দিলেন, তাহাতে মনে হয়, তিনি এই সমস্যা-সমাধানের ভার লইয়াই আসিয়াছিলেন—কোনও সম্পূর্ণাঙ্গ উৎকৃষ্ট কাব্য-রচনাই যেন তাঁহার ব্রত নয়। য়ুরোপীয় সাহিত্য-কলার মূল আদর্শটি—তাহার সেই ভঙ্গি ও সুর কেমন করিয়া বাংলা ভাষায় সম্ভব হইতে পারে; কেমন করিয়া কোন্ দিক দিয়া সেই কাব্য-রস-ধারাকে বাংলা ভাষার খাতে প্রবাহিত করা যায়—তাহারই সন্ধান দিয়া, নিজের দৈবশক্তির দুঃসাহসে পরবর্ত্তিগণের প্রাণে ভরসা সঞ্চার করিয়া, তিনি সেই মহাসমস্যার সঙ্কট হইতে বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে উদ্ধার করিলেন। ইহার জন্য তাঁহার স্বকীয় প্রতিভা, এবং বিদেশী সাহিত্য ও বিদেশী ভাষার সাধনা, দুই-ই সমানভাবে কার্য্য করিয়াছে। আর সকলে বিদেশী সাহিত্যের মর্ম্মটিকে প্রাণের মধ্যে উপলব্ধি করিয়াছিল, কিন্তু বাংলা-ভাষায় তাহার রূপটি প্রতিফলিত করিতে পারে নাই—ভাষার তৎকালীন অবস্থায় তাহা অসম্ভব ছিল। যে-ভাষায় ও যে ছন্দ-ভঙ্গিতে য়ুরোপীয় মহাকবিগণ যে ভাবসৌন্দর্য্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—Homer, Virgil, Milton, Shakespeare এর সেই বাণী-মূর্ত্তিকে, বাংলার গ্রাম্যগাথা বা গানের ভাষায় রূপ দেওয়ার চেষ্টা বৃথা বলিয়াই কেহ সেই দুঃসাহস করে নাই। তাই রঙ্গলাল বিদেশী বলিয়াই তাহাকে বর্জ্জন করিতে চাহিয়াছিলেন, এবং হেমচন্দ্র ভাষা, ছন্দ—এক কথায়, কাব্যের যাহা আধার, সেই কলা-কৌশল বা প্রকাশ-সুষমাকে একেবারে পাশ কাটাইয়া, বিষয় বা বক্তব্যকেই প্রধান করিয়াছিলেন; ভাব বা idea, এবং উচ্ছ্বাসই যে কাব্যবস্তু নয়, প্রকাশ-কৌশলই যে কাব্যের সর্ব্বস্ব—এ কথা তিনি জানিতেন না

বলিয়াই, অসঙ্কোচে একরাশি পদ্য রচনা করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের রসবোধ ছিল, রসসৃষ্টির ক্ষমতা ছিল না; তাই তিনি বিদেশী কাব্যের নানা বিষয় ও বস্তু তাঁহার রচনায় একত্র করিয়াছিলেন—কাব্য-প্রাণটিকে মূর্ত্তি দিতে পারেন নাই। যাহারা বস্তু ও বিষয়ের মহিমায় মুগ্ধ হয়, সেই প্রাকৃত জনমণ্ডলীর অপরিপক্ক রস-পিপাসা তাহাতে নিবৃত্ত হইয়াছিল; কিন্তু যে গভীরতর সাহিত্যরস-চেতনা ভাষা ও ছন্দে বাণীর রূপকে প্রত্যক্ষ করিতে চায়, বিদেশী কাব্যের রসগ্রাহী সাহিত্য-প্রাণ ব্যক্তিগণের সেই ক্ষুধার নিবৃত্তি তাহাতে হইত না। বাংলা ভাষায় সেই রস-সৃষ্টির সম্ভাবনা সম্বন্ধেও কেহ আশান্বিত ছিলেন না।

মধুসূদনের প্রতিভায় এই আশা ও বিশ্বাস জন্মিল—নিজ ভাষার অসীম সম্ভাবনার সেই যে নিদর্শন, তাহারই দুর্দ্দমনীয় উৎসাহে বাংলা কাব্যের নবজন্ম হইল। অতঃপর পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে আমরা বাংলা কাব্যে যে নবযুগের লীলা দেখিলাম, সেই Renaissance-এর সঞ্জীবনী মন্ত্রের আদিদ্রষ্টা হিসাবেই, মধুসূদনকে বুঝিয়া লইতে হইবে। মধুসূদন কোন School বা আদর্শের প্রতিষ্ঠা করেন নাই, পরবর্ত্তী যুগের কাব্যসাহিত্য তাঁহার কল্পনা-ভঙ্গিকে অবলম্বন করে নাই; তিনি বাংলাকাব্যে শক্তি ও সাহস সঞ্চার করিয়াছিলেন, তাহাকে নবভাবে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন—গ্রাম্যতার গণ্ডী কাটাইয়া তিনি তাহাকে বিশ্ব-সাহিত্যের অভিমুখে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। য়ুরোপীয় সাহিত্যের কুলঙ্কশ ভাবধারায় তিনি তাহার লজ্জা সঙ্কোচ ঘুচাইয়া, দুই কূল ভাঙ্গিয়া, অপূর্ব্ব ছন্দে তরঙ্গায়িত করিয়া, তাহাকে সাগর-সঙ্গমাভিমুখী করিয়াছিলেন। এই যে শক্তি, এই যে সাহস, এই যে নব-জীবনের আশ্বাস ও উন্মাদনা - ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তিকে প্রকট করিয়া, উৎকৃষ্ট কাব্যকলার প্রয়োজন-সাধনে তাহার সামর্থ্য নির্দ্দেশ করিয়া তিনি বাঙ্গালীর মনে এই যে সাহিত্য-গৌরবের উদ্বোধন করিলেন—সে কার্য্য যে কত বড় প্রতিভা-সাপেক্ষ তাহাই চিন্তা করিবার বিষয়। বাংলা গদ্যে বঙ্কিম যাহা করিয়াছিলেন বাংলা কাব্যে মধুসূদন তাহা অপেক্ষা অধিক অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন; বঙ্কিম পূর্ব্ববর্ত্তীদের পথচিহ্ন পাইয়াছিলেন, মধুসূদন তাহাও পান নাই। তিনি একেবারে Virgil ও Milton হইতে ভারতচন্দ্র ও কৃত্তিবাসে সেতু যোজনা করিয়াছিলেন।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রোমাণ্টিক ভাবধারা

(১)

জার্ম্মাণ কবি হাইনে (Heinrich Heine) রোমাণ্টিক রচনাকে চিত্রকলার সহিত, ও ক্লাসিক্যাল রচনাকে মূর্ত্তিশিল্পের সহিত তুলনা করিয়াছেন। চিত্রে বিষয়াতিরিক্ত বহু অর্থের ব্যঞ্জনা থাকে, তাহার পটভূমিকার দৃশ্য-সন্নিবেশ ভাব ও অর্থকে বহুদূর প্রসারিত করিয়া দেয়; তা'ছাড়া তাহাতে ছায়া ও আলোকের খেলা, চোখের ধাঁধা রহিয়াছে—ধরিবার ছুঁইবার কিছুই নাই। অপর পক্ষে, কোনও মূর্ত্তিরচনার মধ্যে আমরা একটা পরিষ্কার আয়তন পাই, তাহার কোনখানটাই ধাঁধা নয়, অপরিস্ফুট নয়। তাহার কোথাও অসীমতার ব্যঞ্জনা নাই, তাহাকে চারিদিক হইতে স্পর্শ করিয়া অনুভব করা যায়; তাহার মধ্যে শিল্পী যে সৌন্দর্য্য ফুটাইতে চাহিয়াছে, তাহা বস্তু বা বিষয়কে ছাড়াইয়া নহে, অথচ অসম্পূর্ণ নয়। এ সম্বন্ধে অধিক কিছু এখানে বলিব না, কারণ, বিষয়টি গভীর এবং বিস্তৃত, স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা না করিলে তাহার গৌরব রক্ষা করা যায় না। মোটের উপর, অর্থে নহে—ভাবে যাহা গভীর, শব্দ হইতে শব্দাতিরিক্ত ভাবসৃষ্টি যাহার উদ্দেশ্য, প্রকাশ অপেক্ষা ইঙ্গিত-ব্যঞ্জনা যাহাতে অধিক,—তাহাকেই আমরা রোমাণ্টিক রচনা বলিতে পারি।

কিন্তু রচনা দেখিয়া এবং তাহার রীতি পর্য্যালোচনা করিয়া সোজাসুজিভাবে আমরা যে ভেদ নির্দ্দেশ করিতে পারি তাহা অনেকটা বাহ্যিক; রচনারীতিগত ভেদ লইয়া বেশী দূর যাওয়া চলে না। ক্লাসিক্যাল লেখকের ও রোমাণ্টিক লেখকের স্বভাবগত ভেদ কতটুকু? দুই-ই তো মানব-হৃদয়। সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে, মানবীয় চিন্তাস্রোতের জোয়ার-ভাটায়, ভাবনা-বাসনা, আশা-বিশ্বাসের বিপর্য্যয়ে, সাহিত্যে যে তরঙ্গ উঠে—তাহারই একপার্শ্ব রোমাণ্টিক, অপর পার্শ্ব ক্লাসিক্যাল; একটা আর একটার অনুযায়ী, এমন কি, সহগামী, এবং উভয়ে একত্র বর্ত্তমান। ক্লাসিক্যাল লেখা রোমাণ্টিক হইয়া উঠিতে বেশিক্ষণ লাগে না, রোমাণ্টিক লেখার মধ্যে ক্লাসিক্যাল লক্ষণ একেবারে অবিদ্যমান নাই। জগৎ আপনাকে যেমন করিয়া দেখাইতেছে তেমন করিয়া দেখিয়া আপনি নিষ্ক্রিয় থাকিয়া—পরিদৃশ্যমান যাহা তাহার হাতে নিজকে সমর্পণ করা; চিন্তা ও অনুভূতির রাজ্যে চিরপরিচিতের সহিত আত্মীয়তা রক্ষা করা; বহুমানবের সমাজে প্রাচীন জ্ঞান-বিশ্বাসের নির্দ্দিষ্ট গভীরাঙ্কিত সহজ সরল পথে চলিয়া যাওয়া;—নিয়ম-সংযমের অনুবর্ত্তী হওয়ার এই যে ভাব, তাহাই সাহিত্যে 'ক্লাসিক্যাল' নামে পরিচিত। অন্যদিকে, আপনার স্বাধীন অনুভূতি বাসনা ও প্রেরণার সাহায্যে ব্যক্তিগতভাবে সত্যানুভূতির চেষ্টা; বহু তর্ক-বিচারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত চিরানুগত প্রথা বা সংস্কারের উপর আস্থা স্থাপন না করিয়া প্রাণ যাহা চায় তাহাকেই

উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করা ; সামাজিক সুখ, সুবিধা, প্রয়োজন ইত্যাদির বিষয় কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া, মস্তিষ্ক নহে—হৃদয়ের আলোকে, যাহাকে সত্যরূপে দর্শন ও প্রতীতি করিয়াছি, তাহাকেই একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করা ;—ইহাই রোমান্টিক-ভাব নামে পরিচিত। ইংরেজী সাহিত্যে এই ভাব প্রধানতঃ সাহিত্যের মধ্যে আবদ্ধ থাকিলেও, ফ্রান্সে ও জার্ম্মাণীতে এই ভাবকে জীবন-ব্যাপারেও অবলম্বন করার চেষ্টা হইয়াছিল। এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, সর্ব্বপ্রকার প্রচলিত নিয়মতন্ত্রের বিরুদ্ধে এই আক্রোশ, এই বিপ্লব ও বিদ্রোহের ভাব—রোমান্টিক সাহিত্যের একটি প্রধান লক্ষণ। আবার, পুরাতনকে ছাড়িয়া নূতনের এই স্পৃহা মনকে পরিচিত হইতে অপরিচিতের দিকে—নির্দ্দিষ্ট হইতে অনির্দ্দিষ্টের পথে—টানিয়া লইয়া যায় ; কল্পনা বিস্ময় উদ্রিক্ত করে—নব নব বিস্ময়লোক সৃষ্টি করিতে ক্লান্তি মানে না ; নিত্যপরিচিতের মধ্যে বিস্ময়ের দিক যেটি আছে, তাহাকেও যেমন ফুটাইয়া তোলে, তেমনই, দেশ ও কালের বিস্তৃতির মধ্যেও বিস্ময়ের উপাদান খুঁজিয়া বেড়ায়। এইজন্য অপরিজ্ঞাত দূর প্রদেশ, অতীতের ইতিহাস, এবং আদিম সংস্কারবিশিষ্ট অশিক্ষিত সমাজের রীতি-নীতি ও ধর্ম্ম-বিশ্বাস রোমান্টিক সাহিত্যের উপকরণ জোগাইয়াছে। য়ুরোপীয় মধ্যযুগের জীবনযাত্রার ইতিহাসে এই সকল রোমান্টিক উপাদান একাধারে সুলভ বলিয়া, অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কবি এই মধ্যযুগের কল্পনায় এমনি বিভোর যে, কোন কোন ইংরেজ সমালোচক 'রোমান্টিসিজম্'-এর অপর নাম দিয়াছেন 'Mediaevalism' ; এবং ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যে স্কট্, কোলরিজ, কীটস্ এই তিনটি মাত্র কবিকেই ভিন্ন ভিন্ন দিক দিয়া প্রকৃত রোমান্টিক কবি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। এইরূপ নামকরণের সহিত অবশ্য আমাদের সাহিত্যের কোনও সম্বন্ধ নাই ; তবে যে কারণে এরূপ নামকরণ সম্ভব হইয়াছে, তাহার সহিত সম্বন্ধ আছে,—তাহাই আমরা মিলাইয়া দেখিব। আর একটি মাত্র লক্ষণ আমরা ইহাতে যোগ করিব। রোমান্টিক কল্পনায় আকাঙ্ক্ষা যেমন অপরিমিত তেমনিই তাহাতে তৃপ্তি নাই। অসীম আকাঙ্ক্ষার অসীম অপরিতৃপ্তি—বুক-ভাঙ্গা বেদনা ও নৈরাশ্যের সুর, বিষাদ-ব্যাকুলতা, মহৎ-জীবনের ট্র্যাজেডি, আক্ষেপ ও অনুশোচনা—ইহাই রোমান্টিক সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সুর। মহৎ-হৃদয়, অত্যুচ্চ কল্পনা, ও অতৃপ্ত বাসনার যে অনিবার্য্য পরাজয়, ও তজ্জনিত হাহাকার—তাহাই রচনার প্রকৃতিভেদে, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ আকারে, রোমান্টিক সাহিত্যে প্রকটিত হইয়াছে। নাট্যসাহিত্যে, শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডির নায়ক—ব্রুটাস, করিওলেনাস্, হ্যামলেট ; গীতিকাব্যে, বিদ্যাপতির অমর-গীতি—"জনম অবধি হাম রূপ হেনারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল" ; এবং মহাকাব্যে—'প্যারাডাইজ লষ্টে'র Satan ও 'মেঘনাদবধে'র রাবণ ;—ইহারা সকলেই উৎকৃষ্ট রোমান্টিক কাব্যের নিদর্শন। মধ্যযুগের য়ুরোপীয় সাহিত্যের 'রোমান্স' নামক যে কাব্য ও গানগুলি হইতে এই 'রোমান্টিসিজম্' নামকরণ হইয়াছে, সেগুলির সহিত এই সকল কাব্যের যথেষ্ট পার্থক্য থাকিলেও, উভয়ের মধ্যে ভাবগত একটি সাদৃশ্য আছে। প্রসিদ্ধ লেখক Andrew Lang 'রোমান্সে'র উদাহরণস্বরূপ

যে একটি সুন্দর কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা ভাবে ও রচনাভঙ্গিতে, কল্পনায় ও শব্দচাতুর্য্যে, ইংরেজী রোমান্টিক গীতিকাব্যের একটা সুর স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে, যথা—

Romance

My love dwelt in a Northern Land,
A grey tower in a forest green
Was hers, and far on either hand
The long wash of the waves was seen,
And leagues on leagues of yellow sand
The woven forest boughs between.

And through the silver Northern Light
The sunset slowly died away,
And herds of strange deer lily-white
Stole forth among the branches grey,
About the coming of the light
They fled like ghosts before the day.

I know not if the forest green
Still girdles round the castle grey
I know not if the boughs between
The white deer vanish ere the day;
Above my love the grass is green,
My heart is colder than the clay.

(২)

এইবার আমাদের নবযুগের সাহিত্যে এই রোমান্টিসিজ্‌মের গতি ও প্রকৃতি লক্ষ্য করিবার অবকাশ হইয়াছে। আধুনিক বাংলাসাহিত্যের যে যুগ মহাকাব্যের যুগ—মাইকেল, হেম-নবীনের রচনায় সেই যুগের রোমান্টিসিজ্‌ম্ সম্বন্ধে কেবল ইহাই বলা যাইতে পারে যে, তাহাতে স্বাধীন কল্পনার উচ্ছ্বাস, পুরাতন হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এক নূতন ভাবস্রোতের লীলা, পুরাণ ও ইতিহাস হইতে উপাদান-সংগ্রহ প্রভৃতি—নব-স্ফূর্ত্ত কবিচিত্তের স্পন্দন লক্ষিত হয়। কিন্তু এক 'মেঘনাদবধ' ছাড়া আর কোনও কাব্যে সার্থক ষ্টাইল বা আর্টহিসাবে এই নবভাব পূর্ণ পরিণতি লাভ করিতে পারে নাই—একটা চাঞ্চল্য বা অস্থিরতা ভিন্ন সাহিত্যে আর কিছুরই পরিচয় দেয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী সাহিত্যেও 'রোমান্টিসিজ্‌ম্' মহাকাব্যকে আশ্রয় করে নাই; সেখানে খণ্ড কাব্য ও বিশেষতঃ গীতিকাব্যেই এই ভাবধারা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, নাটকেও তাহার তেমন স্ফূর্ত্তি ঘটে নাই। তাহার কারণ—Subjectivity বা আত্মভাবের প্রাধান্যই রোমান্টিক কল্পনার বিশিষ্ট প্রেরণা; মহাকাব্যে তাহার স্থান নাই, বরং মহাকাব্য ক্লাসিক্যাল রচনারীতির কণ্টকবেষ্টনে রোমান্টিক কবির একান্ত দুরধিগম্য। কীট্‌স্

তাঁহার Hyperion সমাপ্ত করিতে পারেন নাই—Endymion-ও মহাকাব্য নয়। যেখানে বিষয়ের ও কল্পনার তাদৃশ বিস্তৃতি ছিল, সেখানে এই সকল কবিরা, স্কট্ ও বায়রণের ন্যায় কাহিনীকাব্যে, শেলীর ন্যায় নাট্য-গীতিকায় (Lyrical Drama) সেই ভাব উৎসারিত করিয়াছেন। মাইকেলের মহাকাব্য য়ুরোপীয় ক্লাসিক্যাল আদর্শে লিখিত হইলেও তাহার ছন্দ, ভাষা ও কাব্যনিহিত কবি-হৃদয়ের প্রেরণা লক্ষ্য করিলে, তাহাকে আমাদের সাহিত্যের প্রথম রোমান্টিক কাব্য বলা যাইতে পারে। কাব্যের আকৃতি বা রচনারীতিতে 'রোমান্টিসিজ্‌ম্‌' নাই সত্য, কিন্তু সমগ্রভাবে তাহার মধ্যে সর্ব্ববিষয়ে যে স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য ও চরিত্রসৃষ্টির বিশেষত্ব লক্ষিত হয়—তাহাতে যে বিদ্রোহ পরিস্ফুট হইয়াছে—তাহা কোন ইংরেজ রোমান্টিক কবির সাহস ও স্বেচ্ছাবৃত্তির সহিত তুলনায় ন্যূন নহে। বস্তুতঃ এক অমিত্রাক্ষর ছন্দেই যে প্রবল বিদ্রোহ সূচিত হইয়াছে, এবং রাবণের চরিত্রে যে ভ্রূক্ষেপহীন 'self-representation' বা কবির আত্মপ্রচার-বাসনার পরিচয় পাওয়া যায়—তাহাই তাহাকে আমাদের সাহিত্যে প্রথম ও প্রধান রোমান্টিক রচনার আসন দান করিয়াছে। তথাপি মাইকেল ও তদনুসরণকারী অন্য কবিদ্বয়ের মহাকাব্যগুলিতে যে রোমান্টিক ভাবপ্রবাহ রহিয়াছে, তাহা খুব গভীর নহে, এবং ঐ ভাবের প্রেরণা তখন যে সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাতে রোমান্টিক আর্টহিসাবে কোন কৃতিত্ব রাখিয়া যায় নাই।) য়ুরোপীয় সাহিত্যের সংঘাতে জাতির যে চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিয়াছিল, সেই আকস্মিক আকালিক জাগরণের অপরিপক্ক ও অপরিস্ফুট ফল ক্রমেই নীরস ও বিবর্ণ হইয়া গেল। মাইকেলের কাব্য অন্য হিসাবে স্থায়ী গৌরবের অধিকারী, কারণ তাহা রচনাহিসাবে অনবদ্য। তাহার আকৃতি ও প্রকৃতি যেমনই হউক, খাঁটি কাব্য-সৃষ্টিহিসাবে তাহা নিষ্ফল হয় নাই। কল্পনার সামঞ্জস্য, কাব্যের গঠননৈপুণ্য, ভাব ও চিত্রের সুপরিস্ফুট সৌন্দর্য্য 'মেঘনাদবধ' কাব্যখানিকে শ্রেষ্ঠ ক্লাসিক্যাল রচনার গৌরব দান করিয়াছে বটে, কিন্তু যে হিসাবে আমি কবিকে রোমান্টিকদিগের অগ্রণী বলিয়াছি, তাহাই নব্যসাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহাকে সমধিক স্মরণীয় করিয়াছে।

এই যুগেই, নব্যসাহিত্যের আর এক ভাগে—গীতিকাব্যে—যে রোমান্টিক ভাবধারার সূচনা হইয়াছিল, এখানে আমি সেই গূঢ়তর প্রবৃত্তির কথা বলিতেছি না। সে কল্পনা বহির্মুখী নয়—অন্তর্মুখী; তাহা মানব-জীবন ও বহির্জগৎ লইয়া নহে—একান্তভাবে আত্মপরায়ণ। এখানে আমি যে ভাবধারার কথা বলিতেছি, পরবর্ত্তীকালের বাংলা গীতি-কবিতার সুর তাহার বিপরীত; সেই সুরই শেষে মধু-বঙ্কিম-হেম-নবীনের রোমান্টিসিজ্‌ম্‌কে পরাস্ত করিয়া আধুনিক বাংলাসাহিত্যে দ্বিতীয় যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে; সে কথা আমি এই গ্রন্থে অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। এ প্রবন্ধে আমি, প্রথম যুগান্তর ও তাহার অন্তর্নিহিত ভাব-ধারার কথাই বলিতেছি।

কিন্তু ইংরেজী সাহিত্যের সংঘাত-জনিত এই নবীন চেতনা সর্ব্বপ্রথমে আমাদের সাহিত্যে যেখানে পরিপূর্ণ গৌরবে প্রোজ্জ্বল প্রভায় প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করিল, তাহা

পদ্য নয়—গদ্য, কাব্য নয়—উপন্যাস। এ যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রোমান্টিক লেখক—বঙ্কিমচন্দ্র; তাঁহার উপন্যাসগুলিই এ যুগের শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কাব্য, রোমান্টিক কল্পনার সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন। মাইকেল হৃদয়ে যাহা পাইয়াছিলেন কাব্যে তাহা ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই; তাঁহার রচনাগুলিতে আমরা অপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় পাই মাত্র। তাঁহার হৃদয়ে যে দ্বন্দ্ব জাগিয়াছিল তিনি তাহাকে আয়ত্ত করিয়া সাহিত্যে সুপ্রকাশ করিতে পারেন নাই—নূতন চিন্তা-ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া এই দ্বন্দ্বের সমন্বয় চেষ্টা করেন নাই; স্বাভাবিক কবিত্বের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছিলেন। কেবলমাত্র প্রতিভার যে শক্তি, তাহা তাঁহার মত আর কাহারও ছিল না—কিন্তু বঙ্কিমের মনীষা উচ্চতর; তাই তাঁহার ভিতরে সেই দ্বন্দ্ব এক অপূর্ব্ব সাহিত্য-সৃষ্টিতে নিঃশেষ হইতে চাহিয়াছে। দ্বন্দ্ব থাকিবে অথচ দ্বন্দ্বের অতীত হওয়া চাই—এই অতীত হওয়ার শক্তিই কল্পনার সংযমরূপে কবির প্রধান সহায়। বঙ্কিমের হৃদয় এই নব-ভাবে একেবারে কানায় কানায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সেই ভাবাতিরেককে তিনি যেন সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারেন নাই—তাহাকে যেমন অনুভব করিয়াছিলেন, তেমনি দূরে ধরিয়া তাহাকে বিশেষরূপে চিনিতে চাহিয়াছেন। একদিকে ইংরেজী সাহিত্য তাঁহাকে যেমন মুগ্ধ করিয়াছিল, তেমনই, অপরদিকে ইংরেজের ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান তাঁহার যে বিচার-বুদ্ধি জাগাইয়াছিল, তাহার আলোকে তিনি আপনার দেশের ইতিহাস ও দর্শন-বিজ্ঞানের অন্ধকার মণিগৃহে অতি সন্তর্পণে ভক্তিকম্প্রপদে প্রবেশ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু বিচারশীল বঙ্কিম দেশের অতীতকে কেবল ভাবের দ্বারাই গ্রহণ করিতে পারেন নাই; তাহার একটি ধ্যানসম্মত মূর্ত্তি গড়িয়া দেশকে ভালবাসিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের যে ব্যাখ্যা, হিন্দুদর্শনের যে অর্থ, তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সেই বিচারশীলতার সহিত সামঞ্জস্য করিয়া। মাইকেলের এসব উপসর্গ ছিল না; নবীনও ভক্তি-ধর্ম্মের প্রাবল্যে সকল দ্বন্দ্বের নিরসন করিয়াছিলেন; বঙ্কিম ইহার কোনটাই পারেন নাই। এতকথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, বঙ্কিমের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব, এবং দ্বন্দ্বাতীত হইবার আকাঙ্ক্ষা—উভয়ই প্রবল ছিল; এই গুণে, তাঁহার সাহিত্য-সাধনা, সে যুগের আকস্মিক ভাবোচ্ছ্বাসকেই আশ্রয় করিয়া নহে—আমাদের জীবনে যাহা নূতন সত্যরূপে চিরস্থায়ী হইতে আসিয়াছে, তাহাকেই বরণ করিয়া, এবং তৎসঙ্গে অতীত জাতীয়-সাধনার সংযোগ রক্ষা করিয়া—প্রকৃত নব্যসাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল।

(৩)

কিন্তু দ্বন্দ্ব রহিয়া গিয়াছে, তাঁহার প্রাণ পরিতৃপ্ত হইতে পারে নাই; তাই তাঁহার কাব্যগুলি এত মনোহারী। সৌন্দর্য্যানুভূতি, পৌরুষাভিমান ও স্বদেশপ্রীতি এই তিনের অপূর্ব্ব মিলন, এবং মানব-জীবনের গৌরব ও মাহাত্ম্যবোধ—এক অসাধারণ কবি-প্রতিভার

বলে আমাদের সাহিত্যে যে অপরূপ ভাবজগৎ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা কখনও পুরাতন হইবে না। তাঁহার উপন্যাসগুলিতে মানব-হৃদয়ের প্রবলতম আকাঙ্ক্ষা ও তাহার নিষ্ফল পরিণামের যে কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে তাহা সর্ব্বযুগের উন্নত মানব-হৃদয়ের ইতিহাস। তিনি মানব-ভাগ্যের নিষ্ঠুর নির্ম্মম বিধানের কোন সদর্থ করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতে চান নাই—সেখানে তাঁহার মজ্জাগত 'রোমান্টিসিজম্' জয়ী হইয়াছে। মহৎ প্রাণের যে শ্রেষ্ঠ প্রেরণা ও প্রাণপণ প্রয়াস, তাহা ঐ নিষ্ফলতার গৌরবেই যেন সমধিক বরণীয় হইয়া উঠিয়াছে ; নিয়তি তাহাকে নিহত করিয়াও আপনি পরাজিত হইয়াছে। সে জীবনের পরিণামদৃষ্টে অশ্রু স্তম্ভিত হইয়া যায়, মানব-জীবনের না হউক—মানব-হৃদয়ের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া জয়গর্ব্বে হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠে। নিষ্ফলতা কোথায় ? নিষ্ফলতায় কি আসে যায় ? পাওয়াটা বড় নহে, চাওয়াটাই বড়। পাওয়া কিছু যায় না, তাই বলিয়া চাওয়াটা ছোট করিব কেন ? এই চাওয়া, এই যে ক্ষুধা—ইহাই মানুষের অমরত্বের নিদান, যে পরিমাণে জগৎ এই ক্ষুধার পরিতৃপ্তিসাধনের অনুপযোগী, সেই পরিমাণে মানুষ এই জগৎ হইতে বহু ঊর্দ্ধে অবস্থিত। মানবপ্রাণের পক্ষে জাগতিক বিধি-ব্যবস্থার এই সঙ্কীর্ণতা—এই 'শেক্‌স্‌পীরীয় ট্র্যাজেডি'র প্রধান লক্ষণ পূর্ণ প্রকটিত হইয়াছে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কাব্য 'চন্দ্রশেখরে'।) প্রতাপ তখন অগাধ জলে সাঁতার দিতেছে ; যে অমৃত-লালসা তাহার মরজীবনে অমরতা আনিয়াছে, সেই অমৃত ধরণীর পাত্রে তীব্র হলাহলে পরিণত হইয়াছে, তাই সে তাহাকে নিঃশেষে বর্জ্জন করিবে—শৈবলিনীকে অতি ভীষণ শপথ করাইবে। এমনই সময় ঊর্দ্ধ আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রতাপ বলিয়া উঠিল—কি পুণ্য করিলে ঐ উপরকার নীলসমুদ্রে অবলীলায় সাঁতার দেওয়া যায় ? নিম্নে কি সংগ্রাম ! উপরে কি শান্তি ! তরঙ্গবিক্ষুব্ধ জাহ্নবী-জীবনে প্রতাপ নিরতিশয় পরিশ্রান্ত, কিন্তু তাহার আকাঙ্ক্ষা তেমনি বলবতী—সে কিছুতেই হার মানিবে না। অন্তরের ঐ বাসনা এমনি মহৎ, এমনি উচ্চ—যে, এই দুর্ভাগ্য-পীড়িত আঘাত-জর্জ্জর নিমজ্জমান মানব-সন্তান আমাদের চক্ষে আদৌ কৃপার পাত্র হইয়া উঠে নাই, পরন্তু ভক্তি ও সম্ভ্রমে আমাদের হৃদয় আপ্লুত করিয়া দেয়। (প্রতাপ যখন প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পুনরায় যুদ্ধে চলিয়াছে, তখন রামানন্দ স্বামীর প্রশ্নে সেই যে উত্তর করিল—'মরিতে যাইতেছি', সে কথার অর্থ আর কিছুই নয়, শেক্‌স্‌পীয়রের ক্লিওপেট্রা আত্মহত্যার পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিল তাহাই—'I have immortal longings in me'। আমি এই উপন্যাসকে বঙ্কিমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কাব্য বলিয়াছি এই জন্য যে, ইহার মধ্যে তাঁহার রোমান্টিক হৃদয়ের ভাবৈশ্বর্য্য যেমন পরিপূর্ণ নিখুঁত আকারে প্রকাশ পাইয়াছে, তেমন আর কোনটাতেই হয় নাই। কেন, তাহা বলিতেছি। রোমান্টিক কবিগণ যে সত্য-সুন্দরের পূজারী তাহার মধ্যে সমাজ-সম্মত নীতিবাদের দোহাই নাই ; পাপ করিলে তাহার দণ্ড, বা পুণ্যকার্য্যের পুরস্কার যে হওয়াই চাই, তাহা না হইলে কাব্যের কোনও গুরুতর দোষ ঘটে—এমন কোন ন্যায়-ধর্ম্মের প্ররোচনা তাঁহাদের

কাব্যসৃষ্টির মূলে বিদ্যমান নাই।) এ-জাতীয় কাব্যের যদি কোনও নৈতিক মূল্য থাকে তাহা আরও উচ্চাঙ্গের, এবং তাহা রসিক জনের নিকটেই আছে। (ওথেলো এমন কোন পাপ করে নাই যাহার জন্য এতবড় ভয়াবহ পরিণাম ঘটিতে পারে; হ্যামলেটও কোন পাপ করে নাই, বরং পাপের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল; কর্ডেলিয়ার অপেক্ষা মধুরতর প্রকৃতি আর কি হইতে পারে? তবে এমন সর্ব্বনাশ কেন হইল? তবে কি ঐ সকল নাটক আমাদের নীতি-জ্ঞানকে খর্ব্ব করে? পূর্ব্বে বলিয়াছি, জয়-পরাজয়, দণ্ড-পুরস্কার নহে—জীবন-সংগ্রামের ভীষণতায় মধ্যে নায়ক-নায়িকার চরিত্রের যে মহত্ত্ব বা শক্তির সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে, এ সকল কাব্যে তাহাই আমাদিগকে গভীরভাবে আশ্বস্ত করে। হৃদয় মহৎ, আকাঙ্ক্ষা মহৎ, যাহা চাই তাহা পাইবার জন্য সর্ব্বস্ব-পণ—বিরাট, দুর্ণিবার কামনাশক্তির সেই স্বতঃস্ফূর্ত্ত লীলায় এই মৃত্তিকার কারাগার চূর্ণ হইয়া যায়! সেই ধ্বংসেরই মধ্যে যে রমণীয়-গম্ভীর আলোক বিকীর্ণ হইয়া পড়ে, তাহা এই 'লোক-চরচা'র পাপ-পুণ্যবোধের ক্ষুদ্র সমস্যা পূরণ করে না; তাহা হৃদয়কে ঊর্দ্ধতর লোকে লইয়া যায়, এবং এক পরমসুন্দর অনুভাব-রসে আপ্লুত করিয়া কৃতকৃতার্থ করিয়া দেয়। তাই রোমান্টিক সাহিত্যকলা এরূপ নীতিবাদকে অগ্রাহ্য করে; কোন ধর্ম্ম বা পরলোকের আশ্বাস তাহাতে নাই। হৃদয়ের মহত্ত্বই একমাত্র ধর্ম্ম,—সে ধর্ম্মের পরিণাম-চিন্তার প্রয়োজন নাই; মনুষ্য-জীবনে নীতি যদি কোথাও থাকে, তবে হৃদয়ের সেই স্বতঃস্ফূর্ত্ত আবেগেই তাহা আছে। ধর্ম্ম-বিশ্বাস—পরলোকের আশ্বাস—মানুষের স্বভাবধর্ম্মকে খর্ব্ব করে; বরং মানব-ভাগ্যের দুর্জ্ঞেয়তা, পরজীবনের রহস্য ও তজ্জনিত নিরাশ্বাস হৃদয়কে আশ্রয়-হীন করিয়া যে নব নব ভাবলোকের সৃষ্টি করে, তাহার অসীম বৈচিত্র্য ও অনন্ত সৌন্দর্য্যই রোমান্টিক সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ। এই যে দুর্জ্ঞেয়তা, ও তজ্জনিত নিরাশ্বাসের অনির্ব্বচনীয় ভাবসৌন্দর্য্য, ইহাই 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে পূর্ণ প্রকটিত হইয়াছে। প্রতাপের যে পরিণাম তাহা কোন অর্থে পরাজয় নহে; ভবানন্দ, গোবিন্দলাল, সীতারাম, নগেন্দ্রনাথের মত, প্রতাপ কোনও পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে নাই, সে তাহার জীবন উৎসর্গ করিয়াছে। এতবড় অন্তর-সংগ্রাম আর কোন বাংলা কাব্যে চিত্রিত হয় নাই; সেই সংগ্রামে এতখানি শক্তির পরিচয়—যে শক্তি এমন অবস্থায় এমন করিয়া আত্মবিসর্জ্জন করে, প্রেমের এমন 'রূপান্তর'—আর কোথাও কাব্যসৃষ্টিতে এমন সার্থক হয় নাই। আর একটি কথা বলিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের নামকরণ ওরূপ হইল কেন? চন্দ্রশেখরের চরিত্র যেমনই হোক্, এ গ্রন্থের নায়ক অবশ্যই প্রতাপ। আমার একটি সন্দেহ আছে,—চন্দ্রশেখর, প্রতাপ ও শৈবলিনী এই তিনটি চরিত্রের ইঙ্গিত বঙ্কিমচন্দ্র বোধ হয় Tennyson-এর 'Idylls of the King'—কাব্য হইতে পাইয়াছিলেন; কারণ, এই তিনটির সহিত উক্ত কাব্যের Arthur, Lancelot ও Guinevere-এর সাদৃশ্য বেশ স্পষ্ট বলিয়া মনে হয়। শৈবলিনী যখন প্রতাপকে ভুলিয়া চন্দ্রশেখরে চিত্ত স্থির করিতেছে, তখন Guinevere-এর ঠিক ঐ অবস্থা স্মরণ হয়। তবে কি বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রশেখরকেই নায়ক করিতে চাহিয়াছিলেন?

তাহা ত' হইবার নয়। Tennyson-এর 'mid-Victorian morality' যে আর্থার-চরিত্র গড়িয়াছে, বঙ্কিমের খাঁটি রোমান্টিক প্রতিভা সে আদর্শে আকৃষ্ট হয় নাই। বঙ্কিমের Lancelot-এর কাছে বঙ্কিমের Arthur একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে; বস্তুতঃ চন্দ্রশেখর-চরিত্রে মহত্বের একটা আভাসমাত্র পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা একেবারেই ফোটে নাই; এইজন্য বঙ্কিমের কাব্য ও Tennyson-এর কাব্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। সর্ব্বশেষে আর একটি কথা না বলিলে একটু গোল থাকিয়া যাইবে। বঙ্কিমের কোন কোন উপন্যাসে ধর্ম্ম ও পরলোকের যে ইঙ্গিত আছে, তাহা সেই সান্ত্বনার নিষ্ফলতারই পরিচয় দিবার জন্য নিপুণ শিল্পীর উদ্ভাবনা। এ সম্বন্ধে বিচার করিবার কিছুই নাই। গোবিন্দলাল যখন সন্ন্যাসী হইয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'আমি ভ্রমরাধিক ভ্রমর পাইয়াছি', অথবা কবি যখন নিজেই প্রতাপের উদ্দেশে বলিলেন, 'যাও প্রতাপ সেই অমরধামে',—তখন আমাদের প্রাণ আরও অধীর হইয়া উঠে, সে সান্ত্বনা কিছুতেই গ্রহণ করে না; পাঠকের চিত্তে এইরূপ বিদ্রোহ-উদ্দীপনাই কবির অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়।

(৪)

বঙ্কিমচন্দ্রের যুগকে কেহ কেহ 'Hindu Revival' বা 'হিন্দুর নব-জাগরণের যুগ' বলিয়া থাকেন; সাহিত্যের দিক দিয়া, এরূপ বলিতে হানি নাই, যদি ইহাকে—ইংরেজী কাব্যের রোমান্টিসিজ্‌মকে Mediaevalism বলার মত—ধরিয়া লওয়া হয়। জাতীয়-সাধনার প্রতি—দেশের অতীত-ইতিহাসের প্রতি কবিত্বময় অনুরাগ বঙ্কিমের যুগে আমরা সাহিত্যক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ দেখিতে পাই, জীবনে বা সমাজ ব্যাপারে যদি কোন তরঙ্গ উঠিয়া থাকে, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। এইরূপ অনুরাগকে জাতীয়-উন্নতির পরিপন্থী বলিয়া—অতিশয় সঙ্কীর্ণ রক্ষণশীলতা বলিয়া, যাঁহারা ধিক্কৃত করিতে চান, তাঁহাদের বিচার-বুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না। বঙ্কিমের যুগ অতি প্রবল ও গভীর ভাবুকতার যুগ, অন্তর্গূঢ় দ্বন্দ্ব ও বিপ্লবের যুগ; তাহা যাহাকে আশ্রয় করিয়া যুঝিতে চাহিয়াছিল—তাহা দেশের অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা। হৃদয় চিন্তাশক্তিকে অভিভূত করিয়াছিল—এই হৃদয়-বল না থাকিলে, দেশের প্রতি স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত অনুরাগ না জন্মিলে, আজ আমরা কোথায় দাঁড়াইতাম কে বলিতে পারে! তখন বেড়া দিবার, বাঁধ বাঁধিবার আবশ্যক হইয়াছিল, নতুবা সব যায়। উচ্চ-চিন্তা বা উদারতার অভাব আর যাহার মধ্যে থাক্, যুগনায়ক বঙ্কিমের মধ্যে ছিল না। যেটুকু সঙ্কীর্ণতা ছিল তাহা ধর্ম্মের গোঁড়ামি নহে—জাতীয় সম্মানবোধ, পূর্ব্ব পিতৃগণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা;—অতি উচ্চহৃদয়ের উচ্চতম বৃত্তি, অতি পবিত্র সেন্টিমেণ্ট, অতি নির্দ্দোষ মোহ। ইহাই তাঁহার রোমান্টিসিজ্‌মের মূল; তিনি তথাকথিত ধার্ম্মিকতা জাগাইয়া তুলিতে চান নাই। তাঁহার ধর্ম্মনৈতিক প্রবন্ধগুলিও খাঁটি হিন্দু-চিন্তাপ্রসূত নয়; তাহার মধ্যে সংস্কারকের ভাব, এমন কি বিপ্লবের বীজ আছে—

রক্ষণশীলতা, সঙ্কীর্ণতা নাই। ইংলণ্ডের Oxford Movement-এর নায়ক Cardinal Newman-এর মত, অথবা জার্ম্মানীর নব্যসাহিত্যের অন্যতম নেতা Schlegel-ভ্রাতৃদ্বয়ের মত, তিনিও আচারে বিশ্বাসে রক্ষণশীল ছিলেন না।

উনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় সাহিত্য হইতে খাঁটি রোমাণ্টিক প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই, বঙ্কিমচন্দ্র একাধারে নবযুগের নূতন-মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি ও উদ্গাতা কবি হইতে পারিয়াছিলেন। তিনি, যে অর্থে—Hindu Revival-এর নায়ক, তাহা কোন অংশে সঙ্কীর্ণ নহে; তাহার দ্বারা—যেমন উৎকৃষ্ট সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছিল, তেমনই জাতির প্রাণমূলে নবজীবনসঞ্চার হইয়াছে। অতএব, 'রোমাণ্টিসিজম্' বলিতে যে ভাবধারা বুঝায়—সাহিত্যের চিরন্তন রূপ-বিচারে তাহার মূল্য যেমনই হোক, ভাবের দিক দিয়া, অর্থাৎ বিশিষ্ট কবি-প্রেরণা-হিসাবে সাহিত্যে তাহার ফলাফল অস্বীকার করা যায় না; এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তাহার ফল নিতান্ত অল্প হয় নাই।

১৩২৩

নির্দ্দেশিকা

[পত্রাঙ্কের পূর্ব্বে (*) এইরূপ চিহ্ন বিশেষ-আলোচনার নির্দ্দেশক]